রচনাবলি

[চতুর্থ খণ্ড]

সৈয়দ মুজতবা আলী

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

রচনাবলি

সৈয়দ মুজতবা আলী

চতুর্থ খণ্ড

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৬২

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

প্রথম সংস্করণ প্রথম মুদ্রণ
পৌষ ১৪২২ জানুয়ারি ২০১৬

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
চৈত্র ১৪২৩ এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ্ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
তিনশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0461-1

SYED MUJTABA ALI RACHONABOLI (Vol. 4)
Collected works of Syed Mujtaba Ali
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price : Tk. 375.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বড়বাবু

বড়বাবু	১৩
রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ	২৭
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৩৫
সরলাবালা	৩৮
হাসনোহানা	৪০
বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি	৪৩
পরিচিতি	৫০
হতভাগ্য কাছাড়	৫৩
নেতাজি	৫৬
মস্কো-যুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয়	৫৯
কৃষ্টি	৬৪
দরখাস্ত	৬৯
সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় শিকার	৭৩
অপর্ণার পারণা বা স্যালাড	৯৩
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়	৯৬
রাষ্ট্রভাষা	১০২
বন্ধ-বাতায়নে	১১২
অ্যারোপ্লেন	১১৭
চরিত্র-বিচার	১২৫
গান্ধীজির দেশে ফেরা	১২৭
তপঃশান্ত	১৩০
মৃত্যু	১৩১

কত না অশ্রুজল

কত না অশ্রুজল	১৪৫
আন্ ফ্রাঙ্ক	১৮৩

www.pathagar.com

ভরাডুবি (আন্ ফ্রাঙ্ক)	১৮৬
ধন্য অবাঙালি!	১৯৪
নট গিলটি	১৯৬
ব্রেন-ড্রেন	১৯৯
বনে ভূত না মনে ভূত	২০২
স্পাই	২০৪
আধুনিকের আত্মহত্যা	২০৯
দর্পণ	২২৩
চুম্বন	২৩৩
মরহুম অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হাই	২৩৮
সিংহ-মূষিক কাহিনী	২৪২
রাবাৎ— ইনসল্ট	২৪৬
অল-মসজিদ্-উল-আক্সা	২৪৮
ন্যাকামো	২৫১
বিশ্বভারতী প্রাগ্	২৫৪
ত্রিমূর্তি	২৫৫
রহস্য লহরি	২৫৮
দ্বন্দ্ব-পুরাণ	২৬১
মাভৈঃ	২৮১
হিটলারের শেষ প্রেম	২৮৩

হিটলার

হিটলারের শেষ দশ দিবস	৩০১
৩০ এপ্রিল— শেষ দিন	৩২১
উত্তর হিটলার	৩২৭

www.pathagar.com

সৈয়দ মুজতবা আলী (জন্ম : ১৯০৪ - মৃত্যু : ১৯৭৪)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বড়বাবু

www.pathagar.com

নিবেদন

এই সঞ্চয়নের কোনও কোনও প্রবন্ধে পুনরাবৃত্তি দোষ একাধিকবার ঘটেছে। তার প্রধান কারণ, তাবৎ প্রবন্ধ একই সময় পরপর লেখা হয়নি। ফলে কোনও প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বহু বছর পরে লিখিত অন্য প্রবন্ধের পটভূমি নির্মাণে পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু, আমার যাবতীয় প্রবন্ধের তাবৎ বিষয়বস্তু পাঠকমাত্রই স্মরণ রেখে পরবর্তী প্রবন্ধ পড়বেন, এ হেন দুরাশা আমার মতো নগণ্য লেখক করতে পারে না। এমতাবস্থায় স্মৃতিধর পাঠকের কাছে অধম কিঞ্চিৎ ক্ষমাভিক্ষা করতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে অন্য কথাটি না বললে সত্য গোপন করা হবে যে, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাবশত অহেতুক পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে, যার জন্য আমি কোনও প্রকারের ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি না। তবে ভরসা রাখি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে, যতখানি সম্ভব, ভ্রমের পুনরাবৃত্তি সংশোধন করে নিতে পারব।

বিনীত—

মুজতবা আলী

www.pathagar.com

নগরপাল বন্ধুবর

শ্রীযুত সুধীন্দ্র ও

শ্রীযুক্তা নীলিমা দত্তের

চতুর্ভদ্রচরণে

বোলপুর — সৈয়দ মুজতবা আলী

ফাল্গুন, ১৩৭২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বড়বাবু

অবতরণিকা

প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে; পিতার চেয়ে তেইশ বছরের ছোট এবং তাঁর জন্মের সময় তাঁর মাতার বয়স চৌদ্দ। কনিষ্ঠতম ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেয়ে একুশ, বাইশ বছরের ছোট।

আমি এ জীবনে দুটি মুক্ত পুরুষ দেখেছি; তার একজন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

এঁর জীবন সম্বন্ধে কোনওকিছু জানবার উপায় নেই। তার সরল কারণ, তাঁর জীবনে কিছুই ঘটেনি। যৌবনারম্ভে বিয়ে করেন, তাঁর পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। যৌবনেই তিনি বিগতদার হন। পুনর্বার দারগ্রহণ করেননি।[১] চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ এদেশে সুপরিচিত। দুঃখের বিষয় সুধীন্দ্রনাথের স্থায়ী কীর্তিও বাঙালি পাঠক ভুলে গিয়েছে।

দ্বারকানাথ যে যুগে বিলেত যান সে-সময় অল্প লোকই আপন প্রদেশ থেকে বেরুত। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তো প্রায়শ বাড়ির বাইরে বাইরে কাটাতেন। (ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই।) তাই স্বতই প্রশ্ন জাগবে, ইনি কতখানি ভ্রমণ করেছিলেন।

---

১. এ তথ্যগুলো প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী থেকে নেওয়া।

২. আমি 'ভ্রমণগমনে' পাঠও শুনেছি। কিন্তু স্পষ্টত 'জ' অক্ষর 'ত্র'-র চেয়ে ভালো।
এই কবিতাটির আর একটি পাঠ আমি পেয়েছি। কোনটা আগের কোনটা পরের বলা কঠিন। মনে হয় নিম্নলিখিতটাই আগের। এটি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত :

দীন দ্বিজের রাজ-দর্শন না ঘটিবার কারণ।

টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা ॥
ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লি মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি ॥'

www.pathagar.com

একদা কে যেন বলেছিলেন, বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই লিখে দিলেন :

ইচ্ছা সম্যক্ জগদরশনে[২] কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লি মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি!
টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা না রহে কোনও জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছু না কিছু না শুধু ভস্মে ঘি ঢালা ॥[৩]

চারটি ছত্রের চারটি তথ্যই ঠাট্টা করে লেখা। কারণ আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনিনি, বড়বাবুর (দ্বিজেন্দ্রনাথের) বেড়াবার শখ ছিল। বরঞ্চ শুনেছি, তাঁর প্রথম যৌবনে তাঁর পিতা মহর্ষিদেব তাঁর বিদেশ যাবার ইচ্ছা আছে কি না, শুধিয়ে পাঠান এবং তিনি অনিচ্ছা জানান। 'পাথেয় নাস্তি' কথাটারও কোনও অর্থ হয় না; দেবেন্দ্রনাথের বড় ছেলের টাকা ছিল না, কিংবা কর্তা গত হওয়ার পরও হাতে টাকা আসেনি, এটা অবিশ্বাস্য।

আমার সামনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি তা হলে নিবেদন করি। ১৩৩১-এর ১লা বৈশাখের সকালে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা সমাপন করে যথারীতি সর্বজ্যেষ্ঠের পদধূলি নিতে যান। সেবারে ওই ১লা বৈশাখেই বোঝা গিয়েছিল, বাকি বৈশাখ এবং বৃষ্টি না নামা পর্যন্ত কীরকম উৎকট গরম পড়বে। প্রেসের পাশের তখনকার দিনের সবচেয়ে বড় কুয়োর জল শুকিয়ে গিয়ে প্রায় শেষ হতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বাগ্রজকে বললেন যে, এবারে গরম বেশি পড়বে বলে তিনি হিমালয়ের 'ঘুমে' বাড়ি ভাড়া করেছেন, 'বড়দাদা' গেলে ভালো হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বড়বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'আমি? আমি আমার এই ঘর-সংসার নিয়ে যাব কোথায়?' যে সব গুরুজন আর ছেলেরা গুরুদেবের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরা একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলেন। হয়তো-বা মুখ টিপে হেসেও ছিলেন। তাঁর ঘর-সংসার! ছিল তো সবে মাত্র দু-একটি কলম, বাক্স বানাবার জন্য কিছু পুরু কাগজ, দু-একখানা খাতা, কিছু পুরনো আসবাব! একে বলে ঘর-সংসার! এবং তার প্রতি তাঁর মায়া! 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক স্মরণে আনতে পারবেন, নিজের রচনা, কবিতার প্রতি তাঁর কী চরম ঔদাসীন্য ছিল![৪] লোকমুখে শুনেছি সকলের অজান্তে এক ভিখিরি এসে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি বললেন, 'আমার কাছে তো এখন কিছু নেই। তুমি এই

---

৩. এর থেকে কিছুটা উৎসাহ পেয়েই বোধহয় সত্যেন্দ্রনাথ রচেন 'পিঙ্গল বিহ্বল, ব্যথিত নভতল,—'। চতুষ্পদীটি আমি স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে উদ্ধৃত করছি বলে ছন্দপতন বিচিত্র নয়। সংস্কৃত কাব্যের আদি ও মধ্যযুগে মিল থাকত না (মিল জিনিসটাই আর্য ভাষা গোষ্ঠীর কাছে অর্ধপরিচিত। পক্ষান্তরে সেমিতি আরবি ভাষাতে মিলের ছড়াছড়ি। মিলের সংস্কৃত 'অন্ত্যানুপ্রাস' শব্দটিই কেমন যেন গায়ের জোরে তৈরি বলে মনে হয়। এ নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত।)

৪. 'বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এই জন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলো কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।'— *জীবনস্মৃতি*।

www.pathagar.com

শালখানা নিয়ে যাও।' প্রাচীন যুগের দামি কাশ্মিরি শাল। হয়তো-বা দ্বারকানাথের আমলের। কারণ তাঁর শালে শখ ছিল। ভিখিরি প্রথমটায় নাকি নিতে চায়নি! শেষটায় যখন বড়বাবুর চাকর দেখে বাবুর উরুর উপর শালখানা নেই, সে নাতি দিনেন্দ্রনাথকে (রবীন্দ্রনাথের 'গানের ভাণ্ডারী') খবর দেয়। তিনি বোলপুরে লোক পাঠিয়ে শালখানা 'কিনিয়ে' ফেরত আনান। ভিখিরি নাকি খুশি হয়েই 'বিক্রি' করে; কারণ এরকম দামি শাল সবাই চোরাই বলেই সন্দেহ করত। কথিত আছে, পরের দিন যখন সেই শালই তাঁর উরুর উপর রাখা হয় তখন তিনি সেটি লক্ষই করলেন না যে এটা আবার এল কী করে!

আবার কবিতাটিতে ফিরে যাই। 'পায়ে শিকলি, মন উড়ু উড়ু' আর যার সম্বন্ধে খাটে খাটুক, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খাটে না! এরকম সদানন্দ, শান্ত-প্রশান্ত, কণামাত্র অজুহাত পেলে অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত মানুষ আমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি। আমার কথা বাদ দিন। তাঁর সম্বন্ধে বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, হরিচরণ যা লিখে গেছেন সে-ই যথেষ্ট। কিংবা শ্রীযুত নন্দলালকে জিগ্যেস করতে পারেন।

'টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা'— ও বিষয়ে তিনি জীবন্মুক্ত ছিলেন।

আর সবচেয়ে মারাত্মক শেষ ছত্রটি। তাঁর 'বিদ্যাবুদ্ধি' 'কিছু না কিছু না' বললে কার যে ছিল, কার যে আছে সেটা জানবার আমার বাসনা আছে। অবশ্য সাংসারিক বুদ্ধি তাঁর একটি কানাকড়িমাত্রও ছিল না। কিন্তু সে অর্থে আমি নেব কেন? 'বুদ্ধি' বলতে সাংখ্যদর্শনে যে অর্থে আছে সে অর্থেই নিচ্ছি— যে গুণ প্রকৃতির রজঃ তম গুণের জড়পাশ ছিন্ন করে জীবকে 'পুরুষে'র উপলব্ধি লাভ করতে নিয়ে যায়।[৫] তাঁর বিদ্যা সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি করে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই, রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের বলেন, তিনি জীবনে দুটি পণ্ডিত দেখেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁর বড়দাদা; কিন্তু রাজেন্দ্রলাল পণ্ডিত ইয়োরোপীয় অর্থে। তাঁর বড়দাদা কোন অর্থে, কবি সেটি বলেননি। এবং খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমরা যেন না ভাবি তাঁর বড়দাদা বলে তিনি একথা বললেন।

বর্তমান লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি উভয়ই অতিশয় সীমাবদ্ধ। তবে আমারই মতো অজ্ঞ একাধিকজনের জানবার বাসনা জাগতে পারে আমি কাদের পণ্ডিত বলে মনে করি। আমি দেখেছি দুজন পণ্ডিতকে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ইয়োরোপবাসের পরও।

অনেকের সম্বন্ধেই বেখেয়ালে বলা হয়, অমুকের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। আমি বলি সত্যকার বহুমুখী প্রতিভা ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই চর্চা করেছেন তিনি সমস্ত জীবন ধরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গণিতচর্চা বিদেশে প্রকাশিত করার জন্যে উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু 'বড়দাদা' বিশেষ গা-করেননি।[৬] এদেশের অত্যল্প লোকই এযাবৎ গ্রিকলাতিনের প্রতি

---

৫. অবশ্য শেষ পর্যন্ত কৈবল্য লাভের পর এটিও থাকে না। গীতাতে আছে, 'ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেবচ/ অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টকা ॥' ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অহঙ্কার (আমিত্ববোধ) এ প্রকৃতি অপরাপ্রকৃতি। প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে কৈবল্য লাভে 'বুদ্ধি'র কতখানি প্রয়োজন সেটি এস্থলে না বলে পাঠককে ঠাকুর রামকৃষ্ণের *কথামৃত*, পঞ্চম খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায় বরাত দিচ্ছি।

৬. দ্বিজেন্দ্রনাথের এক আত্মীয়ের (ইনি রবীন্দ্র সদনে কাজ করেন) মুখে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ আরম্ভ করেন তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে একদিন বলেন,

www.pathagar.com

মনোযোগ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ গ্রিকলাতিনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে শব্দতত্ত্বে সংস্কৃত উপসর্গ, তথা মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর সুদীর্ঘ রচনা অতুলনীয়। কঠিন, অতিশয় কঠিন— পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটারও উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি যে, এরকম কঠিন জিনিস এর চেয়ে সরল করে স্বয়ং সরস্বতীও লিখতে পারতেন না।

আমার যতদূর জানা, খাঁটি ভারতীয় পণ্ডিতের ন্যায় ইতিহাসকে তিনি অত্যধিক মূল্য দিতেন না— ইতিহাস 'পের সে', বাই ইট্সেলফ্। অথচ পরিপূর্ণ অনুরাগ ছিল 'ইতিহাসের দর্শন'-এর (ফিলসফি অব হিস্ট্রির) প্রতি।

সাহিত্য ও কাব্যে তাঁর অধিকার কতখানি ছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। বিশেষ বয়সে তিনি খাঁটি কাব্য রচনা বন্ধ করে দেন। কিন্তু দর্শন ছাড়া যে কোনও বিষয় রচনা করতে হলে (যেমন শব্দতত্ত্ব বা রেখাক্ষর বর্ণমালা অর্থাৎ 'বাংলায় শর্টহ্যান্ড;) মিল, ছন্দ ব্যবহার করে কবিতারূপেই প্রকাশ করতেন। বস্তুত কঠিন দর্শনের বাদানুবাদ ভিন্ন অন্য যে কোনও ভাবানুভূতি তাঁর হৃদয়মনে সঞ্চারিত হলেই তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হত সেটি কবিতাতে প্রকাশ করার। এবং তাতে যদি হাস্যরসের কণামাত্র উপস্থিতি থাকত, তা হলে তো আর কথাই নেই।

নিচের একটি সামান্য উদাহরণ নিন :

তাঁরই নামে নাম, অধুনা অর্ধবিস্মৃত, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (বরঞ্চ ডি. এল. রায় বললে আজকের দিনের লোক হয়তো তাঁকে চিনলে চিনতেও পারে) 'একদা তদীয় গণ্যমান্য বিখ্যাত ও অখ্যাত বহু বন্ধু-বান্ধবকে' একটা বিরাট ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার যে আহ্বান-লিপি 'জারি' হইয়াছিল তাহা এস্থলে অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিতেছি।—

"যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ— এ হেন যে আপনি, আপনার ভবনের নন্দন-কানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্মপলাশবসনা ভামিনী-সমভিব্যাহারে (sic), আপনার স্বর্ণশকটে অধিরূঢ় হইয়া, এই দীন অকিঞ্চিৎকর, অধমদের গৃহে, শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে আসিয়া যদি শ্রীচরণের পবিত্র ধূলি ঝাড়েন— তবে আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়। ইতি,

শ্রীসুরবালা দেবী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার।"[৭]

এর উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন,

'ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি,
যমঃ প্রতাপ নাহিক মে।
ন চ নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন
পদ্মবিনিন্দিত পদযুগ মে।

'এসব কাজ তুই করছিস কেন? যার দরকার সে অনুবাদ করিয়ে নেবে। তুই তোর আপন কাজ করে যা না।'

৭. দেবকুমার রায়চৌধুরী, *দ্বিজেন্দ্রলাল*, পৃ. ৩২০।

www.pathagar.com

আছে সত্যি পদরজরত্তি—
তাও পবিত্র কে জানিত মে
চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি,
অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে।
কিন্তু— মেঘাচ্ছন্নে শনি অপরাহ্নে
যদি গুরু বাধা না ঘটে মে।
কিম্বা (sic) যদ্যপি সহসা চুপিচুপি
প্রেরিত না হই পরধামে ॥'[৮]

গুরুজনদের মুখে এখানে শুনেছি যে সময় তিনি এই মিশ্র সংস্কৃতে নিমন্ত্রণপত্রের উত্তর দেন তখন তিনি *গীতগোবিন্দ* নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন বলে ওই ভাষাই ব্যবহার করেন। কেউ কেউ বলেন, জয়দেবই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ভাষার কাঠামো তৈরি করে দিয়ে যান। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের উত্তরও শেষের দিকটি বাঙলায়। আবার কোনও কোনও গুরুজন দ্বিতীয় ছত্রটি পড়েন, 'ন চ নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন পদ্মপলাশলোচনভামিনী মে।'

কবিতাতে সবকিছু প্রকাশ করার আরও দুটি মধুর দৃষ্টান্ত দিই।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি দেওয়া নিষেধ ছিল। একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাতর্ভ্রমণের সময় দূর হতে দেখতে পান, হেডমাস্টার জগদানন্দ রায় একটি ছেলের কান আচ্ছা করে কষে দিচ্ছেন। কুটিরে ফিরে এসেই তাঁকে লিখে পাঠালেন :

'শোনো হে, জগদানন্দ দাদা,
গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব
অশ্বে পিটিলে হয় যে গাধা—'

'গাধা পিটলে ঘোড়া হয় না'— এটা আমাদের জানা ছিল, কিন্তু 'ঘোড়াকে পিটলে সেটা গাধা হয়ে যায়' এটি দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অবদান'। এরসঙ্গে আবার কেউ কেউ যোগ দিতেন,

'শোন হে জগদানন্দ,
তুমি কি অন্ধ!'

এটির লিখিত পাঠ নেই। তাই নির্ভয়ে উদ্ধৃত করলুম। এর পরেরটি কিন্তু ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে বেরিয়েছে। এরমধ্যে ভুল থাকলে গবেষক সেটি অনায়াসে মেরামত করে নিতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের ৬৫ বৎসর বয়স হলে তিনি ভোরবেলা চিরকুটে লিখে পাঠালেন :

---

৮. যদিও দেবকুমার হতাশায় লিখেছেন তিনি এগুলো 'অবিকল মুদ্রিত' করে দিয়েছেন, তবু আমার মনে ধোঁকা আছে যে তাঁর নকলনবিশ কোনও কোনও স্থলে ভুল করেছেন। এমনকি শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে যে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রয়েছে সেটিতে 'চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি' স্থলে 'চৌদ্দপুরুষাবধি ত্রাণ পায় যদি' কে যেন মার্জিনে পাঠান্তর প্রস্তাব করছেন, হস্তাক্ষরে। তাই বোধ করি হবে। কারণ প্রতি ছত্রে ভিতরের মিল, যথা 'সম্পত্তি'র সঙ্গে 'বৃহস্পতি', 'কানন'-এর সঙ্গে 'বাহন', 'সত্যি-র সঙ্গে 'রত্তি' রয়েছে। বস্তুত দ্বিজেন্দ্রনাথের এসব রসরচনা কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি বলে শুদ্ধপাঠ জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব।

www.pathagar.com

চমৎকার না চমৎকার!
সেই সেদিনের বালক দেখো,
পঞ্চষষ্টি হল পার।
কাণ্ডখানা চমৎকার,
চমৎকার না চমৎকার!

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ততদিন কলকাতাতেই ছিলেন। মোটামুটি বলা যেতে পারে, ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় বিদ্বজ্জনসমাজের চক্রবর্তী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম (তিনি ধর্মের স্মৃতিশাস্ত্রটুকু ব্যবহার করেছেন মাত্র; মোক্ষপথ-নির্দেশক ধর্ম ও দর্শনে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল না) ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন না বলে সে যুগের অন্যতম চক্রবর্তী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের নিত্যালাপী— প্রায়ই ঠাকুরবাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করে যেতেন।[৯]

ওই সময় বঙ্কিমের বিরুদ্ধ-আলোচনা হলে তাঁর কিঞ্চিৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং ফলে, এঁর মধ্যে একজন ঠাকুরবাড়িতে কাজ করতেন বলে বঙ্কিম লেখেন, 'শুনিয়াছি ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের একজন ভৃত্য— নাএব কি কি আমি ঠিক জানি না।' অথচ দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন— আমার মনে হয় অনিচ্ছায়— বঙ্কিম সম্বন্ধে আলোচনা করেন তখন বঙ্কিম গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেন, 'তত্ত্ববোধিনীতে "নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত "ধর্ম-জিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া (বঙ্কিমের রচনাটি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হচ্ছিল—লেখক) তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোনও দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন,[১০] তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর (অর্থাৎ যাঁরা বঙ্কিমের প্রতিবাদ করেন, 'নগণ্য' অর্থে নয় — লেখক) ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধহয় বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

আমি জানি আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করবেন না, তাই আমি এঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণার উল্লেখ করলুম। বস্তুত বাঙলা দেশের এই ঊনবিংশ শতকের শেষের দিক (ফ্যাঁ দ্য সিএক্‌ল্) যে কী অদ্ভুত রত্নগর্ভা তা আজকের দিনের অবস্থা দেখে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

---

৯. ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্কিমে তখন যে বাদ-বিবাদ হয় সেসময় প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিম লেখেন, '১৫ শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপর অনেক রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবারে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইয়াছে। কথাবার্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে।' (*বঙ্কিম রচনাবলী*, সাহিত্যসংসদ, ২ খণ্ড, পৃ. ৯১৬।১৭।) বলাবাহুল্য বঙ্কিম যেতেন দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।

১০. বস্তুত তখন বাঙলা দেশে প্রচলিত ধারণা ছিল, বিদ্যাসাগর ও 'কঁৎ-এর শিষ্য' বঙ্কিমের ঈশ্বরবিশ্বাস দৃঢ় নয়।

www.pathagar.com

আমি সে আলোচনা এস্থলে করতে চাই নে। আমি শুধু নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা তত্ত্বান্বেষী তাঁদের দৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রনাথের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রায় এক বৎসর তাঁর সখা সিংহ পরিবারের সঙ্গে রাইপুরে কাটান। তার পর ১৯০৭-এর কাছাকাছি শান্তিনিকেতন আশ্রমের বাইরে (এখন রীতিমতো ভিতরে) এসে আমৃত্যু (১৯২৬) বসবাস করেন। কলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে তিনজন লোক তাঁর নিত্যালাপী ছিলেন, স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন ও রেভরেন্ড এন্ড্রুজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই ভুলে যেতেন যে রবীন্দ্রনাথের বয়সও ষাট পেরিয়ে গেছে (আমি শেষের পাঁচ বৎসরের কথা বলছি— স্বচক্ষে যা দেখেছি) এবং শাস্ত্রীমশাই যদি দ্বিজেন্দ্রনাথের কোনও নতুন লেখা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলতেন, 'এটি গুরুদেবকে দেখাতেই হবে', তখন তিনি প্রথমটায় বুঝতেনই না, 'গুরুদেব' কে, এবং অবশেষে বুঝতে পেরে অট্টহাস্য করে বলতেন, 'রবি? রবি তো ছেলেমানুষ! সে এসব বুঝবে কি?' ভুলে যেতেন, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আবার পরদিনই হয়তো বাঙলা ডিফথং সম্বন্ধে কবিতায় একটি প্রবন্ধ (!) লিখে পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথকে। চিরকুটে প্রশ্ন, 'কীরকম হয়েছে?' রবীন্দ্রনাথ কী উত্তর দিতেন সেটি পাঠক খুঁজে দেখে নেবেন।

শিশুর মতো সরল এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে সে যুগে কত লেজেন্ড প্রচলিত ছিল তার অনেকখানি এখনও বলতে পারবেন শ্রীযুত গোস্বামী নিত্যানন্দবিনোদ, আচার্য নন্দলাল, আচার্য সুরেন কর, বন্ধুবর বিনোদবিহারী, অনুজপ্রতিম শান্তিদেব, উপাচার্য সুধীরঞ্জন। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দীপেন্দ্রনাথ তাঁরই জীবদ্দশায় গত হলে পর তিনি নাকি চিন্তাতুর হয়ে পুত্রের এক সখাকে জিগ্যেস করেন, 'তা দীপু উইল-টুইল ঠিকমতো করে গেছেন তো?' এ গল্পটি বলেন শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত ও উপাচার্য শ্রীযুত সুধীরঞ্জন। সুধীরঞ্জন চিফ-জাস্টিস ছিলেন বলে আইনের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'দুশ্চিন্তা' স্বতই তাঁর মনে কৌতুকের সৃষ্টি করে— এবং গল্পটি বলার পর তিনি বিজ্ঞভাবে গম্ভীর হয়ে চোখের ঠার মানেন।

তাঁর অকপট সরলতা নিয়ে যেসব লেজেন্ড (পুরাণ) প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে একাধিক আশ্রমবাসী একাধিক রসরচনা প্রকাশ করেছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সামান্য। একবার আমার হাতে একটি সুন্দর মলাটের খাতা দেখে শুধোলেন, 'এটা কোথায় কিনলে?' আমি বললুম, 'কোপে'। 'সে আবার কী?' আমি বললুম, 'কো-অপারেটিভ স্টোর্সে'। তিনি উচ্চহাস্য[১১] (এ উচ্চহাস্য কারণে অকারণে উচ্ছ্বসিত হত এবং প্রবাদ আছে 'দেহলী'তে বসে গুরুদেব তাই শুনে মৃদুহাস্য করতেন) করে বললেন, 'ও! তাই নাকি! তা কত দাম নিলে?' আমি বললুম, 'সাড়ে পাঁচ আনা।' আমি চলে আসবার সময় একখানা চিরকুট আমার হাতে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'বউমা (কিংবা ওই ধরনের সম্বোধন), আমাকে তুমি (কিংবা 'আপনি', তিনি কখন কাকে 'আপনি' কখন 'তুমি' বলতেন তার ঠিক থাকত না— 'তুই' বলতে বড় একটা শুনিনি) সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা দিলে আমি একখানা খাতা কিনি।' তাঁর পুত্রবধূ তখন বোধহয় দু-একদিনের জন্য উত্তরায়ণ গিয়েছিলেন।

---

১১. তিনি একাধিকবার গীতা থেকে, 'প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে' 'প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লক্ষ্যবস্তুতে স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়', ছত্রটি উদ্ধৃত করেছেন।

www.pathagar.com

তাঁর এক আত্মীয়ের মুখে শুনেছি, একবার বাম্পার্-ক্রপ্ হলে পর সুযোগ বুঝে পিতা মহর্ষিদেব তাঁকে খাজনা তুলতে গ্রামাঞ্চলে পাঠান। গ্রামের দুরবস্থা দেখে তিনি নাকি তার করলেন, সেন্ড ফিফ্‌টি থাউজেন্ড'। (তাঁর 'গ্রামোন্নয়ন' করার বোধহয় বাসনা হয়েছিল।) উত্তর গেল, 'কাম ব্যাক!'

* * *

তাঁর সাহিত্যচর্চা, বিশেষত 'স্বপ্নপ্রয়াণ', মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ ও অন্যান্য কাব্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে অত্যুত্তম আলোচনা করেছেন। বস্তুত তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করেননি বলে বঙ্গজন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এ নিয়ে আরও আলোচনা হলে ভালো হয়।

আশ্চর্য বোধ হয়, এই সাতিশয় অন্-প্রাকটিক্যাল, অধ্যবসায়ী লোকটি কেন যে বাঙলায় 'শর্টহ্যান্ড' প্রচলন করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন! এ কাজে তাঁর মূল্যবান সময় তো একাধিকবার গেলই, তদুপরি আগাগোড়া বইখানা— দু দুবার— ব্লকে ছাপতে হয়েছে, কারণ তিনি যেসব সাংকেতিক চিহ্ন (সিম্‌বল) আবিষ্কার করে ব্যবহার করেছেন সেগুলো প্রেসে থাকার কথা নয়। তদুপরি মাঝে মাঝে পাখি, মানুষের মুখ, এসবের ছবিও তিনি আপন হাতে এঁকে দিয়েছেন।

প্রথমবারের প্রচেষ্টা পুস্তকাকারে প্রকাশের[১২] বহু পরে তিনি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা দেন। তার প্রাক্কালে তিনি বিধুশেখরকে যে পত্র দেন সেটি প্রথম (কিংবা দ্বিতীয়) প্রচেষ্টার পুস্তকের ভিতর একখানি চিরকুটে আমি পেয়েছি। তাতে লেখা,

'শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি বহু পূর্বে হোল্‌দে কাগজে রেখাক্ষর স্বহস্তে ছাপাইয়াছিলাম[১৩]— লাইব্রেরিতে তাহার গোটা চার-পাঁচ কপি আছে। তাহার একখানি পাঠাইয়া দিন।' নিচে স্বাক্ষর নেই। শুনেছি, স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার একখানি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করেন। প্রথমখানির সঙ্গে দ্বিতীয়খানি মিলালেই ধরা পড়ে যে, তিনি এবারে প্রায় সম্পূর্ণ নতুন করে বইখানা লিখলেন। এটির প্রকাশ ১৩১৯ সনে।

এবং বই দুইখানি না দেখা পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবেন না যে, শর্টহ্যান্ডের মতো রসকষহীন বিষয়বস্তু তিনি আগাগোড়া লিখেছেন পদ্যে— নানাবিধ ছন্দ ব্যবহার করে।

প্রথমেই তিনি লেগেছেন বাঙলার অক্ষর কমাতে; লিখেছেন—

রেখাক্ষর বর্ণমালা

॥ প্রথম ভাগ ॥

বত্রিশ সিংহাসন।
বাঙলা বর্ণমালায় উপসর্গ নানা।
অদ্‌ভুত নূতন সব কাণ্ডকারখানা ॥

---

১২. ১৩. এ পুস্তক বোধহয় কখনও সাধারণে প্রকাশ হয়নি। প্রাইভেট সার্কুলেশনের জন্য ছিল। তার অন্যতম কারণ তাতে প্রকাশক বা প্রকাশস্থানের নাম নেই। এবং লেখক বলছেন, তিনি 'স্বহস্তে' ছাপিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

য-য়ে শূন্য, ড-য়ে শূন্য, শূন্য পালে পাল!
দেবনাগরিতে নাই এসব জঞ্জাল ॥
য যবে জমকি বসে শবদের মুড়া।
জ বলে সবাই তারে— কি ছেলে কি বুড়া ॥
মাজায় কিম্বা ল্যাজায় নিবসে যখন।
ইয় উচ্চারণ তার কে করে বারণ ॥
ময়ূর ময়ূর বই মজুর তো নয়!
উদয় উদজ নহে, উদয় উদয় ॥

এরপর তাঁর বক্তব্য ছবি দিয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তিনি ড ঢ ও ড় ঢ় নিয়ে পড়লেন :

কেন এ ঘোড়ার ডিম ড-য়ের তলায়?
বুঢ়াটাও ডিম পাড়ে! বাঁচিনে জ্বালায়!
একি দেখি! বাঙ্গালার বর্ণমালী যত
সকলেই আমা সনে লড়িতে উদ্যত!
ব্যাকরণ না জানিয়া অকারণ লঢ়।
শবদের অন্তে মাঝে ড ঢ-ই তো ড় ঢ়।

দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যাপারটি তিনি আরও সংক্ষেপে সারছেন :

শূন্যের শূন্যত্ব

শবদের অন্তে মাঝে বসে যবে সুখে।
বেরোয় য়-ড়-ঢ় বুলি য-ড-ঢ'র মুখে ॥
জানো যদি, কেন তবে শূন্য দেও নীচে?
চেনা বামুনের গলে পৈতে কেন মিছে!
নীচের ছত্তর চারি চেঁচাইয়া পড়—
যাবৎ না হয় তাহা কণ্ঠে সড়গড় ॥

পাঠ

আষাঢ়ে ঢাকিল নভ পয়োধর-জালে।
বায়স উড়িয়া বসে ডালের আড়ালে ॥
ঘনরবে ময়ূরের আনন্দ না ধরে।
খুলিয়া খড়ম জোড়া ঢুকিলাম ঘরে ॥

একেই বোধহয় গ্রিক অলঙ্কারের অনুকরণে ইংরেজিতে 'বেথস্' বলা হয়। প্রথম তিন লাইনে নৈসর্গিক বর্ণনার মায়াজাল নির্মাণ করে হঠাৎ খড়ম-জোড়ার মুদ্গার দিয়ে আলঙ্কারিক মোহ-মুদ্গর নির্মাণ।

ছন্দ মিল ব্যঞ্জনা অনুপ্রাস— কবিতা রচনার যে কটি টেকনিক্যাল স্কিল প্রয়োজন তার সবটাই কবির করায়ত্ত। কোনটা ছেড়ে কোনটা নিই! এর পরেই দেখুন সাদামাটা পয়ার ভেঙে ১১ অক্ষরের (!) ছন্দ :

চারি বর্গপতি

ক চ-বরগের ক মহারথী :
ত প-বরগের ত কুলপতি;

www.pathagar.com

ন ট-বরগের ন নটবর;
র স-বরগের র গুণধর;—
চারি বরগের চারি অধিপ
বরণমালার কুলপ্রদীপ ॥

শুধু তাই নয়, পাঠক লক্ষ করবেন, প্রথম চার ছত্রের প্রথম অংশে ছ' অক্ষর, শেষের অংশে চার অক্ষর; ফলে জোর পড়বে সপ্তম অক্ষর ক, ত, ন, র-এর ওপর। এবং সেইটেই লেখকের উদ্দেশ্য, জোর দিয়ে শেখানো।

ওই যুগে অনেকেই বৈষ্ণবদের 'ঢলাঢলি' পছন্দ করতেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁদের বহু ঊর্ধ্বে। তাই :

'এই' 'এউ' 'আউ' ইত্যাদি ডিফ্‌থং-এর অনুশীলন করাতে এগুলো নিয়ে কীরকম কবিতা ফেঁদেছেন, দেখুন :

আউলে গোঁসাই গউর চাঁদ
ভাসাইল দেশ টুটিয়া বাঁধ
দুই ভাই মিলি আসিছে অই[১৪]
কী[১৫] মাধুরী আহা কেমনে কই ॥
পাষাণ হৃদয় করিয়া জয়
আধা-আধি করি বাঁটিয়া লয়
শওশ হাজার দোধারি লোক।
দোঁহারে নেহারে ফেরে না চোক ॥
কূল ধসানিয়া প্রেমের ঢেউ
দেখেনি এমন কোথাও কেউ
এই নাচে গায় দু'হাত তুলি
এই কাঁদে এই লুটায় ধূলি ॥

কে বলবে এটা নিছক রসসৃষ্টি নয়, অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা? নিতান্ত গদ্যময় শর্টহ্যান্ড— পদ্যে!

এর পর তিনি যেটা প্রস্তাব করেছেন সেটি বহু বৎসর পরে মেনে নেওয়া হল :—

শুনিবে গুরুজি মোর কি বলেন? শোনো!
তেলা শিরে তেল দিয়া ফল নাই কোনও ॥
আর্‌-ত দিলে "আর্ত"-এ ছাড়িবে আর্তরব।
আর-দ চাপাইলে পিঠে রবে না গর্দভ ॥
ইষ্ট করিও না নষ্ট বোঝা করি পুষ্ট।
অর্দ্ধে[১৬] দিয়া জলে ফেলি অর্ধে থাক' তুষ্ট ॥

---

১৪. এটি বহু বৎসর পরে বানান-সংস্কার-সমিতি গ্রহণ করেন।
১৫. পরবর্তী যুগে তিনি প্রধানত বিস্ময় স্থলে (যেমন এখানে) কী লিখতেন। অবশ্য বানান-সংস্কার-সমিতির বহু পূর্বে।
১৬. এখানে দ্ধ আছে। আজকাল প্রেসে তার উপর রেফ দেবার ব্যবস্থা আছে কিনা, অর্থাৎ দ + ধ + রেফ, জানি না।

www.pathagar.com

কর্মের ম এ ম ফলা অকর্ম বিশেষ।
কার্য্যের যয়ে য ফলা অকার্যের শেষ ॥

প্রথম পাঠ সাঙ্গ হলে 'কবি-মাস্টার' ভরসা দিচ্ছেন 'পুরো লেখা সাঙ্গ হবে অর্ধেক পাতায়।' এবং তদুপরি

কাগজ বাঁচিবে ঢের নাহি তায় ভুল।
বাঁচিতেও পারে কিছু ডাকের মাশুল ॥

এ না হয় হল। কিন্তু গড়ের মাঠে যখন কংগ্রেসিরা (তখনও কমুনিস্টি আসেননি), বাক্যের ঝড় বওয়াবেন তখন? তখন কি সেটা শব্দে শব্দে তোলা যাবে? না।

ওবিদ্যার কর্ম নহে— যখন বক্তার
মুখে ঝড় বহি চলে ছাড়ি হুহুঙ্কার—
তার সঙ্গে লেখনীর টক্কর লাগানো
এ বিদ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে হয়েছে বাগানো।
তখন
মস্তকে মথিয়া লয়ে পুস্তকের সার,
হস্তকে করিবে তার তুরুক-সোআর ॥
হইবে লেখনী ঘোড় দোউড়ের ঘোড়া
আগে কিন্তু পাকা করি বাঁধা চাই গোড়া ॥

এবং দ্বিতীয় খণ্ডের পুস্তক সমাপ্তিতে বলছেন :

তখন তাহাকে হবে থামানো কঠিন
ছুটিবে— পরাণ ভয়ে যেমতি হরিণ ॥

এই বইয়ে প্রতিটি ছত্র তুলে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু স্থানাভাব। তবে সর্বশেষে কয়েকটি ছত্র না তুলে দিলে সে আমলের কয়েকটি তরুণ— আজ তাঁরা বৃদ্ধ— মর্মাহত হবেন। কারণ রেখাক্ষর তাঁরা না শিখলেও এ কবিতাটি মুখে মুখে এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আজও সেটি কিয়জ্জনের কণ্ঠস্থ :—

আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার।
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর ॥[১৭]
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি!
কালিন্দীর কূলে বসি কান্দে গোপনারী,
তরঙ্গিনী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী ॥[১৮]
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে

---

১৭. প্রথম সংস্করণে এর পাঠ : বন্ধ হলো বৃন্দাবনে যাহার যা কাজ।
ভঙ্গ হল ভৃঙ্গগীত কুঞ্জবন মাঝ ॥

১৮. ডোঙ্গাখানি ভাসিতেছে নবেন্দুসুঠাম/পারাপার হইবার নাহি আর নাম। কালিন্দী বহিয়া যায় কান্দ কান্দ স্বরে/কুঞ্চিত কুন্তল প্রায় মন্দানিল ভরে ॥

www.pathagar.com

সিন্ধিকাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে ॥
কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট[১৯] পথে হাটে।
শুষ্ক মুখ রাধিকার দুশ্খে বুক ফাটে ॥
কৃষ্ণ বলি ভ্রষ্ট বেণী বক্ষে ধরি চাপি।
ভূপৃষ্ঠে লুটায় পড়ে মর্মদাহে তাপি ॥
কষ্ট বলে অষ্ট সখী মর্মদাহে কোলে
চিন্তা করিও না রাই কৃষ্ণ এল ব'লে ॥
এত বলি হাহু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে ॥
দুষ্ট বধে পূরে নাই কৃষ্ণের অভীষ্ট।
অদৃষ্টে অবলাবধ আছে অবশিষ্ট ॥[২০]

কে বলবে প্রথমাংশ লেখা হয়েছে ন, ঙ, ম-প্রধান যুক্তাক্ষর ও দ্বিতীয়টি স্ব-প্রধান যুক্তাক্ষরের অনুশীলনের জন্য! আরেকটি কথা এই সুবাদে নিবেদন করি— আমার এক আত্মজনের মুখে শোনা : বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রমাণ করতে চাইলেন, গীতার শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এক ব্যক্তি নন, তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বলেন, 'বঙ্কিমবাবু, এসব কী আরম্ভ করলেন, রবি? বৃন্দাবনের রসরাজকে মেরে ফেলছেন যে!' বাঙলা সাহিত্য বৈষ্ণব-পদাবলীর ওপর কতখানি খাড়া, আজ সেটা স্বীকার করতে আমাদের আর বাধে না। কিন্তু সেই মারাত্মক পিউরিটান যুগে, যখন কেউ কেউ নাকি কদম্ববৃক্ষকে 'অশ্লীলবৃক্ষ' (এটা অবশ্য বিরুদ্ধপক্ষের ব্যঙ্গ— 'রিডাকসিও অ্যাড আবসার্ডাম' পদ্ধতিতে) বলতেন তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ জানতেন, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে গীতার শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন করে ফেললে বৃন্দাবন-লীলা নিতান্তই মানবিক প্রেমে পর্যবসিত হয়; ভক্তজন তাঁদের আধ্যাত্মিক অমৃত থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রথম যৌবন থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর্ম-সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতিতে* লিখেছেন তাঁর এগারো বছর বয়সে 'আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
সে সহায় ভব-অন্ধকারে

তিনি (পিতা) নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন— সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।'

এই গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা; এবং রেখাক্ষর বর্ণমালাতেও তিনি অনুশীলন হিসেবে এটি উদ্ধৃত করেছেন। যদিও 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' তাঁর মাত্র ত্রিশটি গান পাওয়া যায়, তবু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তিনি বিস্তর গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের রচনা সম্বন্ধে এমনই উদাসীন ছিলেন— একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি— যে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখবার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি।

১৯. দ্বিজেন্দ্রনাথ বরাবর 'রাষ্ট' লিখতেন; 'রাষ্ট্র' লেখেননি।
২০. বলা বাহুল্য 'কৃষ্ণ' শব্দ 'কষ্ট' বা কেষ্ট পড়তে হবে।

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে তিনি সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শব্দতত্ত্ব, ইতিহাসের দর্শন সব জিনিস থেকে বিদায় নিয়ে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও তার অনুশীলনে নিযুক্ত হলেন। এ যে কী অভ্রভেদী দুর্জয় সাধনা তার বর্ণনা দেবার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। একদিকে ইয়োরোপীয় দর্শন তাঁর নখাগ্রদর্পণে ছিল— অন্যদিকে বেদান্ত, সাংখ্য এবং যোগ— উপনিষদ, গীতা এবং মহাভারতের তত্ত্বাংশ। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান শুধু স্পেকুলেট তথা তর্কবিতর্ক করতে শেখায় না। গোড়ার থেকেই ধ্যানধারণা, সাধনা করতে হয়। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান মেন্টাল জিমনাস্টিক নয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানধারণায় মগ্ন হলেন।

এখনও বাঙলা দেশে বিস্তর না হোক, বেশকিছু লোক বেঁচে আছেন যাঁরা তাঁর সে ধ্যানমূর্তি দিনের পর দিন দেখেছেন। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই তিনি আগের দিনের বাসি জলে স্নান করে ধ্যানে বসতেন। সেসময় ছোট ছোট পাখি, কাঠ-বেড়ালি তাঁর গায়ের উপর বসত, ওঠা-নামা করত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। পাখিরা অপেক্ষা করত, ধ্যান ভঙ্গের পর তিনি তাদের খাওয়াবেন। ময়দার গুলি বানিয়ে মুনীশ্বর তার ব্যবস্থা করে রাখত।

বহু বৎসর একাগ্রচিত্তে ধ্যানধারণা ও শাস্ত্র-চর্চার ফলস্বরূপ তাঁর গ্রন্থ, বাঙলা তত্ত্বকথার অতুলনীয় সম্পদ, 'গীতাপাঠ'।

এখানে এসে আমার ব্যক্তিগত মত অসঙ্কোচে বলছি— বিড়ম্বিত হতে আপত্তি নেই, যদি শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, আমার মতের কীই-বা মূল্য— বাঙলা ভাষায় এরকম গ্রন্থ তো নেই-ই, ভারতীয় তথা ইংরেজি, ফরাসি, জর্মনেও ভারতীয় তত্ত্বালোচনার এমন গ্রন্থ আর নেই।

যাঁদের সামনে (এবং খুব সম্ভব তাঁদের অনুরোধেই তিনি এ গ্রন্থখানি লেখেন) তিনি এই গ্রন্থখানি পাঠ করে শোনান (পুস্তকের ভূমিকায় আছে 'এই "গীতাপাঠ" তত্ত্ববোধিনী এবং প্রবাসীতে ছাপাইতে দিবার পূর্বে সময়ে সময়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আচার্যগণের সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর-ক্রমে শুনানো হইয়াছিল') তাঁদের অনেকেই ইয়োরোপীয় দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁদের বোঝার সুবিধার জন্য (আজও তাই ইয়োরোপীয় দর্শনের পণ্ডিতদের কাছে এ বইটি অমূল্য) তিনি প্রয়োজনমতো ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের অভিমতও প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করি : উপনিষদে আছে 'অবিদ্যা' শব্দটি; সেটি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'বেদান্ত এবং সাংখ্য ছাড়া আরেক শাস্ত্র আছে; সে শাস্ত্রে বলে এই যে, ১. সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি, ২. কান্টের Thing-in-itself, ৩. Schopenhauer-এর অন্ধ Will, ৪. Mill-এর ইন্দ্রিয়-চেতনার অধিষ্ঠাত্রী নিত্যা শক্তি, ইংরাজি ভাষায়— Permanent Possibility of Sensation, ৫. বেদান্তের সদসদ্‌ভ্যামনির্বাচনীয়া অবিদ্যা; পাঁচ শাস্ত্রের এই পাঁচ রকমের বস্তু একই বস্তু।' পূর্বেই বলেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথের মূল উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, বেদান্ত (দর্শন) সাংখ্য ও যোগ। পাঠক আরও পাবেন, বেন্থাম, চার্বাক, সফিস্ট, স্টয়িক্, ডারুইন, ভোজরাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, ভাস্করাচার্য, সেন্ট আইগুস্টিন, নীলকণ্ঠ, স্পেন্সার প্রভৃতি।

সম্পূর্ণ পুস্তিকায় পাঠক পাবেন কী? এর নাম নাকি গোড়াতে ছিল 'গীতাপাঠের ভূমিকা'— পরে 'গীতাপাঠ'-এ পরিবর্তিত হয়। সাংখ্য বেদান্ত তথা তাবৎ ইয়োরোপীয় জ্ঞান (এবং বিজ্ঞান) ও দর্শনের ভিতর দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ তরুণ সাধককে গীতাপাঠ এবং তার অনুশীলনে নিয়ে যেতে চান।

www.pathagar.com

তাই তিনি আরম্ভ করেছেন সাংখ্য নিয়ে।

'দুঃখত্রয়াভিঘাতজ জিজ্ঞাসা।'

অর্থাৎ 'ত্রিবিধ দুঃখের (বাইরে থেকে, নিজের থেকে এবং দৈবদুর্বিপাকে ঘটিত দুঃখ) কীরূপে বিনাশ হইতে পারে, তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়।' এবং সেটা যেন 'একান্তাত্যন্ততোৎভবাৎ' ক্ষণিক বা আংশিক বিনাশ না হয়; হয় যেন, ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক বিনাশ। কারণ, দুঃখ লোপ পেলেই সুখ দেখা দেবে। যেরকম শরীর থেকে সর্বরোগ দূর হলে স্বাস্থ্যের উদয় হয়। তা ভিন্ন স্বাস্থ্য বলে অন্য কোনও জিনিস নেই। এবং এ সুখ যা-তা সুখ নয়। উপনিষদের ভাষায় অমৃত, আনন্দ।

গ্রন্থের মাঝামাঝি এসে তিনি এই তত্ত্বটি গীতা থেকে উদ্ধৃত করে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন :

আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ
প্রবিশন্তি যদবৎ।
তদ্‌বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স
শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।

অর্থাৎ 'স্বস্থানে অবিচলিতভাবে স্থিতি করিতেছেন যে আপূর্যমান সমুদ্র, তাহাতে যেমন নদনদী সকল প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তেমনি, যিনি আপনাতে স্থির থাকেন, আর, চতুর্দিক হইতে কামনা সকল যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন; যিনি কামনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হন— তিনি না।'

এরই টীকা করতে গিয়ে তিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য, মানবমাত্রেরই জীবনের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন :

'আত্মসত্তার রসাস্বাদ-জনিত একপ্রকার নিষ্কাম প্রেমানন্দ যাহা মনুষ্যের অন্তঃকরণের অন্তরতম কোষে নিয়তকাল বর্তমান রহিয়াছে, তাহা জীবাত্মার অনন্তকালের পাথেয় সম্বল, এবং সেইজন্য তাহারই পরিস্ফুটন মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।' (*গীতাপাঠ* পৃ. ১৬২)

এই চরম মোক্ষকেই মুসলমান সাধকেরা বলে থাকেন, ফানা ও বাকা। খ্রিস্টীয় সাধকরা এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'As the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall the Lord rejoice over thee।'

এদেশে একাধিক সাধকও ওই একই বর্ণনা দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ খুব ভালো করেই জানতেন এ যুগে কেন, সর্বযুগেই মানুষ সাধনার এই কঠিন পথ বরণ করতে চায় না। তাই তিনি গীতা পাঠের তৃতীয় অধিবেশনের অন্তে বলেছেন :

'আনন্দ সম্বন্ধে এ যাহা আমি কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম— এটা সাধন' পদ্মানদীর ওপারের কথা; আমরা কিন্তু রহিয়াছি এপারে কারাবদ্ধ, কাজেই আমাদের পক্ষে ওরূপ উচ্চ আনন্দের কথাবার্তার আন্দোলন এক প্রকার "গাছে কাঁটাল— গোঁফে তেল।" এরকম বাক্যবাণ আমার সহ্য আছে ঢের; সুতরাং উহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া আমার যাহা কর্তব্য মনে হইল তাহাই আমি করিলাম;— যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হ'ন— এই জন্য পদ্মানদীর ওপার যে কীরূপ রমণীয় স্থান তাহা দুরবীনযোগে (অর্থাৎ প্রথম

www.pathagar.com

তিন অধিবেশনে তিনি যে অবতরণিকা নির্মাণ করেছেন তা দিয়ে— লেখক) তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত; অতএব যাত্রী ভায়ারা পোঁট্‌লাপুঁটুলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হউন।[২১]

এই অমূল্য পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করা আমার জ্ঞানবুদ্ধি ত্রিসীমানার বাইরে। তবে বর্ণনা দিতে গিয়ে এইটুকু নিবেদন করতে পারি, জড়-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি, তথা জীবের সুখ-দুঃখ বিশ্লেষণ করার সময় তিনি প্রধানত শরণ নিয়েছেন সাংখ্যের, সাধনার যে পন্থা অবলম্বন করেছেন সেটি যোগের এবং আস্থা ও আশা রেখেছেন বেদান্তের ওপর।

তবে এ পুস্তিকায় মৌলিকতা কোথায়? ছত্রে ছত্রে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। তিন দর্শন এক করে (প্রয়োজনমতো ইউরোপীয় দর্শন দিয়ে সেটা আমাদের আরও কাছে টেনে এনে) তার সঙ্গে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমজনিত দীর্ঘকালব্যাপী সশ্রদ্ধ সাধনালব্ধ অমূল্য নিধি যোগ করে, কবিজনোচিত অতুলনীয় তুলনা, ব্যঞ্জনা, বর্ণনা দিয়ে অতিশয় কালোপযোগী করে তিনি এই পুস্তকখানি নির্মাণ করেছেন।

সকলেই বলে, এ পুস্তক বড় কঠিন। আমিও স্বীকার করি। তার প্রধান কারণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ একই সময়ে একাধিক ডাইমেনশনে বিচরণ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও পুনরায় সবিনয় নিবেদন করি, এরকম কঠিন জিনিস এতখানি সরল করে ইতোপূর্বে আর কেউ লেখেননি।

রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ

কেউ দেশের জন্য প্রাণ দেয়, কেউবা দয়িতের জন্য, কেউ বংশের সম্মানরক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ করে। যাঁরা প্রাণ দিয়ে শহীদ হন তাঁদের অনেকেই তখন সুদ্ধমাত্র কর্তব্যবোধ থেকে, বিবেকের অলঙ্ঘ্য আদেশ পালন করার জন্যই নিজের জীবন বিসর্জন দেন। আবার কেউ কেউ ভাবেন, কর্তব্যকর্ম না করলে তাঁরা মুক্তি-মোক্ষ-নির্বাণ থেকে বঞ্চিত হবেন।

এদেশে সাধারণজনের ধারণা, মুক্তি বা মোক্ষের অর্থ নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে কঠোর-কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। অথচ আমাদের দেশে সর্ব দার্শনিক সর্ব ঋষি একবাক্যে বলেছেন মানুষের চরম কাম্য বা মোক্ষ বলতে বোঝায় পরিপূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ— যে আনন্দের সঙ্গে পার্থিব কোনও সুখেরই তুলনা হয় না। মুসলমান সাধকরা ওই কথাই বলেছেন, এবং ইহুদি মহাপুরুষ তো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "As the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall the Lord rejoice over thee" এবং এইটিই খ্রিস্টানদের মূলমন্ত্র।

২১. দ্বিজেন্দ্রনাথ বলতেন, বাংলা ভাষা এখনও এমন দুর্বল যে সূক্ষ্ম চিন্তা প্রকাশ করা কঠিন; তাই আমাদের প্রধান কাজ হবে টু বি কনসাইজ, টু বি প্রিসাইজ, টু বি ক্লিয়ার। সেটা করতে গিয়ে যদি একটি কঠিন সংস্কৃত শব্দের পরেই একটি জুতসই— not juste— সহজ বাংলা শব্দ আসে, তবে নির্ভয়ে সেখানে লাগানো উচিত। অর্থাৎ তিনি 'গুরুচণ্ডালী' অনুশাসন মানতেন না।

www.pathagar.com

কয়েক মাস পূর্বে আমি 'মৃত্যু'— হয়তো 'শোক' বললে ভালো হতো— নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যুদূত বার বার এসে তাঁকে যে কী গভীর বেদনা দিয়েছে তার বিবরণ দিই। আরও বহু, বহু বেদনা তিনি পেয়েছেন, যার স্মরণে আপন জন্মদিন উপলক্ষে পিছন পানে তাকিয়ে বলছেন—

'পায়ে বিঁধেছে কাঁটা
ক্ষতবক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দায় তলায়, পঙ্কের মধ্যে।'[১]

এসব কিছু তিনি সয়ে নিয়েছিলেন তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল দিয়ে।

কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পেয়েছেন, যখন তাঁর আত্মজন পেয়েছে আঘাত। যেখানে তাঁকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে, বেদনা-বেদনায় সে আত্মজনের ধূলিতলে অবলুণ্ঠন। সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষাও খুঁজে পাননি তখন। নিজের বেলা তিনি অন্তরের দিকে তাকিয়ে নিরাশ হননি, কিন্তু আত্মজনের বেলা?

বলা হয়, পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন শোক পায় মা, যখন সে পুত্রহারা হয়। এবং সে মা-ও যদি দুঃখিনী হয়, এবং ওই পুত্রই যদি একমাত্র পুত্র হয়। এবং তার চেয়ে নির্মম আঘাত পান যদি সে মাতার আপন পিতা জীবিত থাকেন তবে তিনি। রবীন্দ্রনাথের বেলা তাই হয়েছিল। 'দুর্ভাগিনী'কে মনশ্চক্ষুর সামনে রেখে বলছেন—

'তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।
যেন ভয় লাগে
প্রণয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে।
এ কী দুঃখভার,
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ
তব ভূত ভবিষ্যৎ!
প্রকাণ্ড এ নিষ্ফলতা
অভ্রভেদী ব্যথা
দাবদগ্ধ পর্বতের মতো
খররৌদ্রে রয়েছে উন্নত

---

১. সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,
'যে খেয়ার কর্ণধার তোমাদের নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা।' — *পূরবী*

www.pathagar.com

লয়ে নগ্ন কালো শিলাস্তূপ
ভীষণ বিদ্রূপ।'

কী হৃদয়ভেদী তুলনা! যেন আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে এসেছে 'লাভা' হয়ে মাতার বাৎসল্যরস! তার পর সে মায়ের আকুলিবিকুলি—

'সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে;
ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে
খুঁজিছ বুকের ধন সে আর তো নেই
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই।'

এর চেয়ে নিদারুণতর বর্ণনা আর মানুষ কী দিতে পারে— মায়ের পুত্রশোকের? আমার লেখাপড়া সীমাবদ্ধ। পাঠক, তুমি যদি পেয়ে থাকো, তবে সেটি আমায় পাঠিও। না, ভুল বললুম, পাঠিও না! পড়ে দরকার নেই।

'চিরচেনা ছিল চোখে চোখে
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।'

স্বল্পপরিচিত জনের মৃত্যুসংবাদ শুনেই আমরা শোকে, এক অজানা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যাই— আর, এখানে কল্পনা করুন যে বাচ্চাটিকে মা ক্ষণতরে চোখের আড়াল হতে দিত না, যার কণ্ঠস্বরের সামান্যতম রেশ, যার ক্ষুদ্রতম অঙ্গভঙ্গি তার চেনা, আর সে যখন হঠাৎ খেলা ছেড়ে ছুটে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলত, 'মা', সে হঠাৎ নেই হয়ে গেল? চিরতরে? এ মহাশূন্যতা— কল্পনায়— এ যে আপন মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও নির্মম!

কিন্তু তার পর শুনুন, বীভৎসতার চূড়ান্ত :

দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ,
সেখানে বিদ্রূপ।

চরম দুঃখে মা যখন কোনও সান্ত্বনা পেয়ে তার পুজোর ঘরে মাথা কুটতে গেল— ইষ্টদেবতার সামনে— , যে-দেবতা যুগ যুগ ধরে এ-বংশের কত না দুঃখী, কত না দুঃখিনীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন, সে-দেবতা তখন যদি লজ্জায় গা-ঢাকা দিতেন তা-ও কিছু বিচিত্র হত না, কিন্তু তার চেয়েও পৈশাচিক পরিস্থিতি। দেবতার জায়গায় হনুমান বসে মায়ের শোকের দিকে ভেংচি কাটছে!

* * *

এসব দুঃখ থেকে নিষ্কৃতির পথ কি রবীন্দ্রনাথ জানতেন না? জানতেন, খুব ভালো করেই জানতেন— অন্তত আমার মনে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অ্যাকাডেমিক অর্থে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন না। অর্থাৎ কান্টের 'থিং ইন্ ইট্‌সেল্‌ফ্' এবং বেদান্তের 'অ-সত্য' একই বস্তু কি না, ব্রহ্ম যেখানে নির্গুণ সেখানে ত্রিগুণ তাঁর ভিতরে লোপ পায়, না, তিনি তখন ত্রিগুণের অতীত এসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কালক্ষেপ করতেন না। কিন্তু একথা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন ভারতীয় দর্শনের চরম আদর্শ আনন্দ। এবং

www.pathagar.com

সাংখ্য দর্শনের গোড়ার কথাই হচ্ছে, দুঃখের কারণ কীভাবে, ঐকান্তিকরূপে সমূলে বিনষ্ট করা যায়। আমার সঙ্গে সকলে একমত না হলেও নিবেদন করি, যোগ যত না ব্রহ্মানন্দের পথ নির্দেশ করেছেন, তার চেয়ে বেশি পথ নির্দেশ করেছেন আপনাতে স্থির হয়ে আপন 'আনন্দময় কোষ' থেকে আনন্দ আহরণ করতে। বেদান্ত প্রণবমন্ত্রের অনুসরণে ত্রিভুবনে— অর্থাৎ ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ— যা কিছু আনন্দ আছে তা ব্রহ্মে লীন আছে জেনে সেই ব্রহ্মে যোজিত হয়ে অনন্তকালব্যাপী অনন্ত-দেশব্যাপী পরিপূর্ণানন্দে লীন হতে আদেশ দেয়।

পাঠক! মা ভৈঃ! আমি তোমাকে দর্শনশাস্ত্রের গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে অযথা হয়রান করতে চাইন— যদিও আমার বিশ্বাস পতঞ্জলি, কপিল, শঙ্কর তাঁদের মূল বক্তব্য আমাদের মতো সাধারণজনের জন্যই বলে গেছেন, এবং সামান্য একটু শ্রদ্ধাভরে এঁদের মূল বক্তব্য বার বার পড়লে আপাতদৃষ্টিতে যা কঠিন বলে মনে হয় সেটি সরল হয়ে যায়। অবশ্য এঁরা প্রত্যেকেই যেস্থলে আপন বক্তব্য সপ্রমাণ করতে, অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে আপন বক্তব্যের কোনখানে গরমিল সেটা বোঝাতে গিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কের অবতারণা করেছেন— সেগুলো বোঝা পরিশ্রম ও ধ্যান-সাপেক্ষ। যেমন স্বাস্থ্যবান হতে হলে বৈদ্যরাজ প্রদত্ত কয়েকটি মূলসূত্র পালনই যথেষ্ট; পুরো আয়ুর্বেদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করা পরিশ্রমসাপেক্ষ ও নিষ্প্রয়োজন।

এসব তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো করেই জানতেন।

এবং সেটা সপ্রমাণ করা কঠিন নয়।

* * *

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ কবিতা রচনা করে যান অস্ত্রোপচারের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। এবং সকলেই জানেন, সে অস্ত্রোপচার ব্যর্থকাম হয়, ও কবি অন্য কোনও রচনাতে হাত দিতে পারেননি। এ কবিতা সকলেই পড়েছেন, তবু আলোচনার সুবিধার জন্য এটি তুলে দিচ্ছি :

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে!
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চির স্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।

www.pathagar.com

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে না পারে তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

শেষ লেখা, ৩০ জুলাই ১৯৪১

এস্থলে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, রবীন্দ্রনাথ কোনও বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ করবার জন্য কবিতা লিখতেন না। একথা তিনি নিজেও একাধিকবার বলেছেন। কবিতা তার নিজের মহিমায় মহিমময়ী,— দর্শন বিজ্ঞান এমনকি ধর্মের সেবা-দাসী হয়েও সে তার চরম মোক্ষের অনুসন্ধান করে না (ধর্মও ঠিক সেইরকম দর্শন বা বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়)। কাল যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ঐতিহাসিক কড়ায় কড়ায় প্রমাণ করে দেন যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আদৌ হয়নি, কৃষ্ণার্জুন সংবাদের তো কথাই ওঠে না, তা হলেও গীতার মূল্য কানাকড়ি কমবে না। মধুসূদন যখন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,

'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়!'

তখন তিনি একথা সপ্রমাণ করতে কোমর বাঁধেননি যে, 'আশার ছলনে' ভুলতে নেই। বস্তুত তিনি তার পরও আশার ছলনে ভুলেছেন, বেঁচে থাকলে আরও ভুলতেন— এবং না ভুললে আমাদের ক্ষতি হত।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, পৃথিবী নিশ্চল এবং ধ্রুবতারা ধ্রুবস্থির। বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু বলেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড— মায় ধ্রুবতারা— প্রচণ্ড গতিবেগে কোনও অজানার দিকে যে ধেয়ে চলেছে সে খবর কেউ জানে না। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন,

'দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।'

তখন তিনি কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝে, তার পর হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সেটি কবিতার রসে প্রকাশ করছেন না। এটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, পুত্রশোকে মাতার কাতরতা যেমন সোজা অনুভূতি, প্রিয়জনবিরহ আমাদের বুকে যেরকম সরাসরি বেদনার অনুভূতি এনে দেয়, সেইরকম।

তাই যখন কবি বলছেন 'তোমার সৃষ্টির পথ' 'বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ' করে রেখেছ তখন তিনি একটি সহজ সত্য অনুভব করেছেন। এটি দার্শনিক গবেষণা নয়।

এখন প্রশ্ন, এই 'ছলনাময়ী'টি কে?

তিনি পরব্রহ্ম হতে পারেন না, কারণ তাঁর লিঙ্গ নেই, এবং এ-স্থলে শব্দটি পরিষ্কার স্ত্রীলিঙ্গে আছে।

www.pathagar.com

তাই এখানে সাংখ্যদর্শনের আশ্রয় নিলে কবিতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝবার সুবিধে হয়— রসগ্রহণ অবশ্য অন্য ক্রিয়া।

'কপিল মুনির চরম বক্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিই আপন অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সুখ-দুঃখাদির গুণদ্বারা বন্ধন করেন, এবং প্রকৃতিই মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারণ করিয়া সুখ-দুঃখাদির হস্ত হইতে জীবকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন।'[২]

এই টীকাটি করেছেন রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাপাঠ' গ্রন্থে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতে এঁর মতো তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তিনি তাঁর জীবনে আর দেখেননি।[৩] পাছে পাঠক ভাবেন আমি আমার নিজস্ব টীকা দিয়ে তাঁকে অতিশয় কঠিন বস্তু সাতিশয় সরল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের টীকা উদ্ধৃত করলুম।

তা হলে দাঁড়াল এই :

'হে ছলনাময়ী' (অয়ি প্রকৃতি!), তুমি তোমার আপন হাতে 'সৃষ্টির পথ' (যে-পথ দিয়ে মানুষ চলে) 'বিচিত্র ছলনা' দিয়ে কন্টকাকীর্ণ করে রেখেছ। (যেমন দড়ির টুকরো দেখে সাপ ভেবে আঁৎকে উঠি, আবার ঝিনুকের টুকরোটাকে কোম্পানির টাকা ভেবে উল্লাসে নৃত্য করি)। তার পর কবি এই 'বিচিত্র ছলনা' উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করছেন, চতুর্থ ছত্রে,— 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে।' যে 'জীবন সরল' বলে মনে হয়, সেখানে রয়েছে 'মিথ্যা বিশ্বাসে'র ছলনা (তাই প্রকৃতি 'ছলনাময়ী')। এই 'মিথ্যা বিশ্বাস' কী সেটা রবীন্দ্রনাথ এ কবিতা লেখার সতেরো বছর পূর্বে বর্ণনা করেছেন— তাঁর আপন জীবনে,

---

২. ঠাকুর রামকৃষ্ণ বোঝাতেন উপনিষদ দিয়ে : 'বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে আবার অবিদ্যা-রূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়; আর অবিদ্যা-রূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়। তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ সংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য এইসব হয়। অবিদ্যামায়া পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।'

উপনিষদে আছে : 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে,
ততো ভূয়ো ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।'

অর্থাৎ,

'যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে।'
তাহা অপেক্ষা আরো ঘোরতর অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে যাহারা বিদ্যায় রত।'

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ।

এখানে স্পষ্টত একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। সেটা সরল হয়, কান্ট যেটাকে thing-in-itself বলেছেন সেটাকে অবিদ্যা অর্থে নিলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই অর্থে নিয়েছেন। তাঁর মতে, 'এই জিনিসই সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি, শোপেন-হাওয়ারের অন্ধ Will, Mill-এর ইন্দ্রিয়চেতনার অধিষ্ঠাত্রী নিত্যাশক্তি, ইংরাজিতে Permanent possibility of sensation, বেদান্তের সদ্‌সদ্‌ভ্যামনির্বাচনীয়া অবিদ্যা।' সাংখ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বুঝবার চেষ্টা করলে সরল হয় বলে আমি সাংখ্য নিয়েছি।

৩. সুদ্ধমাত্র পণ্ডিত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নাম করতেন স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের।

www.pathagar.com

'পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে সে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে সে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে।'

আর একথা বুঝতে তো কণামাত্র অসুবিধা হয় না, সরলকেই ফাঁকি দেয় ধুরন্ধর! বিদ্যাসাগরের মতো সরল লোকই ঠকেছেন সবচেয়ে বেশি!

এর পর আবার একটুখানি সাংখ্যদর্শনে আসতে হয়। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যার নাম মহান দেওয়া হয়েছে সেই মহান শব্দের অর্থ অবাধিত অপরিচ্ছিন্ন (বাঙলা মলিন অর্থে নয়, সংস্কৃত অর্থে অখণ্ডিত) বুদ্ধিতত্ত্ব।

এই মহান-ই চিরানন্দের পথ দেখায়।

সেই মহান-কে, 'হে ছলনাময়ী,' তুমি 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ' পেতে

'প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত'

অর্থাৎ মহান-কে আচ্ছাদিত করেছ। সাংখ্যের সেই মহান-কে এখানে কবি 'মহত্ত্ব'রূপে ব্যবহার করেছেন। এর পর বোঝার সুবিধার জন্য একটি 'কিন্তু' যোগ দিতে হবে।[৪] পড়তে হবে, (কিন্তু) 'তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।'

এরপর বাকি কবিতাটুকু সহজ; তাতে তিনটি কথা আছে :

১. যে-পথ দিয়ে জীবন ছলনা থেকে মুক্ত হয়ে 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' পায়, সেটা তার ভিতরেই আছে। সেটা তার 'অন্তরের পথ'।

২. সে যখন মানুষকে সরল বিশ্বাস করে ঠকবে, সে হয়তো জানতেই পারবে না যে বুদ্ধিমতী (ছলনাময়ী) তাকে ঠকাচ্ছে, এবং অন্য লোক তার সরলতা ও ছলনাময়ীর নষ্টামি দেখে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে— 'লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।'

৩. সে-ই শুধু 'শান্তির অক্ষয় অধিকার পায়' যে 'অনায়াসে' 'ছলনা সহিতে' পারে। সেই লোক যে ছলনাময়ীকে— তা সে রমণীরূপেই দেখা দিক, আর পুরুষরূপেই দেখা দিক [সে ছলনা— সে বেদনা— তিন প্রকারের হতে পারে : ক. বাহ্যবস্তু-ঘটিত খ. আপনা-ঘটিত কিংবা গ. দেবতা-ঘটিত— অর্থাৎ অ্যাক্সিডেন্টাল] সে যখন তার বেদনার জন্য দায়ী দুষ্টকে কঠোর সাজা দিয়ে প্রতিহিংসা নেয় না, হাসিমুখে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নেয়— সেই পায় 'শান্তির অক্ষয় অধিকার।' (অবশ্য সে যখন লোকের কাছে আরও বেশি হাস্যাস্পদ, বিড়ম্বিত।)

আবার অন্তরের পথে ফিরে যাই। এ প্রবন্ধে সেইটেই মূল বক্তব্য।

এই অন্তরের পথের শেষ প্রান্তে আছেন জ্যোতির্ময় পুরুষ। কুরান শরিফও বলেন তিনি জ্যোতিস্বরূপ।[৫]

---

৪. মনে রাখতে হবে এ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ডিক্‌টেট্ করেন। যখন সেটি read-back করা হল তখন তিনি বলেছিলেন যে, ওটাকে আবার দেখে দিতে হবে। সে সুযোগ তিনি পাননি।

৫. কুরান শরিফ, ২৪ অধ্যায়, 'অন্-নূর' (জ্যোতি) মণ্ডল দ্রষ্টব্য। বাইবেলেও মহাপুরুষ তাঁর প্রভু ইয়াহ্‌ভেকে অগ্নিরূপে দেখেছিলেন। সর্বকলুষ পুড়ে গিয়ে জীবাত্মা যখন অগ্নিশিখারূপে পরিবর্তিত হয় তখন ব্রহ্মাগ্নিতে লীন হতে মাঝখানে আর কোনও প্রতিবন্ধ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ তাই গেয়েছেন, 'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই।'

www.pathagar.com

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর জীবনে কতবার উল্লেখ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই! তিনিই জীবন-দেবতা। যে পাঠক 'জীবন-দেবতা' জাতীয় কবিতা কঠিন বলে মনে করেন তিনি যেন গল্পে গল্পে বলা— ওই বিষয় নিয়েই— 'সিন্ধুপারে' (*চিত্রা*) কবিতাটি পড়েন। কবি এক গভীর রাত্রে হঠাৎ ডাক শুনতে পেয়ে, ঘুম থেকে জেগে উঠে, 'দুরু-দুরু বুকে' বাইরে এসে দেখেন, 'কৃষ্ণ অশ্বে' বসে আছে এক 'রমণীমূরতি'— 'আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে অদূরে পুচ্ছ ভূতল চুমে।' কবিকে নিয়ে রমণী উধাও— 'বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় ঘোড়া।' তার পর কী হল, পাঠক নির্ভয়ে পড়ে নেবেন, ঠিক 'কথা ও কাহিনী'র গল্পের মতো সরল— সাস্‌পেন্‌স নষ্ট হবে বলে আমি আর বাকিটা বললুম না।

এঁকে তিনি ঠিক চিনতে পারেননি বলে রবীন্দ্রনাথ বার বার দুঃখ করেছেন :

'জানি, জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।'

এবং এই ধরনের ক্ষোভ ও আক্ষেপ কবি বহু শত বার করেছেন। এ নিয়ে কৌতূহলী তরুণ পাঠক চর্চা করলে উপকৃত হবেন।

তা হলে প্রশ্ন, এই 'অন্তরের পথ' ধরে তিনি সেই 'অন্তরের গহনবাসী'র সম্মুখীন হলেন না কেন?

তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল ছিল, জীবনমরণ পণ করে যে কোনও সাধনার পথে এগিয়ে যাবার মতো বিধিদত্ত বীর্যবল তাঁর ছিল, তিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষোত্তম ছিলেন— এসব কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠতম ভ্রাতার সম্বন্ধে এখানকারই এক গুরুজনকে বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে— রবির কখনও পা পিছলোয়নি!'

তবে শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সে সাধনা করলেন না কেন, যাতে করে তিনি দুঃখবেদনার ওপারে চলে যেতে পারেন?

আমার মনে হয়— এবং পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, এইখানে এসে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল না-ও হতে পারে— তা হলে তাঁকে কাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। আমার দুঃখানুভূতি হবে, আমার আনন্দোল্লাস হবে, পুত্রবিয়োগে, সন্তানহারা মাতার হাহাকারে আমার অনুভূতির কেন্দ্র, আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে তবে তো আমি সেটাকে রসস্বরূপে প্রকাশ করতে পারব। যদি মহাপুরুষের বাণী

'সর্বদা নিত্য প্রত্যক্ষ আত্মনে তন্ময় হয়ে থাকবে'

বরণ করে নিই, তবে সুখদুঃখ আমাকে স্পর্শ করবে কী করে?

প্রাচীন যুগের কথা বলা কঠিন। এ যুগে দেখতে পাচ্ছি, যে-দ্বিজেন্দ্রনাথ (শুনেছি মধুসূদনের মতো কবি তাঁর কবিতা পড়ে বলেছিলেন, ওই একটিমাত্র লোক কবিতা লিখতে পারে; হ্যাট্ অফ্ টু দ্যাট ম্যান্— তাকে নমস্কার) 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র মতো অতুলনীয় কাব্য রচনা করে বাগ্দেবীর বরপুত্ররূপে স্বীকৃত হলেন, তিনি যেদিন থেকে তাঁর 'অন্তরের পথে'র প্রয়াণ আরম্ভ করলেন, সেদিন রুদ্ধ হল— কিংবা আপন হাতেই তিনি রুদ্ধ করলেন— গোলাপের-পাপড়ি-ছড়ানো পথের শেষের ('প্রিম্‌রোজ পাথ টু ইটার্নেল বন-ফায়ার') কাব্যলক্ষ্মীর দেউল-দ্বার। স্বামী বিবেকানন্দের অতুলনীয় সৃজনীশক্তি ছিল; প্যারিসে (বোধ

www.pathagar.com

হয়) তিনি একখানা উপন্যাসও আরম্ভ করেছিলেন— শেষ করলেন না কেন? শ্রীঅরবিন্দও কবিতা রচেছিলেন, কিন্তু সে তো গায়ত্রীর সমগোত্র— আপনার আমার নিত্যদিনের হাসিকান্নার সন্ধান তাতে কোথায়? ঠাকুর রামকৃষ্ণ, দক্ষিণভারতের রমণ মহর্ষি উভয়ই এ যুগের বিখ্যাত পরমহংস, জীবন্মুক্ত। সাধারণজনের সুখদুঃখ নিয়ে এঁরা আলোচনা করেছেন অতি ললিত মধুর ভাষায়— কিন্তু সে তো রসসৃষ্টি নয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, দাসী মুনিব-বাড়িতে কাজ করে নিখুঁতভাবে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে আপন বাড়িতে আপন বাচ্চার কাছে। আমরা এ সংসারের কর্তব্য-কর্ম করব দাসীর মতো, কিন্তু মন পড়ে রইবে ব্রহ্মার পদতলে!

এই উপদেশ নিয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন, দাসীকে যদি আদেশ করা হয়, তাকে কাপড় কাচা বাসন মাজার মেকানিক্যাল রুটিন কাজ নয়, তন্ময় হয়ে গাইতে হবে গান, কিংবা উদ্ভাবন করতে হবে কাঁথা সেলাইয়ের নিত্য-নব প্যাটার্ন— পারবে কি সে? দাসী কেন, যদি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বলা হত, জমিদারি চালানো বা ছাত্র-অধ্যাপনা নয়— এগুলো মোটামুটি মেকানিক্যাল কাজ— তোমাকে তন্ময় হয়ে গাইতে হবে গান কিংবা রচতে হবে কবিতা অথচ তোমার সর্বসত্তা পড়ে থাকবে পরব্রহ্মের পদপ্রান্তে, তবে তিনি কি সেটা পারতেন? এই ডবল তন্ময়তা কি সম্ভবপর? হয়তো ধর্মসঙ্গীত রচনার সময় সম্ভবপর (যদিও কেউ কেউ বলেন, তাঁর ধর্মসঙ্গীত অনবদ্য হলেও তাঁর প্রেম বা প্রকৃতি সঙ্গীতের তুলনায় নিচে) কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম বেদনার স্মরণে তন্ময় হয়ে সে-বেদনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর, বিশ্বজননমস্য রূপ দিয়ে সৃষ্টি করা কি সম্ভবপর? দুঃখে যে-জন অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যে জন বিগতস্পৃহ সে তো শান্ত; শান্ত রস কি রস? খ্রিস্টান মিস্টিক তরুণ সাধককে বলেছেন, 'যা বলার এই বেলা বলে নাও। ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর যে অভূতপূর্ব আনন্দ পাবে তখন আর কোনও কিছু বলতে চাইবে না।'

চতুর্দিক থেকে তারস্বরে প্রতিবাদ উঠবে— আমি জানি— তবু ক্ষীণকণ্ঠে নিবেদন করে যাই, রবীন্দ্রনাথ সেই ব্রহ্মানন্দে লীন হতে চাননি। তিনি আমাদের মতো পাপীতাপীদের যে ভাঙা নৌকা, সেটা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চাননি। সুখের মলয় বাতাসে ঝঞ্ঝাবাতের ক্রূর আঘাতে নিমজ্জমান তরীতে বসে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, আমাদেরই হৃদয়ের গীতি— যে গীতির প্রকাশক্ষমতা আমাদের নেই।

যুধিষ্ঠিরের মতো তিনিও স্বর্গারোহণ করতে চাননি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রাপ্য সম্মানের শতাংশের একাংশও পাবেন বলে আমি আর আশা করি না।

এই যে আজ আমরা অজন্তা বাঘগুহার ছবি নিয়ে এত দাপাদাপি করি, অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুর কীর্তিকলাপ নিয়ে গর্ব অনুভব করি— আমাদের চোখের সামনে

www.pathagar.com

এঁদের তুলে ধরল কে? এবং তখন তাঁকে কী অন্যায় প্রতিবাদের সামনে না দাঁড়াতে হয়েছিল! শুধু প্রতিবাদ নয়, নীচ আক্রমণ।

আজ আর তাই নিয়ে ক্ষোভ করি না। তার কারণ, প্রতিবাদ এবং ভিন্নমত (অপজিশন) না থাকলে অসৎ মানুষ যে আরও কতখানি অসততার দিকে এগিয়ে যায় সে তো আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পারছি। রামানন্দের শতদোষ থাকতে পারে কিন্তু তিনি অসৎ, একথা বললে আমাদের মতো লোক মানবজাতির ওপর শ্রদ্ধা হারাবে। তিনি সৎ ছিলেন তৎসত্ত্বেও তাঁর অপজিশনের দরকার ছিল। পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রার চেয়েও বেশি।

এই বক্তব্যটি আবার উল্টো করেও দেখা যায়।

আশুতোষ কৃতী পুরুষ। রামানন্দ ও আশুতোষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। কিন্তু একটি বিষয়ে দুজনাতে বড়ই মিল। দুজনাই জহুরি। ভারতের সুদূরতম প্রান্তের কোন এক নিভৃত কোণে কে কোন গবেষণা নিয়ে পড়ে আছে, আশুতোষ ঠিক জানতেন। তাকে কী করে ধরে নিয়ে আসা যায় সেই সন্ধানে লেগে যেতেন। রামানন্দের বেলাতেও ঠিক তাই। কোথায় কোন এক অখ্যাতনামা কাগজে তার চেয়েও অখ্যাতনামা এক পণ্ডিত তিন পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশ করেছে— ঠিক ধরে ফেলতেন রামানন্দ! আপন হাতে চিঠি লিখে তাঁকে সবিনয় অনুরোধ জানাতেন তাঁর কাগজে লেখবার জন্য। শুধু তাই নয়, এ পণ্ডিত কোন বিষয়ে হাত দিলে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ জ্যোতি বিকশিত হবে সেটি ঠিক বুঝতে পারতেন— সেদিকে ইঙ্গিতও দিতেন কোনও কোনও স্থলে।

তাই রামানন্দ ছিলেন আশুতোষের অপজিশন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন কৈশোরে পা দিয়েছে। ক্রটি-বিচ্যুতি অতিশয় স্বাভাবিক। আশুতোষ তার গুরু, রামানন্দ তার গার্জেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সৌভাগ্য যে, সে এই মণিকাঞ্চন সংযোজিত বিজয়মাল্য একদিন পরতে পেরেছিল।

*   *   *

সে যুগের *প্রবাসী*তে এক মাসে যা নিরেট সরেস বস্তু বেরুত, এ যুগের কোনও মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকা পূর্ণ এক বছরেও তা দেখাতে পারবে না। অবশ্য একথাও স্বীকার করি,— ঈশান ঘোষ 'জাতক' অনুবাদ করলেন বাঙলায় (জর্মন, হিন্দি বা অন্য কোনও অনুবাদ তার শত যোজন কাছেও আসতে পারে না) এবং তার সমালোচনা করলেন বিধুশেখর। এ যুগে কই ঈশান, কোথায় বিধুশেখর? এ সুবাদে আরেকটি কথার উল্লেখ করি। রামানন্দের উৎসাহ না পেলে বহু পণ্ডিতই হয়তো তাঁদের গবেষণা ইংরেজিতে প্রকাশ করতেন; বাঙলা সাহিত্যের বড় ক্ষতি হত।

*   *   *

রামানন্দ ছিলেন চ্যামপিয়ন অব লস্ট কজেস— তাবৎ বাঙলা দেশে দুজন কিংবা তিনজন হয়তো লেখাটি পড়বেন, তিনি দিতেন ছাপিয়ে, কারণ দার্শনিক রামানন্দ জানতেন 'কান্টীয় দর্শন ও পতঞ্জলির পথমধ্যে কোলাকুলি'[১] জাতীয় প্রবন্ধ লিখতে পারে এমন লোক দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো আর কেউ নেই। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, রামানন্দ মাসের পর মাস দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অপাঠ্য' প্রবন্ধরাজি প্রকাশ করেছিলেন, কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই কোনও প্রবন্ধ লেখার কিছুদিন পরেই সেটি ছিঁড়ে ফেলতেন। (ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য

---

১. হুবহু শিরোনামটি আমার মনে নেই বলে দুঃখিত।

www.pathagar.com

জ্ঞান সে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাকিটুকু রমন মহর্ষির কাছ থেকে ও বিবেকানন্দ পড়ে। হিন্দু দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে সুফিতত্ত্বের মূল মর্মকথা বুঝিয়ে দেন। সুফিতত্ত্বে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে)।

এই দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলায় শর্টহ্যান্ড বই ছাপিয়েছিলেন। তার ১২/২৪ বছর পর রামানন্দের অনুরোধে বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ সেটি আবার নতুন করে লেখেন। রামানন্দ তাবৎ বইখানা নিজের খর্চায় ব্লক করে ছাপান (কারণ এতে প্রতি লাইনে এত সব সিম্‌বল্ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল যে এছাড়া গত্যন্তর ছিল না)। এটা আরেকটা লস্‌ট্ কজ্। এরকম বই কেউ পড়েও না। কিন্তু রামানন্দ ঘন ঘন তাড়া না লাগালে এই অতুলনীয় পুস্তক সৃষ্ট হত না।

আবার অন্য দিকটা দেখুন। পাবলিসিটি কারে কয় সেটা মার্কিনদের পূর্বেই রামানন্দ জেনে গিয়েছিলেন। সে যুগের যে কোনও 'প্রবাসী' সংখ্যা নিলেই পাঠক তত্ত্বকথাটি বুঝে যাবেন।

রামানন্দ কোহিনূর বেচতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে মুড়িও বেচতেন। কিন্তু কখনও ভেজাল বেচেননি।

এই পাবলিসিটি ব্যাপারে স্বর্গত চারু বাঁড়ুয্যেকে স্মরণে এনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানানো উচিত।

'প্রবাসী'র কথা (এবং সুদ্ধমাত্র যেকথা লিখতে গেলেই পুরোপুরি একখানি ভল্যুম লিখতে হয়; আমার মনে হয় প্রবাসীর কর্মকর্তারা যদি 'প্রবাসী সঞ্চয়ন' জাতীয় একটি ভল্যুম বের করেন তবে বড় ভালো হয়— এতে থাকবে প্রবাসী থেকে বাছাই বাছাই জিনিস) বাদ দিলেই আসে 'মডার্ন রিভ্যু'র কথা। তখনকার দিনে মডার্ন রিভ্যু খাস লন্ডনে প্রচারিত যে কোনও কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। আজও প্রাচ্যভূমিতে এরচেয়ে সেরা ইংরেজি মাসিক বেরোয়নি।

* * *

প্রবাসী ও মডার্ন রিভ্যু ('বিশাল ভারতে'র সঙ্গে আমি পরিচিত নই; পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে— 'হিন্দির পৃষ্ঠপোষক রামানন্দ'— লিখবেন) এই একাধিক পত্রিকার মাধ্যমে রামানন্দ ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় এনে দেন স্পষ্ট চিন্তন, স্পষ্ট ভাষণ ও সর্বোপরি নির্ভীকতম সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রচার। আমার মতো বহু মুসলমান তখন রামানন্দকে চিন্তার জগতে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

তার পর এমন একদিন এল যখন তাঁকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হল না। কিন্তু একশোবার বলব, তিনি তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে যেটি সত্য পথ বলে ধরে নিয়েছিলেন সেই পথেই এগোলেন। কোনও সস্তা রাজনীতির চাল তাতে এক কানাকড়িও ছিল না।

বিশ্বভারতীতে আমি ছাত্র থাকার সময় পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রামানন্দ কিছুদিনের জন্য অধ্যক্ষ ছিলেন। সে-সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য না হলেও তাঁর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছি। অন্য সব কথা বাদ দিন, আমাকে স্তম্ভিত করেছিল তাঁর চরিত্রবল। এবং সঙ্গে সাতিশয় মৃদুকণ্ঠে কঠোরতম, অকুণ্ঠ সত্যপ্রচার।

* * *

এদেশে এরকম একটি লোক আজ চাই। কর্তাদের কানে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য।

* * *

ওঁ শান্তিঃ, শান্তি, শান্তিঃ।

www.pathagar.com

সরলাবালা

সরলাবালার অমরাত্মার উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাই।

বাঙলার সংস্কৃতি জগতে তিনি এতই সুপরিচিতা যে, বহু কীর্তিমান লেখক তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করবেন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অকুণ্ঠ প্রশংসা করবেন, তাঁর সরল জীবনাদর্শ তিনি দেশের-দশের চিন্ময় জগতে যে কতখানি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন, তা দেখে বারবার বিস্ময় মানবেন।

কিন্তু আমরা যারা তাঁর স্নেহ, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি— আমাদের শোকের অন্ত নেই যে, আজ আমরা যাঁকে হারালুম, তাঁর আসন নেবার মতো আর কেউ রইলেন না। সাহিত্য জগতে তিনি ছিলেন আমাদের স্নেহময়ী মাতার মতো। আমরা জানতুম, যে সাপ্তাহিক-দৈনিক পত্রিকার জগতে আমরা বিচরণ করি, সেখানে নানা বাধাবিঘ্ন আছে, কিন্তু একথা আরও সত্যরূপে জানতুম যে, শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের ফরিয়াদ-আর্তনাদ এমন একটি মাতার কাছে নিয়ে যেতে পারব, যেখানে সুবিচার পাবই পাব।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না।

১৯৪৪ ইংরেজিতে আমি 'সত্যপীর' নাম নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পরবর্তী স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি। দুটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরই সরলাবালার এক আত্মীয়, আমার বন্ধু এসে আমাকে জানালেন, আমার লেখা তাঁর মনঃপূত হয়েছে।

নিজেকে ধন্য মনে করেছিলুম। ওইদিনই আমার আত্মবিশ্বাসের সূত্রপাত।

তাই আজ স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথাও বার বার মনে পড়ছে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এবং সরলাবালার অনুমোদন না পেলে বাঙালিকে আমার সামান্য যেটুকু বলার ছিল, সেটুকু বলা হত না।

একটুখানি ব্যক্তিগত কথা বলা হয়ে যাচ্ছে, সেটা হয়তো দৃষ্টিকটু ঠেকবে, কিন্তু আজ যদি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা সর্বজনসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ না করি, তবে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ-নেমকহারামের আচরণ হবে। বরঞ্চ সে-আচরণ দৃষ্টিকটুকর হোক।

একথা সত্য, 'আনন্দবাজার', 'হিন্দুস্থান', 'দেশ' পত্রিকায় আমার একাধিক বন্ধু ও স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁদের একজনের— এঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি— মাধ্যমে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু একথা আরও সত্য যে, এঁরা সকলেই সহৃদয় বলে আমার মতো আরও বহু বহু অচেনা-অজানা লেখককে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছেন। সুরেশচন্দ্র যেমন একদিকে পাকা জহুরির মতো কড়া সমালোচক ছিলেন, অন্যদিকে ঠিক তেমনি অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। এই দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে তিনি অনেক সময় অভাজন জনকেও গ্রহণ করতেন— আমি তাদেরই একজন।

সুরেশচন্দ্রকে আমি বাঘের মতো ডরাতুম, যদিও খুব ভালো করেই জানতুম যে, তাঁকে ডরাবার কণামাত্র কারণ নেই। কঠিন কথা দূরে থাক— যে ক বৎসর আমি তাঁর স্নেহ-রাজত্বে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলুম, তার মধ্যে একদিন একবারও তিনি আমার লেখার সমালোচনা করেননি, কোনও আদেশ বা উপদেশও দেননি।

www.pathagar.com

মনে পড়ছে, ১৯৪৪-৪৫ সালে কলকাতায় একবার একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়। আফটার-এডিট না লিখে লিখলুম একটি কবিতা। মনে ভয় হল, আফটার-এডিটের এরজাৎস তো কবিতায় হয় না! তাই এ নিয়ে গেলুম সুরেশবাবুর কাছে স্বহস্তে। তিনি মাত্র দুটি ছত্র পড়েই প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন। 'ওরে— এঁকে চা দে, আর কী দিবি দে, আর'— বাক্য অসমাপ্ত রেখে তিনি ফের কাজে মন দিলেন।

তবু তাঁকে আমি ডরাতুম। কিন্তু যেদিন শুনলুম, সুরেশচন্দ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন সরলাবালাকে এবং তিনি আমার রচনার ওপর আশীর্বাদ রেখেছেন, সেদিন আমার মনে এক অদ্ভুত সাহস সঞ্চার হল। আমার মনে হল, পত্রিকা জগতের সুপ্রিমকোর্টের (তখন বোধহয় প্রিভি কৌন্সিল ছিল) চিফ জসটিসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল— সে জগতে যদি আমার মনোবেদনার কারণ ঘটে, তবে আপিল করব খুদ সুপ্রিমকোর্টে! অবশ্য আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমাকে কখনও স্মল-কজ কোর্টেও যেতে হয়নি। হবে না, সে বিশ্বাসও ধরি।

এটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয়। বহু কর্মী, প্রচুর সাহিত্যিক আমার কথায় সায় দেবেন।

সরলাবালা ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্লের (এন্ড অব দি সেঞ্চুরির) লোক। গত শতাব্দীর শেষ এবং এ শতাব্দীর অর্ধাধিক তিনি দেখেছেন। ফরাসিতে যেমন এঁদের ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্লের প্রতিভূ বলে, আরবিতে ঠিক তেমনি বলে জুঁ অল-করনেন— 'দুই শতাব্দীর মালিক'। এঁদের সম্বন্ধে লেখা কঠিন। বঙ্কিম-রমেশের মধ্যাহ্ন গগন, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উদয় সরলাবালা চোখের সামনে দেখেছেন— এবং আর পাঁচজনের তুলনায় অনেক বেশি ভালো করে দেখেছেন, কারণ সাহিত্যে তাঁর রসবোধ ছিল তো বটেই, তদুপরি তাঁর আসন ছিল ঘোষ-সরকার উভয় পরিবারের পত্রিকা-জগতের মাঝখানে। এদিকে বৈষ্ণবধর্মের রসকুণ্ডে তিনি আবাল্য নিমজ্জিতা, অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আন্দোলন, বিবেকানন্দের সকর্মযোগ এবং সর্বশেষ শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। অত্যন্ত উদারচিত্ত না হলে মানুষ এ তিনটেকে একসঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। আমার কাছে আরও আশ্চর্য বোধ হয়, যে রমণী কোনও বিদ্যালয়েও কখনও যাননি, চিরকাল অন্তঃপুরের অন্তরালেই রইলেন, তাঁর পক্ষে এতখানি উদার, এতখানি ক্যাথলিক হওয়া সম্ভব হল কী প্রকারে?

ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্ল সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু পড়েছি, কিন্তু তার অধিকাংশ— অধিকাংশ কেন, প্রায় সমস্তটাই পুরুষের লেখা। তার মাঝখানে সরলাবালার কোমল নারীহৃদয় সবকিছু অনুভব করেছে হৃদয় দিয়ে, মাতৃরসে সিক্ত করে। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলব, তাঁর বর্ণনা 'রিচ্ উইদ্ নলেজ' না হতে পারে সর্বক্ষেত্রে, কিন্তু নিশ্চয় নিশ্চয় অতিনিশ্চয় 'রেডিয়েন্ট উইদ্ লাভ্'।

অথচ তাঁর লেখাতে ভাবালুতা উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নেই। অত্যন্ত মধুর, আন্তরিক লেখার মধ্যেও সর্বক্ষণ পাই, কেমন যেন একটা বৈরাগ্যের— ডিটাচমেন্টের ভাব। আমার মনে হয়, তিনি বাল্যকাল থেকে অনেক শোক পেয়েছিলেন বলেই বৈরাগ্যযোগে আপন চেষ্টায় সেসব শোক সংহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচনাতে পদে পদে তারই পরিচয় পাই।

ছেলের হৃদয়ের আঁকুবাঁকু মা কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারেন, এবং তিনি যখন সেটা সরল ভাষায় প্রকাশ করেন, তখন ছেলে বিস্ময় মানে, যে জিনিস সেই ভালো করে বুঝতে পারেনি, মা বুঝল কী করে এবং এত সরল ভাষায় প্রকাশ করল কী করে?

www.pathagar.com

বাঙলার চিন্ময় জগতে সরলা ছিলেন মাতৃরূপা। অতি অল্প বয়সেই তিনি মাতৃক্রোড় পেতে দিয়েছিলেন বাঙলার তরুণকে। তাই শুনতে পাই, বাঙালির ওপর যখনই অত্যাচার এসেছে, তিনি ক্ষুব্ধা মাতার মতো অনশন করেছেন। এবং তাই তিনি শেষ দিন পর্যন্ত বাঙালির মনোবেদনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে অতি মহৎ ভাষায় সেটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

সে ভাষায় আছে দার্ঢ্য অথচ মাধুর্য।

এবং সর্বোপরি সে ভাষা অতিশয় সরলা।

সার্থক নাম সরলাবালা ॥

হাসনোহানা

বছর বারো পূর্বে ভারতীয় একখানা জাহাজ সুয়েজের কাছাকাছি লোহিত সাগরে আগুন লেগে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কাপ্তেন সারেঙ মাঝিমাল্লা বেবাক লোক মারা যায়। আশপাশের জাহাজ মাত্র একটি অর্ধদগ্ধ জীবন্মৃত খালাসিকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। তাকে সুয়েজ বন্দরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবরের কাগজে মাত্র কয়েক লাইনে সমস্ত বিবরণটা প্রকাশিত হয়, এবং সর্বশেষে লেখা ছিল, সেই অর্ধদগ্ধ খালাসিটি কাতরকণ্ঠে জল চাইছে কিন্তু বার বার জল এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও জল খাচ্ছে না।

অলস কৌতূহলে আমি আর পাঁচজনের মতো খবরটি পড়ি। কিন্তু হঠাৎ মগজের ভিতর ক্লিক্ ক্লিক্ করে কতকগুলি এলোপাতাড়ি ফেলে-দেওয়া টুকরো টুকরো তথ্য একজোট হয়ে কেমন যেন একটা প্যাটার্ন তৈরি করে ফেলল।

প্রথমত, সুয়েজ বন্দরের কাছে-পিঠে আমি আমার প্রথম যৌবনের একটি বছর কাটিয়েছিলুম। সেখানে 'জল'-কে 'মা'-ই বলা হয়; যদিও খাঁটি আরবিতে 'জল'-কে 'মা-আ' বলা হয়। দ্বিতীয়ত ভারতীয় জাহাজের খালাসি পুব বাঙলার মুসলমান হওয়ারই কথা। এবং পুব বাঙলায়, বিশেষ করে সিলেট মৈমনসিং অঞ্চলে 'মা'-কে 'মা-ই' বলে।

অতএব খুব সম্ভব ওই অর্ধ-দগ্ধ খালাসি বেচারি আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে কাতরকণ্ঠে আপন মাতাকে স্মরণ করে বার বার যে 'মা-ই' 'মা-ই' বলছিল তখন সে সুয়েজের আরবিতে জল চাইছিল না। তাই জল দেওয়া সত্ত্বেও সে সে-জল প্রত্যাখ্যান করছিল।

অর্থাৎ একই শব্দ একই ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধরতে পারে।

তাই একটি শব্দ নিয়ে আমি হালে অনেক চিন্তা করেছি।

হাসুনোহানা। রাজশেখরবাবু এইভাবেই বানান করেছেন। কিন্তু বানান নিয়ে আমার মাথাব্যথা নয়। শিরঃপীড়া শিকড়ে। অর্থাৎ শব্দটার রুট কী? ব্যুৎপত্তি কী?

রাজশেখর বলছেন, [জাপানি।=পদ্মফুল] সাদা সুগন্ধ ছোট ফুল বিঃ (অশুদ্ধ কিন্তু সুপ্রচলিত)।

সুবল মিত্র বলছেন, জাপানি। একরকম ছোট সুগন্ধি ফুল।

www.pathagar.com

বাঙলায় আর যে দু-খানা উত্তম অভিধান আছে তার প্রথম, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* এবং দ্বিতীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙলা ভাষার অভিধান*। উভয় অভিধানেই শব্দটি নেই। এটা কিছু বিচিত্র নয়। পঞ্চাশ-ষাট বছর মাত্র হল শব্দটা লেখাতে ঢুকেছে— আমার যতদূর জানা।

শুনেছি, বাঙলা থেকে সংস্কৃতাগত শব্দ বাদ দিলে শতকরা ষাটটি শব্দ আরবি ফারসি কিংবা তুর্কি। ডজন দুত্তিন পর্তুগিজ এবং শ-কয়েক ইংরেজি। ফরাসি ইত্যাদি নগণ্য। জাপানি আর কোনও শব্দ বাঙলাতে আছে বলে জানিনে। আমরা শান্তিনিকেতনের লোক 'কিমোনো'— জাপানি আলখাল্লা— শব্দটা ব্যবহার করি, কিন্তু সেটি কোনও অভিধানে ঢুকেছে বলে জানিনে, সাহিত্যে তো নয়ই। কিমোনো পরিহিত সত্যপ্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি রবীন্দ্ররচনাবলীতে পাওয়া যায়।

তাই প্রশ্ন, হঠাৎ দুম্ করে একটা জাপানি শব্দ বাঙলায় ঢুকল কী করে? তবে কি জাপান থেকে এসেছে হাসনোহানা ফুল? সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা? চিত্রকর বিনোদ মুখুজ্যে, নন্দলালের নন্দন বিশ্বরূপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জাপান দেখে এসেছেন। অন্ধ্রের বীরভদ্র রাও, মালাবারের হরিহরণ। এঁরা সবাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। তাই এঁদের চিনি। এঁরা সবাই অজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে বলেন হাসনোহানা ফুল জাপানে নেই— অর্থাৎ আমরা এদেশে যেটাকে হাসনোহানা বলে চিনি— এবং শব্দটার ব্যুৎপত্তি জাপানি এ সম্বন্ধে সকলেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন। তার অন্যতম কারণ এঁরা সকলেই বাঙলা জানেন— বীরভদ্র হরিহরণ শান্তিনিকেতনে নন্দলালের সাহচর্যে অত্যুত্তম বাঙলা শিখেছেন— এবং জাপানি আর কোনও শব্দ হুট্ করে বাঙলায় ঢুকে গিয়ে থাকলে তাঁরা এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

কলকাতার উর্দুভাষী, তথা বাঙলা এবং উর্দু দোভাষীরা বলেন, হুস্ন্-ই-হিনা। 'হুস্ন্' শব্দটি আরবি, অর্থ সৌন্দর্য, খুবসুরতি— যার থেকে আমাদের মহরমের হাসন হোসেন জিগির— শ্লোগান— শব্দদ্বয় এসেছে। 'হিনা' শব্দ বাঙলায় হেনা। রবীন্দ্রনাথের গান আছে হেনা, হেনার মঞ্জরি। হেনা শব্দের অর্থ মেহদি। হাসনোহানার পাতা অনেকটা মেহদি-পাতার মতো। তা হলে দাঁড়াল এই— 'হেনার সৌন্দর্য'। অর্থাৎ সুন্দরতম হেনা। অর্থাৎ হেনা par excellence। কিন্তু জিনিসটা তো আর 'হেনা' নয়।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ লক্ষ্ণৌ-দিল্লি, আজমির-বরদা সর্বত্রই এ ফুলটি ডাকা হয় রাতকি রানি নাম ধরে। গুজরাতে অবশ্য রাত-নি রানি ধরে। অর্থ, রাতের রানি। হুস্ন্-ই-হিনা সমাস এঁরা চেনেন না। দিল্লিতে আপনি হাসনোহানার আতর কিনতে পাবেন। কিন্তু চাইবার সময় বলতে হবে, রাতকি রানির আতর। হাসনো-হানা বা হুস্ন্-ই-হিনা বললে চলবে না। খাস হেনার আতর আলাদা।

কাবুল কান্দাহার তব্রিজ তেহরানে এ ফুল নেই। ত্রিশ বছর পূর্বে ছিল না একথা আমি বুক ঠুকে বলতে পারি। হেনা অর্থাৎ মেহদিপাতা অবশ্য আছে। এই ইরানের কবিরা ভারতের মেহদির প্রচুর গুণ-গান গেয়েছেন। যথা—

পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা
ইরান দেশের ভূঁয়ে,
মেহদির পাতা কড়া লাল হয়

www.pathagar.com

ভারতের ভুঁই ছুঁয়ে।
নিস্ত দর্ ইরান, জমিন্ সমান-ই
তহ্সিল-ই কামিল
তা নিয়ামিদ্ সোই হিন্দোস্তান
হিনা রঙিন ন্ শুদ্।[১]

হাসনোহানা গাছ ইরান-তুরানে নেই কিন্তু শব্দটা তো অভিধানে থাকতে পারে— যেমন 'আকাশ কুসুম' কিংবা 'অশ্ব-ডিম্ব' ত্রিভুবনে নেই বটে (যদিও তার অনুসন্ধান চলে, যেমন পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শোপেনহাওয়ার দর্শনচর্চার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'অমাবস্যার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্ব অণ্ডের অনুসন্ধান') তবু অভিধানে শব্দগুলো পাওয়া যায়। হাতের কাছে রয়েছে স্টাইনগাস্ সাহেবের অত্যুৎকৃষ্ট — এমনকি সর্বোৎকৃষ্ট বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না— অভিধান। আর রয়েছে ক্যাথলিক পাদ্রি হাভা সাহেবের আরবি কোষ, বেইরুৎ থেকে প্রকাশিত। এই ফারসি আরবি কোনও কোষেই হুস্ন্-ই-হিনা নেই। 'হুস্ন্' ও 'হিনা'র মাঝখানে যে 'ই' আছে এটি খাঁটি ফারসি। কাজেই এই সমাসটি আরবি অভিধানে থাকার কথা নয়। তবু, যেহেতু আরবরা ইরান বিজয়ের পর বহু ফারসি শব্দ আপন ভাষায় গ্রহণ করে, তাই ভাবলুম, হয়তো শব্দটা থাকতেও পারে। বিশেষ করে ফুলের মামেলা যখন রয়েছে। কারণ 'গুল' ফারসিতে 'ফুল'।

'আপ' (সংস্কৃত অপ্) ফারসিতে 'জল'। অর্থাৎ আমরা যাকে বলি গোলাপ ফুল। আসলে কিন্তু গোলাপ (গুলাপ) অর্থ রোজওয়াটার। আরবিতে 'গ' এবং 'প' ধ্বনি নেই বলে গোলাপ হয়ে গেল 'জুলাব'। গোলাপ জল বিরেচক। তাই বাঙলাতে 'জোলাপ' 'গোলাপ' দুটি সমাসই প্রবেশ করেছে।

তা সে যাই হোক, আরবরা যখন 'গুল' নিয়েছে তখন হাসনোহানা নিতে আপত্তি কী?

কিন্তু আরবি অভিধান নীরব। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় উর্দু অভিধানও শব্দটির উল্লেখ করে না। উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষীরা হাসনোহানাকে 'রাতকি রানি' বলেন বলুন, কিন্তু কোষকার কলকাতায় প্রচলিত হুস্ন-ই-হিনা তাঁর অভিধানে দিলে ভালো করতেন।

তাই আমার সমস্যা:—

১. হয় শব্দটা জাপানি থেকে এসেছে।

২. নয়, এটি কলকাতার উর্দুভাষীদের নিরবদ্য 'অবদান'।

---

১. উর্দুতে হেনা নিয়ে অজস্র দোহা কবিতা আছে। হেনা বলছে—

পিস্ গয়ি তো পিস্ গয়া,
ঘুঁ হো গয়া তো হো গয়া
নাম তো বর্গে হিনাকা
দুল্হিনোঁ মে হো গয়া

'আমায় পিষে ফেললে তো ফেললে, আমি রক্তাক্ত হয়ে গেলুম তো গেলুম। কিন্তু কনেদের ভিতর তো মেহদি পাতার নাম রাষ্ট্র হল।' ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান কনেদের মেহদি দিয়ে হাত রাঙা করতে হয়। আরেক কবি বলেছেন, 'হেনার পাতার উপর হৃদয়-বেদনা লিখি; হয়তো পাতাটি একদিন প্রিয়ার হাতে পৌঁছবে।'

www.pathagar.com

পাঠক ভাববেন না আমি রাজশেখরের ভুল দেখাবার জন্য এ আলোচনা তুলেছি। রাজশেখর শত ভুল করলেও তাঁর অভিধান *চলন্তিকা* শতায়ু— সহস্রায়ু। *চলন্তিকা* চলে এবং চলবে।

আমার নিবেদন, বাঙলা দেশে এখন গোটা চারেক বিশ্ববিদ্যালয়। সেগুলোতে বাঙলা ভাষা পুরো সম্মান পাচ্ছে। বাঙলায় আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দ নিয়ে পয়লানম্বরি গবেষণা হওয়া উচিত।

ইতোমধ্যে কোনও পাঠক-পাঠিকা যদি বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন তবে বড় উপকৃত হই।[২]

বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি

আজ যদি শুধুমাত্র সংস্কৃত পুস্তকপত্র থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে হয় তা হলে এদেশে মুসলমান ধর্ম আদৌ প্রবেশ করেছিল কি না সে নিয়ে বিলক্ষণ তর্কের অবকাশ থাকবে। অথচ আমরা ভালো করেই জানি, মুসলমান আগমনের পরও প্রচুর সংস্কৃত পুস্তক লেখা হয়েছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা পাননি সত্য, কিন্তু তাঁদের ব্রহ্মোত্তর-দেবোত্তর জমিজমার উপর হস্তক্ষেপ না হওয়ার ফলে তাঁদের ঐতিহ্যগত বিদ্যাচর্চা বিশেষ মন্দীভূত

---

২. 'হাসনোহানা' যখন 'দেশে' বেরোয় তখন এ বিষয়ে 'দেশ' পত্রিকায় একাধিক পত্র 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বাড়ির লোক আমার লেখার কাটিং রাখে, আলোচনার রাখে না। যতদূর মনে পড়ছে, একাধিক লেখক আপ্রাণ চেষ্টা দেন, আমাকে বোঝাবার জন্য; 'হাসনোহানা' ও 'হেনা' ভিন্ন। আমার রচনাটি একটু মন দিয়ে পড়লে আমি যে দুটোতে ঘুলিয়ে ফেলিনি সেটা পরিষ্কার হবে। 'হেনা— par excellance' এস্থলে ওই দুটি ফরাসি শব্দ বোঝায় যে par excellance রূপে যে বস্তু ধারণ করে, সে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্র ও বর্ণের হতে পারে। একটি মহিলা সুদূর 'হৈদ্রাবাদ' থেকে 'হেনা' ও 'হাসনোহানা'র পাতা আলাদা করে, নিশ্চয়ই অনেকখানি কষ্ট স্বীকার করে পাঠান। তাঁকে ধন্যবাদ। দুটি গাছই আমার বাগানে আছে ॥... অন্য একজন লেখেন, 'সুনীতিবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, হাসনোহানা জাপানি শব্দ।' সুনীতিবাবু দৃঢ় না ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন সেটা গুরুত্বব্যঞ্জক নয়, গুরুত্ব ধরত যদি পত্রলেখক সুনীতিবাবুর যুক্তিগুলোর উল্লেখ করতেন। কারণ আমার এক সহকর্মী হিন্দি ও উর্দু বাবদে তাঁর আপন কর্মক্ষেত্রে, সুনীতিবাবুরই মতো যশস্বী পণ্ডিত (নাম বলে কাউকে 'বুলি' করার কী দরকার!) দৃঢ়তর কণ্ঠে বলেন, সমাসটা ফারসি— এদেশে নির্মিত।... তবে এস্থলে বিশ্বকোষের শ্রীযুত পূর্ণ মুখুয্যে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি লেখেন যে, যে সময়ে এদেশে হাসনোহানা ফুল বিদেশ থেকে আসে তখন জাপানিরা কলকাতার বাজারে 'হাসনোহানা' নাম দিয়ে একটি সুগন্ধি পদার্থ (সেন্ট) ছাড়ে। তাঁর চিঠির ভাবার্থ এই ছিল। তাই আমার মনে হয়, সেই সেন্টের নাম নিয়ে ওই সময় আগত বিদেশি ফুলকে 'হাসনোহানা' নাম দেওয়া হয়। এটা অসম্ভব নয়। প্রাগুক্ত উর্দু পণ্ডিত সেটা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, তিনি ছেলেবেলা থেকেই 'হুস্‌ন্‌-ই-হিনা' শুনেছেন। ওই সেন্ট কলকাতা আগমনের বহু পূর্ব থেকে।

www.pathagar.com

হয়নি। কিন্তু এইসব পণ্ডিতগণ পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থেকেই আপন আপন লেখনী সঞ্চালনা করেছেন।[১] অল্লোপনিষদ্ জাতীয় দু-চারখানা পুস্তক নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত। বরঞ্চ এরা সত্যানুসন্ধানকারীকে পথভ্রষ্ট করে।

এ এক চরম পরম বিস্ময়ের বস্তু। দশম, একাদশ শতাব্দীতে গজনির মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত আবু-র্-রইহান মুহম্মদ অলবিরুনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর প্রামাণিক পুস্তকে একাধিকবার সবিনয়ে বলেছেন, 'আমরা (অর্থাৎ আরবিতে) যাঁরা জ্ঞানচর্চা করি, দার্শনিক চিন্তা আমাদের মজ্জাগত নয়। দর্শন নির্মাণ করতে পারে একমাত্র গ্রিক ও ভারতীয়েরা।'

সেই ষড়দর্শননির্মাতা আর্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্রপৌত্রেরা মুসলমান আগমনের পর সাত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় ওই সাত শত বৎসর ধরে যে আরবিতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিওপ্লাতনিজম তথা কিন্দি, ফারাবি, বু আলি সিনা (লাতিনে আভিসেনা), অল-গজ্জালি[২] (লাতিনে অল-গাজেল), আবু রুশ্দ্ (লাতিনে আভেরস) ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনও সন্ধান পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলি করলেন না। যে মৌলানা অমুসলমান প্লাতো-আরিস্ততলের দর্শনচর্চায় সোৎসাহে সানন্দে জীবন কাটালেন তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। তিনিও জানতে পেলেন না যে, তিনি প্লাতোর আদর্শবাদ দৃঢ়ভূমিতে নির্মাণ করার জন্য যেসব যুক্তি আকাশ-পাতাল থেকে আহরণ করেছেন তাঁর পাশের চতুষ্পাঠীতেই হিন্দু দার্শনিক শঙ্করাচার্যের আদর্শবাদ সমর্থনার্থে সেইসব যুক্তিই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি 'গুলাত' নাস্তিকদের জড়বাদ যেভাবে খণ্ডন করছেন, ব্রাহ্মণও চার্বাকের নাস্তিকতা সেইভাবেই খণ্ডন করছেন। এবং সবচেয়ে

---

১. টয়িনবি সাহেব যে রীতিতে পৃথিবীর সর্বত্র একই প্যাটার্নের অনুসন্ধান করেন বর্তমান লেখক সে নীতি অনুসরণে বিরত থাকবে। শুধু যেখানে প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি দেখিয়ে দিলে আলোচ্য বিষয়বস্তু স্পষ্টতর হবে সেখানেই এই নীতি মানা হবে। এস্থলে তাই শুধু উল্লেখ করি, যখনই কোনও জাতি বৈদেশিক কোনও ভিন্নধর্মাবলম্বী দ্বারা পরাজিত হয় তখন নতুন রাজা এঁদের পণ্ডিতমণ্ডলীকে কোনও প্রধানকর্মে আমন্ত্রণ জানান না বলে এঁদের এক মানসিক পরিবর্তন হয়। এঁদের চিন্তাধারা তখন মোটামুটি এই : 'আমাদের ধর্ম সত্য, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমরা ম্লেচ্ছ বা যবন কর্তৃক পরাজিত হলুম কেন? এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, আমরা আমাদের ধর্মের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারিনি। ধর্মের অর্থকরণে (ইন্টারপ্রিটেশনে) নিশ্চয়ই আমাদের ভুল রয়ে গিয়েছে। আমরা তা হলে নতুন করে ব্যাখ্যা করে দেখি, ক্রটি কোন স্থলে হয়েছে।' ফলে পরাজয়ের পরবর্তী যুগে তাবৎ সৃষ্টিশক্তি টীকাটিপ্পনী রচনায় ব্যয় হয়।

২. ইসলামের অন্যতম প্রখ্যাত পথপ্রদর্শক বা ইমাম। ইনি দার্শনিক— কিয়ৎকালের জন্য নাস্তিক— এবং পরিণত-বয়সে সুফি (মিস্টিক, ভক্তিমার্গ ও যোগের সমন্বয়কারী) হয়ে যান। এঁর জনপ্রিয় পুস্তক 'কিমিয়া সাদৎ' এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই পুস্তকের বড়ই অনুরাগী ছিলেন এবং আমাদের মন্দিরের উপাসনায় একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। বিধুশেখর অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ 'টোলো পণ্ডিত' ছিলেন। স্মরণ রাখবার সুবিধার জন্য উল্লেখযোগ্য— গজ্জালির মৃত্যু ১১১১ খ্রিস্টাব্দে।

www.pathagar.com

পরমাশ্চর্য, তিনি যে চরক-সুশ্রুতের আরবি অনুবাদে পুষ্ট বু আলি সিনার চিকিৎসাশাস্ত্র— 'য়ূনানী' নামে প্রচলিত (কারণ তার গোড়াপত্তন গ্রিক [আইওনিয়ান= য়ুনানী] চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর)— আপন মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন, সুলতান-বাদশার চিকিৎসার্থে প্রয়োগ করছেন, সেই চরক-সুশ্রুতের মূল পাশের টোলে পড়ানো হচ্ছে। সিনা উল্লিখিত যে-ভেষজ কী, তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, কিংবা সিনা বলেছেন, ফলানা ওষধিবনস্পতি এদেশে (অর্থাৎ আরবে) জন্মে না, সেগুলো যে তাঁর বাড়ির পিছনের আঁস্তাকুড়ে গজাচ্ছে তারও সন্ধান তিনি পেলেন না। কিঞ্চিৎ কল্পনাবিলাস করলে, এ পরিস্থিতিও অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, মৌলানার বেগমসায়েবা সিনা-উল্লিখিত কোন শাক তাঁকে পাক করে খাওয়ালেন, আর তিনি সেটি চিনতেই পারলেন না।

পক্ষান্তরে ভারতীয় আয়ুর্বেদ মুসলমানদের ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এই দুস্তর মরুভূমির মাঝখানে মাত্র একটি লোক দেখতে পাই। আওরঙ্গজেবের অগ্রজ যুবরাজ মুহম্মদ দারাশিকুহ্। ইনিই সর্বপ্রথম দুই ধর্মের সমন্বয় সম্বন্ধে বহুতর পুস্তক লেখেন। তার অন্যতম *মজমা-উল্-বহরেন,* অর্থাৎ দ্বিসিন্ধুসঙ্গম। দারাশিকুহ্ বহু বৎসর অনাদৃত থাকার পর তাঁর সম্বন্ধে প্রামাণিক গবেষণা বিশ্বভারতীতেই হয়। শ্রীযুক্ত বিক্রমজিৎ হস্‌রৎ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'দারাশিকুহ্ : লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস' নামক একখানি অত্যুত্তম গ্রন্থ লেখেন এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক সেটি প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনমতো আমরা এই পুস্তকখানি সদ্ব্যবহার করব।

আরও তিন শত বৎসর পর প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় ফারসিতে রচনা করেন তাঁর সর্বপ্রথম পুস্তক, 'তুহাফতু অল্-মুওয়াহ্‌হিদিন' : 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উৎসর্গ'। রাজা খ্রিস্টধর্মের সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন বলে তাঁর পুস্তককে 'ত্রিরত্ন'ধারী বা ত্রিপিটক বললে অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁরা সামান্যতম অনুসন্ধান করেছেন তাঁরাই জানেন রাজার শিক্ষাদীক্ষা ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির নিকট কতখানি ঋণী এবং পরবর্তী জীবনে যদিও তিনি উপনিষদের ওপর তাঁর ধর্মসংস্কারসৌধের দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছিলেন তবু শেষদিন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কণামাত্র হ্রাস পায়নি। প্রয়োজনমতো আমরা তাঁর রচনাবলিরও সদ্ব্যবহার করব।

প্রায় ছ শো বৎসর ধরে এদেশে ফারসিচর্চা হল। হিন্দুরা না হয় বিদেশাগত ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহল না দেখাতে পারেন, কিন্তু যাদের রাজ্যচালনা করতে হয়েছে তাদের বাধ্য হয়ে এদেশের ভাষা রীতিনীতি অল্পবিস্তর শিখতে হয়েছে। উত্তম সরকারি কর্ম পাবার জন্য বহু হিন্দুও ফারসি শিখেছিলেন। মাত্র একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে : এদেশে বহু হিন্দুর পদবি মুনশি। আমরা বাঙলায় বলি, লোকটির ভাষায় মুন্সিয়ানা বা মুন্‌শিয়ানা আছে, অর্থাৎ সে নাগরিক বিদগ্ধ চতুর (স্কিলফুল) ভাষা লেখে। এর থেকেই বোঝা যায়, কতখানি ফারসি জানা থাকলে তবে মানুষ বিদেশি ভাষায় এরকম একটা উপাধি পায়। তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে : আমরা প্রচুর ইংরেজি চর্চা করেছি, কিন্তু ইংরেজ মুন্‌শি-জাতীয় কোনও উপাধি আমাদের কাউকে দেয়নি— বরঞ্চ আমাদের 'ব্যাবু ইংলিশ' নিয়ে ব্যঙ্গই করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা পরে হবে। উপস্থিত এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই মুন্‌শি-শ্রেণির যাঁরা উত্তম ফারসি শিখেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই কায়স্থ, সংস্কৃতের পটভূমি

www.pathagar.com

তাঁদের ছিল না, কাজেই উভয় ধর্মশাস্ত্রের সম্মেলন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু এঁরা ফারসি শিখেছিলেন অর্থোপার্জনের জন্য— জ্ঞানান্বেষণে নয়। তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে, আমরা প্রায়ই দুইশো বৎসর ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস করেছি বটে, তথাপি খ্রিস্টধর্মগ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন অতি অল্পই অনুভব করেছি।

শ্রীচৈতন্যদেব নাকি ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। কথিত আছে বৃন্দাবন থেকে সশিষ্য বাঙলা দেশে আসার সময় পথিমধ্যে এক মোল্লার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই মোল্লা নাকি তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের ভ্রান্ত ধর্মপথে চালনা করছেন কেন? শ্রীচৈতন্যদেব নাকি তখন মুসলমান শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, তিনি ভ্রান্ত ধর্মপ্রচার করছেন না। মুসলমান ধর্মে বলা হয়, যে লোক আর্তের সেবা করে, মিথ্যাচরণ বর্জন করে সৎপথে চলে— অর্থাৎ কুরান-শরিফ-বর্ণিত নীতিপথে চলে— তাকে 'পয়গম্বরহীন' মুসলমান বলা যেতে পারে, হজরত মুহম্মদকে পয়গম্বররূপে স্বীকার করেনি বলেই সে ধর্মহীন নয়। (আমরা এস্থলে 'কাফির' না বলে 'ধর্মহীন' শব্দ ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি; পরে এর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হবে)। অতএব অনুমান করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় যে, বোধহয় চৈতন্যদেব ওই মতবাদেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তদুপরি চৈতন্যদেবের মতো উদার প্রকৃতিবান ব্যক্তির পক্ষে হজরত মুহম্মদকে অন্যতম মহাপুরুষ বা পয়গম্বররূপেও স্বীকার করে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। বস্তুত সে যুগে এবং এ যুগেও বহু হিন্দু সজ্জন মহাপুরুষ মুহম্মদকে আল্লার প্রেরিত পুরুষরূপে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

দ্বিতীয় ঘটনা, কাজি কর্তৃক সংকীর্তন বন্ধ করা নিয়ে। কথিত আছে, সেবারেও তিনি যুক্তিতর্কে কাজিকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। পূর্বের অনুমান এস্থলেও প্রযোজ্য।

কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাবার।

তবুও এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

এযাবৎ আমাদের মূল বক্তব্য ছিল, মুসলমান যে জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মদর্শন সঙ্গে এনেছিলেন, এবং পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মঙ্গোল-জর্জরিত ইরান-তুরান থেকে যেসব সহস্র সহস্র কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এদেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন আপন কবিত্ব পাণ্ডিত্য নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এদেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, দার্শনিকরা কণামাত্র লাভবান হননি। এবং বিদেশাগত পণ্ডিত দার্শনিক এদেশে এসেছিলেন একমাত্র অর্থলাভের উদ্দেশ্যে— কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের পর এঁদের অধিকাংশ তাঁদের চরম নিমকহারামির পরিচয় দিয়েছেন পঞ্চমুখে এদেশের নিন্দাবাদ করে। নিন্দা করেছেন মুসলমান রাজা এবং আমির-ওম্‌রাহেরই— হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।

ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রাউন উপরে উল্লিখিত যুগকে ফারসি সাহিত্যের 'ইন্ডিয়ান সামার' 'পুনরুচ্ছলিত যৌবন' নাম দিয়েছেন। বস্তুত বর্বর মঙ্গোল অভিযানের ফলস্বরূপ ফারসি সাহিত্যের যে অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল সে তখন অন্নজল পায় মোগল-দরবারে। ইরান আজকের দিনে ভারতের কাছে কতখানি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সে

www.pathagar.com

খবর আমাদের কাছে পৌঁছয় না, কিন্তু ভারতবর্ষে ফারসি সাহিত্যের এই যুগ নিয়ে অতি অল্প আলোচনাই হয়েছে, তা-ও উর্দুতে, বাঙলাতে কিছুই হয়নি।

এ তো প্রধানত সাহিত্য ও অন্যান্য বাঙ্ময়ের কথা, কিন্তু আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি বলে মনে হয় এই দেখে যে, ভুবনবিখ্যাত ষড়দর্শনের দেশের লোক মুসলমান মারফতে প্লাতো-আরিস্ততল, সিনা-রুশ্‌দ্ নিয়ে সপ্তম দর্শন নির্মাণ করল না। কল্পনা করতে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার হয়— ভারতবর্ষ তা হলে দর্শনের ক্ষেত্রে কত না দিক্‌চক্রবাল উত্তীর্ণ হয়ে যেত— দেকার্ত-কান্টের অগ্রগামী পথপ্রদর্শক এদেশেই জন্মাতেন!

পক্ষান্তরে মুসলমান যে আরবি দর্শন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাই নিয়ে পড়ে রইলেন। মঙ্গোল কর্তৃক বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়ার পর, এবং স্পেন থেকে মুররা বিতাড়িত হওয়ার ফলে আরব-জগতে দর্শনের অপমৃত্যু ঘটে। এদেশের মুসলমান দার্শনিককে অনুপ্রাণিত করার জন্য বাইরের সর্ব উৎস সম্পূর্ণ শুষ্ক হল। হায়, এঁরা যদি পাকে-চক্রে কোনওগতিকে ষড়দর্শনের সন্ধান পেতেন!

এ তো কিছু অসম্ভব কল্পনা-বিলাস নয়। আজকের দিনের হিন্দু দার্শনিক একদিকে নব্যন্যায় চর্চা করেন, অন্যদিকে দেকার্ত অধ্যয়ন করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁদের পথ-প্রদর্শক। কবি ইক্‌বালের ঐতিহ্যভূমি আভেরস আভেচেন্নার উপর— তাঁর সৌধনির্মাণে তিনি সাহায্য নিয়েছেন কান্ট-হেগেলের।

আমরা এতক্ষণ যে অবস্থার বর্ণনা করলেম তার থেকে আপাতদৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ অনুচিত নয় যে, ভারতবর্ষে তা হলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হয়নি। যেহেতু ব্রাহ্মণের দেবোত্তর বাদশা কেড়ে নেননি তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে আপন শাস্ত্রচর্চা করে যেতে লাগলেন, এবং যেহেতু আলিম-ফাজিলরা ওয়াক্‌ফ্-সম্পত্তি পেয়ে গেলেন তাই তাঁরাও পরমানন্দে তাঁদের মক্তব-মাদ্রাসায় কোরান-হাদিসের চর্চা করে যেতে লাগলেন। একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করার কোনও প্রয়োজন অনুভব করলেন না।

কিন্তু দেশের সকলের তো লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর ওয়াক্‌ফ্-সম্পত্তি নেই। চাষা তিলি জোলা কাঁসারি মাঝি চিত্রকর কলাবৎ বৈদ্য কারকুন এবং অন্যান্য শত শত ধান্দার লোককে অর্থোপার্জন করে জীবনধারণ করতে হয়। সে স্থলে হিন্দু মুসলমানকে বর্জন করে চলতে পারে না, মুসলমানকেও হিন্দুর সংস্পর্শে আসতে হয়। তদুপরি উচ্চাঙ্গের চিত্রকলা সঙ্গীত স্থাপত্য বাদশা ও তাঁর অর্থশালী আমির-ওমরাহের সাহায্য বিনা হয় না। বাদশারও দরকার হিন্দু রাজকর্মচারীর। কোনও দেশ জয় করা এক কর্ম, সে দেশ শাসন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন শিরঃপীড়া। বাদশা ইরান-তুরান থেকে দিগ্বিজয় করার সময় রাজকর্মচারী সঙ্গে আনেননি। আর আনবেনই-বা কী? তারা এ-দেশের ভাষা জানে না, রাজস্বব্যবস্থা বোঝে না, কোন দণ্ডনীতি কঠোর আর কোনটাই-বা অতি সদয় বলে দেশের লোকের মনে হবে— এ সম্বন্ধে তাদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। বখ্‌শি (চিফ পে-মাস্টার, অ্যাকাউন্টেন্ট্-কম্-অডিটার জেনারেল), কানুনগো (লিগেল রিমেমব্রেন্সার), সরকার (চিফ সেক্রেটারি), মুন্‌শি (হুজুরের ফরমান লিখনেওলা, নতুন আইন নির্মাণের খসড়া প্রস্তুতকারী), ওয়াকে'-নওয়িস্ (যার থেকে

www.pathagar.com

Waqnis), পর্চা-নওয়িস্ (রাজকর্মচারীর আচরণ তথা দেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরি করনেওলা) এসব গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করবে কারা?

আমরা জানি, কায়স্থরা স্মরণাতীত কাল থেকে এসব কাজ করে আসছেন। এঁরাই এগিয়ে এলেন। মুসলমান প্রাধান্য প্রায় দুশো বৎসর হল লোপ পেয়েছে, কিন্তু আজও এসব পদবি— প্রধানত কায়স্থদের ভিতর— সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

এদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, উর্দু ভাষা এবং অন্যান্য বহু জিনিস যে হিন্দু-মুসলমানের অনিবার্য মেলামেশার ফলে হয়েছিল সেকথা সকলেই জানেন।

শুধু ভাস্কর্য ও নাট্যকলা বাদশা-আমির-ওমরার কোনও সাহায্য পায়নি। তার কারণ, ইসলামে মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ এবং নাট্যকলা ভারতের বাইরে মুসলিম জগতের সম্পূর্ণ অজানা।

হিন্দুধর্ম ভিন্নধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মে গ্রহণ করে না। কাজেই অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য নেই। মুসলমান বিধর্মীকে মুসলমান করতে চায়। উভয়ের মিলনের চিন্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিংবা মুসলমান মৌলবি কেউ করেন না। হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানকে বলেন, 'তুমি দূরে থাকো'। মুসলমান মৌলবি হিন্দুকে বলেন, এস, তুমি মুসলমান হবে'। তৃতীয় পন্থাও যে থাকতে পারে সেটা কারও মনে উদয় হয় না। হিন্দু হিন্দু থাকবে, মুসলমান মুসলমান থাকবে অথচ উভয়ের মধ্যে মিলন হবে, হৃদ্যতা হবে।

এ পন্থার চিন্তা করেছিল জনগণ। এটাতে ছিল তাদের প্রয়োজন। তাই এলেন ধর্মের জগতে জননেতা, জনাবতার কবীর দাদু নানক ইত্যাদি। পরম শ্লাঘার বিষয়, শান্তিনিকেতনেই এঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এতদিন ধরে ভারতের হিন্দু-মুসলমান গুণী-জ্ঞানীরা যেসব মহাপুরুষদের সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনেই সে-সময়ের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তাঁদের নিয়ে সমস্ত জীবন ব্যয়িত করেন। তাঁর 'দাদু' 'কবীরে'র পরিচয় এস্থলে নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই।

সে পুণ্যকর্ম এখনও বিশ্বভারতীতে পূর্ণোদ্যমে অগ্রগামী। ক্ষিতিমোহনের বৃদ্ধ বয়সের সহকর্মী বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামপূজন তিওয়ারির 'সুফিমত-সাধনা ঔর সাহিত্য' সুচিন্তিত স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তক হিন্দি সাহিত্য তথা মধ্যযুগীয় লোকায়ত ধর্ম-চর্চার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরল ভাষায় লিখিত এ ধরনের গ্রন্থ সর্ব ভাষায়ই বিরল।

কিন্তু চিন্তাজগতে— দর্শন-ধর্মশাস্ত্র-জ্ঞানবিজ্ঞানে— হিন্দু-মুসলমানের মিলনভাব অথচ অনুভূতির ক্ষেত্রে— চারুকলা সঙ্গীত লোকসাহিত্যে গণধর্মে— আশাতীত মিলন। এ বিষয়ে অধ্যয়ন এবং চর্চা করতে হলে উভয় জনসমাজের মূল ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার গোড়া থেকে অধ্যয়ন করতে হয়। হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু মুসলমান ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রায় কিছুই নেই। যা-কিছু আছে তা সরল ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ এবং স্বধর্মবিশ্বাসীর হৃদয় মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্য— বিধর্মীর সম্মুখে আপন ধর্ম যুক্তিবিচারের

www.pathagar.com

ওপর নির্মাণ করে তাকে আকর্ষণ করার কোনও প্রচেষ্টা তাতে নেই, আপন ধর্মের স্বতঃসিদ্ধ নীতিও যে বিধর্মীর কাছে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ হতে পারে সে দুশ্চিন্তাও এ সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করেনি। উপরন্তু ইংরেজ-আগমনের পর এদেশের ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজির মারফতে পেলেন ইসলামের এক বিকট বিকৃত রূপ। সরল হিন্দু জানত না, খ্রিস্টান এবং মুসলিমে স্বার্থসংঘাত লেগে যায় মহাপুরুষের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই, শত শত বৎসর ক্রুসেডের নামে একে অন্যের মরণালিঙ্গনে তারা সম্পিষ্ট; ফলে খ্রিস্টান কর্তৃক ইসলাম ও হজরত মুহম্মদের বিরুদ্ধে অকথ্য কটুবাক্য এদেশে এসেছে 'নিরপেক্ষ গবেষণা'র ছদ্মবেশ ধরে। সাধারণ সরল হিন্দু এ ছদ্মবেশ বুঝতে পারেনি। (এস্থলে বলে রাখা ভালো, মুসলমান কিন্তু খ্রিস্টানকে প্রাণভরে 'জাত তুলে' গালাগাল দিতে পারেনি, কারণ কুরান-শরিফ যিশুখ্রিস্টকে অন্যান্য মহাপুরুষদের একজন বলে যে স্বীকার করে নিয়েছেন তাই নয়, তিনি মুহম্মদের পূর্বে সর্বপ্রধান পয়গম্বর বলে তাঁকে বিশেষ করে 'রুহুল্লা' 'আল্লার আত্মা' 'পরমাত্মার খণ্ডাত্মা' উপাধি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে খ্রিস্টান যুগ যুগ ধরে হজরত মুহম্মদকে 'ফলস্ প্রফেট' 'শার্লট্যান' ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করেছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেও 'ঐতিহাসিক' ওয়েলস্ তাঁর 'বিশ্ব-ইতিহাসে' মুহম্মদ যে ঐশী অনুপ্রেরণার সময় স্বেদসিক্ত বেপথুমান হতেন তাকে মৃগীরুগীর লক্ষণ বলে মহাপুরুষকে উভয়ার্থে লাঞ্ছিত করেছেন)।

রামমোহন রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সর্বদেশেই বিরল। এদেশে তো অবশ্যই।

ইতোমধ্যে আর একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

এতদিন যে হিন্দু পণ্ডিত দার্শনিক মুসলমানের ধর্ম আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করেননি তাতে হয়তো তাঁদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি, কিন্তু স্বরাজলাভের পর তাঁদের সে দৃষ্টিবিন্দু পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফগানিস্তান ইরান ইরাক সিরিয়া সউদি-আরব ইয়েমেন মিশর তুনিস আলজিরিয়া মরক্কো তথা মুসলমানপ্রধান ইন্দোনেশিয়া ও নবজাগ্রত মুসলিম অধ্যুষিত আফ্রিকার একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা স্থাপন করতে হবে। মুসলিমপ্রধান পাকিস্তানও এ ফিরিস্তির অন্তর্ভুক্ত। এদের ধর্ম, তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক বাতাবরণ-পার্থক্যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ-পরিবর্তন— এসব এখন অল্পবিস্তর অধ্যয়ন না করে গত্যন্তর নেই। সত্য, আমাদের স্কুল-কলেজে এখনও আরবি-ফারসির চর্চা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি, কিন্তু এই নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়াটা সমীচীন হবে না। কিছু কিছু হিন্দুদেরও আরবি-ফারসি শিখতে হবে। এবং এই সাতশো বৎসরের প্রাচীন আরবি-ফারসির শিক্ষাপদ্ধতিও পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যতই প্রয়োজনীয় হোক, এস্থানে কিঞ্চিৎ অবান্তর।

আমরা যে মূল উৎসের সন্ধানে বেরুচ্ছি তার জন্য আজ আর প্রাচীন মানচিত্র কাজে লাগবে না। ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ অথবা সন্দেহে সন্দেহে কণ্টকাকীর্ণ প্রাচীন কোনও পদ্ধতির অনুসরণ করলে আজ আর চলে না। ধর্মকেও আজ রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করতে হয়।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মনের সঙ্গে থাকবে সহানুভূতিশীল হৃদয় ॥

www.pathagar.com

পরিচিতি

কিছুদিন পরপরই নতুন করে আলোচনা হয়— এখনও লোকে মপাসাঁ পড়ে কি না, পড়লে কারা পড়ে? ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন, রুশ? ফ্রান্সের লোকের কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। তারা অল্পবিস্তর সবসময়ই পড়বে। উপস্থিত শুনতে পাই, মার্কিন দেশেই নাকি তাঁর সবচেয়ে বেশি কদর। যাঁরা এসব আলোচনা করেন তাঁরা প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যগুলোর সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন বলে সেগুলোকে হিসাবেই নেন না। আমার জানামতে আরব দেশে এখনও তাঁর প্রচুর সম্মান; তার অন্যতম কারণ আরবি প্রচলিত মিশর থেকে বাইরুৎ-দামাস্কস পর্যন্ত ফরাসির প্রচলন ইংরেজির তুলনায় বেশি। অধুনা মার্কিন ভাষা ওইসব দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু তাতে মপাসাঁর কোনও ক্ষতি হবে না; কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, মার্কিনজাত মপাসাঁ-ভক্ত।

তা সে যা-ই হোক, ফ্রান্সের বাইরে কিন্তু তাঁর রচনা (essays) নিয়ে কখনও কোনও আলোচনা হতে দেখিনি। এ যেন অনেকটা কনান ডয়েলের মতো। তাঁর শার্লক হোম্‌স নিয়ে সবাই এমনই মুগ্ধ যে তাঁর অন্যান্য লেখার দিকে কেউই বড় একটা নজর দেন না। শার্লক হোম্‌সে এমনই ঝাল যে তার পর বাকি তাবৎ রান্না অতিশয় সুনিপুণ হলেও ফিকে বলে মনে হয়।

আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, মপাসাঁর প্রবন্ধ তাঁর ছোটগল্পকে হার মানায়। বস্তুত তাঁর সর্বোত্তম উপন্যাসদ্বয়ই— 'য়্যুন্ ভি' এবং 'বেল্ আমি'[১]— তাঁর ছোটগল্পকে হার মানাতে পারেনি।

তাঁর নাট্য ও কবিতাও নিম্নাঙ্গের। পক্ষান্তরে চেখফ্ ছোটগল্প এবং নাটক, উভয়েই অদ্বিতীয়।

আমার নিজের মনে হয়, মপাসাঁর প্রবন্ধগুলো অত্যুত্তম। তাঁর গুরু ফ্লোবের ও গুরুসম— ফ্লোবেরের অন্তরঙ্গ বন্ধু— তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে তিনি যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলো অতুলনীয়। মপাসাঁর ছোটগল্প বা উপন্যাসে পাঠক পাবেন দেহ ও যৌবন ক্ষুধার ছড়াছড়ি কিন্তু সত্যকার প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা, কিংবা সে শ্রদ্ধার প্রতি সহানুভূতি, অথবা স্নেহের প্রতি অনুরাগ, মানুষের এসব তাবৎ মহামূল্যবান বৈভবের প্রতি মপাসাঁর কোনও আকর্ষণ নেই। তিনি যা চান তাই ফুটিয়ে তুলতে পারেন বলে যখন এগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তখন সেগুলো প্রকাশ করেছেন তাঁর যাদুকাঠির পরশ দিয়েই কিন্তু তখন তাঁর উদ্দেশ্য অন্য, ওইসব বৈভবকে সম্মান দেখানো নয়, ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যেন প্যাডিংরূপে। অথচ আমরা জানি মপাসাঁ তাঁর মাকে ভালোবাসতেন গভীর রূপে— বস্তুত এরকম মাতৃভক্ত পুত্র সর্বকালেই সর্বদেশেই বিরল— যে-লোক প্রতিদিন ভালো-মন্দ-মাঝারি, ডাচেস থেকে স্বৈরিণী পর্যন্ত বিচরণ করে, আপন ফুর্তির জন্য কাঁড়া কাঁড়া টাকা ছড়ায়, হেন দুষ্কর্ম নেই যা তার অজানা এবং যার জন্য সে পয়সা খর্চা করতে রাজি নয়— সেই লোক ঠিক নিয়মিত

---

১. অনেকেরই বিশ্বাস, যেহেতু মপাসাঁ মেয়েদের 'ইটার্নেল হার্লট' বলেছেন তাই পুরুষদের তিনি খুব সম্মানের চোখে দেখতেন। বস্তুত 'বেল্ আমি' পড়ার পর পুরুষকুলকেও 'ইটার্নেল জিগলো' (পুং বেশ্যা) বলা যেতে পারে। তবে যৌনক্ষুধাতুর মপাসাঁ স্বভাবতই মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বেশি এবং তাদের সম্বন্ধে লিখেছেন বেশি।

www.pathagar.com

মাকে মোটা টাকা পাঠায়, নিয়মিত মধুর চিঠি লেখে, পাছে মা টের পেয়ে যান তাই অতিশয় অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রাচীন প্রথামত নববর্ষের পরব রাখতে গাঁয়ে মায়ের বাড়িতে যায় (তার পাঁচ দিন পরই তাঁর মাথার ব্যামো— সিফিলিসজনিত উন্মাদরোগ— তাঁকে এমনি বিভ্রান্ত করে যে তিনি ছুরি দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করার চেষ্টা দেন; অনুগত ভৃত্য ফ্রাঁসোয়া পিস্তলের গুলি আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় সরিয়ে রেখেছিল), সে যে শ্রদ্ধা ভালোবাসার সম্মান দিত না, এ তো হতেই পারে না।

শুধু তাই নয়, সেই শ্রদ্ধার 'নির্লজ্জ' উচ্ছ্বাস পাঠক পাবেন ফ্লোবের ও তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে লিখিত মপাসাঁর প্রবন্ধে।

তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে লেখা তাঁর প্রবন্ধটি অন্য দেশ কতখানি সম্মান দেয়, আমার জানা নেই। তবে রুশ দেশ তার চরম সম্মান দেয় ও দিয়েছে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্গেনিয়েফের মৃত্যুর পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ হলে সারা রুশদেশব্যাপী তাঁকে স্মরণ করা হয়। সেই উপলক্ষে তুর্গেনিয়েফের ভাইয়ের মেয়ে (কিংবা আপন জারজ, পরে আইনসম্মত কন্যা) দেশবাসী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধ আরম্ভ করেন তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে মপাসাঁর প্রশংসাকীর্তন নিয়ে। তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে রুশ দেশ এবং রুশ দেশের বাইরে বিস্তর প্রবন্ধ বের হয়েছে (এবং আশ্চর্য, মপাসাঁ যখন তাঁর খ্যাতির চরমে, যখন তাঁর ছোটগল্প ইয়োরোপের প্রায় সর্ব ভাষায় অনূদিত হচ্ছে তখন তিনি খাতির পাননি এক রুশ দেশে, যদিও রুশ দেশ সবসময়ই ফ্রান্স-পাগল, কারণ রুশে তখন তলস্তয়, তুর্গেনিয়েফ, লেস্কফ[২], দস্তয়েফ্স্কি, চেখফ্ কেউ-বা তাঁর বিজয়শঙ্খ বাজাচ্ছেন বিপুল বিক্রমে, কারও বাণী দূর-দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কারও-বা মধুর কণ্ঠের প্রথম কাকলি দেশের সর্বত্র নবীন চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে— মপাসাঁকে লক্ষ করার ফুর্সৎ তাদের নেই) কিন্তু ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের প্রতিভূ স্মরণ করলেন মপাসাঁকে— সেই মপাসাঁ যাঁর প্রবন্ধ পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত।[৩]

তাই বলছিলুম, মপাসাঁর 'নির্লজ্জ' উচ্ছ্বাস পাঠক পাবেন এ দুটি প্রবন্ধে এবং তাঁর অন্যান্য রচনায়। মানুষ মপাসাঁকে চেনবার ওই একমাত্র উপায়। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা মপাসাঁ বন্ধুদের সঙ্গে তো করতেনই না, লেখাতে যা করেছেন তা-ও পঞ্চাশ লাইনের বেশি হয় কি না হয়।

আর আছে তাঁর চিঠি। কিন্তু সেগুলোতে তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর ব্যথা, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে নীরব। তার কারণ গুরু ফ্লোবের কর্তৃক জর্জ সান্ড্‌কে লেখা তাঁর অন্তরঙ্গ চিঠি যখন ছাপাতে প্রকাশিত হয়, তখন ফ্রান্সের মতো দেশেও তাই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। মপাসাঁ তখনই সাবধান হয়ে যান। পারলে মপাসাঁ ফ্লোবেরের চিঠিগুলো প্রকাশিত হতে দিতেন না। শেষটায় যখন দেখলেন প্রকাশ হবেই হবে তখন মপাসাঁ সে

---

২. লেস্কফের একটি দীর্ঘ গল্প আমি অনুবাদ করেছি, বিশ্বসাহিত্যে এ গল্পটি অতুলনীয় বলে— যদিও আমি পাঁচটা বাবদের ন্যায় এটাতেও অক্ষম। একাধিক গুণীকে অনুরোধ করার পরও তাঁরা যখন সেটি অবহেলা করলেন, তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই করতে হল। 'প্রেম' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. মপাসাঁর এই প্রবন্ধটি আমি অনুবাদ করি একই সময়ে— পঁচাত্তর বৎসরের পরব উপলক্ষে।

www.pathagar.com

সংকলনের ভূমিকা লিখতে রাজি হন। তিনি আশা করেছিলেন গুরুর পদতলে তাঁর শ্রদ্ধা অর্ঘ্য নিবেদন দেশের পাঁচজনকে বুঝিয়ে দেবে, ফ্লোবেরকে কোন পরিপ্রেক্ষিতে দেখে তাঁর সত্য মূল্য দিতে হয়।

তবুও মপাসাঁর চিঠিগুলো যে অমূল্য, তুলনাহীন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আমার জানা মতে তাঁর সর্বশেষ চিঠি তাঁর ডাক্তারকে লেখা— এইটি সর্বশেষ না হলেও এটিতে পাঠক পাবেন 'রাজহংসের মরণগীতি'।

তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার আঁরি কাজালি (জাঁলাওর)-কে লিখিত,

'কান, ইজের কুটির।

আমি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছি। তারও বেশি। আমি এখন মৃত্যুর শেষ যন্ত্রণায়। নাকের ভিতর নোনা জল ঢেলে সেটা ধুয়েছিলাম বলে তারই ফলে আমার মগজ নরম হয়ে গিয়েছে। সেই নুন মাথার ভিতর গাঁজিয়ে ওঠায় (ফের্মাতাসিয়োঁ— ফার্মেন্‌টশন্‌) সমস্ত রাত ধরে আমার মগজ গলে গিয়ে চ্যাটচেটে পেস্টের মতো নাক আর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। এ হচ্ছে আসন্ন মৃত্যু, আর আমি উন্মাদ।[৪] আমি প্রলাপ বকছি। শেষ-বিদায় বন্ধু, বিদায়! তুমি আমাকে আবার দেখতে পাবে না...'[৫]

আমি ডাক্তার নই, তাই বলতে পারব না, মানুষের জীবিতাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পরও তার নাক কান দিয়ে মগজ গলে বেরোয় কি না, নুনের ফার্মেন্টেশন হয় কি না তা-ও জানিনে। স্পষ্টত এ চিঠি উন্মাদের প্রলাপ। কিন্তু প্রশ্ন, উন্মাদ কি স্বীকার করে সে প্রলাপ বকছে?

* * *

ফরাসি ভাষায় মপাসাঁর দু-খানি অত্যুত্তম রচনা ও পত্রসংগ্রহ আছে। ইংরেজিতে এগুলোর অনুবাদ হয়েছে কি না জানিনে।

(১) CHRONIQUES, ETUDES, CORRESPONDANCE
DE GUY DE MAUPASSANT
Recueillies Prefacees et Annotees par
RENE DUMESNIL
avec la collaboration de Jean Loize
et publiees pour la premiere fois avec nombreux
DOCUMENTS INEDITS
LIBRAIRIE GRUEND, 60, RUE MAZARINE. 60,
PARIS, VI, 1938

(২) CORRESPONDANCE INEDITE
DE
GUY DE MAUPASSANT
Recueihie et presentee

৪-৫. এই দুটি ছত্র ক্যাপিটাল অক্ষরে।

www.pathagar.com

ARTINE ARTINIAN
avec la collaboration d'
EDOURAD MAYNIAL
Editions Dominique Wapler,
6, Rue de Londres,
Paris, 1951

বছর কুড়ি পূর্বে একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা নানা দেশের চুয়াত্তর জন খ্যাতনামা লেখককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, কোন কোন লেখক তাঁদের সৃষ্টির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। উত্তরে মপাসাঁ— জর্মন কবি হাইনে, এবং হোমার হুইট্‌মানের সমান সম্মান পান এবং ইব্‌সেন ও স্তাঁদালের চেয়ে বেশি।

এদেশেও মপাসাঁ নিয়ে কৌতূহল আছে।

কয়েকদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অধুনা লিখিত সাহিত্যিকদের জীবনী সম্বলিত সাহিত্যালোচনার একখানা অত্যুত্তম পুস্তক আমার হাতে এসে পৌঁছল। 'সোনার আল্‌পনা' (এভারেস্ট বুক হাউজ, ১৯৬০)।

বইখানিতে অন্যান্য মনোরম প্রবন্ধের ভিতর গি দ্য মপাসাঁ ও ইভান তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধেও দুটি রচনা রয়েছে।

আজকাল এদেশে অনেকেই ফরাসি শিখছেন। উপরের দুখানা মূল গ্রন্থ ও বাঙলা বইখানা নিয়ে আলোচনা হলে বাঙলা সাহিত্য উপকৃত হবে।

হতভাগ্য কাছাড়

প্রশ্ন উঠতে পারে, কাছাড়ের ভাষা আন্দোলন যখন তার চরমে তখন সম্পূর্ণ নীরব থেকে আজ এতদিন পরে সেই পুরনো কাহিনী নিয়ে পড়ি কেন? কাছাড়িতেও আছে,

স্বামী মরল সন্ধ্যা রাত!
কেঁদে উঠল দুপুর রাত!!

(খাস কাছাড়িতে লিখলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলে 'সংস্কৃত' করা হল।)

আসলে তখন ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক রেষারেষি তিক্ততায় রূপান্তরিত হয়েছে, এমনকি কোনও কোনও স্থলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে— অথচ কাছাড়ে কস্মিনকালেও কোনওপ্রকারের সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, মণিপুরি (তাদের ভিতরেও হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছে), নাগা, লুসাই এবং আরও কত যে জাত-বেজাত কাছাড়ে সখ্যভাবে বসবাস করে সে সম্প্রীতি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তখন আমার জানা ছিল, এ আন্দোলন বেশিদিন চলবে না, একটা রফারফি হয়ে যাবেই, এবং তার পর কাছাড়বাসীরা ভাষার কথা বেবাক ভুলে গিয়ে আবার সুখ-নিদ্রায় ঘুমিয়ে

www.pathagar.com

পড়বে। পারি যদি তখন তাকে জাগাবার চেষ্টা করব। সর্বত্রই দেখেছি, পাকা বনিয়াদ গঠনের কাজ আরম্ভ হয় তখনই।

*   *   *

কাছাড়ের উত্তর, পুব, দক্ষিণে পাহাড়। তার বেরোবার পথ মাত্র পশ্চিম দিকে— পুব পাকিস্তানের সিলেটের ভিতর দিয়ে। সে পথ আজ বন্ধ। হিল সেকশন নামক যে রেলপথটি কাছাড়কে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে সেটি নির্মিত হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা চট্টগ্রাম বন্দর তথা চাঁদপুর হয়ে কলিকাতার বন্দরে পাঠাবার জন্য। ওটা কখনও কাছাড়িদের বিশেষ কোনও কাজে লাগেনি।

এর পূর্বে বলে রাখা ভালো, কাছাড় ঐতিহ্যহীন দেশ নয়। সিলেট-কাছাড়ের ঐতিহ্য একসঙ্গে জড়িত ছিল বলে এতদিন ধরে সবাই 'সিলেট সিলেট' করেছে এবং কাছাড় তারই তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কাছাড়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে আর্য-সভ্যতার শেষ পূর্বভূমি। এবং বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির শেষ পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশ। এর পরই মণিপুর— এঁরা বৈষ্ণব হলেও এঁদের রক্ত এবং ভাষা ভিন্ন। তার পর বর্মা। এবং আর্যসভ্যতা বাদ দিয়েও কাছাড়ের প্রাচীন আদিবাসীরাও আপন সভ্যতা নির্মাণ করে গিয়েছেন— তার নিদর্শন আজও কাছাড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কাছাড়ের রাজারা দীর্ঘকাল পূর্বেই বাঙলা ভাষা গ্রহণ করেন।[১] বস্তুত জয়ন্তিয়া (পাঠান-মোগল কেউই এ রাজ্য অধিকার করতে পারেননি), ত্রিপুরা, কাছাড় ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহম রাজারাই আসাম প্রদেশের চারিটি প্রধান রাজবংশ। আমার যতদূর জানা আছে, মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করার সময় কাছাড়কেই কেন্দ্রভূমি করে সে কর্ম করা সম্ভবপর হয়েছিল।

কাছাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য অপূর্ব। যাঁরা হিল-সেকশন দিয়ে রেলেও গিয়েছেন মাত্র, তাঁরাও এ বাবদে আমার মতে সায় দেবেন।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, কাছাড়ে জমিদাররা কখনও দাবড়ে বেড়াননি বলে সেখানকার সমাজে অতি সুন্দর গণতন্ত্র প্রচলিত। জমিদার নেই বলে লেঠেলও ছিল না। তাই কাছাড়িরা বড় শান্ত, নিরীহ। এমনকি সোনাই অঞ্চলে যেসব নাগারা বাস করে তারাও মাঝে-মধ্যে বাঙালি জনপদবাসীর কুকুর ধরে নিয়ে ভোজ-দাওয়াত করলেও এরা দা হাতে করে মানুষের মৃত্যুর সন্ধানে বেরোয় না।

দেশ বিভাগের ফলে কত সহস্র, কিংবা লক্ষাধিক শরণার্থীকে কাছাড় আশ্রয় দিয়েছে সে সম্বন্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। 'পূর্ববঙ্গের রেফুইজি'দের আশ্রয় দেওয়ার প্রায় পুরো ক্রেডিট নেন পশ্চিম বাঙলা। শিলঙে অবস্থিত অহমিয়া সরকার 'বঙাল' কাছাড়ের আত্মত্যাগ সম্বন্ধে যে অত্যধিক লম্ফঝম্প করবেন না সে তো বেদ থেকে পাঁচকড়ি দে তক্ স্বর্ণাক্ষরে লেখা— আমিও দোষ দিইনে।

বস্তুত চৈতন্যভূমি শ্রীহট্টের শত শত ব্রাহ্মণকে কাছাড় আশ্রয় দিয়ে সংস্কৃত চর্চা যে কতখানি বাঁচিয়ে রাখল তার খতিয়ান হওয়া উচিত। অথচ দেশ বিভাগের ফলে কাছাড়ের সর্বনাশ হয়েছে। তার ধনদৌলত, ধান, কাঠ, ছন, বাঁশ, চা প্রাকৃতিক আরও নানা সম্পদ

---

১. সৈয়দ মরতুজা আলী, *A History of Jaintia*, ও এঁর লেখা ওই যুগের আসাম ও বাঙলার চার রাজবংশের মধ্যে বাঙলায় লেখা চিঠিপত্র, দলিলদস্তাবেজ সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সবই পাঠানো হত সিলেটের মাঝখান দিয়ে। আজ সে পথ বন্ধ। পূর্বেই বলেছি, তার তিন দিকে পাহাড়। হিল সেকশন দিয়ে যে খর্চা পড়বে তার অর্ধেক মূল্যে এসব বস্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পাওয়া যায়।

* * *

দেশ বিভাগের পূর্বে কাছাড়-শ্রীহট্ট অর্থাৎ সুর্মা-উপত্যকার আসাম রাজ্যে প্রধান স্থান দখল করে ছিল। সিলেট পাকিস্তানে চলে যাওয়াতে কাছাড়ের বঙ্গভাষীগণ হয়ে গেল নগণ্যাধম মাইনরিটি— এবং যেটুকু তার ন্যায্য প্রাপ্য ছিল তা-ও সে পেল না— সেনসাস নিয়ে কারসাজি করার ফলে।[২]

ইউনাইটেড নেশনস বলেন, তাঁদের প্রধান সমস্যা, পৃথিবীর সর্বত্র, মাইনরিটি নিয়ে। কাজেই আজ যদি অসমীয়ারা কাছাড়বাসীর মাতৃভাষা ভুলিয়ে সেখানে অসমীয়া চালাতে চান তবে কেউ আশ্চর্য হবেন না। অবশ্য সেটা যে অন্যায় সেকথা নিশ্চয়ই বলতে হবে।

কাছাড়িরা বাঙলা ভাষা ও তাদের বাঙালি ঐতিহ্য কখনও ছাড়তে পারবে না— অহমিয়া ঐতিহ্য অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ হলেও পারবে না।

ভাষার ওপর এ অত্যাচার নতুন নয়।

এর বিরুদ্ধে ঔষধ কী?

অধম আকাশবাণীকে বার বার বোঝাবার চেষ্টা করেছে, শিলচরে একটি বেতার কেন্দ্র হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন। কাছাড়ের লোক সচরাচর ঢাকা বেতার শোনে, কারণ কলকাতার আকাশবাণী সেখানে ভালো করে পৌঁছয় না। গৌহাটি কেন্দ্রের ভাষা অসমীয়া। ওদিকে আরেকটি মজার জিনিস। গৌহাটি কেন্দ্র নাগাকে শান্ত করার জন্য সেখান থেকে প্রচারকার্য করেন। আশ্চর্য হই, তাঁরা 'আর্তিস্ত' পান কোথায়? প্রথমত টেপ-রেকর্ডার নিয়ে নাগা অঞ্চলে ঢোকা অনেকখানি হিম্মতের কাজ, দ্বিতীয়ত শুধুমাত্র টেপ-রেকর্ডারের জোরে প্রচারকার্য চলে না। পক্ষান্তরে খাস কাছাড়েই মেলা নাগা রয়েছেন। মাঝখানে পাহাড় আছে বলে গৌহাটির বেতার-গলা, নাগা পাহাড়ে ভালো করে পৌঁছয় না। ওদিকে নাগা পাহাড় কাছাড়ের প্রতিবেশী।

কাছাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়। লুসাইরা নিরীহ। কিন্তু অহমিয়ারা যেভাবে রাজত্ব চালাচ্ছেন তাতে কখন কী হয় বলা যায় না। এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। লুসাইদের সর্ব আমদানি-রপ্তানি একমাত্র কাছাড়ের সঙ্গে। লুসাইদের জন্য প্রচারকর্ম করার জন্য শিলচরই সর্বোত্তম কেন্দ্র— গৌহাটি বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্য কোনও স্থল নয়।

আরও নানা রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণ আছে। স্থানাভাব।

শিলচরে এই বেতার কেন্দ্র নির্মাণের জন্য তীব্রকণ্ঠে দাবি জানাতে হবে। জনমত গড়ে তুলতে হবে। আসাম সরকার সাহায্য করবেন না। বাধা দিলে আমি আশ্চর্য হব না, দোষও দেব না।

কিন্তু এ তো বহুবিধ আশ্চর্য তথ্যের মধ্যে সামান্য জিনিস।

আমার মনে পড়ছে, অস্ট্রিয়ার রাজা হাঙ্গেরির ভাষা নিধন করতে চেয়েছিলেন। ফলে বুদাপেস্তের হাঙ্গেরীয় স্টেজ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বোধহয় রাজা আপন পায়ে

২. আমার অগ্রজ পূর্বোল্লিখিত সৈয়দ মরতুজা আলী আসামে রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি আমাকে ১৯৪১ সালেই(!) বলেন যে, সেনসাস নিয়ে কারসাজি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

কুড়োল মারলেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেরিয়ে পড়ল জিপসি ক্যারাভানে— শহরে শহরে, গাঁয়ে গাঁয়ে তারা এমন ভাষার বান জাগিয়ে তুলল যে, সমস্ত দেশ মনেপ্রাণে অনুভব করল মাতৃভাষা মানুষের জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে আছে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য ওই তার একমাত্র গতি। যে সভ্যতা-সংস্কৃতি সে তার পিতা-পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছে, যার কল্যাণে সে সভ্যজন বলে পৃথিবীতে স্বীকৃত হচ্ছে, যাকে সে পরিপুষ্ট করে পিতৃপুরুষের কাছ থেকে ঋণমুক্ত হতে চায়— সে তার মাতৃভাষা।

এই তার সময়। ভাষা আন্দোলনের বিক্ষোভ-উচ্ছ্বাসের দুর্দিনে গড়ার কাজ করা যায় না। সে যেন আতসবাজি। সেটা শেষ হলে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। তার পূর্বেই ওরই ক্ষুদ্র শিখা দিয়ে গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে হয়।

* * *

এই তার সময়। রাজদণ্ডের ভয় নেই, রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত কারসাজি নেই— শান্ত সমাহিত চিত্তে চিন্তা করতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে, অর্থ সঞ্চয় করতে হবে কী প্রকারে মাতৃভাষার গৌরব সম্বন্ধে সর্ব কাছাড়বাসীকে পরিপূর্ণ সচেতন করা যায়।

সেই চৈতন্যের উপরই মাতৃভাষার দৃঢ়ভূমি নির্মিত হবে।

তাই যখন আবার বিপদ আসবে তখন উন্মাদের মতো দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে হবে না, ভ্যানে করে গ্রামে গ্রামে মাইকে চিৎকার করতে হবে না। গ্রামের লোক নিজের থেকেই সাড়া দেবে। শহরে সীমাবদ্ধ যে কোনও আন্দোলনই সহজে দমন করা যায়। কিন্তু সে যদি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তবে তাকে দমন করা অসম্ভব।

এই তার সময়। চিন্তা করুন, গ্রামে গ্রামে কী প্রকারে সে চৈতন্য উদ্দীপ্ত করতে পারি।

কিন্তু সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

এ আন্দোলন শান্তিময়, গঠনমূলক। এতে কোনও প্রকারের রাজনৈতিক স্বার্থ নেই। এবং সবচেয়ে শেষের বড় কথা— গঠন-কর্ম অগ্রসর হবে অহমিয়া ভ্রাতা, তথা কাছাড়ের কোনও সম্প্রদায় কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি বৈরীভাব না রেখে।[৩]

নেতাজি

আজ— এবং নেতাজি

এ পৃথিবীতে ভারতের মতো অতখানি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর নেই। এবং সে জন্য যে আমরা ক্যাপিটালিস্ট-কম্যুনিস্ট উভয়পক্ষেরই বিরাগভাজন হয়েছি তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। সামাজিক জীবন লক্ষ করলেই এ তত্ত্বটা পরিষ্কার হয়ে যায়। যে মানুষ দলাদলির মাঝখানে যেতে চায় না— তা সে স্বভাবে শান্তিপ্রিয় বলেই হোক, আর দুই দলের গোঁড়ামিই তার কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয় বলেই হোক— সে উভয় দলেরই গালাগালি খায়।

৩. অমিতাভ চৌধুরী, মুখের ভাষা বুকের রুধির।

www.pathagar.com

তাই পাঁড় কম্যুনিস্টরা আমাদের টিটকারি দিয়ে বলছে, 'যাও, কর গে পিরিত ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে; এখন বোঝ ঠ্যালা।' আর পাঁড় ক্যাপিটালিস্টরা বলছে ঠিক এই একই কথা। আমরা নাকি কম্যুনিস্টদের গলায় পিরিতির মালা পরাতে গিয়ে পেয়েছি লাঞ্ছনা।

পুরোপাক্কা সুস্থমস্তিষ্ক নিরপেক্ষ জন পাই কোথা যে তার মতটা জেনে নিয়ে আপন চিন্তাধারা আপন আচরণের বাছ-বিচার করি, জমা-খরচ নিই।

তবে পৃথিবীর লোক সচরাচর বলে থাকে সুইজারল্যান্ড নাকি বড় নিরপেক্ষ দেশ। আমার মনে হয়, লোকে তাকে যতটা নিরপেক্ষ মনে করে ঠিক ততটা সে নয়। তবু সবাই যখন একথা বলছেন তখন সুইসদের মধ্যে যাঁরা সচরাচর লিবরেল উদারপ্রকৃতি-সম্পন্ন বলে গণ্য (সব সুইসই যে সমান নিরপেক্ষ একথা সত্য হতে পারে না) তাঁদের মতটা শোনা যাক।

এঁরা প্রথমেই বলেন, চীন যে ভারত আক্রমণ করেছে এটা তার লাওস, ভিয়েতনাম বা কোরিয়াতে লড়াইয়ের মতো নয়। ওসব জায়গায় সে লড়ে কম্যুনিজ্‌ম ধর্মকে 'কাফের' ক্যাপিটালিস্ট-ইম্‌পিরিয়ালিস্টদের অযথা আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য (ভারতবর্ষ আক্রমণে সে উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, কারণ একথা কেউ বলতে পারবে না যে কম্যুনিজ্‌ম্-ধর্মবিশ্বাসী কম্যুনিস্টদের আমরা নির্যাতন করে করে নিঃশেষ করে আনছিলুম, বরঞ্চ বলব ওদের প্রতি আমাদের সহিষ্ণুতা ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে বলে ঘরে-বাইরে অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন), এস্থলে চীন ভারত আক্রমণ করেছে নিছক রাজ্যজয়ার্থে।

আমরাও বলি তাই, যদিও অন্য একাধিক কারণ থাকতে পারে।

এর পর সুইস লেখক বলেছেন, এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হয়েছে কী?

১. ভারতবাসীর স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়-ঐক্য রুদ্র জাগ্রত রূপ ধারণ করেছে এবং
২. যে কম্যুনিজ্‌মের প্রতি এতদিন সে উদাসীন এবং সহিষ্ণু ছিল তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছে।
৩. বিশ্বজন চীনকেই আক্রমণকারী, পররাজ্য লোভী, ইম্‌পিরিয়ালিস্ট বলেই ধরে নিয়েছে, কারণ তাঁরা নিরপেক্ষ জাতিদের মধ্যে ভারতকেই সর্বাগ্রগণ্য বলে শ্রদ্ধা করতেন ও ভারত যে তার দীনদুঃখীর ক্লেশ মোচনের জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করছে সে সত্যও তাঁরা জানতেন (অর্থাৎ চীন যেমন অস্ত্র নির্মাণে আপন শক্তির অপচয় করছিল তা না করে)।
৪. ভারতীয় কম্যুনিস্টরা পড়েছেন মহাবিপদে (আমরা গাঁইয়া ভাষায় বলি ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে); হয় তাদের প্রাণের পুত্তলি চৈনিক 'অগ্রগতির' সঙ্গে যোগ দিয়ে, সর্বভারতীয়ের সম্মুখে নিজেদের দেশদ্রোহী ভ্রাতৃহন্তা রূপে সপ্রকাশ করে, পরিশেষে রাজনৈতিক আত্মহত্যা বরণ করতে হবে, কিংবা চীনের বিপক্ষে, এমনকি শেষমেশ চীনের কম্যুনিস্ট সৎভাই বিশ্বপ্রলেতারিয়ার গুলিস্তান পরীস্তান রুশ— অবশ্য সৎভাই কারণ সে ছোটভাই চীনকে সাহায্য করতে আদৌ উৎসাহ দেখাচ্ছে না— এমনকি রুশেরও বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে।
৫. শ্রীযুক্ত খ্রুশ্চফকে হয় বিশ্বজনের সম্মুখে স্বধর্মানুরাগী পীতভ্রাতা চীনের বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গ নিতে হবে, কিংবা চীনের পক্ষ নিয়ে ভারত তথা এশো-আফ্রিকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর মৈত্রী থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

www.pathagar.com

৬. ভারতকে এখন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে প্রচুর এবং প্রচুরতর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। ফলে পশ্চিমের সঙ্গে মৈত্রী বাড়বে, কম্যুনিস্টদের প্রতি বৈরীভাব বৃদ্ধি পাবে। ধীরে ধীরে তার নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

পাঠক ভাববেন না, আমি সুইসের সঙ্গে একমত। আমিও ভাবছি না যে আপনি সুইসের সঙ্গে দ্বিমত। তবে একটা কথা আমরা উভয়েই মেনে নেব, নিরপেক্ষতা সর্বকালীন সর্বজনীন সার্বভৌম ধর্ম নয়। যদি সত্যই একদিন আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, কোনও বিশেষ নিরীহ দেশ অকারণে বলদৃপ্ত স্বাধিকার-প্রমত্ত রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে তবে আমরা নিশ্চয়ই নিরপেক্ষতা বর্জন করে আক্রান্ত রাষ্ট্রের পক্ষ নেব। মিশর আক্রান্ত হলে পর কমনওয়েলথের সম্মানিত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা মিশরের পক্ষ নিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য আজ আমরা যে আফ্রিকায় ভারতীয় সৈন্য পাঠাচ্ছি, ঠিক সেইরকম আর্তজনকে রক্ষার জন্য নিরপেক্ষতা বর্জন করে ঠিক সেইরকমই সৈন্য পাঠাব। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কিন্তু হিটলার বিশ্বাস করেন, যেখানে জয় সেখানেই ধর্ম।

কিন্তু উপরের ছয় নম্বর বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বলি, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস আমাদের নিরপেক্ষতা বর্জন অবশ্যম্ভাবী নয়। ক্ষণেকের প্রয়োজনে যদি-বা আমরা তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নিতে বাধ্য হই, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা চিরকালই তৃতীয় পক্ষের কেনা গোলাম হয়ে থাকব। তার অর্থ এ-ও নয়, আমরা নেমকহারাম। এবং যাতে করে তৃতীয় পক্ষের বা বিশ্বজনের এ অন্যায় সন্দেহ না হয়, তাই সাহায্য নেবার পূর্বেই, আমাদের নীতি ও উদ্দেশ্য সর্বজনকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে।

এই দুঃখের দিনে নেতাজির কথা মনে পড়ল।

দশ-বারো বৎসর পূর্বে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলি, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফতি এবং দ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশিদ। এঁদের দুজনাই আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজি। তিনি ভারতের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না।

'তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন যশ ও চরিত্রবল। প্রথম দুজনার স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনও সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুনিসিয়া আলজারিয়ায় লড়তে পারলেন না; শুধু তাই নয়, জর্মন রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে বেরুলেন তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মতো ইতালি থেকে বেতারে আরবিতে বক্তৃতা দিয়ে "প্রোপাগান্ডা" করার।

'অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কী অলৌকিক কর্ম সমাধান করলেন! স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, "ইংরেজের গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের" এক করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার ভারতীয় সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

www.pathagar.com

'আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল, সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যগণ যেন জাপানি ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতি এবং আবদুর রশিদ জর্মনিকে সে সুযোগ দিতে বাধ্য করাতে পারেননি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম। যদি চাও তবে সে রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পার। যদি ইচ্ছা হয় তবে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পার— এক স্বাধীন রাষ্ট্র যেরকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্তু আমি কোনও ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ "আজাদ হিন্দ" ভিন্ন অন্য কোনও রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।'

আজ আমরা স্বাধীন। পৃথিবীতে আমাদের গৌরব আজ অনেক বেশি। নেতাজি বিনাশর্তে সেদিন যে শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, আজ কি আমরা তা পারব না? না পারলে বুঝতে হবে আমাদের রাজনীতি দেউলিয়া।

মস্কো-যুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয়

১

লজ্জায় জর্মন জাঁদরেলরা হিটলারকে মুখ দেখাতে পারতেন না। রুশ-যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বার বার সপ্রমাণ করে ছেড়েছিলেন যে, জাঁদরেলরা ভুল করছেন— সত্যপন্থা জানেন হিটলার।

ভের্সাইয়ের চুক্তিতে পরিষ্কার শর্ত ছিল জর্মনি রাইনল্যান্ডে সৈন্য সমাবেশ করতে পারবে না। হিটলার যখন করতে চাইলেন তখন জেনারেলরা তারস্বরে প্রতিবাদ করে বললেন, 'যদি তখন ফ্রান্স আমাদের আক্রমণ করে তবে...?' হিটলার দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'করবে না।' হিটলারের কথাই ফলল। অবশ্য হিটলার পরে একাধিকবার স্বীকার করেছেন, তখন ফ্রান্স আক্রমণ করলে জর্মনি নির্ঘাত হেরে যেত। তার পর হিটলার পরপর অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করলেন— জেনারেলদের আপত্তি সত্ত্বেও— ফরাসি-ইংরেজ রা-টি পর্যন্ত কাড়লে না। বার বার তিনবার লজ্জা পাওয়ার পরও পোল্যান্ড আক্রমণের পূর্বে জেনারেলরা ফের গড়িমসি করেছিলেন, এমনকি ফ্রান্স আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁরা ওই 'জুয়ো খেলতে' চাননি। কিন্তু বার বার হিটলার প্রমাণ করলেন, জেনারেলদের আর যা থাকে থাক্ সমরনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁদের নেই— ভবিষ্যদ্বাণী করা তো দূরের কথা।

এতবার লজ্জা পাওয়ার পর তাঁরা আর কোন মুখ নিয়ে আপত্তি করতেন— হিটলার যখন রুশ আক্রমণ করবার প্রস্তাব তাঁদের সামনে পাড়লেন? এবং বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করার পর যে হিটলার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সেকথা তাঁরা ভালো করেই জানতেন। বক্ষ্যমাণ 'টেস্টামেন্টেই' আছে,

'এ যুদ্ধে আমাকে যত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়েছে তার মধ্যে কঠিনতম সিদ্ধান্ত রুশ আক্রমণ। আমি বরাবর বলে এসেছি, সর্বস্ব পণ করেও যেন আমরা দুই ফ্রন্টে লড়াই করাটা

www.pathagar.com

ঠেকিয়ে রাখি, এবং আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আমি নেপোলিয়ন এবং তাঁর রুশ-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপন মনে বহুদিন ধরে বিস্তর তোলাপাড়া করেছি।'

এসব তত্ত্ব জানা থাকা সত্ত্বেও জেনারেলরা তো মানুষই বটেন। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের আকছারই যে আচরণ হয় তাঁদেরও তাই হয়েছিল। অর্থাৎ জর্মনি যখন পোল্যান্ড, গ্রিস, ফ্রান্স একটার পর একটা লড়াই জিতে চলল তখন জাঁদরেলরা নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়ে বললেন, 'আমরা জিতেছি, আমরা লড়াই জিতেছি।' হিটলারকে স্মরণে আনবার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করলেন না।[১] কিন্তু হিটলার রুশযুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করলে পর এই জাঁদরেলরাই মোটা মোটা কেতাব লিখলেন, 'হিটলার অগা, হিটলার বুদ্ধু— তারই দুর্বুদ্ধিতে আমরা লড়াই হারলুম।' বাংলা প্রবাদে বলে, 'খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবদ্দন।' ফ্রান্স জয়ের দই খেলেন জাঁদরেলরা, রুশ পরাজয়ের বিকার হল হিটলারের। অবশ্য তাঁর পক্ষে এই সান্ত্বনা যে, তিনি এসব বই দেখে যাননি।

অবশ্য তিনিও কম না। জাঁদরেলরা যা করেছেন তিনিও তাই করে গেছেন। পোল্যান্ড ফ্রান্স জয়ের গর্ব তিনি করেছেন পুরো ১০০ নঃ পঃ, কিন্তু রুশ-অভিযান-নিষ্ফলতার জন্য দায়ী করেছেন তাঁর জাঁদরেলদের ন-সিকে। তিনি আত্মহত্যা করবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে যে উইল লিখে যান তাতে লিখেছেন, 'বিমানবাহিনী লড়েছে ভালো, নৌবহরও কিছু কম নয়, স্থল-সৈনিকরাও লড়েছে উত্তম, কিন্তু সর্বনাশ করেছে ওই জাঁদরেলরা।' অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'তারা মূর্খ, তারা প্রগতিশীল নয়, যুদ্ধের সময় তাদের চিন্তা, তাদের কর্মধারা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৯৪১-৪৫ সালে তারা যে কায়দায় লড়েছে সেটা যেন ১৯১৪-১৮-এর যুদ্ধ। ব্লিৎস ক্রিগ— বিদ্যুৎ-গতি যুদ্ধ— এ যে কী জিনিস তারা আদপেই বুঝতে না পেরে পদে পদে আমার আদেশ অমান্য করেছে।[২]

অর্থাৎ এবার দই খাচ্ছেন হিটলার, বিকারের বেলা জাঁদরেলরা। ফ্রান্স, পোল্যান্ড জয় করেছিলেন তিনি, রুশ-যুদ্ধে হারল জর্মন জাঁদরেলরা!

কিন্তু এহ বাহ্য! রুশ-যুদ্ধে জর্মনির হার হয়েছিল অন্য কারণে।

বহু রণপণ্ডিত একথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সে পরাজয়ের জন্য প্রধানত দায়ী শ্রীমান মুস্‌সোলিনি! হিটলার বলেছেন (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫),

---

১. একমাত্র জঙ্গিলাট কাইটেল করেছিলেন। ফ্রান্স পরাজয়ের খবর পৌঁছলে তিনি উল্লাসে বে-এক্তেয়ার হয়ে হিটলারকে উদ্দেশ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলেছিলেন, 'আপনি সর্বকালের সর্ব সেনাপতির প্রধানতম।' Groesste Feldherr alle Zeiten/ ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বলি, হিটলার যখন রুশে পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন তখন জর্মন কাষ্ঠরসিকরা Groesste-এর Gro, Feldherr-এর F, aller-এর A এবং Zeiten-এর Z নিয়ে সংক্ষিপ্ত করে Grofatz নির্মাণ করেন। এখানে Gro মানে বিরাট এবং Fatz শব্দের অর্থ— গ্রাম্য ভাষায় বাতকর্ম। আমি বাংলায় ভদ্রশব্দটি প্রয়োগ করলুম। বাংলা আটপৌরে শব্দটির সঙ্গে জর্মন শব্দটির উচ্চারণের মিল এস্থলে লক্ষণীয়।

২. যেমন মনে করুন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কানুন ছিল, শত্রু পরাজিত হলেও এক দিনের ভেতর কুড়ি মাইলের বেশি এগোবে না, পাছে তোমার লাইন অব কম্যুনিকেশন ছিন্ন হয়ে যায়। ব্লিৎস ক্রিগে পঞ্চাশ মাইলও নস্যি।

www.pathagar.com

"ইটালি যুদ্ধে প্রবেশ করামাত্র আমাদের শত্রুদের এই প্রথম কয়েকটি সংগ্রাম জয় সম্ভব হল (এস্থলে হিটলার ইংরেজ কর্তৃক উত্তর আফ্রিকা জয়ের কথা বলেছেন) এবং তারই ফলে চার্চিলের পক্ষে সম্ভব হল তার দেশবাসী তথা পৃথিবীর ইংরেজ-প্রেমীদের মনে সাহস এবং ভরসা সঞ্চার করা। এদিকে মুস্‌সোলিনি আবিসিনিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় হেরে যাওয়ার পরও গোঁয়ারের মতো হঠাৎ খামোখা আক্রমণ করে বসল গ্রিসকে আমাদের কাছে থেকে কোনও পরামর্শ না চেয়ে, এমনকি আমাদের সে সম্বন্ধে কোনও খবর না দিয়ে।[৩] খেল বেধড়ক মার; ফলে বল্কানের রাজ্যগুলো আমাদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করল। বাধ্য হয়ে, আমাদের তাবৎ প্ল্যান ভণ্ডুল করে নামতে হল বল্কানে (এবং গ্রিসে) এবং তাতে করে আমাদের রুশ অভিযানের তারিখ মারাত্মকরকম পিছিয়ে (কাটাস্ট্রফিক ডিলে) দিতে হল। এবং তারই ফলে আবার বাধ্য হয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনীর কতকগুলি অত্যুত্তম ডিভিশন পাঠাতে হল সেখানে। এবং সর্বশেষে নেট্‌ ফল হল, বাধ্য হয়ে আমাদের বহুসংখ্যক সৈন্যকে খোদার-খামোখা বল্কানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মোতায়েন করে রাখতে হল। (হিটলার বলতে চান, তা না হলে এ সৈন্যদের রুশ অভিযানে পাঠানো যেত। পক্ষান্তরে তখন তাদের সরালে ইংরেজ ফের গ্রিসে আপন সৈন্য নামাত এবং মুস্‌সোলিনি একা যে তাদের ঠেকাতে পারতেন না, সে তো জানা কথা)!

হায়, ইটালি যদি এ যুদ্ধে না নামত। তারা কোনও পক্ষে যদি যোগ না-দিত!

এ যুদ্ধ একা যদি জর্মনিই লড়ত— এ যদি অ্যাকসিসের যুদ্ধ না হত— তবে আমি ১৫ মে, ১৯৪১-এ-ই রাশা আক্রমণ করতে পারতুম। জর্মন সৈন্য ইতোপূর্বে কোথাও পরাজিত হয়নি বলে আমরা শীত আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই (১৯৪১-৪২-এর শীত) যুদ্ধ খতম করে দিতে পারতুম।" (ইটালির গ্রিস আক্রমণের ফলে ও তাকে সাহায্য করতে গিয়ে সময় নষ্ট হওয়াতে, হিটলার রাশা আক্রমণ করতে সমর্থ হলেন প্রায় এক মাস পরে। তিনি যখন মস্কোর কাছে এসে পৌঁছলেন তখন হঠাৎ প্রচণ্ড শীত আর বরফপাত আরম্ভ হল— এরকম ধারা শীত আর বরফ রাশাতেও বহুকাল ধরে পড়েনি— যুদ্ধের তাবৎ যন্ত্রপাতির তেল-চর্বি জমে গেল, শীতের পূর্বেই জর্মন সৈন্য মস্কো দখল করে সেখানে শীতবস্ত্র লুট করতে পারবে বলে তারও কোনও ব্যবস্থা হিটলার করেননি, বহু হাজার সৈন্য শুধু শীতের অত্যাচারেই জমে গিয়ে মারা গেল। বলা যেতে পারে এই শীতেই হিটলারের পরাজয় আরম্ভ হল— যদিও সেটা দৃশ্যমান হল তার পরের শীতে স্টালিনগ্রাডে।)

হিটলার হা-হুতাশ করে বলেছেন, 'হায়, তাই সব-কিছু সম্পূর্ণ অন্য রূপ নিল!'

কিন্তু প্রশ্ন, মস্কো দখল করতে পারলেই কি হিটলার শেষ পর্যন্ত জয়ী হতেন? নেপোলিয়ন তো মস্কো জয় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি রুশ জয় করতে পারেননি।

২

গত প্রবন্ধে মস্কো যুদ্ধের বর্ণনা লেখার কালি শুকোতে না শুকোতে খাস মস্কো থেকে একটি চমকপ্রদ খবর এসেছে। মস্কো যুদ্ধের বিংশ বাৎসরিক স্মরণ দিবসে গত ৫ ডিসেম্বর

৩. মুস্‌সোলিনি বলেছেন, 'হিটলার প্রতিটি লড়াই লড়েছে আমাকে নোটিশ না দিয়ে— আমিই-বা কেন আগেভাগে দিতে যাব?'

www.pathagar.com

(১৯৬১ খ্রি.) মস্কো শহরে মার্শাল রকসফ্স্কি তাস্ এজেন্সিকে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জর্মনরা স্থির করেছিল, মস্কোকে জলের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে সেটাকে সমুদ্রের মতো করে ফেলবে। পরে যখন দেখা গেল টেকনিকাল কারণে সেটা সম্ভবপর নয়, তখন তারা বোমা ফেলে সেটা ধ্বংস করার চেষ্টা নিল।

আমার মনে হয়, টেকনিকাল কারণে সম্ভবপর হলেও কৃত্রিম বন্যায় মস্কো ভাসিয়ে দেবার প্রস্তাবে হিটলার স্বয়ং রাজি হতেন না। তাঁর প্ল্যান ছিল, জর্মন সৈন্য মস্কো লুট করে গরম জামা-কাপড় এবং কিছু কিছু খোরাক পাবে— কিন্তু প্রধানত গরম জামা-কাপড় ও শীতের আশ্রয়ই ছিল তাঁর আসল লক্ষ্য, কারণ যুদ্ধ শীতের পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে মনে করে হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য সে ব্যবস্থা করেননি। (এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, জর্মনিতে কোনওকালেই উলের প্রাচুর্য ছিল না— জর্মনি চিরকালই তার জন্য নির্ভর করেছে প্রধানত স্কটল্যান্ডের ওপর এবং মস্কোর দোরে যখন জর্মনরা আটকা পড়ে গেল তখন হিটলারকে বাধ্য হয়ে জর্মনির জনসাধারণের কাছে শীতবস্ত্রের জন্য ঢালাও আবেদন জানাতে হল)। কাজেই মস্কো শহরকে সমুদ্রে পরিণত করলে তাঁর কোনও লাভই হত না। এবং মনে পড়ছে, নেপোলিয়নের বেলাতে রুশরা নিজেই কাঠের তৈরি মস্কো শহর পুড়িয়ে খাক করে দেওয়ার ফলে তিনি মস্কোর শ্মশানভূমিতে তাঁর সৈন্যের জন্য এককণা ক্ষুদ, ঘোড়ার জন্য একরত্তি দানা পাননি। এবারে রুশরা সেটা চাইলেও করতে পারত না, কারণ ইতোমধ্যে তারা মস্কো শহর কনক্রিট আর লোহাতে তার বাড়িঘর বানিয়ে বসে আছে। সেটাকে পোড়ানো অসম্ভব।

কাজেই মস্কো জয় করে নেপোলিয়ন লাভবান হননি, কিন্তু হিটলার হতেন।

মার্শাল রকসফ্স্কি আরও বলেছেন, মস্কোবাসী এবং সেখানে রুশ সৈন্যদল জর্মনদের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তারা সেটা গ্রহণ করেননি। এটা সত্যিই অত্যন্ত চমকপ্রদ খবর। এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, কোনও নগর আত্মসমর্পণ করলে সেটাকে বে-এক্তেয়ার লুটতরাজ করা যায় না।[৪]

অবশ্য যেসব ভুলের ফলে হিটলার মস্কো দখল করতে পারলেন না, সেগুলো না করে মস্কো দখল করতে পারলে তিনি যে তার পর অন্য ভুল করে যুদ্ধ হারতেন না, সেকথা বুক ঠুকে বলবে কে?

* * *

সমস্ত জর্মনি যখন রুশ, ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসি সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয়ে গিয়েছে, রুশবাহিনী প্রায় তাবৎ বার্লিন দখল করে হিটলারের বুঙ্কারের থেকে দু-পাঁচ শ'গজ দূরে, বুঙ্কার সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, বার্লিনের বাইরে তাঁর সৈন্যদল ও সেনাপতিরা আত্মসমর্পণে ব্যস্ত তখনও হিটলার কিসের আশায় পরাজয় স্বীকার করছিলেন না? আত্মহত্যার ঠিক তিন মাস পূর্বে হিটলার তাঁর আদর্শ মানব ফ্রেড্রিককে স্মরণ করে বলেছেন,

৪. এরসঙ্গে তুলনীয় মার্কিন কর্তৃক হিরোশিমায় অ্যাটম বম প্রয়োগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জর্মনির পরাজয়ের পর জাপান নিরপেক্ষ সুইডেনের মারফতে আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। মার্কিন সেটা গ্রহণ করলে হিরোশিমায় অ্যাটম বম ফাটিয়ে তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। তাই করেনি। করল এক্সপেরিমেন্টটা দেখে নিয়ে।

www.pathagar.com

"না। একেবারে আর কোনও আশা নেই, এরকম পরিস্থিতি কখনও আসে না। জর্মনির ইতিহাসে আকস্মিক কতবার তার সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে সেইটে শুধু একবার স্মরণ কর। সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধে ফ্রেড্রিক তাঁর নৈরাশ্য ও দুরবস্থার এমনই চরমে পৌঁছেছিলেন যে, ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে তিনি মনস্থির করেন যে, বিশেষ একটি দিনের ভেতর তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত না হলে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। ওই স্থির করা বিশেষ দিনের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে জারিনা হঠাৎ মারা গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন দৈবযোগে সমস্ত পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। মহান পুরুষ ফ্রেড্রিকের মতো আমরাও কয়েকটি সমবেত শক্তির (কোয়ালিশনের) বিরুদ্ধে লড়ছি, এবং মনে রেখ, কোনও কোয়ালিশনই চিরন্তনী সত্তা ধরে না। এর অস্তিত্ব শুধু গুটিকয়েক লোকের ইচ্ছার ওপর। আজ যদি হঠাৎ চার্চিল অবলুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে তড়িৎশিখার ন্যায় এক মুহূর্তেই সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। ব্রিটেনের খানদানি মুরুব্বিরা সেই মুহূর্তেই দেখতে পাবে তারা কোন অতল গহ্বরের সামনে এসে পড়েছে— এবং চৈতন্যোদয় হবে তখন।"

হিটলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলেন মার্কিন এবং ইংরেজ একদিন না একদিন অতি অবশ্য বুঝতে পারবে, ওদের শত্রু জর্মনি নয়, ওদের আসল শত্রু রুশ। এবং সেইটে হৃদয়ঙ্গম করামাত্রই তারা জর্মনির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করে সবাই একজোট হয়ে লড়াই দেবে রুশের বিরুদ্ধে। হিটলার আশা করেছিলেন, যেদিন মার্কিনিংরেজ জর্মনির কিয়দংশ দখল করার পর রুশের মুখোমুখি হবে সেইদিনই লেগে যাবে ঝগড়া, মার্কিনিংরেজ স্পষ্ট বুঝতে পারবে, রুশ কী চিজ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠাবে। কিন্তু ঠিক সেইটেই হল না। বার্লিনকে বাইপাস করে রুশ এবং মার্কিনিংরেজ যখন মুখোমুখি হল তখন তারা সুবোধ বালকের ন্যায় আপন আপন গোঠে জমিয়ে বসে গেল।

এবং অদৃষ্ট হিটলারের দিকে শেষ মুহূর্তে কী নিদারুণ মুখ-ভেংচিই-না কেটে গেলেন।

হিটলারের দুর্দশা যখন চরমে, তিনি যখন দিবারাত্রি আকস্মিক ভাগ্য-পরিবর্তনের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছেন, গ্যোবেল্‌স্ প্রভুর হৃদয়ে সাহস সঞ্চারের এবং কার্লাইলের লিখিত 'ফ্রেড্রিক দি গ্রেটের ইতিহাস' মাঝে মাঝে পড়ে শুনিয়ে যান, এমন সময় উত্তেজনায় বিবশ গ্যোবেল্‌স্ প্রভুকে ফোন করলেন, 'মাইন ফ্যুরার, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। নিয়তি আপনার পরম শত্রুকে বিনাশ করেছেন। জারিনা মারা গেছেন।"

এস্থলে জারিনা অবশ্য রোজোভেল্ট, তিনি মারা যান ১২ এপ্রিল ১৯৪৫।

কিন্তু হায়, চার্চিল নয়, অদৃশ্য হলেন রোজোভেল্ট! তবু মন্দের ভালো। কিন্তু তার চেয়েও নিদারুণ— হায়, হায়— রোজোভেল্টের মৃত্যু সত্ত্বেও মার্কিন তার সমরনীতি বদলাল না। হিটলার প্রতিটি মুহূর্ত গুনলেন অধীর প্রত্যাশায়— ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে। আত্মহত্যা করলেন তার আঠারো দিন পরে। ফ্রেড্রিককে করতে হয়নি।

* * *

এইবারে তাঁর শেষ ভবিষ্যদ্বাণী :

"জর্মনি হেরে গেলে, যতদিন না এশিয়া, আফ্রিকা এবং সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার ন্যাশনালিজমগুলো জাগ্রত হয়, ততদিন পৃথিবীতে থাকবে মাত্র দুটি শক্তি যারা একে অন্যকে মোকাবেলা করতে পারে— মার্কিন এবং রুশ। ভূগোল এবং ইতিহাসের আইন এদের বাধ্য

www.pathagar.com

করবে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে— সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা অর্থনীতি এবং আদর্শবাদের (ইডিয়লজিকাল) সংগ্রাম। এবং সেই ইতিহাস ভূগোলের আইনেই উভয়পক্ষই হবে ইউরোপের শত্রু। এবং এ বিষয়েও কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, শীঘ্রই হোক আর দেরিতেই হোক, উভয়পক্ষকেই ইয়োরোপের একমাত্র বিদ্যমান শক্তিশালী জর্মন জাতির বন্ধুত্বের জন্য হাত পাততে হবে।"

এর টীকা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড় যে জর্মনিতেই হচ্ছে সেকথা কে-না জানে? আর আডেনাওয়ারের কণ্ঠস্বর যে ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠছে সে-ও তো শুনতে পারছি! এবং রুশ যে পূর্ব জর্মনির মারফতে পশ্চিম জর্মনির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করতে উদ্‌গ্রীব, সে-ও তো জানা কথা ॥

কুট্টি

পুব-বাঙলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাদের সংখ্যা একলপতে গুয়াগাছের ডগায় উঠে গেছে। কিছুদিন পূর্বেও পুব-বাঙলার উপভাষা শুধু দক্ষিণ কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোনও কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছিনে— শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো ফায়দা এখনও কোনও লেখক ওঠাননি। পুব-বাঙলার লেখকেরা ভাবেন 'করে' শব্দ 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়া সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গিতে বা 'ইডিয়মে'— অবশ্য সেগুলো ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করতে হয়, যাতে করে সে ইডিয়ম পশ্চিম-বঙ্গ তথা পুব-বাঙলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরিব মার খায় তবে সিলেট অঞ্চলে বলে, 'হাতির লগে পাতি খেলতায় গেছলায় কেনে?' অর্থাৎ 'হাতির সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন?' কিন্তু পাতি খেলা যে polo খেলা সেকথা বাঙলা দেশের কম লোকই জানেন; (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ওৎরাবে না। আবার—

দুষ্টু লোকের মিষ্টকথা
দিঘল ঘোমটা নারী
পানার তলার শীতল জল
তিন-ই মন্দকারী।

'কামুফ্লাজ' বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পুব, পশ্চিম কোনও বাঙলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে এবং গুণটি ঢাকা শহরের 'কুট্টি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ— যদিও তার রস তাবৎ পুব-বাঙলা এবং

www.pathagar.com

পশ্চিম বাঙলারও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রসপটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'— এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম অর্থাৎ চটুল, শৌখিন, হয়তো-বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেন্ট।

কলকাতা, লখনউ, দিল্লি, আগ্রা বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লখনউ, দিল্লিতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক কিন্তু এদের সব্বাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির কাছে। তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাক্‌শূন্য করা, ফারসি এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজির-জবাব') এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলব, কুট্টির সঙ্গে ফস করে মশকরা না-করতে যাওয়াটাই বিবেচকের কর্ম। খুলে কই।

প্রথম তা হলে একটি সর্বজনপরিচিত রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়, অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নতুন বস্তুটি চিনতে পারে— ইংরেজিতে এই পন্থাকেই 'ফ্রম স্কুল রুম টু দি ওয়ার্লড ওয়াইড' বলে।

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারিনে। তাই পশ্চিম-বাংলার ভাষাতেই নিবেদন করি

যাত্রী : 'রমনা যেতে কত নেবে?'

কুট্টি গাড়োয়ান : 'এমনিতে তো দেড় টাকা; কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।'

যাত্রী : 'বল কী হে? ছ আনায় হবে না?'

কুট্টি : 'আস্তে কন কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।'

এর যুতসই উত্তর আমি এখনও খুঁজে পাইনি।

মোটেই ভাববেন না যে, এ-জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মতো কতকগুলি গল্প অবশ্যই কালাতীত, অজরামর, কিন্তু কুট্টি হামেশাই চেষ্টা করে নতুন নতুন পরিবেশে নতুন নতুন রসিকতা তৈরি করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন এক কুট্টি গিয়ে যে-ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কী ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে? সক্কলের শেষে এল?'

কুট্টি হেসে বলল, 'কন্ কী কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া তো নয়, বাঘের বাচ্চা; বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদি হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড্র করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলথি, অপটিমিজ্‌ম।'

কিংবা, আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ-যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশিদের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্নিং সুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লঙ কোট বা প্রিন্সকোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্‌কালো, তদুপরি তিনি হাড়কিপটে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আশপাশ দেখলেন, কোনও কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না, অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। যে-কুট্টি কোচম্যান সঙ্গে ছিল সে শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ

www.pathagar.com

দিল, 'কর্তা, আপনি কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচা করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের উপর ছ-টা বোতাম, আর দু হাতে কব্জির কাছে তিনটে তিনটে করে ছ'টা বোতাম লাগিয়ে নিন! খাসা প্রিন্সকোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানি (বাকিরখানি) রুটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমির আলি এভিন্যুতেই অন্তত আধাডজন দোকানে সাইনবোর্ডে 'বাখরখানি' লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা করি, কুট্টির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাখরখানির মতোই পশ্চিম-বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং তার নতুনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোনও কৃতী লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিশিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে দেবেন— পরশুরাম যেরকম পশ্চিমবাংলার নানা হাল্কা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম একদা কলকাতার নিতান্ত কক্‌নিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমার দিকে কিন্তু খরচের দিকে একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপরিচিত কিংবা বিদেশির সামনে এমন ভাষা ব্যবহার না করা, যে-ভাষা বিদেশি অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পুব-বাঙালির সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটিভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ' বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এন্তার, ইলাহি, বেলেল্লাবেহেড়, দোগেড়ের চ্যাং— এসব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পুব-বাঙালির সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য যদি বক্তা সুরসিক হন এবং আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজান্তেই অনেক ঝাঁঝওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের ভদ্র আড্ডাতে পুব-বাঙালির সংখ্যা থাকত অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারি গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য, প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া বাক্যভঙ্গি বানাতেন যে রসিকজনমাত্র বাহবা শাবাস না বলে থাকতে পারত না।

আজ পুব-বাংলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দ-বিন্যাস ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়তো এঁরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনও ব্যবহার করেন; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জমজমাট হয় না— আড্ডা জমে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পুব-বাংলার সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলো ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব শব্দ আস্তে আস্তে ভদ্রভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে উঠবে, উল্টো এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণির খানদানি কলকাত্তাই চমৎকার বাংলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সায়েবি ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাংলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল ভাশুর-ভাদ্রবধূর। তাই এঁরা বলতেন ঠাকুরমা-দিদিমার কাছে শেখা বাঙলা এবং সে বাঙলা যে কত মধুর এবং ঝলমলে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা সে-বাংলা শুনেছেন। ক্রিক রো'র মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার

www.pathagar.com

অতি খানদানি ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে-বাংলা বলতেন তার ওপর বাংলা সাহিত্যের বা পুব-বাংলার কথ্যভাষার কোনও ছাপ কখনও পড়েনি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্যমনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরান, ঘুমুলে?' মন্মথদার কাছ থেকে এ-অধম এন্তার বাংলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালিই চেনেন। এঁর নাম গাঙ্গুলিমশাই— ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতনে অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিলি ঘরের ছেলে এবং গল্পবলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের একদিক দিয়ে গরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্যদিক দিয়ে জলতরঙ্গের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারি বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ্ টারালাপ্ করে, গাঙ্গুলিমশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতোগুলো ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে— এ গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন ছেলে হেসে কুটিপাটি হয়নি?

হায়, এ শ্রেণির লোক এখন আর দেখতে পাইনে। তবুও এখনও আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের ওপর।

শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়ের উপাদেয় 'স্মৃতিমন্থন' আমারও স্মৃতির ভিজে গামছাটি নিংড়ে বেশ কয়েক ফোঁটা চোখের জল বের করল।

আমিও এ বাবদে একদা একটি প্রবন্ধ লিখি। আশ্চর্য! ছাপাও হয়েছিল। এবং চাটগাঁয়ে প্রকাশিত একটি মাসিকে সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আবার কোনও পুস্তকে সেটি স্থান পেয়েছে কি না, মনে পড়ছে না।

আমার মনে হয়, কুট্টি সম্প্রদায় (ঢাকার গাড়োয়ান শ্রেণি) একদা মোগল সৈন্যবাহিনীর ঘোড়সওয়ার সেপাই ছিল। যার ফলে তারা 'কুঠি'বাড়ির ব্যারাকে থাকত। এবং তাই পরে এদের নাম কুট্টি হয়। পরবর্তীকালে ইংরেজবাহিনীতে এদের স্থান হয়নি বলে, কিংবা মোগলের নেমকহারামি করতে চায়নি বলে এরা ঘোড়ার গাড়ি চালাতে শুরু করে। কারণ ঘোড়া তাদের নিজেরই ছিল, এবং ঘোড়ার খবরদারি করতে তারা জানত। বরোদা রাজ্যেও আমি শুনতে পাই, সেখানকার কোচম্যানরাও নাকি পূর্বে মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে ক্যাভলরি অঙ্গে কাজ করত। ঢাকার কুট্টিরা এককালে উর্দু বলত, পরে ঢাকা শহরের চলতি বাঙলার সঙ্গে মিশে 'কুট্টি ভাষা'র সৃষ্টি হয়। তাই তারা এখনও 'লেকিন, মগর' এ-ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তবে পুব-বাঙলার মৌলবি সায়েবরাও 'লেকিন, মগর' ছাড়া আরও বহু বহু আরবি ফারসি শব্দ 'বাঙাল' কথা বলার সময় ব্যবহার করে থাকেন— ওই অঞ্চলে হিন্দু পণ্ডিতরাও যেরকম গলায় ঘা হলে বলেন, 'কণ্ঠদেশে ক্ষত অইছে'। তাই শুনে মেডিকেল কলেজের গোরা ডাক্তার নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'চীন দেশ হ্যায়, জাপান ভি দেশ হ্যায়, ফির কণ্ঠদেশ কোন দেশ হ্যায়?'

বছর-পঞ্চাশেক পূর্বে ঢাকার এই 'কুট্টি' ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তাতে ওই আমলের কুট্টিভাষার উদাহরণস্বরূপ বলা হয় :

www.pathagar.com

'করিম বক্স্‌কা মা নে আর রহিম্‌ বক্স্‌কা জরুনে এয়সা লাগিস্‌ লাগিস্তা কে এ ভি উস্‌কা বালমে ধরি টানিস্তা, উ ভী ইস্‌কা বাল্‌মে ধরি টানিস্তা।'

অর্থাৎ 'করিম বখ্‌শের মা আর রহিম বখ্‌শের স্ত্রীতে এমন লাগাই লাগল (কোঁদল) যে, এ ওর চুল ধরে টানে, ও এর চুল ধরে টানে।'

(কুট্টি ভাষার উদ্ধৃতিতে কোনও ভুল থাকলে যেন কুট্টিভাষাভাষী আমার ওপর বিরক্ত না হন— কারণ কুট্টি গাড়োয়ান ছাড়া অন্য অনেক লোক এ-ভাষা বলে থাকেন এবং বাঙলা সাহিত্যের চর্চাতে আনন্দ পান। পূর্বে এঁরা সকলেই উঁচু সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। শুনতে পাই এঁদের কেউ কেউ নাকি ভাষা-আন্দোলনে বাঙলা ভাষার পক্ষ নেন।)

* * *

'হাওয়া গাড়ি চইলা গেল গো
(আমার) বন্ধু আইল না।'

গানটি পুব-বাঙলায় রূপকার্থেও নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে হাসন রাজার—

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানি দীন (ধর্ম)—
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদ্‌বয় (সুগন্ধ, দুর্গন্ধ)
আমা হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয় ॥

এ ছত্রগুলো ব্যবহার করেন, সেই হাসন রাজারই একটি গান আছে, 'হাওয়ার গাড়ি ধু ধা করে চলেছে। (নিশ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়ায় যে গাড়ি চলে অর্থাৎ শরীর) তার ভিতর সায়েব সোয়ারি (পরমাত্মা, আল্লা) বসে আছেন। হাসন রাজা (অর্থাৎ ব্যষ্টি পুরুষ) সেই সায়েবকে সেলাম করাতে (মর্মে মর্মে তাঁকে ভক্তিভরে অনুভব করাতে) তিনি হাসনকে আদর করে পাশে বসালেন।'

পুরো গানটি আমার স্মরণে নেই; তবে শেষের দু ছত্র আছে—

'হাসন রাজা, নাচতে আছে, 'আল্লা আল্লা' ধরি।
পবনের গাড়ি চলতে আছে ধু ধু ধা ধা করি' ॥

এখানে পবনের গাড়ি, হাওয়া গাড়ি, শ্রদ্ধেয় বসু মশায়েরও হাওয়া গাড়ি মোটামুটি একই। তাই অর্থ দাঁড়ায়, 'পবনের গাড়ি' অর্থাৎ 'আমার প্রাণবায়ু' চলে গেল, তবু আমার বন্ধু এল না। বলাবাহুল্য পুব-বাঙলার ভাটিয়ালি গীত রচয়িতা এবং পশ্চিম বাঙলার বাউল উভয়ই কিছুদিন আগে পর্যন্তও অত্যন্ত সজীব, প্রাণবন্ত স্রষ্টা ছিলেন বলে নতুন নতুন জিনিস আমদানি হলেও তাকে সিমবল্‌, রূপক রূপে, এলেগরি করে মরমিয়া (মিস্টিক) গান রচনা করতেন। যেমন রেলগাড়ির ঘণ্টা বেজেছে (আসন্ন মৃত্যুর ধ্বনি বেজেছে), আমি যাত্রী ঘুমে অচৈতন্য (তমোগুণে আচ্ছন্ন) ইত্যাদি। বিজলিবাতি নিয়ে একটি গান আমার আবছা আবছা মনে পড়ছে। হাওয়া গাড়ি প্রবর্তিত হলে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ওই 'মোতিফ' নিয়ে একাধিক গীত রচিত হয়।

* * *

প্রধানত রিকশার চাপে কুট্টি গাড়োয়ান সম্প্রদায় ঢাকার রাস্তা থেকে প্রায় অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত এরা নতুন নতুন অবস্থায় নতুন নতুন রসিকতা তৈরি করে গিয়েছে— অনেকেরই ভুল বিশ্বাস, এদের রসিকতার একটি প্রাচীন ভাণ্ডার ছিল এবং তারা শুধু সেগুলো ভাঙিয়েই খায়, আমি যে শেষ রসিকতাটি শুনেছি, সেটি ১৯৪৭-৪৮ সালে নির্মিত।

www.pathagar.com

আমি ১৯৪৮ সালে ঢাকার এক আত্মীয়কে শুধোই, 'মুসলিম লীগ কীরকম রাজত্ব চালাচ্ছেন?'

তিনি বললেন, 'সে সম্বন্ধে একটি কুট্টি রসিকতা বাজারে চালু হয়েছে। অত্যন্ত ক্যারাক্‌টিরিসটিক্— অর্থাৎ লীগের ক্যারাক্‌টার প্রকাশ করে। যদিও গল্পটি একটু 'রিস্‌কে'— অর্থাৎ গলা খাঁকরি দিয়ে বলতে হয়।'

মুসলিম লীগ শাসনভার হাতে নিয়ে এক কুট্টি গাড়োয়ানকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেন, সে যেন তার জাতভাইদের মধ্যে তাঁদের জন্য প্রচারকার্য বা প্রোপাগান্ডা করে। সে তাদের ডেকে বক্তৃতা আরম্ভ করলে, 'ভাই সকল, শোনো (আমি এস্থলে কুট্টি ভাষার পরিবর্তে 'সাধুই' ব্যবহার করছি— লেখক)। আমাদের রাষ্ট্র আমাদের মায়ের মতো! মাকে যদি খাওয়াও-পরাও তবে মায়ের দুধ তুমি-ই পাবে। খাজনাটা ট্যাক্সোটা ঠিকমতো দাও; মায়ের দুধ তুমিই পাবে।' তখন এক ব্যাক্‌বেঞ্চার (হেক্‌লার) বলে উঠল, 'কইছ ঠিকই, লেকিন বাবা হালায় যে খাইয়া ফুরাইয়া দিল।' অর্থাৎ মিনিস্টার, পলিটিশিয়ানের দলই সব লুটে নিচ্ছে।... মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ কারও প্রতিই আমাদের কোনও বৈরী ভাব নেই, তবে মনে হয়, গল্পটি বহু দেশ-প্রদেশের শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে খাটে।

* * *

এই কুট্টি গাড়োয়ানদের সম্বন্ধে শেষ একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

পার্টিশনের, পূর্বে ও পরে, কি হিন্দু, কি মুসলমান সর্ব পিতামাতা নির্ভয়ে তাঁদের কন্যাদের কুট্টির গাড়িতে তুলে দিতেন। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক এরা ঠিক সময়ে মেয়েদের ফের স্কুল-কলেজ থেকে ফিরিয়ে আনত। হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে গেলেও এবং শুনেছি, কোনও কোনও স্থানে দাঙ্গার ফলে বাপ-মা উধাও জানতে পেরে ভালো জায়গায় তাদের পৌঁছে দিয়েছে। কুট্টিরা এ জিম্মাদারিতে কখনও গাফিলি করেছে বলে শোনা যায়নি। এরা সত্যই শিভাল্‌রাস।

আর ওই শিভাল্‌রাস কথাটা এসেছে ফরাসি 'শেভালিয়ের' থেকে। 'শেভাল' মানে ঘোড়া।

শেভালিয়ের অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার। একদা খানদানি ফরাসিদের ছেলেরা এই ক্যাভালরি বা অশ্ববাহিনীর সদস্য ছিল। তাই বলছিলুম, কুট্টিরা আসলে মোগল বাহিনীর ঘোড়সওয়ার ছিল।

দরখাস্ত

এইমাত্র কয়েকদিন পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে। আমার এক বন্ধুপুত্র ঝাড়া তেরোটি বচ্ছর কাজ করার পর মিন্ নোটিশে চাকরি হারাল। টাইপ-করা একখানা কাগজ হাতে তুলে দিল, তার সারমর্ম— তোমাকে দিয়ে আমাদের আর কোনও প্রয়োজন নেই, কেটে পড়।

চৌদ্দ বছর পর চাকরি গেলে খুব আশ্চর্য হতুম না। কারণ আজকাল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অর্থ চোদ্দ বছর। তার পর মুক্তি। ঠিক সেইরকম আমার এক ফরাসি-বন্ধু তাঁর সিলভার

www.pathagar.com

ওয়েডিঙের পরবে আমায় শুধোলেন, আমাদের দেশে, জেলে ম্যাক্সিমাম ক বছর পুরে রাখে? আমি ওই উত্তর দিলে তিনি বললেন, 'তবে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?'

আমি শুধালুম, 'কিসের থেকে?'

কড়ে আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে বউকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে, ওর সঙ্গে পঁচিশটি বৎসর বন্দি হয়ে কাটালুম। এখনও কি মুক্তি পাব না?'

উল্টোটাও শুনেছি। এক ইংরেজকে শুধিয়েছিলুম— নিজে বিয়ে করতে যাবার ঠিক আগের দিন— ওদের বিবাহিত জীবনের কাহিনী শোনাতে। বললেন, 'বিয়ের চোদ্দ বছর পর একদিন বউকে একটুখানি সামান্য কড়া কথা বলতেই সে ডান ভুরুটি একটু উপরের দিকে তুলে শুধোল, "ডার্লিং! তবে কি আমাদের হানি-মুন শেষ হয়ে গেল?" ' ইংরেজ একটু থেমে বললেন, 'ওই আমার আক্কেল হয়ে গেল। এর পর আর কক্খনও রা-টি পর্যন্ত কাড়িনি।' তারই কিছুদিন পর তাঁর যমজ সন্তান হলে পর আমি তাঁকে বলেছিলুম, 'চীনা ভাষায় প্রবাদ আছে "যে লোক মোমবাতির খর্চা বাঁচাবার জন্য সন্ধ্যার সময়েই শুয়ে পড়ে তার যমজ সন্তান হয়।" ইংরেজ সেয়ানা; সঙ্গে সঙ্গে সক্কলকে একটা রাউন্ড খাইয়ে দিলে।

এ বাবদে আমাকে লাখ কথার সেরা কথা শুনিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি— তখন অবশ্য তিনি কাশীতে সাদামাটা অধ্যাপক— জুলুদের অভিধানে নাকি স্বামীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'এক প্রকার জংলি পশু যাকে স্ত্রী পোষ মানায়।'

এবং দুই এক্সট্রিম সদাই মিলে যায় বলে অভিজাত চীনাদের অভিধানে লেখকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'একপ্রকারের বন্যজন্তু যাকে সম্পাদক পোষ মানায়।'

গেল চৌদ্দটি বছর ধরে বঙ্গদেশের সম্পাদক তথা প্রকাশককুল আমাকে পোষ মানাবার চেষ্টা করেছেন। আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু এখন তাঁরা আর আমাকে ছাড়তে চান না। উত্তম শায়েস্তাপ্রাপ্ত কয়েদিকে জেলার ছাড়তে চায় না। বাড়ির এডা-সেডা করে দেয়— অথচ তাকে মাইনে দিতে হয় না।

আমি কিন্তু মহারানির কাছে আপিল করেছি— 'চোদ্দ বছর পূর্বে ঠিক ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আমার প্রথম বই বেরোয়। আজ ১৯৬৪, আমার ছুটি মঞ্জুর হোক।'

কুকর্ম করে মানুষ জেলে যায়। আমিও কুমতলব নিয়ে লেখক হয়েছিলুম।

সাধারণের বিশ্বাস, লেখকের কর্তব্য পাঠককে পরিচিত করে দেবে বৃহত্তর চিন্তাজগতের সঙ্গে, তাকে উদ্বুদ্ধ করবে মহান আদর্শের পানে, প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক জেরোম কে জেরোমের ভাষায়, তাকে 'এলিভেট' করবে। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, 'মাই বুক উইল নট এলিভেট ইভন্ এ কাউ!'

লেখকের কর্তব্য যদি পাঠককে মহত্তর করে তোলাই হয়, তবে নিঃসন্দেহে কুমতলব নিয়েই আমি সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, অর্থ লাভ।

মহাকবি হাইনে একাধিকবার বলেছেন— তাই তাঁকে একাধিকবার উদ্ধৃত করতে আপত্তি নেই— 'কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝিনে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই বুঝেছি।' আমার বেলা তারচেয়েও সরেস। আমার হাতে অর্থ কখনওই আসেনি। কাজেই মূল্য বোঝা-না-বোঝার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। আমি চিরটাকাল 'খেয়েছি লঙ্গরখানায়, ঘুমিয়েছি মস্‌জিদে'; কাজেই বছরটা আঠারো মাসে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

এমন সময় লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে যিনি পুষতেন তিনি আল্লার ডাক শুনে ওপারে চলে গেলেন। বেহেশ্‌তে গিয়েছেন নিশ্চয়ই; কারণ আমাকে নাহক পোষা ছাড়া অন্য কোনও অপকর্ম (গুনাহ্‌) তিনি করেননি।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডে বেরিয়েছে, ফ্লেমিঙের মৃত্যুর পর তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যাতে আছে 'আন্‌অ্যাশেমডলি আই অ্যাডমিট— আই রাইট ফর্‌ মানি।'

এর পর যেসব পূর্বসূরিগণ নিছক অর্থের জন্যই লিখনবৃত্তি গ্রহণ করেন, তাঁদের নাম করতে গিয়ে বাল্‌জাক্‌, ডিকেন্স, স্কট্‌, ট্রলোপের নাম করেছেন।

এই প্রবন্ধটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন মি. কাউলি। তিনি তার পর আপন মন্তব্য জুড়েছেন, 'কিন্তু এখানে, থেমে যাওয়া কেন?' বস্‌ওয়েলের লেখা যাঁরা স্মরণে রাখেন তাঁরাই মনে করতে পারবেন, ড. জনসনও এ-বাবদে কুহকাচ্ছন্ন ছিলেন না, 'নিতান্ত গাড়োল (blockhead) ভিন্ন অন্য কেউ অর্থ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে না'— এই ছিল সেই মহাপুরুষের সুচিন্তিত অভিমত।

অবশ্য তারচেয়েও বড় গাড়োল, যে টাকার জন্য লিখেও টাকা কামাতে পারল না।

আমি ড. জনসনের পদধূলি হওয়ার মতোও স্পর্ধা ধরিনে; অতএব তাঁর মতো কটুভাষা ব্যবহার না করে, অর্থাৎ কে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে, সেই অনুযায়ী কে পাঁঠা, কে গোলাপফুল সে আলোচনা না করে শুধু বলব আমি স্বয়ং লিখেছি, নিছক টাকার জন্য।

আমার বয়স যখন উনিশটাক তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বললেন, 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপাতে আরম্ভ কর্‌। আর দেখ্‌, লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস। আমি ব্যবস্থা করব।'

আমার অর্থাভাব তিনি জানতেন; তদুপরি আমার হাত দিয়ে কেউ যেন তামাক না খায়, অর্থাৎ আমাকে exploit না করে। তিনি একদা উত্তমরূপেই জমিদারি চালিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে যাচ্ছিল তাই বাগ্দেবীকে বানরীর মতো ঘাগরা পরিয়ে ঘরে ঘরে নাচতে হল না (এটি বিদ্যাসাগর মশাই দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, অস্য দগ্ধ উদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া। বানরীমিব বাগ্দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে ॥)।

আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ি ১৯২৬-এ। ১৯৩৮-এ গুরুদেবকে প্রণাম করতে এলে তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোনও লেখা ছাপাচ্ছি না কেন? উত্তরে কী বলেছিলুম সেটা আর এখানে বলে কাজ নেই।

কায়ক্লেশে চলে গেল ১৯৪৯ পর্যন্ত। লঙ্গরখানা (অর্থাৎ ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট-মস্‌জিদে) বন্ধ হয়ে গেল তখন; যেটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপ্‌রা কম্পজিস্ট রস্‌সিনি বলতেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতুম, অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেখলুম, এক অপ্‌রা কম্পোজ করা ভিন্ন অন্য কোনও এলেম আমার পেটে নেই। সেই করে টাকা হয়েছে যথেষ্ট। এখন আর কম্পোজ করব কোন দুঃখে!' খ্যাতির মধ্যগগনে, যৌবনে, তিনি এই আপ্তবাক্যটি ছাড়েন। তার পর তিনি বোধহয় আরও দুটি অপ্‌রা তৈরি করেন— একবার নিতান্ত বাধ্য হয়ে, প্রায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য, ও আরেকবার একজনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য।

www.pathagar.com

রস্‌সিনির তুলনায় আমি কীটস্য কীট। কিন্তু আমি দেখলুম, ওই এক বই লেখা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে পয়সা কামাবার মতো বিদ্যে আমার ব্রেন-বাক্সে নেই। আশ্চর্য, তার পর একটা চাকরি পেয়ে গেলুম। কাজেই লেখা বন্ধ করে দিলুম। চাকরি ইস্তফা দিলুম। ফের কলম ধরতে হল। ফের চাকরি। ফের কলম। ফের চাকরি, ফের— ইত্যাদি।

আমার লেখা অল্প লোকেই পড়েন, আমার জীবন এমন কিছু একটা নয় যা নিয়ে লোকের কৌতূহল থাকতে পারে। তবু যাঁরা নিতান্তই 'নোজি' (পিপিং টম্— নোজি পার্কার) তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন, যখন আমার চাকরি থাকে, তখন আমি লিখি না।

একবার ফ্রান্সে ঢোকবার ফর্মে প্রশ্ন ছিল— 'তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কী?'

উত্তরে লিখেছিলুম, 'কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া (রিজাইনিং জব্ ফ্রম্ টাইম টু টাইম্)।'

ফরাসি শুধোল, 'তা হলে চলে কী করে?'

বললুম, 'তুমি রেজিগনেশনগুলো দেখছ; আমি জব্‌গুলো দেখছি।'

পেটের দায়ে লিখেছি মশাই, পেটের দায়ে। বাংলা কথা স্বেচ্ছায় না লেখার কারণ—

(১) আমার লিখতে ভালো লাগে না। আমি লিখে আনন্দ পাইনে।

(২) এমন কোনও গভীর, গূঢ় সত্য জানি নে যা না বললে বঙ্গভূমি কোনও এক মহাবৈভব থেকে বঞ্চিত হবেন।

(৩) আমি সোশ্যাল রিফর্মার বা প্রফেট নই যে দেশের উন্নতির জন্য বই লিখব।

(৪) খ্যাতিতে আমার লোভ নেই। যেটুকু হয়েছে, সেইটেই প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। নাহক লোকে চিঠি লিখে জানতে চায়, আমি বিয়ে করেছি কি না, করে থাকলে সেটা প্রেমে পড়ে না কোল্ড ব্লাডেড, যেরকম কোল্ড ব্লাডেড খুন হয়— অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন ঠিক করে দিয়েছিলেন কি না?— শব্‌নমের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল কি না, 'চাচা'টি কে, আমি আমার বউকে ডরাই কি না— ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং কেউ কেউ আসেন আমাকে দেখতে। এখানকার বাঘ সিঙ্গি নন্দলাল, সুধীরঞ্জনকে দেখার পর আমার মতো খাটাশ্‌টাকেও একনজর দেখে নিতে চান। কারণ কলকাতায় ফেরার ট্রেন সেই বিকেল পাঁচটায়; ইতোমধ্যে আর কী করা যায়। এবং এসে রীতিমতো হতাশ হন। ভেবেছিলেন দেখবেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো সুপুরুষ সৌম্যদর্শন নাতিবৃদ্ধ এক ভদ্রজন লীলাকমল হাতে নিয়ে সুদূর মেঘের পানে তাকিয়ে আছেন; দেখেন বাঁধিপোতার গামছা পরা, উত্তমার্ধ অনাবৃত, বক্ষে ভাল্লুকের মতো লোম, মাথা-জোড়া-টাক— ঘনকৃষ্ণ ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া রঙ, সাত দিন খেউরি হয়নি বলে মুখটি কদমফুল— হাতলভাঙা পেয়ালায় করে চা খাচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে!

আমি রীতিমতো নোটিশ দিয়ে লেখা বন্ধ করেছি। গত বৎসর মে মাসে আমি 'দেশ' পত্রিকা মারফৎ সেটা জানিয়ে দিয়েছিলুম। কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন— তাঁদের স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তার পরও দু-একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। দাদন শোধের জন্য।

আর কখনও লিখব না, একথা বলছি না। চাকরি গেলেই লিখব। খেতে পরতে তো হবে।

www.pathagar.com

সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় শিকার

উইট্‌নি বলল, 'ডান দিকে— ঠিক কোথায় জানিনে— বেশ বড় একটা দ্বীপ রয়েছে। সে একটা রহস্য—'

রেন্‌সফর্ড শুধাল, 'নাম কী দ্বীপটার?'

'পুরনো দিনের ম্যাপে নাম রয়েছে 'জাহাজ-ফাঁদ দ্বীপ'। নামটার থেকেই অর্থ কিছুটা আমেজ করা যায়, নয় কি? মাঝি-মাল্লাদের ভিতর দ্বীপটার প্রতি কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভয়। কী জানি কেন। কিছু একটা কুসংস্কার বোধহয়—'

ইয়ট জাতের ছোট্ট জাহাজখানির চতুর্দিকে গরম দেশের গাঢ়, ভেজা ভেজা অন্ধকার যেন চেপে ধরেছে। তারই ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চালাবার নিষ্ফল চেষ্টা করে রেন্‌স্‌ফর্ড বলল, 'ওটাকে দেখতে পাচ্ছিনে তো।'

উইট্‌নি হেসে বলল, 'তোমার দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর সে আমি জানি। চারশো গজ দূর থেকে মূস-মোষের মতো শিকারকে ঝোপের ভিতর দেখে ফেলতে আমি তোমাকে দেখেছি কিন্তু ক্যারেবিয়ান সমুদ্রের অন্ধকার রাত্রে চার-পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত দেখা তোমারও কর্ম নয়।'

রেন্‌স্‌ফর্ড সম্মতি জানিয়ে বললে, 'চার গজও না। আখ্— অন্ধকারটা যেন কালো মখমল।'

উইট্‌নি যেন আশ্বাস দিয়ে বলল, 'রিয়ো পৌঁছলে বিস্তর আলোর মেলা পাবে, ভয় কী! কয়েকদিনের ভিতরেই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছি। জাগুয়ার শিকারের বন্দুকগুলো পর্দোর কাছ থেকে পৌঁছে গেলেই হয়। আমাজন অঞ্চলে উত্তম শিকার পাব বলে আশা করছি। শিকারের মতো আর কোনও খেলই হয় না।'

'পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা খেল।' সম্মতি জানালে রেন্‌স্‌ফর্ড।

কিঞ্চিৎ সংশোধন করে উইট্‌নি বলল, 'শিকারির পক্ষে— জাগুয়ারের পক্ষে নয়।'

'আবোল-তাবোল বকো না, উইট্‌নি। তুমি বড় বড় জানোয়ারের শিকারি— তুমি দার্শনিক নও। জাগুয়ার কী অনুভব করে, না করে— তাতে কার কী যায়-আসে?'

'হয়তো জাগুয়ারের যায়-আসে।'

'ছোঃ! তারা আবার ভাবতে পারে নাকি?'

'তা সে যাই হোক, আমার কিন্তু মনে হয়, তারা অন্তত একটা জিনিস বোঝে— ভয়। যন্ত্রণার ভয় আর মৃত্যুভয়।'

'গাঁজা!'— হেসে উঠল রেন্‌স্‌ফর্ড। 'গরমে তোমার মগজ গলে যাচ্ছে— বুঝলে উইট্‌নি? বাস্তববাদী হতে শেখ। পৃথিবীতে দুটি শ্রেণি আছে। শিকারি আর শিকার। কপাল ভালো যে তুমি-আমি শিকারি। আচ্ছা, আমরা কি ওই দ্বীপটা পেরিয়ে এসেছি?'

'অন্ধকারে বলতে পারব না। আশা তো করছি তা-ই।'

'কেন?'

'জায়গাটার নাম আছে— বদনাম।'

'নরখাদক আছে ওখানে?'

www.pathagar.com

'তার সম্ভাবনা অল্পই। এমন লক্ষ্মীছাড়া জায়গাতে ওরাও থাকতে যাবে না। কিন্তু বদনামটা খালাসি-মাঝিদের মধ্যে যে করেই হোক রটে গেছে। লক্ষ করনি আজ ওরা কীরকম যেন এক অজানা আতঙ্কে সন্ত্রস্ত ছিল?'

'তোমার বলাতে এখন মনে হচ্ছে, কেমন যেন তাদের ধরনধারণ আজ অন্য রকমের ছিল। কাপ্তান নিলসেন পর্যন্ত—'

'হ্যাঁ, এমনকি ওই যে তাগড়া কলিজার বুড়ো সুইড্ নিলসেন— খুদ শয়তানের কাছে গিয়ে যে নির্ভয়ে দেশলাইটি চাইতে পারে, মাছের মতো অসাড় তার নীল চোখেও আজ এমন ভাবের পরিবর্তন লক্ষ করলুম, যেটা পূর্বে কখনও দেখিনি। যেটুকু বলল তার মোদ্দা, "খালাসি-লস্করদের ভিতর এ জায়গাটার ভারি দুর্নাম"। তার পর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আমাকে শুধোল, "কেন, আপনি কিছু টের পাচ্ছেন না?" যেন আমাদের চতুর্দিকের আকাশ-বাতাস বিষে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। দেখ, ওই নিয়ে কিন্তু হেসে উঠ না, যদি বলি আমারও সর্বাঙ্গ যেন হঠাৎ হিম হয়ে গেল। ওই সময়ে কোনও বাতাস বইছিল না। ফলে সমুদ্র জানালার শার্শির মতো পালিশ দেখাচ্ছিল। আমরা তখন ওই দ্বীপটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল আমার বুকটা যেন শীতে জমে হিম হয়ে যাচ্ছিল— হঠাৎ যেন এক অজানা ত্রাসে।'

রেন্স্‌ফর্ড বলল, 'নির্ভেজাল আকাশ-কুসুম! একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিক সমস্ত জাহাজের নাবিকদের মাঝে ভয় ছড়িয়ে দিতে পারে।'

'তাই হয়তো হবে। কিন্তু জান, আমার মনে হয়, নাবিকদের যেন একটা আলাদা ইন্দ্রিয় আছে, যেটা বিপদ ঘনিয়ে এলে তাদের জানিয়ে দেয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, অমঙ্গল যেন একটা বাস্তব পদার্থ— ধ্বনি বা আলোর থেকে যেরকম তরঙ্গ বেরোয়, অমঙ্গলের শরীর থেকেও ঠিক তেমনি। সে ভাষায় বলতে গেলে বলব, অমঙ্গলের পাপভূমি যেন বেতারে অমঙ্গল ছড়ায়। তা সে যা-ই হোক, এ এলাকাটা ছাড়িয়ে যেতে পারছি বলে আমি খুশি। যাক্ গে, আমি এখন শুতে চললুম, রেন্স্‌ফর্ড।'

রেন্স্‌ফর্ড বলল, 'আমার এখনও ঘুম পায়নি। পিছনের ডেকে বসে আমি আরেকটা পাইপ টেনে নিই।'

'তা হলে গুডনাইট্, রেন্স্‌ফর্ড। কাল ব্রেকফাস্টে দেখা হবে।'

'ঠিক আছে! গুডনাইট্, উইট্নি।'

রাত্রি নিস্তব্ধ নীরব। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যে ইঞ্জিন ইয়টটিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল শুধু তারই চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছিল আর তার সঙ্গে প্রপেলারের মার খেয়ে জলের শব্দ।

ডেক্ চেয়ারে হেলান দিয়ে অলসভাবে রেন্স্‌ফর্ড তার শখের ব্রায়ার পাইপে টান দিচ্ছিল। রাত্রি যেন ঘুমের ঢুলুঢুলু ভাব তার শরীরে আবেশ লাগাচ্ছিল। আপন মনে চিন্তা করল, 'রাতটা এমনই অন্ধকার যে মনে হয় চোখের পাতা বন্ধ না করেই ঘুমুতে পারব; রাতটিই হবে আমার চোখের পাতা— '

হঠাৎ একটা আওয়াজ এসে তাকে চমকে দিল। ডানদিক থেকে শব্দটা এসেছিল। এসব ব্যাপারে সে সজাগ, সবকিছু ঠিক ঠিক জানে। তার কান ভুল করতে পারে না। আবার সে সেই শব্দটা শুনতে পেল, তার পর আবার। ওই দূরের অন্ধকারে কে যেন তিনবার গুলি ছুড়েছে।

কী রহস্য বুঝতে না পেরে রেন্‌স্‌ফর্ড লাফ দিয়ে উঠে ঝটিতি রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে সেইদিকে যেন চোখ ঠেলে দিল; কিন্তু এ যেন কম্বলের ভিতর দিয়ে দেখবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। আরেকটু উঁচু থেকে দেখবার জন্য সে রেলিঙের একটা রডে লাফ দিয়ে উঠে তার উপর দাঁড়াল। তারই ফলে একটা দড়িতে লেগে তার পাইপটা মুখ থেকে ঠিকরে পড়ে যেতে সেটাকে ধরবার জন্য সে ঝটিতি সামনের দিকে ঝুঁকতেই তার গলা থেকে কর্কশ আর্তনাদ বেরুল— কারণ সে তখন বুঝে গিয়েছে যে বড্ড বেশি এগিয়ে যাওয়ার ফলে সে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছে। তার সে আর্তনাদ টুঁটি চেপে ধরে বন্ধ করে দিল ক্যারেবিয়ান সমুদ্রের কুসুম কুসুম গরম জল। তার মাথা পর্যন্ত তখন সে জলে ডুবে গিয়েছে।

যেন ধস্তাধস্তি করে সে জলের উপরে উঠে চিৎকার দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু ইয়টের দ্রুতগতির মারে ছুটে আসা জল যেন কষাল তার গালে চড় আর নোনা জল তার খোলা মুখের ভিতরে ঢুকে যেন তার টুঁটি চেপে ধরে বন্ধ করে দিল। দুবাহু বাড়িয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে সে মরিয়া হয়ে ক্রমশ অদৃশ্যমান ইয়টের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল, কিন্তু পঞ্চাশ ফুট চলার পূর্বেই সে আর সে-চেষ্টা দিল না। ততক্ষণে তার মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে; জীবনে এই তার সর্বপ্রথম কঠিন সঙ্কট নয়। জাহাজের কেউ তার চিৎকার শুনতে পাবে সে সম্ভাবনা অবশ্য একটুখানি ছিল, কিন্তু সে সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং ইয়ট যতই দ্রুতগতিতে এগুতে লাগল সে সম্ভাবনা ততই ক্ষীণতর হতে লাগল। যেন পালোয়ানের মতো শক্তি প্রয়োগ করে সে নিজেকে তার জামাকাপড় থেকে মুক্ত করে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু ইয়টের আলো ক্ষীণতর হতে লাগল, যেন দূরের ক্রমশ অদৃশ্যমান জোনাকি পোকা। সর্বশেষে ইয়টের আলোকগুলোকে অন্ধকার যেন শুষে নিল।

ইয়টের ডেকে বসে রেন্‌স্‌ফর্ড যে গুলি ছোড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিল সেগুলো তার স্মরণে এল। সেগুলো এসেছিল ডানদিক থেকে। চরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে সেদিকে সাঁতার কাটতে লাগল— ধীরে ধীরে শরীরের শক্তি বাঁচিয়ে সে ভেবেচিন্তে হাত দুখানা ব্যবহার করছিল। ক-বার সে হাত ছুড়ছে সেটা সে গুনতে আরম্ভ করল; সম্ভবত সে আরও শ-খানেক বার হাত ফেলতে-টানতে পারবে, এমন সময়—

রেন্‌স্‌ফর্ড একটা শব্দ শুনতে পেল। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে উচ্চকণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকারের শব্দ। কঠোরতম যন্ত্রণা ও ভীতির চিৎকার।

কোন প্রাণী এ আর্তরব ছাড়ল সে সেটাকে চিনতে পারল না— চেষ্টাও করল না। নবোদ্যমে সেই চিৎকারের দিকে সাঁতার কেটে এগুতে লাগল। সেটা সে আবার শুনতে পেল। এবারে সেটা অন্য একটা ছোট্ট, হঠাৎ বেজে-ওঠা শব্দে অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

সাঁতার কাটতে কাটতে মৃদুকণ্ঠে রেন্‌স্‌ফর্ড বলল, 'পিস্তলের শব্দ।'

আরও দশ মিনিট অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাঁতার কাটার পর রেন্‌স্‌ফর্ডের কানে আরেকটা ধ্বনি এল— জীবনে সে এরকম মধুর ধ্বনি আর কখনও শোনেনি— পাহাড়ি বেলাভূমির উপর ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার মূর্ছনা এবং গুমরানো। পাড়ের পাথরগুলো দেখার পূর্বেই প্রায় সে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে; রাত্রি অতখানি শান্ত না হলে ঢেউগুলো তাকে আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে দিত। অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে সে কোনও গতিকে ঢেউয়ের দ' থেকে নিজেকে টেনে তুলল। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের পাড় বেরিয়ে এসেছে নিরেট অন্ধকার থেকে। দু হাত

www.pathagar.com

দিয়ে আঁকড়ে ধরে সে উপরের দিকে চড়তে আরম্ভ করল। হাত তার ছড়ে গিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপরের সমভূমিতে এসে পৌঁছল। গভীর জঙ্গল সেই পাথুরে পাড়ের শেষ সীমা অবধি পৌঁছেছে। এই জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের ভিতর তার জন্য অন্য কোনও বিপদ আছে কি না, সে চিন্তা রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে অন্তত তখন উদয় হল না। তার মনে তখন শুধু ওইটুকু যে, সে তার শত্রু সমুদ্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে আর তার সর্বাঙ্গে অসীম ক্লান্তি। জঙ্গলের প্রান্তে সে প্রায় আছাড় খেয়ে পড়ে তার জীবনের গভীরতম নিদ্রায় ডুবে গেল।

যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখে অপরাহ্ণ শেষ হয় হয়। নিদ্রা তাকে নবীন জীবনরস দিয়েছে আর তীক্ষ্ণ ক্ষুধায় পেট কামড়াতে আরম্ভ করেছে। প্রায় আনন্দের সঙ্গেই সে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখল।

রেন্‌স্‌ফর্ড চিন্তা করল, 'যেখানে পিস্তলের শব্দ হয় সেখানে মানুষ আছে। আর যেখানে মানুষ আছে সেখানে খাদ্যও আছে।' কিন্তু প্রশ্ন, কীরকমের মানুষ এরকম ভীষণ জায়গায় থাকে— এ চিন্তাও তার মনে উদয় হল। কারণ চোখের সামনেই একটানা আঁকাবাঁকা শাখা, এবড়ো-খেবড়ো জড়ানো গুল্মলতা— এক্কেবারে পাড় পর্যন্ত।

ঠাসবুনোটের লতাপাতা আর গাছের ভিতর দিয়ে সে সামান্যতম পায়ে চলার চিহ্ন বা পথও দেখতে পেল না। তারচেয়ে একেবারে পাড়ের উপর দিয়ে সমুদ্রের কাছে কাছে এগিয়ে যাওয়াই সহজ। হোঁচট খেয়ে খেয়ে সে এগুতে লাগল। যেখানে সে প্রথম পাড়ে নেমেছিল তার অদূরেই সে দাঁড়াল।

নিচের ঝোপে কোনও আহত প্রাণী— চিহ্ন থেকে মনে হল বড় আকারেরই— আছাড়ি-বিছাড়ি খেয়েছে। জঙ্গলের লতাপাতা ছিঁড়ে গিয়েছে আর শ্যাওলা থেঁতলে গিয়েছে একটা জায়গা রক্তরাঙা। একটু দূরেই কী একটা চকচকে জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তুলে দেখল কার্তুজের খোল।

রেন্‌স্‌ফর্ড আপন মনে বলল, বাইশ নম্বরের। কীরকম অদ্ভুত ঠেকছে। আর ওই শিকারটা বেশ বড় ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে। খুবই ঠাণ্ডা মাথার শিকারি ছিল বলতে হবে যে তার সঙ্গে ওই ছোট্ট হাতিয়ার নিয়ে মোকাবেলা করল। আর এটাও তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে জন্তুটা বেশ লড়াইও দিয়েছিল। মনে হচ্ছে, প্রথম যে তিনটে শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম তখন শিকারি তাকে দেখতে পেয়ে তিনটে গুলি ছুড়ে তাকে জখম করেছিল। তার পর তার পালিয়ে যাবার চিহ্ন ধরে ধরে এখানে এসে তাকে খতম করেছে। শেষ আওয়াজ যেটা শুনতে পেয়েছিলুম সেটা সে-ই।

রেন্‌স্‌ফর্ড জমিটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করে যা দেখতে পাবার আশা করেছিল তাই পেল— শিকারির জুতোর চিহ্ন। সে যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল জুতোর চিহ্ন সেই দিকেই গিয়েছে। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় সে এগিয়ে চলল। কখনও-বা পচা গাছের গুঁড়ি বা আধখসা পাথরে সে পিছলে যাচ্ছিল, কিন্তু অগ্রসর হচ্ছিল ঠিকই। দ্বীপের উপর তখন রাত্রির অন্ধকার আস্তে আস্তে নেমে আসছে।

রেন্‌স্‌ফর্ড যখন প্রথম আলোকগুলো দেখতে পেল তখন ঠাণ্ডা অন্ধকার সমুদ্র আর জঙ্গলটাকে কালোয় কালোময় করে দিচ্ছিল। বেলাভূমির একটা বেঁকে-যাওয়া জায়গায় মোড় নিতে সে সেগুলো দেখতে পেল এবং প্রথমটায় তার মনে হয়েছিল, সে কোনও গ্রামের

www.pathagar.com

কাছে এসেছে— কারণ আলো দেখতে পেয়েছিল অনেকগুলো। কিন্তু ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে বিস্মিত হল যে সবকটা আলো আসছে একই বিরাট বাড়ি থেকে— প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ি, তার ছুঁচল মিনারের মতো টাওয়ার উপরের অন্ধকারের দিকে ঠেলে ধরেছে। বিরাট দুর্গের মতো রাজপ্রাসাদের (শাটো) আকার প্রচ্ছায়া তার চোখে ধরা পড়ল এবং দেখল শাটোটি একটি উঁচু জায়গার উপর নির্মিত। তার তিন দিকে খাড়া পাহাড়ের পাঁচিল সমুদ্র পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেখানে কালো ছায়াতে ক্ষুধার্ত সমুদ্র যেন দেওয়ালগুলো ঠোঁট দিয়ে চাটছে।

'মরীচিকাই হবে'— ভাবল রেন্‌স্‌ফর্ড। কিন্তু যখন সে বাড়িটার ফলকওলা গেটটা খুলল তখন বুঝল যে মোটেই মরীচিকা নয়। পাথরের সিঁড়িগুলোও যথেষ্ট বাস্তব; পুরু ভারী পাল্লার দরজাও যথেষ্ট বাস্তব— তার গায়ে রয়েছে দৈত্যমুখাকৃতি কড়া— কিন্তু তবু কেমন যেন সমস্ত জায়গাটার চতুর্দিকে অবাস্তবতার বাতাবরণ।

দরজার কড়া উপরের দিকে তুলে ঘা মারতে গেলে সেটা চড়চড় করল; রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে হল ওটা যেন কখনও ব্যবহার করা হয়নি। কড়াটা ছেড়ে দিতেই সেটা এমনই সুগুরুগম্ভীর নিনাদ ছাড়ল যে, রেন্‌স্‌ফর্ড নিজেই চমকে উঠল। তার মনে হল ভিতরে যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল— দরজা কিন্তু খুলল না। সে তখন আবার কড়া তুলে ছেড়ে দিল। তখন এমনই হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল যে তার মনে হল যে দরজাটা যেন স্প্রিং দিয়ে তৈরি। ঘরের ভিতর থেকে সোনালি অত্যুজ্জ্বল আলোর বন্যাধারা তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিল। তার ভিতর দিয়ে রেন্‌স্‌ফর্ড সর্বপ্রথম যা দেখতে পেল সেটা তার জীবনে এ পর্যন্ত দেখার মধ্যে সর্ববৃহৎ মনুষ্য কলেবর— বিরাট দৈত্যের মতো আকার-প্রকার, নিরেট দড় মালে তৈরি, আর কোমর অবধি নেমে এসেছে কালো দাড়ি। তার হাতে লম্বা নলওলা রিভলভার আর সেটা সে নিশানা করেছে সোজা রেন্‌স্‌ফর্ডের বুকের দিকে।

সেই দাড়ির জঙ্গলের ভিতর থেকে দুটি ছোট্ট চোখ রেন্‌স্‌ফর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ভয় পেয়ো না'— বলে রেন্‌স্‌ফর্ড স্মিত হাস্য করল; তার মনে আশা ছিল যে ওই স্মিতহাস্য লোকটার মনের সন্দেহ দূর করে দেব। 'আমি ডাকাত নই। একটা ইয়ট থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলুম, আমার নাম সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ড— নিউ ইয়র্কের।'

কিন্তু লোকটার ভীতি-উৎপাদক দৃষ্টির কোনও পরিবর্তন হল না। রিভলভারটা নড়ন-চড়ন না করে ঠিক তেমনি তার বুকের দিকে নিশান করে রইল, যেন দৈত্যটা পাথরে তৈরি। রেন্‌স্‌ফর্ডের কথাগুলো যে সে বুঝতে পেরেছে তারও কোনও চিহ্ন দেখা গেল না— এমনকি সে আদপেই শুনতে পেয়েছে কি না তা-ই বোঝা গেল না। লোকটার পরনে কালো উর্দি— তার শেষ প্রান্তে বাদামি রঙের আস্ত্রাখান লোমের ঝালর।

রেন্‌স্‌ফর্ড আবার শুরু করল, 'আমি নিউ ইয়র্কের সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ড। আমি একটা ইয়ট থেকে পড়ে গিয়েছিলুম। আমার ক্ষিধে পেয়েছে।'

লোকটা উত্তরে শুধু বুড়ো আঙুল দিয়ে রিভলভারের ঘোড়াটা তুলল। তার পর রেন্‌স্‌ফর্ড দেখল যে, লোকটার খালি হাতখানা মিলিটারি সেলাম দেবার কায়দায় কপাল ছুঁল, এক জুতো দিয়ে অন্য জুতো ক্লিক করে এটেনশনে দাঁড়াল। আরেকজন লোক চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। ইভনিং ড্রেস পরা একদম খাড়া, পাতলা ধরনের লোক।

www.pathagar.com

'বিখ্যাত শিকারি সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ডকে আমার বাড়িতে শুভাগমন জানাতে পেরে আমি আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি।' চোস্ত খানদানি গলায় লোকটি কথাগুলো বললেন। তাতে বিদেশি উচ্চারণের সামান্য আমেজ ছিল বলে কথাগুলো যেন আরও সুস্পষ্ট, সুচিন্তিত বলে মনে হল।

আপনা-আপনি যেন রেনস্‌ফর্ড তাঁর সঙ্গে করমর্দন করল।

লোকটি বুঝিয়ে বললেন, 'তিব্বতে বরফের চিতেবাঘ শিকার সম্বন্ধে আমি আপনার বই পড়েছি, বুঝলেন তো। আমার নাম জেনারেল জারফ।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের প্রথম ধারণাই হল যে, লোকটি অসাধারণ সুপুরুষ। দ্বিতীয় হল যে জেনারেলের চেহারায় যেন এক অপূর্ব অনন্যতা, প্রায় বলা যেতে পারে বিচিত্র ধরন রয়েছে। লোকটি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছেন, কারণ তাঁর চুল ধবধবে সাদা কিন্তু তাঁর ঘন ভুরু, আর মিলিটারি কায়দায় উপরের দিকে তোলা ছুঁচল গোঁফ মিশমিশে কালো— যেন ঠিক সেই অন্ধকারের কালো যার ভিতর থেকে রেন্‌স্‌ফর্ড এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে। তাঁর চোখদুটোও মিশমিশে কালো আর অত্যন্ত উজ্জ্বল। গালের হাড়দুটো তাঁর উঁচু, নাকটি টিকলো আর মুখ শীর্ণ ধরনের ঈষৎ বাদামি— এ ধরনের চেহারা হুকুম দিতে অভ্যস্ত— খানদানি লোকের চেহারা। জেনারেল সেই উর্দি-পরা দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে ইশারা করাতে সে তার পিস্তল নামিয়ে নিয়ে তাঁকে সেলুট করে চলে গেল।

জেনারেল বললেন, 'ইভানের গায়ে অসুরের মতো অবিশ্বাস্য শক্তি, কিন্তু বেচারির কপাল মন্দ— সে বোবা আর কালা। সরল প্রকৃতির লোক, কিন্তু সত্যি বলতে কী তার জাতের আর-পাঁচজনের মতো একটুখানি বর্বর।'

'লোকটা কি রাশান?'

জেনারেল স্মিত হাস্য করাতে তাঁর লাল ঠোঁট আর ছুঁচল দাঁত দেখা দিল। বললেন, 'কসাক। আমিও।' তার পর বললেন, 'চলুন, এখানে আর কথাবার্তা নয়। আমরা পরে সেটা করতে পারব। আপনার এখন প্রয়োজন জামাকাপড়, আহারাদি এবং বিশ্রাম। সব পেয়ে যাবেন। এ জায়গাটি পরিপূর্ণ শান্তিময়।'

ইভান আবার দেখা দিল। জেনারেল তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন, সুদ্ধমাত্র ঠোঁট নেড়ে, কোনও শব্দ উচ্চারণ না করে।

জেনারেল বললেন, 'আপনি দয়া করে ইভানের সঙ্গে যান। আপনি যখন এলেন তখন আমি সবেমাত্র ডিনারে বসেছিলুম। এখন আপনার জন্য অপেক্ষা করব। আমার জামাকাপড় আপনার গায়ে ফিট করবে মনে হচ্ছে।'

বরগাওলা বিরাট এক বেডরুম, টোপরওলা যে বিছানা তাতে ছ জন লোক শুতে পারে— সেখানে গিয়ে পৌঁছল রেন্‌স্‌ফর্ড নীরব-দৈত্যের পিছনে পিছনে। ইভান একটি ইভনিং ড্রেস বের করে দিল। পরার সময় রেন্‌স্‌ফর্ড লক্ষ করল স্যুটে লন্ডনের যে দর্জির নাম সেলাই করা রয়েছে তারা সাধারণত ডিউকের নিচের পদবির কারও জন্য স্যুট সেলাই করে না।

যে ডাইনিংরুমে ইভান তাকে নিয়ে গেল সেটাও বহুদিক দিয়ে লক্ষণীয়। ঘরটায় যেন ছিল মধ্যযুগীয় আড়ম্বর। দেয়ালে ওক কাঠের আস্তর, উঁচু ছাদ, বিরাট খাবার টেবিলে দু কুড়ি লোক খেতে পারে— এসব সামন্তযুগের কোনও ব্যারনের হলঘরের মতো দেখাচ্ছিল।

www.pathagar.com

দেয়ালে লাগানো ছিল নানা প্রকারের পশুর মাথা— সিংহ, বাঘ, হাতি, ভালুক। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর এবং বৃহৎ নমুনা রেন্‌স্‌ফর্ড ইতোপূর্বে আর কখনও দেখেনি। সেই বিরাট টেবিলে জেনারেল একা বসে।

জেনারেল যেন প্রস্তাব করলেন, 'একটা ককটেল খাবেন তো, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড?' কক্‌টেলটি আশ্চর্য রকমের ভালো এবং রেন্‌স্‌ফর্ড আরও লক্ষ করল যে, টেবিলের সাজসরঞ্জামও সর্বোত্তম পর্যায়ের— টেবিলক্লথ, ন্যাপকিন, স্ফটিকের পাত্রাদি, রুপো এবং চীনেমাটির বাসনকোসন— সবকিছুই।

তাঁরা ঘন মশলাওলা সরে মাখানো বর্শ সুপ খাচ্ছিলেন। এ সুপটি রাশানদের বড় প্রিয়। যেন আধো মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে জেনারেল জারফ বললেন, 'সভ্যতা যেসব সুখ-সুবিধা দেয় আমরা এখানে সেগুলো রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা দিই। ত্রুটিবিচ্যুতি হলে মাফ করবেন। জনগণের গমনাগমনের বাঁধা রাস্তা থেকে আমরা যথেষ্ট দূরে— বুঝলেন তো? আপনার কি মনে হয় অনেক দূরের সমুদ্রপথ পেরিয়ে এসেছে বলে শ্যাম্পেনের স্বাদ খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বলল, 'একদম না।' তার মনে হয় জেনারেলটি অতিশয় অমায়িক ও যত্নশীল অতিথিসেবক— সত্যিকার বিশ্বনাগরিক। শুধু জেনারেলের একটি ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্য রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে অস্বস্তির সঞ্চার করছিল। যখনই প্লেট থেকে মুখ তুলে সে তাঁর দিকে তাকিয়েছে তখনই দেখেছে তিনি যেন তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন, সূক্ষ্মতমভাবে যাচাই করে নিচ্ছেন।

জেনারেল জারফ বললেন, 'আপনি হয়তো আশ্চর্য হয়েছেন আমি আপনার নাম চিনলুম কী করে। বুঝেছেন কি না, ইংরেজি, ফরাসি এবং জর্মন ভাষায় যেসব শিকারের বই বেরোয় আমি তার সব কটাই পড়ি। আমার জীবনের ব্যসন মাত্র একটি, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড— শিকার।'

সুপক্ব ফিলে মিন্নো খেতে খেতে রেন্‌স্‌ফর্ড বলল, 'আপনার শিকারের মাথাগুলো চমৎকার। ওই যে কেপ মহিষের মাথা— এত বড় মাথা আমি কখনও দেখিনি।'

'ও! ওই ব্যাটা! পুরোদস্তুর দানব ছিল সে।'

'আপনার দিকে তেড়ে এসেছিল নাকি?'

'একটা গাছের উপর আমাকে ছুড়ে ফেলেছিল। আমার খুলিতে ফ্রাক্‌চার হয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমি ব্যাটাকে ঘায়েল করি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বলল, 'আমার সবসময়ই মনে হয়েছে যে বড় শিকারের ভিতর কেপের মোষই সবচেয়ে বিপজ্জনক শিকার।'

এক লহমার তরে জেনারেল কোনও উত্তর দিলেন না— তাঁর লাল ঠোঁট দিয়ে তিনি সেই বিচিত্র স্মিত হাস্য হেসে যেতে লাগলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, 'না, আপনি ভুল করেছেন, স্যর! কেপ মহিষ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শিকার নয়।' তিনি মদের গেলাসে একটি ছোট্ট চুমুক দিলেন, 'এই দ্বীপে আমার খাস মৃগয়া ভূমিতে আমি তারচেয়েও বিপজ্জনক শিকার করে থাকি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বিস্ময় প্রকাশ করে শুধোল, 'এই দ্বীপে বড় শিকার আছে নাকি?'

জেনারেল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'সবচেয়ে বড়।'

'সত্যি?'

'ও! প্রকৃতিদত্ত নয়— নিশ্চয়ই। আমাকে স্টক্ করতে হয়।'

www.pathagar.com

'আপনি কী আমদানি করেছেন, জেনারেল? বাঘ?'

জেনারেল স্মিত হাস্য করে বললেন, 'না। বাঘ শিকারে আমার আর কোনও চিত্তাকর্ষণ নেই— কয়েক বছর হয়ে গেল। বাঘের মুরোদ কতখানি তার শেষ পর্যন্ত আমার দেখা হয়ে গিয়েছে। বাঘ আর আমাকে উত্তেজনা দিতে পারে না— কোনও সত্যকার বিপদে ফেলতে পারে না। আমি জীবন ধারণ করি বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড।'

জেনারেল তাঁর পকেট থেকে একটি সোনার সিগারেট কেস বের করে তার অতিথিকে রুপালি টিপওলা একটি লম্বা কালো সিগারেট দিলেন; সুগন্ধি সিগারেট— ধূপের মতো সৌরভ ছাড়ে।

জেনারেল বললেন, 'আমরা অত্যুত্তম শিকার করব— আপনাতে-আমাতে। আপনার সঙ্গ পেলে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করব।'

'কিন্তু কী ধরনের শিকার—'

'বলছি আপনাকে। আপনার খুব মজা লাগবে— আমি জানি। সবিনয়ে বলছি, আমি একটি নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছি। আপনাকে আরেক গেলাস পোর্টওয়াইন দেব কি?'

'ধন্যবাদ, জেনারেল।'

জেনারেল দুটি গেলাস পূর্ণ করে বললেন, 'ভগবান কোনও কোনও লোককে কবি বানান. কাউকে তিনি রাজা বানান, কাউকে ভিখিরি। আমাকে তিনি বানিয়েছেন শিকারি। আমার পিতা বলতেন, আমার হাতখানি বন্দুকের ঘোড়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন খুবই ধনী; ক্রিমিয়াতে তাঁর আড়াই লক্ষ একর জমি ছিল এবং শিকারে ছিল তাঁর চরম উৎসাহ. আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখন তিনি আমাকে ছোট্ট একটি বন্দুক দেন— বিশেষ অর্ডার দিয়ে সেটি মস্কোতে তৈরি করা হয়েছিল— চড়ুই শিকার করার জন্যে। আমি যখন ওইটে দিয়ে তাঁর কতকগুলি জাত টার্কি মুরগি মেরে ফেলি তিনি তখন আমাকে কোনও সাজা দেননি; আমার তাগের তিনি প্রশংসা করলেন। দশ বছর বয়সে ককেসাসে আমি আমার প্রথম ভালুক মারি। আমার সমস্ত জীবন একটানা একটা শিকার। আমি ফৌজে যোগ দিই— খানদানি ঘরের ছেলে মাত্রের কাছ থেকেই সে যুগে এই প্রত্যাশা করা হত— এবং কিছুকালের জন্য আমি একটা ঘোড়সওয়ার কসাক ডিভিশনের কমান্ডারও হয়েছিলুম কিন্তু আমার সত্যকার আকর্ষণ সর্বসময়ই ছিল শিকার। সর্বদেশে আমি সর্বপ্রকারের জন্তু শিকার করেছি। আমি কটা জন্তু মেরেছি সেটা আপনাকে গুনে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

'রাশা যখন তছনছ হয়ে গেল তখন আমি দেশ ছাড়লুম। কারণ জারের একজন অফিসারের পক্ষে তখন সেখানে থাকা অবিবেচনার কাজ হত। অনেক খানদানি রাশান সর্বস্ব হারালেন। আমি কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রচুর মার্কিন শেয়ার কিনে রেখেছিলুম। তাই আমাকে কখনও মন্টিকার্লোতে চায়ের দোকান করতে হবে না, বা প্যারিসে ট্যাক্সি ড্রাইভার হতে হবে না। অবশ্য আমি শিকার চালিয়ে যেতে লাগলুম। আপনাদের রকি অঞ্চলে গ্রিজলি, গঙ্গায় কুমির, পূর্ব আফ্রিকায় গণ্ডার। আফ্রিকাতেই ওই কেপ মহিষ আমাকে জখম করে ছ মাস শয্যাশায়ী করে রাখে। সেরে ওঠামাত্রই আমি আমাজনে জাগুয়ার শিকার করতে বেরোলুম, কারণ আমি শুনেছিলুম যে, তারা অসাধারণ ধূর্ত হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কসাক বললেন, 'মোটেই না। বুদ্ধি সজাগ রাখলে আর জোরদার রাইফেল থাকলে তারা কোনও শিকারির

www.pathagar.com

সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারে না। আমি মর্মান্তিক নিরাশ হলুম। এক রাত্রে আমি তাঁবুতে শুয়ে অসহ্য মাথাব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি এমন সময় একটা ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা আমার মাথায় ঢুকল। শিকার আমার কাছে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। এবং মনে রাখবেন শিকারই ছিল আমার জীবন। শুনেছি, মার্কিন দেশে ব্যবসায়ীরা আপন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে প্রায়ই যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েন, কারণ ওই ব্যবসায়ই ছিল ওদের জীবন।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

জেনারেল স্মিতহাস্য করলেন। 'আমার কিন্তু ভেঙে পড়ার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। আমাকে তা হলে কিছু-একটা করতে হয়। দেখুন, আমার হল গিয়ে বিশ্লেষণকারী মন, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড। নিঃসন্দেহ সেই কারণেই আমি শিকারের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় এত আনন্দ পাই।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বলল, 'এতে কোনও সন্দেহই নেই, জেনারেল জারফ।'

'তাই আমি নিজেকে শুধালুম, শিকার আমাকে এখন সম্মোহিত করে না কেন? আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোট, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, এবং আমি যতখানি শিকার করেছি আপনি ততখানি করেননি কিন্তু তবু আপনি হয়তো উত্তরটা অনুমান করতে পারবেন।'

'সেটা কী?'

'সোজাসুজি এই; শিকার তখন আমার কাছে আর "হয় হারি নয় জিতি" ধরনের বিষয় নয়। আমি প্রতিবারেই আমার শিকারকে খতম করছি। সবসময়। প্রতিবারেই। সমস্ত ব্যাপারটা তখন আমার কাছে অত্যন্ত সরল হয়ে গিয়েছে। আর পরিপূর্ণতার মতো একঘেয়েমি আর কিছুতেই নেই।'

জেনারেল আরেকটা সিগারেট ধরালেন।

'কোনও শিকারেরই আর তখন আমাকে এড়াতে পারবার সৌভাগ্য হতো না। আমি দেমাক করছি না। এ যেন একেবারে অঙ্কশাস্ত্রের নিশ্চয়তা। পশুটার কী আছে?— তার পা আর সহজাত প্রবৃত্তি। অন্ধ প্রবৃত্তি তো বুদ্ধির সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে না। এ চিন্তা যখন আমার মনে উদয় হল সে সময়টা আমার পক্ষে বিষাদময়, আপনাকে সত্যি বলছি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড টেবিলের উপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গোগ্রাসে তাঁর কথা গিলছে।

জেনারেল বলে যেতে লাগলেন, 'আমাকে কী করতে হবে, সেটা যেন একটা অনুপ্রেরণার মতো আমার কাছে এল।'

'এবং সেটা কী?'

জেনারেল আত্মপ্রসাদের স্মিত হাস্য করলেন। মানুষ কোনও প্রতিবন্ধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সেটাকে অতিক্রম করতে পারলে যে মৃদু হাসি হাসে। বললেন, 'শিকার করার জন্য আমাকে নতুন পশু আবিষ্কার করতে হল।'

'নতুন পশু? আপনি ঠাট্টা করছেন।'

জেনারেল বললেন, 'মোটেই না। আমি শিকারের ব্যাপার নিয়ে কখনও মশকরা করিনে। আমার প্রয়োজন ছিল একটা নতুন পশুর। পেলুমও একটা। তাই আমি এই দ্বীপটা কিনলুম, বাড়িটা তৈরি করলুম এবং এখানে আমি আমার শিকার করি। আমার কাজের জন্য এই দ্বীপটি একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর— জঙ্গল আছে, তার ভিতর পায়ে চলা-ফেরার রীতিমতো গোলকধাঁধা রয়েছে, পাহাড় আছে, জলাভূমি—'

www.pathagar.com

'কিন্তু সেই পশুটা, জেনারেল জারফ?'

জেনারেল বললেন, 'ও! এই দ্বীপ আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তেজনাদায়ক শিকার করতে দিয়েছে। অন্য যে কোনও শিকারের সঙ্গে এর তুলনা এক লহমার তরেও হয় না। আমি প্রতিদিন শিকার করি এবং একঘেয়েমি আমার কাছেই আসতে পারে না কারণ আমার শিকার এমনই ধরনের যে তার সঙ্গে আমার বুদ্ধির লড়াই চালাতে পারি।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের মুখে হতভম্ব ভাব।

'আমি চেয়েছিলুম শিকারের জন্য একটা আদর্শ পশু। তাই আমি নিজেকে শুধালুম, "আদর্শ শিকারের কোন কোন গুণ থাকে?" তার উত্তর স্বভাবতই; "তার সাহস, চাতুর্য, এবং সর্বোপরি সে যেন বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে"।'

রেন্‌স্‌ফর্ড আপত্তি জানাল, 'কিন্তু কোনও পশুরই তো বিচারশক্তি নেই।'

জেনারেল বললেন, 'মাই ডিয়ার দোস্ত, একটা পশুর আছে।'

'কিন্তু আপনি তো সত্যই সেটা বলতে—' রেন্‌স্‌ফর্ডের দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

'না কেন?'

'আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে আপনি যথার্থ কথা বলছেন, জেনারেল জারফ। একটা বীভৎস রসিকতা।'

'আমি যথার্থ কথা বলব না কেন? আমি শিকারের কথা বলছি।'

'শিকার? ভগবান সাক্ষী, আপনি যা বলছেন সে তো খুন!'

জেনারেল পরিপূর্ণ খুশ মেজাজে হেসে উঠলেন। রেন্‌স্‌ফর্ডের দিকে তিনি মজার সঙ্গে তাকালেন। বললেন, 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না যে আপনার মতো সভ্য ও আধুনিক যুবা— আপনাকে দেখলে সেই তো মনে হয়— মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে রোমান্টিক ধারণা পোষণ করবে। নিশ্চয়ই যুদ্ধে আপনার অভিজ্ঞতা—'

রেন্‌স্‌ফর্ড কঠিন কণ্ঠে বলল, 'নৃশংস খুন ক্ষমা করতে দেয় না।'

উচ্চহাস্যে জেনারেল দুলতে লাগলেন। বললেন, 'কী অসাধারণ মজার মানুষ আপনি! আজকের দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে— এমনকি আমেরিকাতেও— এ ধরনের হাবাগোবা সরলবিশ্বাসী— আর যদি অনুমতি দেন তবে বলি— মধ্য ভিক্টোরীয় ধারণার মানুষ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তবে কি না, কোনও সন্দেহ নেই আপনার পূর্বপুরুষ গোঁড়া শুদ্ধাচারী (প্যুরিটান) ছিলেন। কত না আমেরিকাবাসীর পিতৃপুরুষ এই সম্প্রদায়ের। আমি বাজি ধরছি, আমার সঙ্গে শিকারে বেরুলে এসব ধারণা আপনি ভুলে যাবেন। আপনার অদৃষ্টে খাঁটি নতুন রোমাঞ্চকর উত্তেজনা সঞ্চিত রয়েছে।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি শিকারি; খুনি নই।'

বিচলিত না হয়ে জেনারেল বললেন, 'হায়, আবার সেই অপ্রিয় শব্দ! কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি আপনার কাছে প্রমাণ করতে পারব, আপনার নৈতিক দ্বিধা ভিত্তিহীন।'

'সত্যি?'

'জীবন জিনিসটাই শক্তিমানের জন্য, বেঁচে থাকবে শক্তিমান, এবং প্রয়োজন হলে সে জীবন নিতেও পারে। দুর্বলদের এই পৃথিবীতে রাখা হয়েছে শক্তিমানকে আনন্দ দেবার জন্য। আমি শক্তিমান। আমি আমার বিধিদত্ত উপহার কাজে খাটাব না কেন? আমি যদি শিকার

www.pathagar.com

করতে চাই তবে করব না কেন? তাই আমি দুনিয়ার যত আবর্জনাকে শিকার করি— রদ্দি জাহাজের খালাসি, মাঝিমাল্লা, কৃষ্ণাঙ্গ, চীনা, শ্বেতাঙ্গ, দুআঁসলা— একটি অবিমিশ্র রক্তের ঘোড়া বা কুকুর এদের কুড়িটার চেয়ে মূল্যবান।'

রেন্‌স্‌ফর্ড গরম হয়ে বলল, 'কিন্তু তারা মানুষ।'

জেনারেল বললেন, 'হুবহু খাঁটি কথা। সেই কারণেই আমি ওদের ব্যবহার করি। আমি তাতে আনন্দ পাই। তারা বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে, অবশ্য যার ঘটে যেমন বুদ্ধি সেইটুকু দিয়ে। তাই তারা বিপজ্জনক।'

'কিন্তু শিকারের জন্য মানুষ জোগাড় করেন কী প্রকারে?' রেন্‌স্‌ফর্ড শুধাল।

ক্ষণতরে জেনারেলের বাঁ-চোখের পাতাটি নড়ে গিয়ে যেন কটাক্ষ মারল। উত্তর দিলেন, 'এ দ্বীপের নাম "জাহাজ-ফাঁদ দ্বীপ"। কখনও কখনও ঝঞ্ঝামথিত ক্রুদ্ধ সমুদ্রদেব আমার কাছে এদের পাঠিয়ে দেন। যখন ভাগ্যদেবী অপ্রসন্না, তখন আমি তাঁকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করি। আমার সঙ্গে জানালার কাছে আসুন।'

রেন্‌স্‌ফর্ড জানালার কাছে এসে বাইরের সমুদ্রের দিকে তাকাল।

জেনারেল বলে উঠলেন, ' লক্ষ করুন! ওই ওখানে বাইরে!' রেন্‌স্‌ফর্ড শুধু নিশির অন্ধকার দেখতে পেল। তার পর যেই জেনারেল একটি বোতাম টিপলেন অমনি দূর সমুদ্রে একাধিক আলোর ছটা দেখতে পেল।

জেনারেল পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, ওই আলোকগুলোর অর্থ, ওখানে চ্যানেল পথ আছে— যেখানে সে জাতীয় কিছুই নেই। বিরাট বিরাট পাথর তাদের ক্ষুরের মতো ধারালো পাশ নিয়ে হাঁ করে ঘাপটি মেরে বসেছে সমুদ্রদৈত্যের মতো। তারা অতি অক্লেশে একখানা জাহাজ গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে পারে— এই যেরকম আমি অক্লেশে এই বাদামটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছি।' তিনি শক্ত কাঠের মেঝের উপর একটি বাদাম ফেলে দিয়ে জুতোর হিল দিয়ে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিলেন। যেন কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিতান্ত কথায় কথায় বললেন, 'আমার ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা আছে। আমরা এখানে সভ্য থাকবার চেষ্টা করি।'

'সভ্য? আর আপনি গুলি করে মানুষ খুন করেন?'

জেনারেলের কালো চোখে ক্রোধের সামান্য রেশ দেখা দিল। কিন্তু সেটা এক সেকেন্ডের তরে। অতি অমায়িক কণ্ঠে বললেন, 'হায় কপাল! কী অদ্ভুত নীতিবাগীশ তরুণই-না আপনি! আমি আপনাকে প্রত্যয় দিচ্ছি, আপনি যা বলতে চাইছেন আমি সেরকম কিছুই করি না। সেটা হবে বর্বরতা। আমি আমার অতিথিদের চরম খাতিরযত্ন করে থাকি। তারা প্রচুর খাদ্য পায়, প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রম করে শরীর সুস্থ-সবল রাখতে পায়। তাদের স্বাস্থ্য চমৎকার হয়ে ওঠে। কাল আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

'মানে?'

মুচকি হেসে জেনারেল বললেন, 'কাল আমরা আমার ট্রেনিং স্কুল দেখতে যাব। স্কুলটা মাটির নিচের সেলারে। উপস্থিত সেখানে আমার প্রায় ডজন খানেক ছাত্র আছে। তারা এসেছে হিস্‌পানি বোট "সানলুকার" থেকে— জাহাজখানার দুর্ভাগ্যবশত সেটা ওই হোথায় পাথরগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সবকটাই অতিশয় নিরেস, বাজে-মার্কা— ডেকের উপর চলা-ফেরাতে যতখানি অভ্যস্ত, জঙ্গলে ততখানি নয়।'

www.pathagar.com

তিনি হাত তুলতেই ইভান— সে-ই ওয়েটারের কাজ করছিল— গাঢ় টার্কিশ কফি নিয়ে এল। রেন্‌স্‌ফর্ড অতিকষ্টে নিজেকে কথা বলা থেকে ঠেকিয়ে রাখছিল।

ঢাকঢাক গুড়গুড় না করে খোলাখুলিভাবে জেনারেল বলে যেতে লাগলেন, 'বুঝতে পারছেন তো এটা হচ্ছে শিকারের ব্যাপার। আমি এদের একজনকে আমার সঙ্গে শিকারে যেতে প্রস্তাব করি। আমি তাকে যথেষ্ট খাদ্য আর উৎকৃষ্ট একখানা শিকারের ছোরা দিয়ে আমার তিন ঘণ্টা আগে বেরুতে দিই। পরে বেরুই আমি, সবচেয়ে ছোট ক্যালিবারের আর সবচেয়ে কম পাল্লার মাত্র একটি পিস্তল নিয়ে। পুরো তিন দিন যদি সে আমাকে এড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে তবে সে জিতল। আর আমি যদি তাকে খুঁজে পাই—' জেনারেল মুচকি হেসে বললেন, 'তবে সে হারল।'

'সে যদি শিকার হতে রাজি না হয়?'

'ও! সেটা বাছাই করা নিশ্চয়ই আমি তার হাতে ছেড়ে দিই। সে যদি না খেলতে চায় তবে খেলবে না। সে যদি শিকারে যেতে রাজি না হয় তবে আমি তাকে ইভানের হাতে সমর্পণ করি। ইভান একদা মহামান্য শ্বেত জারের সরকারি চাবুকদারের সম্মানিত চাকরি করেছে। এবং খেলাধুলা, শিকার বাবদে সে আপন নিজস্ব ধারণা পোষণ করে। কোনও ব্যত্যয় হয় না, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, কোনও ব্যত্যয় হয় না। তারা সব্বাই আমার সঙ্গে শিকার করাটাই পছন্দ করে নেয়।'

'আর যদি তারা জিতে যায়?'

জেনারেলের মৃদু হাস্য আরও বিস্তৃত হল। বললেন, 'আজ পর্যন্ত আমি হারিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'আপনি ভাববেন না, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, আমি দেমাক করছি। বস্তুত ওদের বেশিরভাগই অতিশয় সরল সমস্যা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মাঝে মাঝে দু-একটা দুঁদে দেখা দেয় বটে। একজন প্রায় জিতে গিয়েছিল। শেষটায় কুকুরগুলোকে ব্যবহার করতে হয়েছিল আমাকে।'

'কুকুর?'

'এদিকে আসুন; আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

জেনারেল রেন্‌স্‌ফর্ডকে একটা জানালার কাছে নিয়ে গেলেন। জানালার আলোগুলো নিচের আঙিনায় আলো-ছায়ার হিজিবিজি প্যাটার্ন তৈরি করছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড সেখানে ডজনখানেক বিরাট আকারের কালো প্রাণীকে নড়াচড়া করতে দেখল। তারা তার দিকে মুখ তুলতেই তাদের চোখে সবুজ রঙের ঝিলিমিলি খেলে গেল।

জেনারেল মন্তব্য করলেন, 'আমার মতে উত্তম শ্রেণির। প্রতিরাত্রে সাতটার সময় এদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কেউ যদি আমার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে কিংবা বেরিয়ে যাবার— তবে তার পক্ষে সেটা শোচনীয় হতে পারে।' জেনারেল গুন গুন করে ফলি বের্জেরের একটি গানের কলি ধরলেন।

জেনারেল বললেন, 'এখন আমি যে নতুন মাথাগুলো জমিয়েছি সেগুলো আপনাকে দেখাতে চাই। আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে আসবেন কি?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বলল, 'আমি আশা করছি, আজকে রাত্রের মতো আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমার শরীরটা আদপেই ভালো যাচ্ছে না।'

www.pathagar.com

জেনারেল উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন, 'আহা, তাই নাকি! কিন্তু সেইটেই তো স্বাভাবিক— এতখানি দীর্ঘ সাঁতার কাটার পর। আপনার প্রয়োজন রাত্রিভর শান্তিতে সুনিদ্রা। কাল তা হলে আপনার মনে হবে, আপনি যেন নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছেন— আমি বাজি ধরছি। তখন আমরা শিকারে বেরুব— কী বলেন? কালকের শিকার উত্তম হবে বলেই আমি আশা করছি—'

রেন্‌স্‌ফর্ড তখন তাড়াতাড়ি সে ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে।

জেনারেল পিছন থেকে গলা তুলে বললেন, 'আজ যে আপনি আমার সঙ্গে শিকারে বেরুতে পারছেন না তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। আজ ভালো শিকারের আশা আছে— বড় সাইজের, তাগড়া নিগ্রো। দেখে তো মনে হচ্ছে অন্ধিসন্ধি জানে— আচ্ছা, গুডনাইট, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড! আশা করি রাত্রিটা পুরো বিশ্রাম পাবেন।'

বিছানাটা ছিল খুব ভালো, বিছানায় পরার পাজামা-কুর্তা সবচেয়ে নরম রেশমের তৈরি, তার সর্ব পেশি-স্নায়ুতে ক্লান্তি, কিন্তু তবুও নিদ্রার ওষুধ দিয়ে সে তার মগজটাকে শান্ত করতে পারল না— পড়ে রইল দুটো খোলা চোখ মেলে। একবার তার মনে হল, তার ঘরের সামনের করিডরে কার যেন চুপিসাড়ে চলার শব্দ শুনতে পেল। সে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল; খুলল না। জানালার কাছে গিয়ে সে বাইরের দিকে তাকাল। তার ঘরটা ছিল উঁচু টাওয়ারগুলোর একটাতে। বাড়ির আলো তখন নিভে গিয়েছে। নীরব, অন্ধকার। শুধু আকাশে একফালি পাণ্ডুর চাঁদ; তারই ফ্যাকাসে আলোতে সে আঙিনায় আবছায়া দেখতে পাচ্ছিল। কতকগুলি নিস্তব্ধ কালো আকারের কী যেন সেখানে আনাগোনা করে আলো-ছায়ার আলপনা কাটছিল; কুকুরগুলো জানালাতে তার শব্দ শুনতে পেয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষায় তাদের সবুজ চোখ তুলে তাকাল। রেন্‌স্‌ফর্ড বিছানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার জন্য সে বহু পদ্ধতিতে চেষ্টা করল। তার পর যখন কিছুটা ফল পেয়ে, পাতলা ঘুমে ঝিমিয়ে পড়েছে— ঠিক ভোরের দিকে তখন অতিদূর জঙ্গলের ভিতর সে পিস্তল ছোড়ার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল।

দুপুরের খাওয়ার পূর্বে জেনারেল জারফ দেখা দিলেন না। লাঞ্চে যখন এলেন তখন তাঁর পরনে গ্রামাঞ্চলের জমিদারের নিখুঁত টুইডের স্যুট। তিনি রেন্‌স্‌ফর্ডের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেনারেল বললেন, 'আর আমার কথা যদি তোলেন, তবে বলি আমার ঠিক ভালো যাচ্ছে না। আমার মনে দুশ্চিন্তা, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড। কাল রাত্রে আমি আমার পুরনো ব্যারামের চিহ্ন অনুভব করলুম।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের চাউনিতে প্রশ্ন দেখে জেনারেল বললেন, 'একঘেয়েমি। বৈচিত্র্যহীনতার অরুচি।'

আপন প্লেটে আবার খানিকটা ক্রেপ স্যুজেৎ তুলে নিয়ে জেনারেল বুঝিয়ে বললেন, 'কাল রাত্রে ভালো শিকার হয়নি। লোকটার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। সে এমন সোজাসুজি চলে গিয়েছিল যে, তাতে করে কোনও সমস্যারই উদ্ভব হল না। খালাসিগুলোকে নিয়ে এই হল মুশকিল। একে তো আকাট, তায় আবার বনের ভিতর চলাফেরার কৌশল জানে না। নিরেট

www.pathagar.com

বোকার মতো এমন সব করে যা দেখামাত্রই স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারি বিরক্তিজনক। আরেক গেলাস শাবলি চলবে কি মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড?'

রেন্‌স্‌ফর্ড দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'জেনারেল, আমি এখ্‌খুনি এই দ্বীপ ত্যাগ করতে চাই।'

তাঁর দুই ঝোপ-ভুরু উপরের দিকে তুললেন; মনে হল তিনি যেন আঘাত পেয়েছেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'সে কী দোস্ত! আপনি তো সবে এসেছেন। শিকারও তো করেননি—'

রেন্‌স্‌ফর্ড বলল, 'আমি আজই যেতে চাই।' তার পর দেখে, জেনারেলের কালো চোখদুটো তার দিকে মড়ার চোখের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকে যেন যাচাই করে নিচ্ছে। হঠাৎ জেনারেল জারফের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বোতল থেকে প্রাচীন দিনের শাবলি ঢাললেন রেন্‌স্‌ফর্ডের গেলাসে। বললেন, 'আজ রাত্রে আমরা শিকারে বেরুব— আপনাতে-আমাতে।'

রেন্‌স্‌ফর্ড ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বলল, 'না জেনারেল, আমি শিকারে যাব না।'

জেনারেল ঘাড়দুটো তুলে নামিয়ে অসহায় ভাব দেখালেন। বাগানের কাচের ঘরে বিশেষ করে ফলানো একটি আঙুর মোলায়েমসে খেতে খেতে বললেন, 'আপনার অভিরুচি, দোস্ত! কী করবেন, না করবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার হাতে। তবে যদি অনুমতি দেন তবে বলব, শিকার-খেলা সম্বন্ধে ইভানের ধারণার চেয়ে আমার ধারণা আপনার অধিকতর মনঃপূত হবে।'

যে কোণে ইভান দাঁড়িয়েছিল সেদিকে তাকিয়ে জেনারেল মাথা নাড়লেন। দৈত্যটা সেখানে তার পিপের মতো পুরু বুকের উপর দু বাহু চেপে ভ্রুকুটি-কুটিল নয়নে তাকাচ্ছিল।

রেন্‌স্‌ফর্ড আর্তকণ্ঠে বলল, 'আপনি কি সত্যি বলতে চান—'

জেনারেল বললেন, 'প্যারা দোস্ত! আমি কি আপনাকে বলিনি, শিকার সম্বন্ধে আমি যা-ই বলি না কেন, সেটা সত্য সত্য বলি। কিন্তু এটা আমার খাঁটি অনুপ্রেরণা। আসুন, আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে আমি পান করি।'

জেনারেল তাঁর গেলাস উঁচু করে তুলে ধরলেন; কিন্তু রেন্‌স্‌ফর্ড তাঁর দিকে শুধু স্থির নয়নে তাকিয়ে রইল।

সোৎসাহে জেনারেল বললেন, 'আপনি দেখবেন এ শিকার শিকারের মতো শিকার। আপনার বুদ্ধি আমার বুদ্ধির বিপক্ষে। আপনার শক্তি, আপনার লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা— আমার বিরুদ্ধে। মুক্তাকাশের নিচে দাবা খেলা! এবং যে বাজি ধরা হবে তার মূল্যও কিছু কম নয়— কী বলেন?'

'আর যদি আমি জিতি—', রেন্‌স্‌ফর্ডের গলা থেকে শব্দগুলো যেন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বেরুল।

জেনারেল জারফ বললেন, তৃতীয় দিনের মধ্যরাত্রি অবধি যদি আমি আপনাকে খুঁজে না পাই তবে আমি সানন্দে আপন পরাজয় স্বীকার করে নেব। আমার নৌকা আপনাকে পার্শ্ববর্তী দেশের কোনও শহরের কাছে ছেড়ে আসবে।'

জেনারেল যেন রেন্‌স্‌ফর্ডের চিন্তা পড়ে ফেলে বললেন, 'ও। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ভদ্রলোক এবং শিকারি হিসেবে আমি আপনাকে প্রত্যয় দিচ্ছি।

www.pathagar.com

অবশ্য আপনাকেও তার বদলে কথা দিতে হবে যে, এখানে আপনার আগমন সম্বন্ধে কিছু বলবেন না।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললেন, 'আমি আদপেই এরকম কোনও কথা দেব না।'

জেনারেল বললেন, 'ও! তা হলে— কিন্তু এখন কেন সে আলোচনা? তিন দিন পরে দুজনাতে এক বোতল ভ্যভ্‌ক্লিকো খেতে খেতে সে আলোচনা করা যাবে, অবশ্য যদি—'

জেনারেল মদে চুমুক দিলেন।

কারবারি লোকের ব্যস্ততা তাঁকে সজীব করে তুলল। রেন্‌স্‌ফর্ডকে বললেন, 'ইভান আপনাকে শিকারের কোটপাতলুন, আহারাদি ও একখানা ছোরা দেবে। আমাকে যদি অনুমতি দেন তবে বলি, আপনি নরম চামড়ার তালিওলা জুতোই পরবেন। ওতে করে চলার পথে দাগ পড়ে কম। এবং পরামর্শ দিই, দ্বীপের দক্ষিণপুব কোণের বিস্তীর্ণ জলাভূমিটা মাড়াবেন না। আমরা ওটাকে "মরণ-জলা" নাম দিয়েছি। ওখানে চোরাবালি আছে। এক আহাম্মুক ওইদিক দিয়ে চেষ্টা দিয়েছিল। শোকের বিষয় যে, ল্যাজ্‌রাস্ তার পিছনে পিছনে যায়। আপনি আমার বেদনাটা কল্পনা করে নিতে পারবেন, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড। আমি ল্যাজ্‌রাস্‌কে ভালোবাসতুম; আমার দলের ওইটেই ছিল সবচেয়ে সরেস ডালকুত্তা। তা হলে, এখন আপনার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি। দুপুরে আহার করার পর আমি একটু গড়িয়ে নিই। আপনি কিন্তু নিদ্রার ফুরসত পাবেন না। নিশ্চয়ই আপনি রওনা হতে চাইবেন। গোধূলিবেলার পূর্বে আমি আপনার পেছনে বেরুব না। রাত্রিবেলার শিকারে উত্তেজনা অনেক বেশি, দিনের চেয়ে— কী বলেন? আচ্ছা তবে দেখা হবে, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, ও রিভোয়া।'

নিচু হয়ে নম্র অভিবাদন জানিয়ে জেনারেল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ইভান অন্য দরজা দিয়ে ঘরে এল। তার এক বগলে শিকারের খাকি পোশাক, খাবারের হ্যাভারস্যাক্, চামড়ার খাপের ভিতর লম্বা ফলাওলা শিকারের ছোরা। তার ডানহাত রক্তরঙের কোমরবন্ধের ভিতরে গোঁজা রিভলভারের তোলা ঘোড়ার উপর।

দু ঘণ্টা ধরে রেন্‌স্‌ফর্ড ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেন লড়াই করে চলেছে আর দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করেছে, 'আমি মাথা গরম হতে দেব না, আমার মাথা গরম হলে চলবে না।'

শাটোর গেট্ যখন তার পিছনে কড়াক্ করে বন্ধ হয়ে যায় তখন তার মাথা খুব পরিষ্কার ছিল না। প্রথমটায় তার সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল তার আর জেনারেল জারফের মাঝখানে যতখানি সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করতে, আর ওই উদ্দেশ্য মনে রেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সামনের দিকে। যেন এক করাল বিভীষিকা ঘোড়সওয়ারের জুতোর কাঁটার মতো খোঁচা মেরে মেরে তাকে সম্মুখপানে খেদিয়ে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু এতক্ষণে সে অনেকখানি আত্মকর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছে; সে দাঁড়িয়ে গিয়ে তার নিজের পরিস্থিতিটা বিচার-বিবেচনা করতে লাগল।

সোজা, শুধু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই— কারণ তাতে করে সে সমুদ্রের কাছে গিয়ে মুখোমুখি হবে। সে যেন চতুর্দিকে সমুদ্রের ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির মাঝখানে; সে যা-ই করুক না কেন, এই ফ্রেমের ভিতরই তাকে সেটা করতে হবে।

www.pathagar.com

রেন্‌স্‌ফর্ড বিড়বিড় করে বলল, 'দেখি, আমার চলার পথ সে খুঁজে বের করতে পারে কি না।' এতক্ষণ সে জঙ্গলের কাঁচা পায়ে চলার পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেটা ছেড়ে এখন নামল দিকদিশেহীন ঘন জঙ্গলের ভিতর। সে অনেকগুলো জটিল ঘোর-প্যাঁচ খেয়ে তার উপর দিয়ে বার বার এলোপাতাড়ি আসা-যাওয়া করতে করতে শেয়াল-শিকারের সমস্ত কলাকৌশল, আর শেয়ালের এড়িয়ে যাবার তাবৎ ধূর্ত সধন্ধ-সুলুক স্মরণে আনতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নামল তখন সে গভীর জঙ্গলে ভরা একটা টিলার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। পা দুটো শ্রমক্লান্ত, হাত আর মুখ জঙ্গলের শাখা-প্রশাখার আঁচড়ে ভর্তি। সে বেশ বুঝতে পারল, এখন তার গায়ে শক্তি থাকলেও এই অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে চলাটা হবে বদ্ধ পাগলামি। এখন তার বিশ্রাম নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন। মনে মনে ভাবল, 'এতক্ষণ আমি শেয়ালের যা করার তাই করেছি, এখন বেড়ালের খেলা খেলতে হবে।' কাছেই ছিল একটা বিরাট গাছ— মোটা গুঁড়ি আর বিস্তৃত কাণ্ড নিয়ে। অতি সাবধানে সামান্যতম চিহ্ন না রেখে সে গাছ বেয়ে উঠে যেখানে একটা মোটা শাখা গুঁড়ি থেকে বেরিয়েছে সেখানে চওড়া শাখাটার উপর গা এলিয়ে দিয়ে যতখানি পারা যায় বিশ্রামের ব্যবস্থা করল। এই বিশ্রান্তি তার বুকে যেন এক নতুন আত্মবিশ্বাস এনে দিল; এমনকি সে অনেকখানি নিরাপত্তাও অনুভব করতে লাগল। মনে মনে নিজেকে বলল, জেনারেল জারফ যত বড় উৎসাহী শিকারিই হোন না কেন, এখানে তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন না। সে যে গোলকধাঁধার প্যাঁচ পিছনে রেখে এসেছে তার জট ছাড়িয়ে অন্ধকারে এই জঙ্গলের ভিতর একমাত্র শয়তানই এগুতে পারবে। কিন্তু হয়তো জেনারেল একটা শয়তানই—

আহত সর্প যেরকম ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়, এই উদ্বেগময়ী রজনীও সেইরকম কাটতে লাগল, এবং জঙ্গলে মৃতা ধরণীর নৈস্তব্ধ্য বিরাজ করা সত্ত্বেও রেন্‌স্‌ফর্ডের চোখের পাতায় ঘুম নামল না। ভোরের দিকে যখন আকাশ ঘোলাটে পাঁশুটে রঙ মাখছিল তখন চমকে ওঠা একটা পাখির চিৎকার রেন্‌স্‌ফর্ডের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করল। কী যেন একটা আসছে ঝাড়ঝোপের ভিতর দিয়ে— ধীরে, সাবধানে— সেই এলোপাতাড়ি গোলকধাঁধা বেয়ে, ঠিক যেভাবে রেন্‌স্‌ফর্ড এসেছিল। ডালের উপর চ্যাপ্টা হয়ে শুয়ে পড়ে সে পাতায় বোনা প্রায় কার্পেটের মতো পুরু আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যে বস্তু আসছিল সে মানুষ।

জেনারেল জারফ! সর্বচৈতন্য কেন্দ্রীভূত করে, গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে তিনি এগিয়ে আসছিলেন। প্রায় ঠিক গাছটার সামনে তিনি দাঁড়ালেন, তার পর মাটিতে হাঁটু গেড়ে জমিটা খুটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিছুমাত্র চিন্তা না করে রেন্‌স্‌ফর্ডের প্রথম রোখ চেপেছিল নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ করল জেনারেলের ডানহাতে ধাতুর তৈরি কী একটা বস্তু— ছোট্ট একটি অটোম্যাটিক পিস্তল।

শিকারি কয়েকবার মাথা নাড়লেন, যেন তিনি ধন্ধে পড়েছেন। তার পর সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কেস্ থেকে তাঁর কালো একটা সিগারেট বের করলেন; তার তীব্র সুগন্ধ ভেসে উঠে রেন্‌স্‌ফর্ডের নাকে পৌঁছল।

রেন্‌স্‌ফর্ড দম বন্ধ করে রইল!

জেনারেলের চোখ তখন মাটি ছেড়ে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠছে। রেন্‌স্‌ফর্ড বরফের মতো জমে গিয়েছে, তার সবকটা মাংসপেশি লাফিয়ে পড়ার জন্য

www.pathagar.com

টনটন করছে। কিন্তু যে ডালটার উপর রেন্‌স্‌ফর্ড শুয়েছিল ঠিক সেখানে পৌঁছবার পূর্বে শিকারির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেমে গেল। তার রোদেপোড়া মুখে দেখা দিল স্মিত হাস্য। যেন অতিশয় সুচিন্তিতভাবে তিনি ধুঁয়োর একটি রিং উপরের দিকে উড়িয়ে দিলেন; তার পর গাছটার দিকে পিছন ফিরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে চললেন। ঘাসপাতার উপর তাঁর শিকারের বুটের খস্‌খস্ শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল।

ফুসফুসের ভিতরে রেন্‌স্‌ফর্ডের বন্ধ প্রশ্বাস উগ্র বিস্ফোরণের মতো ফেটে বেরুল। তার মনে প্রথম যে চিন্তার উদয় হল সেটা তাকে ক্লিষ্ট, অবশ করে দিল। শিকার যেটুকু সামান্যতম চিহ্ন রেখে যেতে বাধ্য হয় জেনারেল সেই খেই ধরে রাতের অন্ধকারে বনের ভিতর এগুতে জানেন; তিনি ভুতুড়ে শক্তি ধরেন। সামান্যতম দৈববশে কসাক তাঁর শিকার এবার দেখতে অক্ষম হয়েছেন।

রেন্‌স্‌ফর্ডের দ্বিতীয় চিন্তা বীভৎসতর রূপে উদয় হল। সে কুচিন্তা তার সর্বসত্তার ভিতর মরণের হিমের কাঁপন তুলে দিল। জেনারেল মৃদুহাস্য করলেন কেন? তিনি ফিরে চলে গেলেন কেন?

তার সুস্থ বিচার-বুদ্ধি তাকে যে কথা বলছিল রেন্‌স্‌ফর্ড সে সত্য বিশ্বাস করতে চাইল না— অথচ ঠিক সেই সময় প্রভাত-সূর্য যেরকম কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল সে সত্য ঠিক ওইরকমই প্রত্যক্ষ। জেনারেল তাঁর সঙ্গে শিকার-খেলা খেলছেন! আরেকদিনের শিকার-খেলার জন্য জেনারেল তাঁকে বাঁচিয়ে রাখছেন! কসাকই বেড়াল; সে ইঁদুর। মৃত্যুর আতঙ্ক তার পরিপূর্ণ অর্থ নিয়ে এই প্রথম রেন্‌স্‌ফর্ডের কাছে আত্মপ্রকাশ করল।

'আমি আত্মকর্তৃত্ব হারাব না, কিছুতেই না।'

সে গাছ থেকে পিছলে নেমে আবার ঘন বনের ভিতর ঢুকল। তার মুখ তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন এবং সে তার মস্তিষ্কযন্ত্র সবলে পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগিয়ে দিল। প্রায় তিনশো গজ দূরে সে বিরাট একটা মরাগাছের গুঁড়ির সামনে দাঁড়াল। সেটা বিপজ্জনকভাবে পড়-পড় হয়ে একটা ছোট জ্যান্ত গাছের উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড তার খাবারের ব্যাগ মাটিতে ফেলে দিয়ে খাপ থেকে শিকারের ছোরা বের করে পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে গেল।

অনেকক্ষণ পরে কর্ম সমাপ্ত হল। শ-ফুট খানেক দূরে একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি পড়ে ছিল। রেনস্‌ফর্ড তার আড়ালে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বেড়ালটা ওই তো আবার আসছে, ইঁদুরের সঙ্গে খেলবে বলে!

ডালকুত্তার মতো দ্বিধাহীন প্রত্যয় নিয়ে জেনারেল জারফ আসছেন রেন্‌স্‌ফর্ডের খেই ধরে ধরে। তাঁর সদাসন্ধানী কালো চোখকে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না— একটিমাত্র থেঁতলে যাওয়া ঘাসের পাতা না, বেঁকে যাওয়া ছোট্ট ডালের টুকরোটি না, শ্যাওলার উপর ক্ষীণতম চিহ্নটি না— হোক না সে যতই ক্ষীণ। সন্ধান খুঁজে খুঁজে এগুতে গিয়ে জেনারেল এতই নিমগ্ন ছিলেন যে রেন্‌স্‌ফর্ড তাঁর জন্য যে জিনিসটি তৈরি করেছিল সেটা না দেখার পূর্বেই তার উপরে এসে পড়লেন। তাঁর পা পড়ল সামনে-এগিয়ে-পড়া একটা ঝোপের উপর— এইটেই রেন্‌স্‌ফর্ডের পাতা ফাঁদের হ্যান্ডিল। কিন্তু তাঁর পা ওইটে ছোঁয়ামাত্রই জেনারেলের চৈতন্যে বিপদের পূর্বাভাস চমক মারল— সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র বানরের মতো তিনি ত্বরিত বেগে পিছনের দিকে লাফ দিলেন। কিন্তু যতখানি ক্ষিপ্র হওয়ার প্রয়োজন ছিল ঠিক ততখানি হননি; কাটা

www.pathagar.com

জ্যান্ত গাছের উপর সন্তর্পণে রাখা মরা গাছটা মড়মড়িয়ে পড়ার সময় জেনারেলের ঘাড়ের উপর মারল ট্যারচা ঘা। জেনারেলের ক্ষিপ্র বিদ্যুৎগতি না থাকলে তিনি গাছের তলায় নিঃসন্দেহে গুঁড়িয়ে যেতেন। টাল খেয়ে তিনি টলতে লাগলেন বটে কিন্তু মাটিতে পড়লেন না; এবং পিস্তলটিও হস্তচ্যুত হল না। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জখমি ঘাড়টাতে হাত ঘষতে লাগলেন। রেন্‌স্‌ফর্ডের বুকটাকে সেই ভীতি আবার পাকড়ে ধরেছে; সে শুনতে পেল জেনারেলের ব্যঙ্গ-হাস্য জঙ্গলের ভিতর খলখলিয়ে উঠছে।

তিনি যেন ডেকে বললেন, 'রেন্‌স্‌ফর্ড, আপনি যদি আমার কণ্ঠস্বরের পাল্লার ভিতরে থাকেন— এবং আমার বিশ্বাস আছেন, তবে আপনাকে আমার অভিনন্দন জানাই। মালয় দেশের মানুষ ধরার ফাঁদ খুব বেশি লোক বানাতে জানে না। কিন্তু আমার কপাল ভালো যে, আমিও মালাক্কাতে শিকার করেছি। আপনি সত্যি এখন আমার কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছেন। আমি এখন আমার জখমটাকে পট্টি বাঁধতে চললুম; জখমটা সামান্যই। কিন্তু আমি ফিরে আসছি। আমি ফিরে আসছি।'

জেনারেল যখন তাঁর ছড়ে-যাওয়া ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে চলে গেলেন তখন রেন্‌স্‌ফর্ড আবার আরম্ভ করল তার পলায়ন। এবারে সত্যকার পলায়ন— আশাহীন, জীবনমরণের পলায়ন, এবং সে পলায়ন চলল কয়েক ঘণ্টা ধরে। গোধূলির আলো নেমে এল, তার পর অন্ধকার হল, তবু তার অগ্রগতি বন্ধ হল না। পায়ের নিচের মাটি তখন নরম হতে আরম্ভ করেছে, গুল্মলতা ঘনতর নিবিড়তর হতে লাগল, পোকাগুলোও ভীষণভাবে তাকে কামড়াতে আরম্ভ করেছে। তার পর আরেকটু এগুতেই তার পা জলা-মাটিতে ঢুকে বসে গেল। সে তার পা-টা মুচড়ে টেনে বের করবার চেষ্টা করল কিন্তু সেই চোরা-কাদা বিরাট জোঁকের মতো তার পা পাশবিক শক্তির সঙ্গে শুষতে লাগল। প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে রেন্‌স্‌ফর্ড তার পা-খানা মুক্ত করল। সে তখন বুঝতে পেরেছে, কোথায় এসে পৌঁছেছে! এ সেই 'মরণ-জলা' তার চোরাবালি নিয়ে।

তার হাত দুটি তখন মুষ্টিবদ্ধ। যেন তার বিচারবুদ্ধির সুস্থ স্নায়ুবল ধরা-ছোঁয়ার জিনিস এবং সেইটাকে অন্ধকারে কে যেন তার কব্জা থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওই থলথলে মাটি তার মনে এক নতুন কৌশল এনে দিল। চোরাবালি থেকে ডজনখানেক ফুট পিছিয়ে গিয়ে যেন কোনও আদিম অন্ধকার যুগের মৃত্তিকা খননদক্ষ বিরাট বিভারের মতো সে মাটি খুঁড়তে লাগল।

ফ্রান্সে যুদ্ধের সময় মাটি খুঁড়ে রেন্‌স্‌ফর্ড ট্রেঞ্চের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে— তখন এক সেকেন্ডের বিলম্ব হওয়ার অর্থ ছিল মৃত্যু। তখনকার মৃত্তিকাখনন এর তুলনায় তার কাছে গদাইলস্করি চালের খেলাধুলো বলে মনে হল। গর্তটা গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল; যখন সেটা তার ঘাড়ের চেয়েও গভীর হল তখন সেটার থেকে বেয়ে উঠে কতকগুলো শক্ত গাছের চারা কেটে ডগাগুলো সূচাগ্র তীক্ষ্ণ করে বানাল বর্শার মতো করে। ডগাগুলো উপরমুখো করে সেগুলো সে পুঁতে দিল গর্তের তলাতে। আগাছা আর ছোট ছোট ডাল নিয়ে দ্রুত হস্তে একটা এবড়ো-খেবড়ো কার্পেটের মতো করে বুনল এবং সেটা গর্তের উপর পেতে মুখটা বন্ধ করে দিল। ঘামে জবজবে ভেজা ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীর নিয়ে সে গুঁড়ি মেরে বসল একটা বাজে পোড়া গাছের গুঁড়ির পিছনে।

www.pathagar.com

সে বুঝতে পেরেছে তার তাড়নাকারী আসছে; নরম মাটির উপর পায়ের থপ থপ শব্দ শুনতে পেয়েছে এবং রাত্রের মৃদু বাতাস জেনারেলের সিগারেট-সৌরভ তার কাছে নিয়ে এসেছে। তার মনে হল যেন জেনারেল অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন; আগের মতো এক ফুট এক ফুট করে সমঝে-বুঝে আসছেন না। যেখানে গুঁড়ি মেরে রেন্‌স্‌ফর্ড বসে ছিল সেখান থেকে সে জেনারেল বা গর্তটা কোনও কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। প্রত্যেকটি মিনিট যেন তার কাছে এক-একটা বছরের আয়ুষ্কাল বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তার পর, হঠাৎ সে উল্লাসভরে সানন্দে চিৎকার করতে যাচ্ছিল— কারণ সে শুনতে পেয়েছে মড়মড় করে গর্তের ঢাকনা ভেঙে নিচে পড়ে গিয়েছে; ধারালো কাঠের ডগাতে পড়ে কে যেন বেদনার তীক্ষ্ণ আর্তরব ছেড়েছে। তার লুকানো জায়গা থেকে সে লাফ দিয়ে উঠেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মুষড়ে গিয়ে পিছু হটল। গর্ত থেকে তিন ফুট দূরে একজন মানুষ ইলেকট্রিক টর্চ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেনারেলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'শাবাস রেন্‌স্‌ফর্ড, তোমার বর্মা-পদ্ধতিতে তৈরি গর্তটা আমার সবচেয়ে সেরা কুকুরদের একটাকে গ্রাস করেছে। আবার তুমি জিতলে। এবারে দেখব মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, তুমি আমার পুরো পাল কুকুরের বিরুদ্ধে কী করতে পার। আমি এখন বাড়ি চললুম একটু বিশ্রাম করতে। ভারি আমোদে কাটল সন্ধ্যাটা— তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

জলাভূমির কাছে শুয়ে রাত কাটানোর পর ভোরবেলা তার ঘুম ভাঙল এমন একটা শব্দ শুনে যেটা তাকে বুঝিয়ে দিল যে ভয় বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে এখনও তার নতুন কিছু শেখবার আছে। শব্দটা আসছিল দূর থেকে— ক্ষীণ, এবং ভাসা ভাসা। একপাল কুকুরের চিৎকার।

রেন্‌স্‌ফর্ড জানত, সে দুটোর একটা করতে পারে। যেখানে আছে সেখানেই থেকে অপেক্ষা করা। সেটা আত্মহত্যার শামিল। কিংবা সে ছুট লাগাতে পারে। সেটা হবে অবধারিতকে মুলতবি করা। এক মুহূর্তের তরে সে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল। তার মাথায় যা এল সেটা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অতিশয় ক্ষীণ। কোমরের বেল্ট শক্ত করে নিয়ে সে জলাভূমি ত্যাগ করল।

কুকুরগুলোর চিৎকার আরও কাছে আসছে, তার পর আরও কাছে, তারচেয়ে আরও কাছে। পাহাড়ের খাড়াইয়ের উপরে একটা গাছে চড়ে রেন্‌স্‌ফর্ড দেখতে পেল, একটি জলধারার পোয়াটাক মাইল দূরে একটা ঝোপ নড়ছে। চোখ যতদূর সম্ভব পারে টাটিয়ে দেখতে পেল জেনারেলের একহারা শরীর আর তার সামনে আরেকজনের বিশাল স্কন্ধ জঙ্গলের উঁচু বোনো ঘাস ঠেলে ঠেলে এগুচ্ছে। এ সেই নরদানব ইভান। তাকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তি টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে; রেন্‌স্‌ফর্ডের বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না সে কুকুরগুলোর চেন হাতে ধরে রেখেছে।

যে কোনও মুহূর্তে তারা তার ঘাড়ে এসে পড়বে। তার মগজ তখন ক্ষিপ্তবেগে চিন্তা করছে। ইউগান্ডায় শেখা গ্রামবাসীদের একটা ফন্দি তার মনে এল। গাছ থেকে নেমে সে একটা লিকলিকে চারাগাছের সঙ্গে তার শিকারের ছোরাটার ডগা নিচের দিকে মুখ করে বাঁধল সে যে-পথ দিয়ে এসেছে তার ঠিক উপরে; সর্বশেষে চারাগাছটাকে লতা দিয়ে ধনুর মতো বাঁকিয়ে পিছন দিকে বাঁধল। তার পর সে দিল প্রাণপণ ছুট। কুকুরগুলো ইতোমধ্যে আবার তার গন্ধ পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে তীব্রতর স্বরে। এইবারে রেন্‌স্‌ফর্ড হৃদয়ঙ্গম করল, কোণ-ঠাসা শিকারের বুকে কোন অনুভূতি জাগে।

www.pathagar.com

দম নেবার জন্য তাকে থামতে হল। হঠাৎ কুকুরগুলোর চিৎকার থেমে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে রেন্‌স্‌ফর্ডের হৃদস্পন্দনও যেন থেমে গেল। তা হলে তারা নিশ্চয়ই ছোরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

রেন্‌স্‌ফর্ড উত্তেজনার চোটে চড়চড় করে একটা গাছে উঠে পিছনপানে তাকাল। তার তাড়নাকারীরা তখন দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু গাছে চড়ার সময় রেন্‌স্‌ফর্ড তার হৃদয়ে যে আশা পুষেছিল সেটা লোপ পেল; সে দেখতে পেল শুকনো উপত্যকার উপর জেনারেল জারফ আপন পায়ের উপরই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ইভান নয়। জ্যা-মুক্ত চারাগাছের আঘাতে ছোরাটা সম্পূর্ণ নিষ্ফলকাম হয়নি।

রেন্‌স্‌ফর্ড হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়তে না পড়তে কুকুরগুলো আবার চিৎকার করে উঠল।

আবার দৌড়তে আরম্ভ করে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলছে, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, হবে, হবে।' একদম সামনে, গাছগুলোর ফাঁকে দেখা দিয়েছে এক ফালি নীলরঙের ফাঁকা! রেন্‌স্‌ফর্ড প্রাণপণ ছুটল সেদিক পানে। পৌঁছল সেখানে। সেটা সমুদ্রের পাড়। সমুদ্র সেখানে খানিকটে ঢুকে গিয়ে ছোট্ট উপসাগরের মতো আকার ধরেছে। রেন্‌স্‌ফর্ড তারই ওপারে দেখতে পেল বিষণ্ন পাঁশুটে পাথরের তৈরি জেনারেলের শাটো। রেন্‌স্‌ফর্ডের পায়ের বিশ ফুট নিচে সমুদ্র গজরাচ্ছে আর ফোঁস ফোঁস করছে। রেন্‌স্‌ফর্ড দোটানায়। শুনতে পেল কুকুরগুলোর চিৎকার। লাফ দিয়ে পড়ল দূরে, সমুদ্রে।

জেনারেল আর তাঁর কুকুরের পাল সে জায়গায় পৌঁছলে পর তিনি সেখানে থামলেন। কয়েক মিনিটের তরে তাকিয়ে রইলেন নীলসবুজ বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে। ঘাড়ের ঝাঁকুনি দিয়ে 'যাকগে' ভাব প্রকাশ করলেন। তার পর মাটিতে বসে রুপোর ফ্লাস্ক থেকে ব্রান্ডি খেয়ে সুগন্ধি সিগারেট ধরিয়ে 'মাদাম বাটারফ্লাই' গীতিনাট্য থেকে খানিকটা গান গুনগুন করে গাইলেন।

সে রাত্রে তাঁর কাঠের আস্তরওলা বিরাট ডাইনিং হলে জেনারেল জারফ অত্যুৎকৃষ্ট ডিনার খেলেন। সঙ্গে পান করলেন এক বোতল পল রজের আর আধ বোতল শ্যাবেরত্যাঁ। দুটি যৎসামান্য বিরক্তিকর ঘটনা তাঁকে পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগে বাধা দিল মাত্র। তার একটা, ইভানের স্থলে অন্য লোক পাওয়া কঠিন হবে এবং অন্যটা, তাঁর শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল বলে— স্পষ্টই দেখা গেল যে মার্কিনটা আইনমাফিক শিকারের খেলাটা খেলল না। ডিনারের পর লিক্যোরে চুমুক দিতে দিতে অন্তত জেনারেলের তাই মনে হল। আরাম পাবার জন্য তাই তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে মার্কুস আউরেলিয়ুসের রচনা পড়লেন। দশটার সময় তিনি শোবার ঘরে ঢুকলেন। দোরে চাবি দিতে দিতে তিনি আপন মনে বললেন, আজকের ক্লান্তিটা তাঁর বড় আরামের ক্লান্তি। সামান্য একটু চাঁদের আলো আসছিল বলে তিনি বাতি সুইচ্ করার পূর্বে জানালার কাছে গিয়ে নিচে আঙিনার দিকে তাকালেন। বিরাট কুত্তাগুলোকে দেখে তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আসছে বারে তোমাদের কপাল ভালো হবে, আশা করছি।' তার পর তিনি আলো সুইচ্ করলেন।

খাটের পর্দার আড়ালে যে লোকটা লুকিয়ে ছিল সে সেখানে দাঁড়িয়ে।

জেনারেল চেঁচিয়ে বললেন, 'রেন্‌স্‌ফর্ড! ভগবানের দোহাই, তুমি এখানে এলে কী করে?'

www.pathagar.com

রেন্‌স্‌ফর্ড বলল, 'সাঁতরে। আমি দেখলুম, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে না এসে এভাবেই তাড়াতাড়ি হয়।'

জেনারেল ঢোক গিললেন, তার পর মৃদু হেসে বললেন, 'আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আপনি শিকারে জিতেছেন!'

রেন্‌স্‌ফর্ড স্মিতহাস্য হাসল না। নিচুস্বরে হিসহিসিয়ে সে বলল, 'আমি এখনও কোণ-ঠাসা শিকারের পশু। তৈরি হোন, জেনারেল জারফ!'

জেনারেল যেভাবে নিচু হয়ে বাও করলেন সেটা তাঁর গভীরতম বাওয়ের একটি। বললেন, 'তাই নাকি? চমৎকার! আমাদের একজনকে কুত্তাগুলোর খানা হতে হবে। অন্যজন ঘুমুবে এই অতি উৎকৃষ্ট শয্যায়। এসো রেন্‌স্‌ফর্ড, হুশিয়ার...'

রেন্‌স্‌ফর্ড সিদ্ধান্ত করল, এরচেয়ে ভালো বিছানায় সে কখনও ঘুমোয়নি।*

অপর্ণার পারণা বা স্যালাড

বাসনা ছিল দু-একটি গাল-গল্প বলার পর যখন আসর খানিকটা ওম পেয়েছে তখন এই লেখাটিতে হাত দেব কিন্তু হিসাব করে দেখি সে আর হয় না। স্যালাড পাতা বাজারে ফুরিয়ে যাওয়ার পর এ লেখা বেরুলে কে আর সেটি ন মাস বাঁচিয়ে রাখবে? এমনকি মনে হচ্ছে এমনিতেই বোধহয় কিঞ্চিৎ দেরি হয়ে গেল। অবশ্য কলকাতা এবং হিলস্টেশনে যাঁরা থাকেন তাঁদের কথা আলাদা।

স্যালাড শব্দের মূল অর্থ 'নোনতা' কিন্তু এখন শব্দটি অন্য নানা অর্থে ব্যবহার হয়। প্রধানত কাঁচা পাতা খাওয়ার অর্থে। তাই আমি যখন কোনও ইয়োরোপীয়কে পান দিই, তখন বলি, 'হ্যাভ্ সাম নেটিভ স্যালাড।'— অবশ্য তারা পান বলতে সেটাকে স্যালাডের ভিতর ধরেনি।

স্যালাড বললে দেশে-বিদেশে প্রধানত লেটিস (ইংরেজিতে বানান lettuce কিন্তু উচ্চারণ লেটিস) স্যালাডই বোঝায়। তার নানা জাত-বর্ণ আছে কিন্তু এদেশে প্রধানত হেড্ এবং লিফ্ এই ধরনেরই রেওয়াজ বেশি। হেড্ অর্থাৎ মাথা— এ লেটিস দেখতে অনেকটা বাঁধাকপির মতো। আর লিফ্ স্যালাডে থাকে শুধু পাতা। দুটোরই বাইরের দিকের পাতাগুলো পুরু এবং তেতো বলে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের নরম-বস্তু কাজে লাগাতে হয়। আর যদি আপন বাগানে লিফ্ ফলিয়ে থাকেন তবে সূর্য ওঠবার সময়— আগে হলে আরও ভালো— প্রয়োজনমতো যে-কটি পাতা দরকার সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন লেটিসের ভিতরকার দিক থেকে ছিঁড়ে তুলে নেবেন (ভিন্ন ভিন্ন লেটিসে সেসব জায়গায় আবার নতুন কচি পাতা গজাবে, বাইরের দিকে যে পাতাগুলো ছেঁড়েননি সেগুলোর নিরাপদ আশ্রয়ে)। কেউ কেউ বলেন স্যালাড তৈরি করা পর্যন্ত পাতাগুলো ভিজিয়ে রাখতে, আমি বলি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে রাখতে।

---

* বিদেশি গল্পের অনুবাদ।

www.pathagar.com

অমলেট, মাছভাজা যেমন বেশি আগে তৈরি করে রাখা হয় না, স্যালাডও তেমনি খেতে বসার যত অল্পক্ষণ আগে করা যায় ততই ভালো; না হলে পাতাগুলো নেতিয়ে একাকার হয়ে যায়।

সবচেয়ে ঘরোয়া আটপৌরে স্যালাড কী করে বানাতে হয় তারই বর্ণনা দিচ্ছি। এটা বানাতে যেসব মাল-মসলা লাগে সেগুলো আপনার ভাঁড়ারে আর সবজির ঝুড়িতেই আছে— আপনাকে শুধু কিছু লেটিস পাতা কিনে আনতে হবে। আপনার যদি স্যালাড সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞানগম্যি থাকে তবে আপনি এখানেই তীব্র কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে বলবেন, 'কিন্তু অলিভ ওয়েল?— সে তো আমাদের ভাঁড়ারে থাকে না!' দাঁড়ান বলছি, ওটা বড্ড আক্রা জিনিস— এমনকি খাজা ভেজালটাও কম আক্রা নয়। সেকথা পরে আসছে।

বাজার কিংবা বাগান থেকে লেটিস পাতা এনে তার বাইরের পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাইরের কটা পাতা? যত বেশি ফেলবেন, ভেতরের কচি পাতার গুণে স্যালাড তত সুস্বাদু হবে, কিন্তু তা হলে তো পরিমাণ এত কমে যাবে যে খরচায় পোষাবে না। অতএব আপনাকেই চিন্তা করে স্থির করতে হবে, বাইরের কটা পাতা ফেলে দেবেন। এ ব্যাপারে পাক্কা গিন্নির মতো বড্ড বেশি কঞ্জুসি করবেন না, কারণ লেটিস অতিশয় সস্তা জিনিস।

ভিতরের যে পাতাগুলো বাছাই করে নিলেন সেগুলো অতি সযত্নে ধুয়ে নেবেন। ধোয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ওগুলো থেকে ধুলোবালি ছাড়ানো— আর কিছু নয়। তার পর পাতাগুলো হাত দিয়ে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে নেবেন, এই মনে করুন, টুকরোগুলো যেন তিন ইঞ্চির মতো লম্বা হয়। কিন্তু সাবধান! বঁটি দিয়ে কাটবেন না। যে জিনিস কাঁচা খাওয়া হয় সেগুলো লোহা দিয়ে কাটা উচিত নয়— এ তো জানা কথা। *স্টেনলেস স্টিলের* ছুরি অবশ্য ব্যবহার করতে পারেন— অথবা যাকে বলা হয় ফ্রুট নাইফ বা ফল কাটার ছুরি। কিংবা ঝিনুক, কিংবা বাঁশের ছিলকে দিয়ে। কাঁচা আম মা-মাসিরা যে পদ্ধতিতে কাটেন— বাংলা কথা। কিন্তু লেটিসের পাতা ছিঁড়বেন হাত দিয়েই। এগুলো দরকার হবে পরের জিনিসগুলো কাটবার জন্য।

এইবারে ছেঁড়া পাতাগুলো চিনেমাটির কিংবা শুধু মাটির চ্যাপ্টা থালাতে রাখুন। কাঁসা বা পেতল সম্পূর্ণ বর্জনীয়। কারণ এতে নেবুর রস আসবে। সবচেয়ে ভালো হয়, ময়দা ছাঁকার ছাকনির উপর রাখলে। তা হলে পাতার গায়ের জল ঝরে পড়ে পাতাগুলো ফের শুকনো হয়ে যায়।

তার পর মোটা সাদা পেঁয়াজ চাকতি চাকতি করে কাটুন। টমাটো, শসাও চাকতি চাকতি করুন। ছোট ছোট নরম লাল মুলো কিংবা খুব নরম সাধারণ মুলোও চাকতি চাকতি করে দিতে পারেন। কাঁচালঙ্কাও কুচি কুচি করে দেবেন, যদি বাড়ির লোক কাঁচালঙ্কার ঝাল পছন্দ করেন।

এইবারে সবকিছু— অর্থাৎ লেটিসের ছেঁড়া পাতা ও এগুলো— একসঙ্গে রাখুন। তার উপর সরষের তেল ঢালুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সরষের তেল, যে তেল দিয়ে আমরা তেল-মুড়ি খাই। আপনি বলবেন, 'অলিভ তেলের কী হল?' উত্তরে নিবেদন, স্যালাড বানাবার সময় মার্কিন-ইয়োরোপীয় বিশেষ করে ফরাসিরা মাস্টার্ড পাউডার অর্থাৎ সরষেগুঁড়ো অলিভওয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়, কিংবা আগেভাগে সরষেগুঁড়ো জলের সঙ্গে খুব পাতলা করে মিশিয়ে তার সঙ্গে লেটিস পাতা মাখিয়ে নেয়। অলিভওয়েলের আপন গন্ধ ও স্বাদ খুব

www.pathagar.com

কম। তার সঙ্গে সরষেগুঁড়ো মেশালে ফলে তো সর্ষের তেলই দাঁড়াল— অবশ্য আমাদের সরষের তেলের ঝাঁজ এবং ধক তাতে থাকবে না। অবাঙালি সর্ষের তেলের ঝাঁজ সইতে পারে না বলেই 'অলিভ ওয়েল' করে। আমরা যখন ওইটেই পছন্দ করি তবে সরষের তেল দিয়ে স্যালাড বানাব না কেন? আমি নিজে তো পুরনো আচারের মজা-সরষের তেলই ব্যবহার করি।

সরষের তেলে সবকিছু আলতো আলতো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর তার উপরে ঢালবেন পাতি বা কাগজি নেবুর রস। নুন। সবকিছু ফের আলতো আলতো করে মাখুন। ব্যস্— স্যালাড তৈরি।

নেবুর রসের বদলে অনেকেই ভিনিগার বা সিরকা দেয়। তার কারণ ইয়োরোপে ওই ভিনিগার ছাড়া অন্য কোনও টক বস্তু নেই। নেবুর রসের বদলে যদি ভিনিগার ব্যবহার করেন তবে সেটা জল দিয়ে ডাইলুট অর্থাৎ কম-তেজ করে নেবেন।

প্রশ্নটা, কতখানি লেটিসের সঙ্গে কতখানি পেঁয়াজ, টমাটো, শসা, তেল, নেবুর রস দেব? এর উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে মনে রাখা উচিত, লেটিস পাতাই হবে প্রধান জিনিস, সে-ই যেন বাকি সব জিনিসের উপর প্রাধান্য করে। পাতাগুলো তেলতেলে হওয়ার মতো তেলে মাখানো হবে, কিন্তু জবজবে যেন না হয়। নেবুর রস তেলের এক সিকি ভাগের মতো। বেশি টকটক যেন মনে না হয়; এবং খাবার সময় লেটিস পাতা যেন আর পাঁচটা জিনিসের চাপে আপন স্বাদ না হারায়।

এ স্যালাড অন্য পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে খেতে হয়। অর্থাৎ ডাল-ভাত, ভাত-ঝোল, ভাত-মাংস, একগ্রাস মুখে দেবার পর খানিকটা স্যালাড মুখে নিয়ে একসঙ্গে চিবোবেন। স্বাধীন পদ হিসেবে যে স্যালাড খাওয়া হয় সেটাতে মাছ, মাংস কিংবা ডিম থাকে, এবং মায়োনেজ দিয়েই তৈরি করা হয়। (ডিমের হলদে ভাগের সঙ্গে তেল-সিরকা দিয়ে মেখে মেখে সেটা তৈরি করতে হয়; বড্ড খুঁটিনাটি বলে বাজারে তৈরি মায়োনেজ বোতলে পাওয়া যায়, টমাটো সসেরই মতো, যদিও ইটালিয়ানরা প্রতিদিন তাজা টমাটো সস বাড়িতেই বানায়, আমরা যেরকম বাজারের কারি পাউডার না কিনে নিজেরাই হরেক জিনিস বেটে-গুলে রান্নায় ব্যবহার করি।) সেসব স্বাধীন পদের স্যালাড বানাতে এটা ওটা সেটা এবং সময়ও লাগে বেশি— তদুপরি সবচেয়ে বড়কথা বাঙালি রান্নার আর তিনটে পদের সঙ্গে ওটা ঠিক খাপ খায় না।

অনেকে আবার তেল-নেবুর রস ব্যবহার না করে লেটিসপাতা-টমাটো-প্যাঁজ সবকিছু টক দইয়ে মেখে নেন, উপরে গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেন। আমার তো ভালোই লাগে।

কাবুলিরা ব্যত্যয়। তারা শুধু লেটিস পাতা একঠোঙ্গা মধুতে গুত্তা মেরে খেয়ে চলে রাস্তায় যেতে যেতে।

আমাদের দেশে শীতকালেও রোদ কড়া বলে লেটিস ভালো হয় না। তাই এদেশে লেটিস ফলাতে জানেন অল্প লোকই। লেটিস ক্ষেত যেন দিনে অল্পক্ষণের জন্য পুবের রোদ পায়, সার যেন বেশি না দেওয়া হয়, এবং জলসেচের পরিমাণও নির্ণয় কঠিন। মোট কথা, লেটিস যেন বড্ড বেশি প্রাণবন্ত না হয়। তাকে যেন খানিকটে জীবন্মৃত রাখা হয়। লেটিস পাতা পান ও তামাকপাতার মতোই বড় ডেলিকেট লাজুক কোমল প্রাণ। তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় বরজের মতো কোনও একটা ব্যবস্থা করে লেটিস ফলিয়ে দেখলে হয়।

www.pathagar.com

এখন সর্বশেষ প্রশ্ন, আমি স্যালাড নিয়ে অত পাঁচ কাহন লিখছি কেন?

প্রথম : স্যালাড জিনিসটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। যে কোনও ডাক্তারকে শুধোতে পারেন।

দ্বিতীয় : বাঙালি গরিব জাত। লেটিস সস্তা এবং স্যালাড বানাতে আর যেসব জিনিস লাগে সেগুলো বাঙালির ঘরে ঘরে কিছু-না-কিছু থাকে। প্রত্যেককে একবাটি স্যালাড দিতে খর্চা তেমন কিছুই নয়। ডাল ভাত মাছ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গ্রাস কিংবা দ্বিতীয় তৃতীয় গ্রাসে কিছুটা স্যালাড খেলে ওই দিয়ে পেটের কিছুটা ভরে। একটা হাফ-পদও হল। পরে যদি স্যালাডে আপনার রুচি জন্মে যায় তবে আপনি তার পরিমাণ বাড়িয়ে পেটের আরও বেশি ভরাতে পারবেন।

তৃতীয় : স্যালাড এক্সপেরিমেন্ট করে করে অনেককিছু দিয়ে তার পরিমাণ বাড়ানো যায়। আলুসেদ্ধ চাকতি চাকতি করে (এমনকি আগের রাতের বাসি ঝোলের আলুগুলো তুলে নিয়ে, ধুয়ে, চাকতি চাকতি করে), মটরশুঁটি সেদ্ধ করে, গাজর বিট ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছুই তাতে দেওয়া যায়। এমনকি ঠাণ্ডা হাফবয়েলড ডিমও চাকতি চাকতি করে দেওয়া যায়— তবে ওটা স্যালাড তৈরি হয়ে যাবার পর সর্বশেষে; নইলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, অতি আলতো আলতোভাবে মাখাবার সময়ও। অর্থাৎ বাড়ির কোনওকিছু খামকা বরবাদ হয় না। এমনকি আগের রাতের মাছ-মাংস দিয়েও স্যালাড করা যায়— তবে সে অন্য মহাভারত, পদ্ধতি আলাদা।

সর্বশেষে পাঠক, এবং বিশেষ করে পাঠিকাকে সাবধান করে দিচ্ছি, স্যালাড এমন কিছু ভয়ঙ্কর সুখাদ্য নয়, (দেখতেই পাচ্ছেন, যেসব মাল দিয়ে স্যালাড তৈরি হয় সেগুলো এমন কিছু মারাত্মক মূল্যবান সুখাদ্য নয়) যে আপনি হন্তদন্ত হয়ে স্যালাড তৈরি করে খেয়ে বলবেন, 'ও হরি! এই মালের জন্য আলী সাহেব এতখানি বকর বকর করল।'

মনে পড়ল, এক মহিলাকে আমি কথায় কথায় এক বিশেষ ব্র্যান্ডের সাবান ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছিলুম। দিন সাতেক পরে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। নাক সিঁটকে বললেন, 'তা আর এমন কী সাবান!' আমি বললুম, 'ম্যাডাম, আপনি কি আশা করেছিলেন যে ওই সাবান ব্যবহার করার সাত দিনের মধ্যেই আপনার কর্তা আপনাকে নতুন গয়না গড়িয়ে দেবেন!'— ১৪ ক্যারেটের আগের কথা বলছি।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার ওপর দেশি-বিদেশি কোন কোন মহাজন তথা কীর্তিমান লেখক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সে বিষয় নিয়ে বাঙলাসাহিত্যে বহু বৎসর ধরে আলোচনা-গবেষণা হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনও একাধিক সজ্জন আছেন যাঁদের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অতি সহজে পাওয়া যাবে না, যদিও এঁদের প্রভাব থাক আর না-ই থাক, এঁদের সাহচর্যে যে রবীন্দ্রনাথ উপকৃত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

যে একটি বিষয়ে অনুমতি পেলে আমি প্রথমেই বলতে চাই সেটি এই— দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে ছাত্রাবস্থায় আমি রবীন্দ্রনাথকে ক্লাস নিতে দেখেছি, সভাস্থলে সভাপতিরূপে, আপন প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা, নাট্যের পাঠকরূপে এবং অন্যান্য নানারূপে তাঁকে দেখেছি। আমার মনের ওপর সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছে, গুণী-জ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, কখনও কখনও সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তর্ক, ভাবের আদান-প্রদান, আলোচনা। কিন্তু, এই সমস্ত আলোচনায় তাঁকে তাঁর সৃজনী সাহিত্যের (ক্রিয়েটিভ লিটরেচারের) আঙ্গিকের (টেকনিকাল দিকের) আলোচনা করতে শুনিনি। যেমন 'বেলা'-র সঙ্গে 'খেলা' মিলের চেয়ে 'পূর্ণিমা সন্ধ্যায়'-এর সঙ্গে 'উদাসী মন ধায়' অনেক ভালো মিল, কিংবা তারচেয়ে অনেক বড় সাধারণতত্ত্ব— লিরিকে কী গুণ থাকলে কবি এমনই শব্দের সঙ্গে শব্দ বসাতে পারেন যার ফলে পাঠক শব্দ অর্থ ধ্বনি সবকিছু পেরিয়ে অপূর্ব নবীন লোকে উপনীত হয়। তাঁর বহু বহু গান শুনে মনে হয়, এই যে অভূতপূর্ব শব্দ সম্মেলন, যার একটিমাত্র শব্দ পরিবর্তন করে অন্য শব্দ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব— আর্টে এই পরিপূর্ণ সিদ্ধহস্তের কৃতিত্ব আসে কী প্রকারে? তিনি কোন পদ্ধতিতে এখানে এসে পৌঁছলেন? কিংবা কোনও সুচিন্তিত পূর্ব-পরিকল্পিত পদ্ধতি যদি না থাকে তবে অন্তত সে পরিপূর্ণতায় পৌঁছবার পক্ষে নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে তিনি কী দেখলেন, কী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন?

বিষয়টি আমি খুব পরিষ্কার করে পেশ করতে পারলুম না, কিন্তু আমার মনে ভরসা আছে, যাঁরা শুধু পাঠক নন, কবিতা বা গল্প সৃষ্টি করেন, তাঁরা আমার বক্তব্যটি অনুমানে অনুভব করে নিয়েছেন।

অবশ্য শুনেছি, পরবর্তী যুগে কবি যখন তথাকথিত 'আধুনিক' কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গল্প-কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তখন নাকি তিনি ওই নিয়ে বিস্তর আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করেন। তার বোধহয় অন্যতম কারণ, 'আধুনিক' কবিতার বহুলাংশ বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করে বলে তাই নিয়ে আলোচনা করা সহজ; পক্ষান্তরে আমি পূর্বে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছি সেটা প্রধানত বুদ্ধির ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এমনকি সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন প্রসাদগুণ এবং ওই সম্পর্কে অন্যান্য নানা বিষয় তাঁকে আলোচনা করতে শুনেছি কিন্তু তিনি স্বয়ং যে তাঁর গানে শব্দ ও সুরের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে পৌঁছলেন সেটা কী পদ্ধতিতে হল, তার ক্রমবিকাশের সময় কোন কোন দ্বন্দ্ব কিংবা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনা করতে শুনিনি। আমি যে পাঁচ বৎসর এখানে ছিলুম, তখন তাঁকে বহু-বহুবার সঙ্গীতরাজ দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, খোশগল্প করতে শুনেছি, কিন্তু, যেমন মনে করুন, তাঁর প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত কাঁচা কথাসুরের সম্মিলিত গান থেকে তিনি কী করে নিটোল গানের পরিপূর্ণতায় পৌঁছলেন সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করতে শুনিনি। স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ এবং শ্রীযুত দিলীপ রায়ের সঙ্গে তিনি সঙ্গীত নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন— এবং এখানকার শিক্ষক শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর সঙ্গে তো অহরহই হত— কিন্তু আমি এস্থলে যে বিষয়টির অবতারণা করেছি সেটি হত বলে জানিনে।

এবং এস্থলে আমার যদি ভুলও হয় তাতেও আমার মূল বক্তব্যের কোনওপ্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমার মূল বক্তব্য : চিন্তার জগতে রবীন্দ্রনাথ কাদের সঙ্গে বিচরণ করতেন।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পর (১৯০৫/৬) শান্তিনিকেতনে এসে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনা করার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ এখানেই মোটামুটি পাকাপাকিভাবে বাস করেন। সে-যুগে তাঁদের ভিতর কতখানি যোগাযোগ ছিল বলতে পারি না, কিন্তু ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত— অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর দুজনাতে একসঙ্গে বসে দীর্ঘ আলোচনা করতে কখনও দেখিনি। অথচ এ সত্য আমরা খুব ভালো করেই জানি, দ্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য, চরিত্রবল তথা বহুমুখী প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অতি অবিচল শ্রদ্ধা ছিল এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে অতিশয় সম্মানের চোখে দেখতেন। শুধু তাই নয়, আমি আশ্রমে কিংবদন্তি শুনেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি একদা এক আশ্রমাচার্যকে বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলেছে, কিন্তু রবির কখনও পা পিছলায়নি।' অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ প্রতি উৎসব দিনে, কিংবা বিদেশ থেকে আশ্রমে ফিরলে সেখানে প্রবেশ করামাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করতে আসতেন। সামান্য যে দু-একটি কথাবার্তা হত তা অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ছোট্ট একটি কবিতা কিংবা অন্য ওই ধরনের কোনওকিছু একটা লিখে কবিকে পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভিন্ন অন্যকিছু রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করতে শুনিনি।

রেভারেন্ড এন্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যতা ছিল একথা সকলেই জানেন। এঁরা দুজনাই জীবনের শেষের ভাগ শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দারূপে ছিলেন। তা ছাড়া লেভি, ভিনটারসিৎস, তুচ্চি, ফরমিকি, স্টেনকোনো, মর্গ্যানস্টিয়েের্নে, কলিন্‌স্‌ বগদানফ[1] প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ভারতীয় তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু ঘণ্টা, বহুদিনব্যাপী প্রচুর আলোচনা করেছেন, কখনও-বা সভাস্থলে (প্রধানত 'বিশ্বভারতী সাহিত্যসভায়'), কখনও স্বগৃহের বারান্দায়। আর্ট কি, রস ও অলঙ্কার নিয়ে তিনি সর্বাধিক আলোচনা করেছেন শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে। নন্দলাল স্বল্পভাষী গুণী— বরঞ্চ অসিতকুমারের সঙ্গে ওই নিয়ে তাঁর মুখর আলোচনা হত বেশি। অবশ্য একথাও স্মরণ রাখা উচিত, আর্ট বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বোঝেন নন্দলালই সেটি শুনেছেন বহু বৎসর ধরে এবং সবচেয়ে বেশি। এবং বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁকে উৎসাহিত করেছেন নন্দলালই। নন্দলালই তাঁকে একাডেমিক আর্টের মরুপথে তাঁর ধারা হারাতে দেননি।

কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সভ্যতা— ধর্মদর্শন কাব্য অলঙ্কার এ নিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন দুটি পণ্ডিতের সঙ্গে : স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন। আলোচনা বললে অত্যন্ত কমই বলা হল। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে ঐতিহ্যগত ভারতীয় সংস্কৃতি কতখানি বিরাট জায়গা জুড়ে রেখেছিল সেকথা আমরা সবাই জানি। বিধুশেখরের ছিল ওই একমাত্র জগৎ। ক্ষিতিমোহন সেন সে জগতে বাস করলেও দেশের গণধর্মের উৎপত্তি বিকাশের সত্য নির্ণয়ে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। এই তিনজনের

১. এঁদের ছাড়া আরও বহু পণ্ডিতের নাম করতে হয়। তাঁদেরই একজন কোষকার স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি যৌবনকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই বসবাস করেন। অন্যজন ভগবদ্‌কৃপায় এখনও আমাদের মাঝখানে আছেন। গোস্বামীরাজ নিত্যানন্দবিনোদ। ইনি ১৯২০/২১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিস্তর শাস্ত্রালোচনা করেন।

www.pathagar.com

জীবন এবং রচনাতে বার বার মনে হয়— এঁরা যেন অভিন্ন। অথচ যেন ত্রিমূর্তির তিনটি মুখ দেখছি। যেন বেদের উৎস থেকে তিনটি ধারা বেরিয়ে এসেছে অথচ তিনটি ধারাই আপন আপন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভেও যেন একে অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেছে। এস্থলে আমি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি যে, বিষয়টি আমার পক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা কঠিন, কারণ এঁদের আলোচনা আমি শুনেছি অপরিণত বয়সে ও পরবর্তীকালে, এবং আজও আমার সংহিতাজ্ঞান এতই যৎসামান্য যে, ত্রিমূর্তির এই লীলাখেলা আমি প্রধানত অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছি, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বিশ্লেষণ— গবেষণা দ্বারা নয়। এস্থলে 'ত্রিধারা' 'ত্রিমূর্তি' বলার সময় আমি স্মরণে রেখেছি যে অনেকেই (যেমন 'ত্রিবেদী') চতুর্থ বেদ স্বীকার করেন না।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন বাল্যবন্ধু, হয়তো-বা সতীর্থ ছিলেন। উভয়েই কাশীতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ ও সংস্কৃত চর্চা করেন। উভয়েই শাস্ত্রী।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন উভয়েই অত্যুত্তম সংস্কৃত এবং পালি জানতেন।

এ স্থলে পালি ভাষার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হল। কারণ বৌদ্ধধর্ম তথা পালি ভাষার প্রতি সাধারণ সংস্কৃত পণ্ডিতের অনুরাগ থাকে না। পণ্ডিত-জনোচিত বিশেষজ্ঞ না হয়েও রবীন্দ্রনাথ এ দুটি ভাষাই জানতেন। পরবর্তী যুগে সংহিতা পাঠের সুবিধার জন্য বিধুশেখর জেন্দ-আবেস্তার ভাষা শেখেন।[২] ক্ষিতিমোহন গণধর্মের সন্ধানে হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি প্রভৃতি অর্বাচীন ভাষাগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করেন। বেদ উপনিষদে তিনজনারই অবাধগতি।

কিন্তু সংহিতাই বিধুশেখরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, বিশেষ করে ঋগ্বেদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপ্রেরণা পেতেন উপনিষদ থেকে। এবং ক্ষিতিমোহনের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ ছিল ভারতীয় গণধর্ম তথা ক্রিয়াকাণ্ডের সর্বপ্রাচীন ভাণ্ডার অথর্ববেদের প্রতি। আমি একাধিক পণ্ডিতের মুখে শুনেছি, ক্ষিতিমোহন যতখানি শ্রদ্ধাসহ, মনোযোগ সহকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেছিলেন ততখানি এ যুগে অন্য কোনও পণ্ডিতই করেননি। সংহিতায় সুপণ্ডিত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ল্যুডার্সকে বলতে শুনেছি, অথর্ববেদ বড়ই অবহেলিত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পরবর্তী যুগের বহু রহস্যের সমাধান অথর্ববেদে আছে। অরবিন্দও নাকি এই মত পোষণ করতেন।

বিধুশেখর যখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করেন তখন তিনি এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়েই আসেন যে, তিনি বৈদিক যুগের আশ্রমেই প্রবেশ করেছেন। এখানে বেদমন্ত্র পাঠ হয়, ব্রাহ্মণসন্তান মাত্রই যজ্ঞোপবীতধারী, আমিষ পাদুকা আশ্রমে নিষিদ্ধ, ব্রহ্মচর্যের বহু ব্রত এখানে পালিত হয়, এবং গুরু শিষ্যের সম্পর্ক অতি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী। পাঠক এ যুগের ইতিহাস প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের *রবীন্দ্র-জীবনী*তে পাবেন।

বিধুশেখরের মতো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এ যুগে অল্পই জন্মেছেন। শুধু স্বপাকে ভক্ষণ, সন্ধ্যাআহ্নিক পালন তথা সশ্রদ্ধ বেদাধ্যয়নের কথা নয়— বাহ্যিক শুচি-অশুচিতে পার্থক্যও তিনি করতেন অনায়াসে অবহেলে, কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান প্রচেষ্টা ছিল অন্তর্জগৎকে পরিপূর্ণ

২. বিধুশেখরের পালি ও আবেস্তাচর্চা, ক্ষিতিমোহনের পালিচর্চায় রবীন্দ্রনাথই প্রধান উৎসাহদাতা। হয়তো-বা ভুল বলা হবে না, রবীন্দ্রনাথের আদেশেই বিধুশেখর আবেস্তাচর্চা আরম্ভ করেন।

www.pathagar.com

শুচিশুদ্ধ পবিত্র করার। তাঁর আদর্শ ছিল তাঁর কল্পনার ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং তাঁর কল্পনার আচার্য— অনাসক্ত পূত পবিত্র।

ক্ষিতিমোহনও নিষ্ঠাবান বৈদ্য-সন্তান। কিন্তু তাঁর সামাজিক আচার-ব্যবহার ছিল অনেকটা বিবেকানন্দের মতো।

আশ্রমে যতদিন বারো বৎসরের বেশি বয়স্ক ছাত্র নেওয়া হত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রীতিনীতি পালন করা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। ইতোমধ্যে মহাত্মা গাঁধী কিছুদিনের জন্য আশ্রম পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে দেখিয়ে দিলেন, এতদিন আশ্রমবাসীরা যে জীবন কৃচ্ছ্রসাধনময় ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন সেটা বাস্তবিক বিলাস পরিপূর্ণ। আশ্রমের মেথর-চাকর বিদায় দিয়ে তিনি এখানে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করলেন সেটা এখানকার অনেক গুরুর পক্ষে অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। ফলে গাঁধী সাবরমতী চলে গেলেন। আশ্রমও ধীরে ধীরে তার রূপ পরিবর্তন করতে লাগল।

বিধুশেখর তবু তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদর্শে আকণ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যারিকেন লণ্ঠন যখন আশ্রম ব্যবহার করেছে, বিজলিই-বা করবে না কেন?'

বিধুশেখর বললেন, 'রেড়ির তেলে আমি সানন্দে ফিরে যাব। হ্যারিকেন আর রেড়ির তেল প্রায় একই— বিজলির তুলনায়। বিজলি আনবে বিলাস। তার সর্বনাশের সর্বশেষ সোপান আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

পাঠক ক্ষণতরে ভাববেন না, বিধুশেখর সঙ্কীর্ণচেতা কূপমণ্ডূক ছিলেন। তাঁর প্রতি এরচেয়ে নির্মম অবিচার আর কিছুই হতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনে খ্রিস্টান পাদ্রি এন্ড্রুজ যাঁর অন্তরঙ্গ সখা, ব্রহ্মমন্দিরের আচার্যের আসনে বসে যিনি মুগ্ধ কণ্ঠে 'যবন' ইমাম গজ্জালির 'কিমিয়া সাদৎ' (সৌভাগ্য-স্পর্শমণি) আবৃত্তি করে ব্রহ্মলাভের পন্থা-বর্ণনা করছেন, যিনি মৌলানা শওকত আলিকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে আশ্রম ভোজনাগারে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি যদি সঙ্কীর্ণচেতা হন তবে প্রার্থনা করি সর্বভারতবাসী যেন এরকম সঙ্কীর্ণচেতা হয়।

বিধুশেখর না থাকলে যে রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি ব্রহ্মবিদ্যালয়কে অক্সফর্ডে পরিণত করতেন তা নয়। বিধুশেখর ছিলেন প্রাচীন ভারতের মূর্তমান প্রতীক। তাঁর সন্তুষ্টি থাকলে রবীন্দ্রনাথ আপন কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে দ্বিধাহীন হতে পারতেন। এবং যখনই তিনি বিধুশেখরকে— তা সে যত অল্পই হোক না কেন— আপন মতে টেনে আনতে পারতেন তখনই তাঁর মনে হত তিনি যেন ঐতিহ্যাবদ্ধ ভারতকে, তার ধর্ম থেকে তাকে বিচ্যুত না করে, বর্তমান প্রাচীন সংসারের বিশ্বনাগরিকরূপে তার প্রাপ্য আসন নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছেন।

এই বিশ্বনাগরিক হওয়ার জন্য বিশ্বভারতীয় সৃষ্টি।

পূর্বেই বলেছি, আশ্রম যতদিন বারো বৎসরের বেশি বয়স্ক ছাত্র নিত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাদর্শ সম্মুখে রাখা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম যখন বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হল (স্কুলের সঙ্গে কলেজও যুক্ত হল) তখন পূর্ণবয়স্ক কিশোর ও যুবাকেও গ্রহণ করতে হয়। এই বিশ্বভারতী নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ও সচিব ছিলেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন (সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ, চিত্রে নন্দলাল)। রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন, 'এই শান্তিনিকেতনে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের গুণী-জ্ঞানীরা একত্র হবেন'— সঙ্গে সঙ্গে বিধুশেখর সংস্কৃত থেকে উদ্ধার করে দিলেন, 'যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্'।

www.pathagar.com

বিধুশেখরের আনন্দের সীমা নেই। এতদিন আশ্রম-বালক তাঁর কাছ থেকে সন্ধি-সমাস পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার পূর্বেই 'অর্ধস্নাতক' অবস্থায় আশ্রম ত্যাগ করত, এখন ভারতের সর্ব খণ্ড থেকে আসতে লাগল প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রী। এরা লুপ্তপ্রায় যাস্কের 'নিরুক্ত' অধ্যয়নে উদ্‌গ্রীব, বিধুশেখরেরই সম্পাদিত ও অনূদিত পালি গ্রন্থ 'মিলিন্দা পঞ্‌হো' থেকে তাঁকে বহুতর 'পঞ্‌হো' (প্রশ্ন) শুধায়। বিধুশেখরের আনন্দ উচ্ছ্বলিত হয়ে উপচে পড়ছে। এইবারে সত্য জ্ঞানচর্চা হবে। এইবারে তিনি তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিতে পারবেন।

কিন্তু হায়, এইসব ছাত্রছাত্রীর অনেকেই তো ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাস করে না। এমনকি এদের ভিতর 'নাস্তিক' 'চার্বাকপন্থী'ও একাধিক ছিল। খ্রিস্টান-মুসলমানও ছিল। এদের কেউ কেউ সমবেত উপাসনায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে অনিচ্ছুক। খ্রিস্টান ছেলেটির আপত্তি ছিল না কিন্তু সেই 'চার্বাকপন্থী' তাকে বোঝাল খ্রিস্টানের সর্বপ্রার্থনা যিশুর মারফত পাঠাতে হয়, বেদমন্ত্রে তা হয় না; এবং মুসলমানকে আল্লা-রসুলের দোহাই দিল। খ্রিস্টান ধাঁধায় পড়ল, মুসলমান বলল, পাঁচ বেকৎকে সাত বেকৎ করতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু বেদমন্ত্রদ্বারা উপাসনা করছে এ খবর পেলে তার পিতা অসন্তুষ্ট হবেন।

নাচার অধ্যক্ষ বিধুশেখর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলেন পাদ্রি এন্ড্রুজের হাতে।

এন্ড্রুজ আবেগ-ভরা কণ্ঠে বিশ্বমানবিকতার শপথ নিয়ে বেদমন্ত্রের সর্বজনীনতা ব্যাখ্যা করলেন। আস্তিক-নাস্তিক সকলেই সসম্ভ্রম নতমস্তকে তাঁর বক্তব্য শুনল। কিন্তু সংশয়বাদী তথা নাস্তিকদের মত পরিবর্তন হল না।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে বাধ্য করলেন না।

ক্ষিতিমোহন সমাজে সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলে কেউ যেন মনে না করেন— তিনি শুচি-অশুচির পার্থক্য করতেন না। কিন্তু তাঁর কষ্টিপাথর মনু এমনকি ঋগ্বেদ থেকেও তিনি আহরণ করেননি। বেদ থেকে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটি আয়ুর্বেদ। একে তিনি বৈদ্যকুলোদ্ভব, তদুপরি তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন; আহারবিহার তিনি তাই আয়ুর্বেদসম্মত পদ্ধতিতেই করতেন।

প্রাচীন-অর্বাচীন নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। উপনিষদের বাণীর সন্ধান তিনি অহরহ পাচ্ছেন আউল-বাউলে। আবার আউল-বাউলের আচার-আচরণ তিনি পাচ্ছেন অথর্ববেদে। তাঁর সম্মুখে বহু পন্থা, তিনি সবকটিতেই বিশ্বাস করেন।

তিনি ছিলেন বিধুশেখর ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে সেতুস্বরূপ— এন্ড্রুজ যেরকম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর মাঝখানে। তিনি এ যুগে সনাতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের 'অসম্ভব' আদর্শে বিশ্বাস করতেন না, আবার সখা বিধুশেখরের নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলে তাঁকে সমর্থন করতে পারলে আনন্দিত হতেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ, তার ধ্যানলোকের ঐতিহ্যের সন্ধানে বিধুশেখর শরণ নিতেন ঋগ্বেদের, আশ্রমের পাল-পার্বণের জন্য মন্ত্রসন্ধানে ক্ষিতিমোহন যেতেন অথর্ববেদে।

আজ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদানের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু তার মূল্য যতই হোক না কেন, বিধুশেখর-ক্ষিতিমোহন যে মূলধন তাঁদের গুরুদেবের পদপ্রান্তে রেখেছিলেন তার ওপর নির্ভর করে চিন্ময় মৃন্ময়— ধ্যানে এবং কর্মকাণ্ডে— অদ্যকার ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিশ্বভারতী। অদ্য বাদশতান্তে সে যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, এঁদের কাছে বিশ্বভারতী চিরঋণী।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রভাষা

১

ভারতবর্ষের সবাই যদি এক ভাষায় কথা বলত তা হলে সবদিক দিয়ে আমাদের যে কত সুবিধে হত সেকথা ফলিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। শুধু যে কাজ-কারবারের মেলা বখেড়ার ফৈসালা হয়ে যেত তাই নয়, একই ভাষার ভিত্তিতে আমরা অনায়াসে নবীন ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের ইমারত গড়ে তুলতে পারতুম। মালমসলা আমাদের বিস্তর রয়েছে, তাই সে ইমারত বাইরের পাঁচটি দেশের শাবাসিও পেত।

এ তত্ত্বটা নতুন নয়। কিন্তু একই ভাষার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ইমারত গড়ে তুলতে গেলেই এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে করজোড়ে স্বীকার করছি আমার জীবনে আমি যত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি কাবু করেছে— এ দ্বন্দ্বের সমাধান আমি কিছুতেই করে উঠতে পারিনি। বিচক্ষণ পাঠক যদি দয়া করে এ অধমকে সাহায্য করেন।

বৈদিক সভ্যতাসংস্কৃতি একটিমাত্র ভাষার ওপরই খাড়া ছিল সেকথা আমরা জানি তার কারণ সে যুগে আর্যরা ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েননি এবং দ্বিতীয়তর অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি বলে সে ভাষাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন অতি অল্পই হয়েছিল।

প্রভু বুদ্ধের যুগ আসতে না আসতেই দেখি, সে ভাষা আর আপামর জনসাধারণ বুঝতে পারছে না। যতদূর জানা আছে, প্রভু বুদ্ধ তাঁর নবীন ধর্ম প্রচারের জন্য বৈদিক ভাষা কিংবা সে ভাষার তৎকালীন প্রচলিত রূপের শরণ নেননি। তিনি তৎকালীন সর্বজনবোধ্য ভাষার শরণ নিয়েছিলেন— সে ভাষাকে প্রাকৃত বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিংবা ব্রাহ্মণ্য ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তিনি যে বিহারে প্রচলিত তৎকালীন সর্বজনবোধ্য ভাষার স্মরণ নিয়েছিলেন তা নয়, কারণ সকলেই জানেন বুদ্ধদেব 'ব্রাহ্মণ-শ্রমণ' এই সমাস বার বার ব্যবহার করেছেন, উভয়কে সমান সম্মান দেখাবার জন্য। জনপদ-ভাষা যে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তার একমাত্র কারণ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের অন্যতম সর্বপ্রথম গণ-আন্দোলন এবং গণ-ভাষার প্রয়োগ ব্যতীত গণ-আন্দোলন সফল হতে পারে না।

এস্থলে লক্ষ করবার বিষয় বিহারের আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করতে বুদ্ধদেব সর্বভারতের পণ্ডিতজনবোধ্য ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিনি তাতে বিচলিত হননি।

ঠিক একই কারণে মহাবীর জিনও আঞ্চলিক উপভাষার শরণ নিয়ে অর্ধ-মাগধীতে আপন বাণী প্রচার করেন। শাস্ত্রীয় মতবাদ এবং জীবহত্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতানৈক্য বাদ দিলে বৌদ্ধ ও জৈন গণ-আন্দোলন একই রূপ একই গতি ধারণ করেছিল।

অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ ভাষাও সংস্কৃত নয়।

তার পরের বড় আন্দোলন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আনয়ন করেন। তিনিও প্রধানত সর্বজনবোধ্য বাঙলার শরণ নিয়েছিলেন— যদিও তাঁর সংস্কৃতজ্ঞান সে যুগের কোনও পণ্ডিতের

www.pathagar.com

চেয়ে কম ছিল না। পশ্চিম ও উত্তর ভারতেও তুকারাম মারাঠি ব্যবহার করেন। কবীর-দাদু প্রভৃতি সাধকেরা হিন্দি ব্যবহার করেন। কবীর বললেন, 'সংস্কৃত কূপজল,' সে জল কুয়ো থেকে বের করে আনতে হলে ব্যাকরণ-অলঙ্কারের লম্বা দড়ির প্রয়োজন কিন্তু 'ভাষা' (অর্থাৎ সর্বজনবোধ্য প্রচলিত ভাষা) 'বহতা নীর'— সে জল বয়ে যাচ্ছে, যখন-তখন ঝাঁপ দিয়ে শরীর শান্ত করা যায়। আর তুকারাম বললেন, 'সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয় তবে মারাঠি কি চোরের ভাষা?'

তার পরের গণ-আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করেন। তিনি যদিও জনগণের ভাষা হিন্দির শরণ নিয়েছিলেন তবু লক্ষ করার বিষয় যে, অসহযোগ আন্দোলন বাঙলা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরালায় হিন্দি কিংবা ইংরেজির মাধ্যমে আপামর জনসাধারণে প্রসারলাভ করেনি; জনগণ যে সাড়া দিল সে বাঙলা, তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ভাষার মাধ্যমে— অসহযোগ আন্দোলন প্রচার করার ফলে। বারদলই সত্যাগ্রহের প্রধান বক্তা ছিলেন বল্লভভাই পটেল। তিনি যে অদ্ভুত তেজস্বিনী গুজরাতি ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে ভাষা অনায়াসে সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে। বল্লভভাইয়ের গুজরাতির সঙ্গে তাঁর হিন্দির কোনও তুলনাই হয় না।

এতক্ষণ ধরে যে ঐতিহ্যের বর্ণনা দিলুম সে শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রভু খ্রিস্ট সাধু এবং পণ্ডিতি ভাষা হিব্রুতে তাঁর ধর্ম প্রচার করেননি। তাঁর প্রথম ও প্রধান শিষ্যদের বেশিরভাগই ছিলেন অতি সাধারণ জেলে। তাঁর প্রচারকার্য এঁদের নিয়েই আরম্ভ হয় বলে তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন গ্যালিলি-নাজারেৎ অঞ্চলবোধ্য আরামেইক উপভাষায়। মহাপুরুষ মুহম্মদও যখন আরবির মাধ্যমে আল্লার আদেশ প্রচার করলেন তখন আরবি ভাষা ছিল পৌত্তলিকদের 'না-পাক' ভাষা, এবং সে ভাষায় ধর্মপ্রচারের কোনও ঐতিহ্য ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে লেখা আছে মহাপুরুষ মুহম্মদের ঈষৎ পূর্বে এবং তাঁর সমবর্তীকালে মক্কাবাসীদের যাঁরা সত্য পথের অনুসন্ধান করতেন তাঁরা হিব্রু শিখে সে ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পড়তেন। তাই যখন মহাপুরুষ হিব্রুর শরণাপন্ন না হয়ে আরবির মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করলেন তখন সবাই তাজ্জব মেনে গেল। তার উত্তরে আল্লা-ই কুরান শরিফে বলেছেন, তাঁর প্রেরিত পুরুষ যদি আরব হয় তবে প্রচারের ভাষা আরবি হবে না তো কী হবে? আর আরবি না হলে সবাই বলত, 'আমরা তো এসব বুঝতে পারছিনে'।

লুথারও পোপের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন জর্মনের পক্ষ নিয়ে— পণ্ডিতি লাতিন তিনি এই বলেই অস্বীকার করেছিলেন যে, সে ভাষার সঙ্গে আপামর জনসাধারণের কোনও যোগসূত্র ছিল না।

মোদ্দা কথা এই, এ পৃথিবীতে যতসব বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে— তা সে নিছক ধর্মান্দোলনই হোক আর ধর্মের মুখোশ পরে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনই হোক— তার সব কটাই গণ-আন্দোলন এবং গণ-আন্দোলন সর্বদাই আঞ্চলিক গণভাষার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছে।*

* রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে-বিপক্ষে যে কটি যুক্তি আছে, সবকটিরই আলোচনা করা এ প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য— লেখক।

www.pathagar.com

২

রাষ্ট্রভাষার যে প্রয়োজন আছে সে সত্য তর্কাতীত, কিন্তু প্রশ্ন সে ভাষা গণ-আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করতে পারবে কি না? যাঁরা মনে করেন, স্বরাজ লাভ হয়ে গিয়েছে এখন আর গণ-আন্দোলনের কোনও প্রয়োজন নেই, তাঁরা হয় মারাত্মক ভুল করছেন, নয় ভাবছেন দেশের জনগণ তাঁদের জন্য পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে খাটবে আর তাঁরা শহরে শহরে দিব্য খাবেন-দাবেন আর কেউ কোনওপ্রকারের তেরিমেরি করলে ডাণ্ডা উঁচিয়ে ভয় দেখাবেন এবং তাইতেই সবকিছু বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে।

সেটি হচ্ছে না, সেটি হবার জো নেই। যে জনসাধারণকে একদা স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন করে স্বরাজের জন্য লড়ানো হল, তাদের এখন ডেকে আনতে হবে রাষ্ট্রনির্মাণ কর্মে। তারা যদি ভারতীয় রাষ্ট্রকে আপন রাষ্ট্র বলে চিনতে না পারে, সে রাষ্ট্রের প্রতি যদি তাদের আত্মীয়তাবোধ না জন্মে তবে নানাপ্রকারের বিপদের সম্মুখীন হতে হবে— তার ফিরিস্তি দেবার প্রয়োজন নেই। পাড়ার কম্যুনিস্টকে ডেকে জিগ্যেস করুন— সে সব বাৎলে দেবে।

এখন প্রশ্ন, কোন ভাষার মাধ্যমে আমরা জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হব? বেশিরভাগ লোকই স্বীকার করে নিয়েছেন পাঠশালাতে মাত্র একটি ভাষা শেখানো হবে— অর্থাৎ হিন্দি যেসব অঞ্চলের আপন ভাষা সেগুলো বাদ দিয়ে আর সর্বত্র মাত্র প্রাদেশিক ভাষাটিই শেখানো হবে। অর্থাৎ বাঙলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র অঞ্চলের পাঠশালাগুলোতে ছেলেমেয়েরা সুদ্ধ আপন আপন মাতৃভাষা শিখবে। ভারতবর্ষ থেকে নিরক্ষরতা কবে দূর হবে জানিনে, তবে আশা করি সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, নিরক্ষরতা দূর হওয়ার বহু বৎসর পর পর্যন্ত এদেশের শতকরা ৭০টি ছেলেমেয়ে পাঠশালাতেই লেখাপড়া শেষ করবে— এবং শিখবে শুধু মাতৃভাষা।

বাদবাকিরা হিন্দি শিখবেন— সে হিন্দি জ্ঞান কতটা হবে তার আলোচনা পরে হবে— এবং ক্রমে ক্রমে অতি অল্পসংখ্যক লোকই ইংরেজি শিখবেন, আজকের দিনে চীন কিংবা মিশরের লোক যে অনুপাতে ইংরেজি শেখে।

রাষ্ট্রভাষা সর্বভারতে চালু করনেওয়ালারা বলেন, আজ ইংরেজি ভাষা যেরকম ব্যবহৃত হচ্ছে একদিন হিন্দি তার আসনটি নিয়ে নেবে অর্থাৎ যাবতীয় রাজকার্য, মামলা-মোকদ্দমার তর্কাতর্কি, রায়, আপিল, বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, পার্লিমেন্টে বক্তৃতা ঝাড়া ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হিন্দিতে হবে। কলকাতা তথা অন্ধ্র, তামিলনাড়ু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দির মাধ্যমে জ্ঞানদান হবে কি না সে সম্বন্ধে অনেকেরই মনে ধোঁকা রয়ে গিয়েছে, তবে কট্টর রাষ্ট্রভাষীদের বাসনা যে তাই সে সম্বন্ধে খুব বেশি সন্দেহ নেই।

তা হলে অনায়াসে ধরে নিতে পারি ইংরেজ আমলে যেরকম আমাদের বেশিরভাগ ভালো লেখকেরা সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরেজিতে বই লিখতেন (রাধাকৃষ্ণনের *ইন্ডিয়ান ফিলসফি* থেকে পণ্ডিতজির *ডিস্‌কভারি অব্ ইন্ডিয়া* ইস্তেক) ঠিক তেমন আমাদের ভবিষ্যতের শক্তিশালী লেখকেরা তাঁদের প্রচেষ্টা নিয়োগ করবেন হিন্দির মাধ্যমে এবং যে সৎসাহিত্য— গল্প উপন্যাস কবিতাই সাহিত্যের একমাত্র কিংবা প্রধান সৃষ্টি নয়— হিন্দিতে গড়ে উঠবে সেটা, বাঙলা, তামিল, গুজরাতি সাহিত্য-সৃষ্টিপ্রচেষ্টার খেসারতি দিয়ে। এতদিন যে ভারতীয় ভাষাগুলোতে নানামুখী সৃষ্টিকার্য প্রসার এবং প্রচার লাভ করতে পারছিল না তার জন্য আমরা প্রাণভরে ইংরেজির জগদ্দল পাথরকে গালমন্দ করেছি এখন হিন্দির চাপে সেই একই

www.pathagar.com

পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, কিন্তু হয়তো গালমন্দ করার অধিকার থাকবে না। পূর্ববঙ্গে যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করবার চেষ্টা হয়েছিল তখন আমি অন্যান্য যুক্তির ভিতর এইটিও পেশ করে তীব্রকণ্ঠে আপত্তি জানিয়েছিলুম এবং বহু পূর্ববঙ্গবাসী আমার যুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন।

আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যের যে ক্ষতি হবে সেকথা এখন থাক। উপস্থিত মোদ্দাকথা হচ্ছে এই, ভারতীয় নবীন রাষ্ট্রনির্মাণ সম্বন্ধে গবেষণা, আলোচনা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ যেসব গ্রামভারি কেতাব, ব্লু বুক, দলিল-দস্তাবেজ, উৎসাহোদ্দীপক ওজস্বিনী এবং গম্ভীর পুস্তক রচিত হবে সেগুলো হবে হিন্দিতে এবং দেশের শতকরা সত্তরজন লোক গ্রামে বসে সেগুলো পড়তে পারবে না।

একদা এই সত্তরজন লোকের প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র এই সত্তরজনকে বাদ দিয়ে নির্মাণ করা যাবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাবৎ কেতাব বাঙলাতে লিখলেই কি এরা সেগুলো পড়ে বুঝতে পারবে? সে সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। আমার বিশ্বাস, দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় সবসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ছাপের ওপর নির্ভর করে না। এমন সব ইংরেজি-অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ সুদ্ধ বাঙলা-ভাষী পাঠশালার পণ্ডিত আছেন, যাঁরা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন আছেন বলে এবং বাংলা দৈনিকের মারফতে অতি অল্প যে রাষ্ট্রসংবাদ পান তারই জোরে গ্র্যাজুয়েটকে তর্কে ঘায়েল করতে পারেন। অনেক এম.এ. পাস লোক বই জমায় না— জমালে জমায় চেক বুক— আর অনেক পাঠশালার পণ্ডিত গোগ্রাসে যে কেতাব পান তাই গেলেন। পুনরায় নিবেদন করি, জ্ঞানতৃষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ওপর নির্ভর করে না।

তাই দেখতে হবে আমাদের রাষ্ট্রনির্মাণ প্রচেষ্টার সর্বসংবাদ যেন এমন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যে ভাষা মানুষের মাতৃভাষা। ইংরেজ আমলে ইংরেজি জাননেওয়ালা ও না-জাননেওয়ালার মধ্যে যে ন্যক্কারজনক কৌলীন্যের পার্থক্য ছিল সেটা যেন আমরা জেনেশুনে আবার প্রবর্তন না করি।

৩

সুশীল পাঠক, মাঝে মাঝে ধোঁকা লাগে, রাষ্ট্রভাষা, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে এই যে আমি হপ্তার পর হপ্তা দাপাদাপি করছি তাতে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছ না তো? আমি তো হয়ে গিয়েছি কিন্তু বিষয়টি বড্ডই গুরুত্বব্যঞ্জক এবং আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এর ওপর নির্ভর করছে না, আমাদের অতীত ঐতিহ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি সবকিছুই এর ওপর নির্ভর করছে। একবার যদি ভুল রাস্তা ধরি তবে আমড়াতলার মোড়ে ফিরে আসতেই আমাদের লেগে যাবে বহু যুগ এবং তখন আবার নতুন করে সবকিছু ঢেলে সাজাতে গিয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। আজকের দিনে পৃথিবীতে কেউ বসে নেই— তখন দেখতে পাবেন, আর সবাই এগিয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ রাজনীতিতে আপনি অমুক দেশের ধামাধরা হয়ে আছেন, অর্থনীতিতে আপনি আর এক মুল্লুকের কাছে সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়েছেন এবং কৃষ্টি সংস্কৃতিতে নিরেট হটেন্‌টট বনে গিয়েছেন।

কেন্দ্রের ভাষা যে হিন্দি হবে সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদের ভাষা হবে কী? অর্থাৎ প্রশ্ন, পার্লিমেন্টে সদস্যেরা বক্তৃতা দেবেন কোন ভাষায়?

www.pathagar.com

হিন্দিওয়ালা হিন্দিতে দেবেন— বাঙলা কথা। কিন্তু তামিল-ভাষীরা দেবেন কোন ভাষায়?

এতদিন একদিক দিয়ে আমাদের কোনও বিশেষ হাঙ্গামা ছিল না। সব প্রদেশের সদস্যরা ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন— অথচ কারওরই মাতৃভাষা ইংরেজি ছিল না বলে অহেতুক সুবিধা কেউই পেত না। এবং যে সুবিধাটা পেত ইংরেজ রাজসম্প্রদায় এবং তারা যে সে সুযোগটা ন-সিকে কাজে লাগাত সেকথাও সবাই জানেন।

এখন অবস্থাটা হবে কী? কেঁদে-ককিয়ে যেটুকু হিন্দি শিখব তার জোরে কি পার্লিমেন্টে বক্তৃতা ঝাড়া যায়? পূর্বেই নিবেদন করেছি, হিন্দিকে যদি তিরু অনন্তপুরম (ত্রিভান্দরম) কিংবা বিশাখাপট্টনম (ভাইজাগ্) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম করা হয় (কলকাতা কিছুতেই মানবে না, সে আপনি-আমি বিলক্ষণ জানি) তবে তাদের আখেরটি ঝরঝরে হয়ে যাবে। অতএব অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালার লোক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে যেটুকু হিন্দি শিখবে— (সবাই শিখবে তা-ও নয়, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার না-ও শিখতে পারে)— তা দিয়ে কি সে হিন্দি-ভাষীদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ চালাতে পারবে?

দু দণ্ড রসালাপ সব ভাষাতেই করা যায়। 'আমি তোমায় ভালোবাসি', জ্য ত্যেম্', 'ইস লিবে ডিস'— আহা এসব কথা দেখতে না দেখতেই শিখে ফেলা যায়। মদন যেস্থলে গুরু, সখা কন্দর্পও হয়তো মজুত, কালটি মধুমাস, উর্বশী দু-চক্কর নাচভি দেখিয়ে দিচ্ছেন, তার মধ্যিখানে সবাই এক লহমায় হরিনাথ দে হয়ে যান। কিংবা বলতে পারেন, সেখানে ভাষার দরকারই-বা কী— কোন প্রয়োজন মধুর ভাষণের?

কিন্তু পার্লিমেন্টে তো মানুষ রসালাপ করতে যায় না। সেখানে লাগে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, চিন্তাধারা-চিন্তাধারায় টক্কর লেগে 'উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি', বাজেটকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে হয় যেখানে— সেখানে 'করেঙ্গা, খায়েঙ্গা' হিন্দি দিয়ে কাজ চলে না। আমাদের বাঙাল দেশে বলে 'ছাগল দিয়ে হাল চালাবার চেষ্টা কর না।'

বিচক্ষণ পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, ঘড়েল প্যাসেঞ্জার কক্খনও, অর্থাৎ 'কাইট্যা ফালাইলে'ও বেহারি মুটের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে তর্ক করার সময় হিন্দি বলে না। কারণ সে একখানা বলতে না বলতে মুটে ঝেড়ে দেবে পাঁচখানা পুরো পাঁচালী এবং লক্ষ করেছ, মুটেও ততোধিক ঘড়েল— দিব্য বাঙলা জানে, কিন্তু মেশিনগান চালাচ্ছে তার বিহারি হিন্দি 'করত, খাওত', আর 'ভজলু কি বহিনিয়া ভগলু কি বেটিয়া'র ভাষা দিয়ে।

অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখা ভাষা দিয়ে কোনও মরণ-বাঁচনের ব্যাপারে তর্কাতর্কি করা যায় না। সে ভাষা দিয়ে বই পড়ে জ্ঞান আহরণ করা যায়— ব্যস্।

আরেকটা উদাহরণ দিই। ইংলন্ড যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি পৌন্ড খরচা করেছে ইংরেজ ছোকরাদের ফরাসি শেখাবার জন্য— দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে। অথচ দশ হাজার ইংরেজ যদি প্যারিস বেড়াতে আসে তবে দশটা ইংরেজও ফরাসি বলতে পারে না।

সে এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। বাপ, মা, ম্যাট্রিক-পাস ব্যাটা নাবলেন ক্যালে বন্দরে। ইস্টিমারে ইংরেজি চলে, কোনও অসুবিধা হয়নি। ক্যালেতেও হবে না, বাপ-মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, কারণ ছেলে ম্যাট্রিকে ফরাসিতে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। বাপ প্রতাপ রায়ের মতো ছেলে বরজলালকে হেসে বললেন, 'জিগ্যেস কর তো বাবাজি, পোর্টারটাকে— প্যারিসের ট্রেন কটায় ছাড়বে?'

www.pathagar.com

ছেলে প্রমাদ গুনছে। বরজলালেরই মতো আপন ফরাসি ভাষার গুরুকে স্মরণ করে ক্ষীণ কণ্ঠে যখন পোর্টারকে বিদঘুটে উচ্চারণে জিগ্যেস করল, 'আকেল আর পার লা জ্যাঁ পুর পারি?' তখন পোর্টার মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে হাঁ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তার পর মিনিট তিনেক ঘাড় চুলকে চুলকে ভেবে নিল। হঠাৎ মুখে হাসি ফুটল। চিৎকার করে আরেকটা পোর্টারকে ডাক দিয়ে বলল, 'এ, জ্যাঁ ভিয়ানিসি, ওয়ালা আঁ মসিয়ো কী পার্ল লাংলে।' 'এই জন, এদিকে আয়, এক ভদ্রলোক ইংরেজি বলছেন। বুঝতে নারনু।'

হায়, কিন্তু বেচারা ফাঁকি দিয়ে গোল্ড মেডেল মারেনি। ফরাসি ব্যাকরণ তার কণ্ঠস্থ, পার্স্ট কন্ডিশনাল, ফ্যুচার সবজনকটিভ তার নখাগ্রদর্পণে— কিন্তু ফরাসি জাতটাই নচ্ছার, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিদেশির মুখে ভুল উচ্চারণে আপনার ভাষার শব্দরূপ ধাতুরূপ শুনতে কিছুতেই রাজি হয় না!

* * *

কিন্তু পাঠক নিরাশ হবেন না। পার্লিমেন্টে বক্তৃতার ভাষা-সমস্যা সমাধান করা যায়। পরে নিবেদন করব।

৪

ভারতের ভবিষ্যৎ বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি কী রূপ নেবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হলেই দেখতে পাই অনেকেই মনে মনে আশা পোষণ করছেন, সে বৈদগ্ধ্য যেন ঐক্যসূত্রে তাবৎ প্রদেশগুলোকে সম্মিলিত করে নব নব বিকাশের দিকে ধাবিত হয়। এ অতি উত্তম প্রস্তাব এবং এতে কারও কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। যখন ভাবি, এই ভারতবর্ষেই একদা একই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে কাবুল থেকে কামরূপ, হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারী সর্ব কলাপ্রচেষ্টা সর্ব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে, তখনই ঐক্যাভিলাষী হৃদয় উল্লসিত হয়ে ওঠে, আর তার পুনরাবৃত্তি দেখতে চায়।

সংস্কৃতকে ব্যাপকভাবে পুনরায় সেরকম ধারায় চালু করার আশা আর কেউ করেন না। এখন প্রশ্ন, হিন্দির মাধ্যমে সেটা সম্ভবপর কি না?

এই মনে করুন 'রামের সুমতি' কিংবা 'বিন্দুর ছেলে'। ধরে নিন অতি উত্তম অনুবাদক বই দু-খানা হিন্দিতে অনুবাদ করলেন। আপনি উত্তম না হোক মধ্যম ধরনের হিন্দি জানেন, অর্থাৎ হিন্দি পুস্তকমাত্রই দিব্য গড়গড় করে পড়ে যেতে পারেন। এখন প্রশ্ন, আপনি কি সে সুখটা পাবেন যে সুখ ওই দু-খানা বাঙলা বই বাঙলাতে পড়ে পান? ('গোরা'র ইংরেজি তর্জমা পড়েছেন? তাতে তো কোনও সুখই পাওয়া যায় না— কারণ ইংরেজি অতি-দূরের ভাষা) কেন পান না? তার প্রধান কারণ বিন্দু কী ভাষায়, কী ভঙ্গিতে কথা বলে, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে আপনার পরিচয় আছে; যখন দেখবেন তার সঙ্গে কিছুই মিলছে না, সবই কৃত্রিম বোধ হচ্ছে, তখন আপনার কাব্যরসাস্বাদনের সব বাসনা চিরতরে না হোক, তখনকার মতো লোপ পাবে। সংস্কৃতে যাঁরা নাটক লিখে গিয়েছেন, তাঁরা এ তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানতেন, তাই অন্তত মেয়েদের দিয়ে সংস্কৃত বলাননি, বলিয়েছেন প্রাকৃত। নৃপ ব্রাহ্মণ সংস্কৃত বলেছেন, কারণ তাঁরা সংস্কৃত বলতে পারতেন, কিন্তু গোরা, বিনয়, অমিট রে কেউই দৈনন্দিন জীবনে হিন্দি

www.pathagar.com

বলেন না, কখনও বলবেন বলে মনে হয় না। কাজেই হিন্দি দিয়ে এদের চরিত্র বিকাশ করে বাঙালিকে সুখ দেওয়া যাবে না। যাঁদের মাতৃভাষা বাঙলা নয়, তাঁদের কথা আলাদা— তাঁরা অবশ্য অনেকখানি রস পাবেন— যদিও স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, অনুবাদ সাহিত্যমাত্রই কাশ্মিরি শালের উল্টো দিকের মতো, মূল নকশাটি বোঝা যায় মাত্র, আর সব রসের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।*

উপরিস্থ তত্ত্বকথাটি সকলের কাছে এতই সুপরিচিত যে, আমার পুনরাবৃত্তিতে অনেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন, কিন্তু এইটির ওপর নির্ভর করে আমি যে বক্তব্য পেশ করব, সেটা যদি সকলে গ্রহণ করেন কিংবা অন্ততপক্ষে সেটি বিবেচনাধীন করেন, তবে আমি শ্রম সফল বলে মানব।

শুধু ভাষা এবং সাহিত্য নয়, অন্যান্য প্রচেষ্টাও স্বভাবতই প্রাদেশিক রঙ নেয়। অজন্তা ও মোগল-শৈলীর নবজীবন লাভ হয় বাঙলা দেশে, তাই সে সম্বন্ধে যত আলোচনা-গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশই বাঙলাতে। অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষাকে একবার সার্বভৌম অধিকার দিলে যে বৈদগ্ধ্য গড়ে উঠে, সেটা প্রাদেশিক।

এইখানে লেগে গেল দ্বন্দ্ব। আমরা এ প্রবন্ধ প্রারম্ভ করেছি প্রতিজ্ঞা নিয়ে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্য যেন ঐক্যসূত্রে তাবৎ প্রদেশগুলোকে সম্মিলিত করে নব নব বিকাশের দিকে ধাবিত হয়। তা হলে মুক্তি কোন পন্থায়— প্রাদেশিক ভাষাকে সংস্কৃতি জগতের চক্রবর্তীরূপে স্বীকার করে প্রাদেশিক সংস্কৃতি গড়ব, না বাঙলা বর্জন করে হিন্দির মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতির সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করব?

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ভাষাকে বর্জন করে নয়, তার সম্যক উন্নতি সাধন করে, এবং আমার আরও বিশ্বাস, প্রাদেশিক সংস্কৃতি নির্মাণ করলে বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ন হবে না।

কারণ ভারেতীয় ঐক্য (ইউনিটি) ও ভারতীয় সমতা (ইউনিফর্মিটি) এক বস্তু নয়। আজ যদি পাঞ্জাব থেকে আসাম অবধি সবাই ভাত খেতে আরম্ভ করে, তবে বিদেশ থেকে শস্য কেনার সময় আমাদের বহুৎ বখেড়া আসান হয়ে যাবে, আজ যদি তাবৎ ভারতীয়ের উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি হয়ে যায়, তবে সৈন্যদের ইউনিফর্ম বানাবার কত না সুবিধা! তবু কেউ বলবেন না, সবাইকে জোর করে ভাত খাওয়াও, কিংবা ঢ্যাঙাদের শরীর থেকে দু ইঞ্চি কেটে ফেল। এ ইউনিটি নয়, ইউনিফর্মিটি।

যাঁরা মেরে-পিটে ভারতীয় সমতা চাইছেন, তাঁরা যে জেনে-শুনে ভুল করেছেন তা না-ও হতে পারে। আমার বিশ্বাস, তাঁরা ইউনিটি চাইছেন সত্য, কিন্তু ইউনিটি এবং ইউনিফর্মিটিতে গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, প্রত্যেক ভারতীয় প্রদেশ যদি আপন প্রাদেশিক সংস্কৃতি সভ্যতা আপন শক্তি ও প্রতিভা দিয়ে গড়ে তোলে, তবে সেই সম্মিলিত সংস্কৃতিই হবে সত্যকার ভারতীয় সংস্কৃতি।

গুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে নিবেদন করি, তিনি বলেছিলেন, একতারা বাজানো সহজ, বীণা বাজানো কঠিন; কিন্তু সেটা বাজাতে পারলে তার থেকে যে harmony বা বহুধ্বনি

* সত্যই স্বামীজি বলেছেন কি না, হলপ করে বলতে পারব না; এক গুণীর মুখে শোনা।

www.pathagar.com

আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ঐক্যের যে সঙ্গীত নির্মাণ করে তোলে, তার সঙ্গে একতারার ইউনিফর্‌মিটির কোনও তুলনা হয় না।

বহু প্রদেশের নানাবিধ সঙ্গীত জেগে উঠে যে harmony-র সৃষ্টি হবে, সে-ই সত্যকার ভারতীয় ঐক্য-সঙ্গীত। তবেই 'জনগণ ঐক্যবিধায়ক' বলা সফল হবে।

৫

হিন্দির প্রসার এবং প্রচার অতীব প্রয়োজনীয়, সেকথা আমরা সকলেই স্বীকার করি— কিন্তু সে প্রসার যেন প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক ভাষা এবং সাহিত্যকে গলা টিপে না মেরে ফেলে। হুশিয়ার হয়ে সে প্রসারকর্ম সমাধান করলে কারওরই কোনও আপত্তি থাকবে না। কী প্রকারে সেটা করা যেতে পারে, সে নিবেদন করার পূর্বে হিন্দির বিরুদ্ধে যে কয়টি আপত্তি বাঙলা দেশের কাগজে ইদানীং উঠেছে, তারই দু-একটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

হিন্দির বিরুদ্ধে প্রধান এবং প্রথম আপত্তি, হিন্দির লিঙ্গ বিভাগটা বড্ডই বদখদ। বাঙালি ভাবে, 'ছেলেটা যাচ্ছে', 'মেয়েটা যাচ্ছে' বললে যখন দিব্য অর্থ বুঝতে পারি তখন 'লড়কা জাতা হৈ', 'লড়কি জাতি হৈ' বলে মানুষকে বিরক্ত করা ছাড়া অন্য কোনও লাভ হয় না। এস্থলে বক্তব্য, 'অর্থ বুঝতে পারার' মান নিয়েই ভাষা সৃষ্টি হয় না। তাই যদি হত তবে বাঙলায় বলি না কেন, 'আমি গেলুম' 'তুমি গেলুম' 'সে গেলুম'? ইংরেজ তো খাসা এক 'ওয়েন্ট' দিয়েই বলে যায়, 'আই ওয়েন্ট', 'ইউ ওয়েন্ট', 'হি ওয়েন্ট'— অর্থ জলের মতো পরিষ্কার বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না।

অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষারই আপন আপন বৈশিষ্ট্য থাকে এবং তা নিয়ে গোসা করলে চলে না। এখন প্রশ্ন, হিন্দি যে লিঙ্গভেদ করে সেটা কি নিছক তারই 'পাগলামি', না অন্যান্য ভাষাও করে? বাঙলা এককালে কিছুটা করত, সেকথা সকলেই জানেন, এবং এখনও কিছুটা করে। 'সুন্দর রমণী' বলতে এখনও বাধো বাধো ঠেকে, এবং কোনও রমণীকে যদি বলি, 'ওগো সুন্দর, গঙ্গাস্নানে চললে নাকি'— তবে এখনও সেটা ভুল, 'সুন্দরী' বলতে হয়।

সংস্কৃতে যে লিঙ্গভেদ আছে এবং সে লিঙ্গভেদ যে সরল নয়, সেকথাও সকলেই জানেন। প্রাণহীন বস্তুমাত্রই যে ক্লীব হয় তা-ও তো নয়। বহু নদনদী এ জীবনে দেখেছি কিন্তু কোনটারই নাম পুংলিঙ্গ আর কোনটারই-বা স্ত্রীলিঙ্গ— ক্লীবের তো কথাই উঠে না— সে তত্ত্বটি জলধারা দেখে ঠাহর করতে পারিনি। দিক্‌সুন্দরীর (ডিক্‌শনারির) শরণাপন্ন হলে পর তিনি দিশেহারাকে দিক বাতলে দেন।

উত্তরে হয়তো বলবেন, সংস্কৃতের উদাহরণ এখন আর চলবে না। চালু ভাষা থেকে নজির পেশ কর।

এই মুশকিলে পড়ে গেলেন। ফরাসি, জর্মন, রুশ, ইতালি, ওলন্দাজ, আরবি, গুজরাতি, মারাঠি এ সব ভাষাতেই লিঙ্গভেদ আছে— এবং আরও বহু ভাষায় আছে বলে শুনেছি—, সত্য বলতে কি, লিঙ্গভেদ নেই এরকম ভাষাই বিরল। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান বলে, বড় ভাষার ভিতরে তিনটিমাত্র ভাষাতে লিঙ্গবিচার নেই— ইংরেজি, ফারসি এবং বাঙলা। এ তিনটি ভাষা যতখানি ছাত্রত্রাস ব্যাকরণ বর্জন করতে পেরেছে অন্য ভাষাগুলো সেরকম পারেনি।

www.pathagar.com

জর্মনের লিঙ্গ সবচেয়ে বেতালা বেহিসাব। 'ছুরি' 'কাঁটা' এবং 'চামচ' তিনটি শব্দই আমাদের কাণ্ডজ্ঞান অনুযায়ী ক্লীব হওয়া উচিত অথচ জর্মন ভাষাতে 'ছুরি' ক্লীব, 'কাঁটা' স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'চামচ' পুলিঙ্গ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'সূর্য' স্ত্রীলিঙ্গ, শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর 'চন্দ্রমা' পুংলিঙ্গ এবং 'নারী' ('ডাস ভাইব', 'ভাইব'— 'ওয়াইফ') ক্লীব লিঙ্গ! শুধু তাই নয়, সূর্যের চেয়েও দোর্দণ্ডপ্রতাপ জর্মন পুলিশ বাহিনী ('ডি পোলিৎসাই') স্ত্রীলিঙ্গ!

পুনরপি পশ্য, পশ্য, ফরাসি এবং হিন্দিতে 'দাড়ি' স্ত্রীলিঙ্গ।

তবে কি দাড়ির জৌলুসের মালিক এককালে রমণীরা ছিলেন? পুরুষেরা পরবর্তী যুগে জোর করে কেড়ে নিয়েছেন? কিন্তু ভুলবেন না, গোঁফ হামেশাই দাড়ির উপরে!

তবে বলুন তো, ভদ্র হিন্দিকে দোষ দিয়ে লাভ কী? বরঞ্চ হিন্দি জর্মনের তুলনায় ভদ্রতর। জর্মনে তিনটি লিঙ্গ; 'লাগলে তাগ, না লাগলে তুক্কা' করে যদি লিঙ্গবিচার করেন তবে শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র শতকরা ৩৩.৩ ভাগ; হিন্দিতে ৫০ ভাগ, কারণ হিন্দিতে মাত্র দুটি লিঙ্গ।

যাঁরা হিন্দি জানেন তাঁরা হিন্দির বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। হিন্দিতে বলি, 'মৈঁ রোটি খাতা হুঁ— 'আমি রুটি খাই', কিন্তু অতীতকাল নিলে বলতে হয় 'মৈঁ নে রোটি খাই'— 'আমি রুটি খেয়েছি'। অর্থাৎ অতীতকালে 'আমি' আর কর্তা থাকলুম না, কর্তা হয়ে গেলেন 'রুটি' এবং সেই অনুযায়ী ক্রিয়াপদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে গেল, কারণ 'রোটি' হিন্দিতে স্ত্রীলিঙ্গ ('পানি', 'ঘি', 'দহি', 'মোতি'র মতো মাত্র কয়েকটি ই-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; তাই পুংভূষণ 'দাড়ি' বেচারি স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে গিয়েছে)। তার মানে 'আমা-দ্বারা রুটি খাওয়া হল' বললে অনেকটা হিন্দির ওজনে বলা হল। কিংবা 'পাগলে কি না বলে!' সংস্কৃতে এরকম জিনিস আছে একথা সকলেই জানেন।

কিন্তু এসব সমস্যা অপেক্ষাকৃত সরল। একবার কোন শব্দ কোন লিঙ্গ জানা হয়ে গেলে বাদবাকি জট তিন লহমায় ছাড়িয়ে নেওয়া যায়।

লিঙ্গ নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে কোনও লাভ নেই। আমরা যদি হিন্দিভাষীকে বলি লিঙ্গ তুলে 'লড়কা জাতা', 'লড়কি জাতা' বলা আরম্ভ করে দাও, তবে ইংরেজ বাঙালিকে বলবে, 'আমি গেলুম', 'তুমি গেলুম', 'সে গেলুম', বলতে আরম্ভ কর। তাই ইংরেজ ফরাসি লেখার সময় ফরাসির লিঙ্গবিচার নিয়ে আপত্তি তোলে না। চাঁদপানা মুখ করে, মুখস্থ করে 'শব্দের অন্তে বি, সি, ডি, জি, এল, পি, কিউ, জেড থাকলে শব্দ পুংলিঙ্গ হয়' অবশ্য বিস্তর ব্যত্যয় আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফরাসিতে হিন্দির মতো মাত্র দুটি লিঙ্গ— কিন্তু আমার মনে হয়, ফরাসিতে লিঙ্গবিচার হিন্দির চেয়ে শক্ত।

এটা অবশ্য অসম্ভব নয় যে, হিন্দি বহু বহু প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ার পর প্রাদেশিক অজ্ঞতাবশত লিঙ্গে ভুল হতে আরম্ভ হবে এবং তারই ফলে হয়তো একদিন হিন্দি থেকে লিঙ্গ লোপ পেয়ে যাবে। তবে তার ফললাভ আমরা করতে পারব না সেকথা সুনিশ্চিত।

৬

হিন্দি-বিরোধী সম্প্রদায় বলেন, হিন্দিতে এমন কী সাহিত্য আছে, বাপু, যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হিন্দি শিখতে যাব? উত্তরে হিন্দির দল বলেন, তাবৎ ভারত যদি হিন্দি গ্রহণ করে সে

www.pathagar.com

ভাষাতে সাহিত্যসৃষ্টি আরম্ভ করে তবে দেখতে না দেখতেই হিন্দি ইংরেজি-ফরাসির সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করবে।

এ উত্তরটা ইতিহাসের ধোপে টেকে না। সকলেই জানেন, এককালে লাতিন সর্ব ইউরোপের 'রাষ্ট্রভাষা' ছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও লাতিন ভাষা গ্রিক কিংবা সংস্কৃতের মতো উচ্চাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। তার পর ফরাসি ভাষা লাতিনের আসনটি কেড়ে নিল। কিন্তু ফরাসি সাহিত্য যে বিত্তবান হল সেটা ইংরেজ, জর্মন, ইতালীয়দের ফরাসি সাহিত্য-চর্চা করার ফলে নয়— ফরাসির ব্যাপক সাহিত্য গড়ে উঠেছে ফরাসি যাঁদের মাতৃভাষা একমাত্র তাঁদেরই প্রচেষ্টার ফলে। ঠিক সেই কারণেই প্রশ্ন, কটা বিদেশি ইংরেজিতে লিখে নাম করতে পেরেছে কিংবা কজন ইংরেজ ফরাসি-জর্মনে লিখে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছে? ইংরেজিতে ফিরে যাই; ফরাসির পর এই যে ইংরেজি ভুবনজুড়ে রাজত্ব করল সে ভাষাতেই-বা কটি বিদেশি নাম করতে পেরেছেন? এমনকি, কজন অস্ট্রেলিয়া কিংবা কানাডাবাসী ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের রচনা লিখতে সক্ষম হয়েছে? এ জিনিসটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে কি ভাষাকে টবে পুঁতে বিদেশে পাঠালে সেখানে সে বেঁচে থাকতে সক্ষম হলেও ফল দিতে পারে না? আমেরিকার মতো বিরাট দেশে তো আরও বেশি লেখকের জন্ম নেবার কথা ছিল— একদম পয়লা নম্বরের লেখক সে মহাদেশে জন্মেছেন কজন? অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকাবাসীর মাতৃভাষা ইংরেজি— তারাই যদি এ বাবদে কাহিল তবে যাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয় তাঁরাই-বা কোন গন্ধমাদন উত্তোলন করতে পারবেন?

অথচ দেখুন, লাতিন-ফরাসির একচ্ছত্রাধিপত্য যেমন যেমন লোপ পেল সঙ্গে সঙ্গে জর্মন, ইংরেজি, ইতালি, রুশ, সুইডিশ, ওলন্দাজ সাহিত্য কী অল্প সময়ে কত না কত অদ্ভুত উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। তাই আজ আধমরা লাতিনের জায়গায় জেগে উঠেছে বহুতর ভাষা গরুড়ের ক্ষুধা নিয়ে। তাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বহু ভাষার শিখরতোরণ, মিনার-গম্বুজ দিয়ে গড়া 'ইউরোপীয় সাহিত্য' নামক এক গগনচুম্বী তাজমহল!

ইংরেজ ফরাসি ভাষায় লেখে না, ফরাসি জর্মনে লেখে না, রুশ দিনেমার ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে যায় না, তথাপি এদের ভিতর আন্তরিক সহযোগিতার অন্ত নেই। আজ ফরাসি দেশে যে গঁকুর পুরস্কার পায় কালই তার বই ইংরেজিতে তর্জমা হয়ে যায়— অধিকাংশ স্থলে প্রাইজ পাওয়ার বহু পূর্বেই তর্জমা হয়ে গিয়েছে। আর নোবল পেলে তো কথাই নেই— হুস হুস করে ডজনখানেক ভাষায় খান বিয়াল্লিশ তর্জমা বাজার গরম করে তোলে।

ইংরেজ গেছে, আপদ গেছে। এখন আমি স্বপ্ন দেখি— সুশীল পাঠক তুমিও যোগ দাও— ভারতবর্ষের নানা ভাষায় যেন উত্তম উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং এক সাহিত্যের ভালো লেখা যেন অন্য সব সাহিত্যে অনুবাদ করা হয়। ইংরেজের মতলব ছিল প্রদেশে প্রদেশে যেন ভাবের আদান-প্রদান না হয়। তৎসত্ত্বেও আমরা ইংরেজির মাধ্যমে একে অন্যকে কিছুটা চিনতে পেরেছি কিন্তু বহুস্থানেই অনেকখানি ভুল চেনাশোনা হয়েছে। এবার সৎসাহিত্যের ভিতর দিয়ে আসল সদালাপ আরম্ভ হবে— আমরা এই স্বপ্ন দেখি।

বাঙলা বই হিন্দিতে অনুবাদ হবে, তার পর হিন্দি থেকে তামিলে— এ ব্যবস্থা আমার মনঃপূত হয় না। জ্যামিতি নাকি সপ্রমাণ করতে পারে, ত্রিভুজের যে কোনও এক বাহু যে কোনও দুই বাহুর চেয়ে হ্রস্বতর।

www.pathagar.com

সোজাসুজি পরিচয় সবচেয়ে ভালো পরিচয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিই। একখানি পুস্তকের প্রতি আমার ভক্তিশ্রদ্ধার অন্ত নেই— এ সম্বন্ধে পূর্বেও ইঙ্গিত করেছি— বইখানি স্বর্গীয় লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের 'গীতারহস্য'।

লোকমান্য গীতার এই নবীন ভাষ্য মারাঠিতে লিখেছিলেন এবং তার এক অতি জঘন্য ইংরেজি অনুবাদ আছে—

একদম অখাদ্য অপাঠ্য। কিন্তু বৃদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনে-শেখা, মরচে-ধরা, জাম-পড়া তাঁর মারাঠিজ্ঞানকে ঝালিয়ে নিয়ে বাঙলায় যে অনুবাদখানি করেছেন তার প্রশংসা করতে গিয়ে আমার অক্ষম লেখনী বার বার তার দুর্বলতা নিয়ে লজ্জিত হয়। এ তো অনুবাদ নয়, এ যেন বাঙালি টিলক বাঙলায় লিখেছেন। মারাঠির সঙ্গে মিলিয়ে এ অধম সে পুস্তক বহুবার অধ্যয়ন করেছে, প্রতিবার মনে মনে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, বন্ধুবান্ধবকে সে কেতাব-ই-কুৎব্-মিনার পড়তে অনুরোধ করেছে, এবং 'সত্যপীর' ছদ্মনামে সে গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের জন্য 'আনন্দবাজারে' বিস্তর কান্নাকাটি করেছে।

এই বই পড়লে 'গীতা' নতুন করে চেনা যায় সেকথা অতি সত্য; কিন্তু উপস্থিত আমার নিবেদন, এ গ্রন্থ পড়লে মহারাষ্ট্র দেশকেও চেনা যায়। সংস্কৃত আজ সর্বত্রই মুমূর্ষু, কিন্তু কতখানি সংস্কৃত-চর্চা থাকলে পর এরকম গ্রন্থ বেরুতে পারে সেটা এ বই পড়লে মহারাষ্ট্রের সেই ক্ষুদ্র পল্লি চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেখানে বালক বালগঙ্গাধর সংস্কৃত-চর্চার মাঝখানে মানুষ হলেন। আমার গর্ব, আমি সে গ্রামে গিয়েছি, সে তীর্থ দেখেছি।*

বন্ধ-বাতায়নে

১

ইংরেজকে যত দোষই দিই না কেন, ইংরেজি সভ্যতার যত নিন্দাই করি না কেন, ইংরেজ যে একটা মহৎ কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। একদিক দিয়ে বহু জাত-বেজাত ইংলন্ড দখল করেছে, অন্যদিক দিয়ে ইংরেজ বিশ্বভুবনময় ছড়িয়ে পড়েছে, এবং তার ফলে ইংলন্ডে যে কত প্রকারের ভাবধারা এসে সম্মিলিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এই নানা ঘাত-প্রতিঘাতী পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা, রসবোধ পদ্ধতি, আদর্শানুসন্ধান যখন পৃথকভাবে যাচাই করি তখন বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না যে, ইংরেজ কী করে সবকটাকে এক করে বহুর ভিতর দিয়ে ঐক্যের সন্ধান পেল।

* এ প্রবন্ধ আমি বহু বৎসর পূর্বে, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে লিখি, কিন্তু তখনও রাষ্ট্রভাষা সমস্যা তার রুদ্রতম রূপ ধারণ করেনি বলে— আমি জানতুম একদিন নেবেই নেবে, তাই আগেভাগেই সাবধানবাণী শোনাতে চেয়েছিলুম— (দক্ষিণ ভারতে হিন্দির বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম প্রয়োজনাতীত তাণ্ডব রূপ ধারণ করে— সে তো তার বহু পরের ঘটনা!) আমার প্রিয় পাঠকবর্গ সমস্যাটির গুরুত্ব অনুভব করতে পারেননি। ফলে, উৎসাহাভাবে, আমি প্রবন্ধটিকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারিনি।

www.pathagar.com

কাব্যকলায় ইংরেজের যে খুব বেশি মৌলিকতা গুণ আছে তা নয়— ইয়োরোপীয় সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রকলায় ইংরেজের দান অতি অল্পই— কিন্তু মনের সবকটি জানালা ইংরেজ সবসময়ই খোলা রেখেছে বলে বহু ভ্রমর তার ঘরে এসে নানা গুঞ্জন গান তুলেছে, নানা ফুলের সুবাস তার বৈদগ্ধ্যকে সুবাসিত করে তুলেছে। সে বৈদগ্ধ্যের প্রকাশও তাই সুভাষিত।

অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এই নানা বস্তু অন্তরে গ্রহণ করার ক্ষমতার পিছনে রয়েছে সহিষ্ণুতা। এ গুণটি বড় মহৎ, এবং জর্মন জাতির এ গুণটি নেই বলেই তারা বহু প্রতিভাবান কবি, গায়ক, দার্শনিক পেয়েও কখনওই ইয়োরোপে একচ্ছত্রাধিপত্য করতে পারেনি।

ইংরেজরাজত্বের সময় আমাদের প্রধান কর্ম ছিল ইংরেজকে খেদানোর কল-কৌশল বের করা। আমরা সহিষ্ণু এবং উদার কি না, ছুঁৎবাইগ্রস্ত এবং কূপমণ্ডূক— এ প্রশ্ন জিগ্যেস করবার ফুরসত এবং প্রয়োজন আমাদের তখন ছিল না।

এ প্রশ্ন জিগ্যেস করবার সময় আজ এসেছে।

আমাদের বৈদেশিক রাজনীতি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে আমাদের চরিত্রের ওপর।

আমরা যদি হাম-বড়াই প্রমত্ত হয়ে দেশ-বিদেশে সর্বত্র এরকম ধারা ভাবখানা দেখাই যে কারও কাছে আমাদের কিছু শেখবার নেই, আমাদের পুরাণাদি অনুসন্ধান করলে এটম বম্ বানানোর কৌশল খুঁজে পাওয়া যায়, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির সামনে যে লোক মাথা না নোওয়ায় সে আকাট মূর্খ, আমরা যদি দেশ-বিদেশে আপন সামাজিক জীবনে পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করে, নিমন্ত্রণ রেখে হৃদ্যতাযোগে সকলের সঙ্গে এক না হতে পারি তবে আমরা বৈদেশিক রাজনীতিতে মার খাব— বেধড়ক মার খাব, সে বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

যুদ্ধের সময় কত মার্কিন, ফরাসি, চেক্, বেলজিয়াম আমার কাছে ফরিয়াদ করেছে, বাঙালিদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ তারা পেল না। এক মার্কিন আমাদের একখানা বাজে ইংরেজি কাগজের রবিবাসরীয় পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলল, 'তোমরা যদি এরকম ইংরেজি লিখতে পার তবে বাঙলাতে তোমাদের চিন্তাধারা কত না অদ্ভুত খোলতাই হয় তার সন্ধান পাব কী প্রকারে? বাঙলা শেখবার মতো দীর্ঘকাল তো আর এদেশে থাকব না, তাই অন্তত দু-চারজন গুণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও, দু-দণ্ড রসালাপ আর তত্ত্বালোচনা করে লড়াইয়ের খুনকতলের কথাটা যাতে করে ভুলে যেতে পারি।'

আলাপ করিয়ে দিলুম কিন্তু জমল না।

আমার বাঙালি বন্ধুরা যে জাত মানেন তা নয়, কিংবা মার্কিন ভদ্রলোকটি যে আমাদের ঠাকুরঘরে বসে গোমাংস খেতে চেয়েছিলেন তা-ও নয়, বেদনাটা বাজল অন্য জায়গায়।

আলাপ-পরিচয়ের দুদিন বাদেই ধরা পড়ে, আমাদের মনের জানালাগুলো সব বন্ধ। আমরা করি সাহিত্যচর্চা ও কিঞ্চিৎ রাজনীতি। নিতান্ত যাঁরা অর্থশাস্ত্র পড়েছেন, তাঁদের বাদ দিলে আমাদের রাজনীতিচর্চাও নিতান্ত একপেশে; আর আমাদের নিজেদের দর্শন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, নৃত্য সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অত্যল্প। ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খানিকটে আছে বটে কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যের আর পাঁচটা সম্পদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন।

তাই গালগল্প ভালো করে জমে না। যে আমেরিকান পঁচিশপদী খানা খায় তাকে দুবেলা ডালভাত দিলে চলবে কেন? রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী, গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ করে তো আর দিনের পর দিন কাটানো যায় না।

www.pathagar.com

এরচেয়ে আশ্চর্যের জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। কারণ এখনও আমাদের যেটুকু বৈদগ্ধ্য আছে, যে সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের বেশিরভাগ লোকই অচেতন, সেটুকু গড়ে উঠেছে এককালে আমাদের মনের সবকটি জানালা খোলা ছিল বলে।

শুধু তাজমহল নয়, সমস্ত মোগল-পাঠান স্থাপত্য— জামি মসজিদ, আগ্রা দুর্গ, হুমায়ুনের কবর, সিক্রি এবং তার পূর্বেকার হৌজখাস, কুৎবমিনার সবকিছু গড়ে উঠল ভারতবাসীর মনের জানালা খোলা ছিল বলে; দিল্লি-আগ্রার বাইরে যেসব স্থাপত্যশৈলী রয়েছে, যেমন ধরুন আহমদাবাদ বাঙলা দেশ কিংবা বিজাপুরে সেগুলোও তাদের পরিপূর্ণতা পেয়েছে, এককালে আমাদের মনের দরজা খোলা ছিল বলে; খানসাহেব আব্দুল করীম খান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে চরমে পৌঁছতে পেরেছিলেন তার সোপান নির্মিত হয়েছে ভারতীয় পূর্বাচার্যগণের ঔদার্যগুণে।

এই বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যই নিন। বৌদ্ধচর্যাপদে তার জন্ম, তার গায়ে বৈষ্ণব পদাবলির নামাবলি, 'মঙ্গল'-মুকুট তার শিরে, আরবি-ফারসি শব্দের খানা খেয়েছে সে বিস্তর আর তার কথার ফাঁকে ফাঁকে যে ইংরেজি বোল ফুটে ওঠে তার জ্বালায় তো মাঝে মাঝে প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে।

আর কিছু না হোক আরবি-ফারসির যে দুটো জানালা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি— যেগুলো সামান্য ফাঁক করে দিয়েই কবি নজরুল ইসলাম আমাদের গায়ে তাজা হাওয়া লাগিয়ে দিলেন— সেগুলোই যদি আমরা পুনরায় খুলে ধরি তা হলে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, মিশর, লিবিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সহজ হয়ে যাবে। আফগানিস্তান ও ইরানে ফারসি প্রচলিত আর বাদবাকি দেশ আরবি।

স্বার্থের সন্ধানে একদিন আমরা তাদের কাছে যাব, তারাও আমাদের অনুসন্ধান করবে। তখন যদি তারা আমাদের যতটা চেনে তারচেয়ে তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বেশি হয় তবে আমরাই জিতব।

আর পুবের জানালাও তো খুলে ফেলা সহজ। বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটক তো ভারতের পিটকেই বন্ধ আছে। ত্রিশরণ ত্রিরত্নের রত্নাকর তো আমরাই।

২

পশ্চিমের জানালা খুললে দেখতে পাই, পাকিস্তান ছাড়িয়ে আফগানিস্তান, ইরান, আরব দেশের পর ভূমধ্যসাগর, অর্থাৎ ভারত এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী ভূমি মুসলিম। তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিশাল ভূখণ্ড যদি ধর্মের উদ্দীপনায় ঐক্যলাভ করতে পারে তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-পঞ্চায়েতে এদের উচ্চকণ্ঠ কি মার্কিন, কি রুশ কেউই অবহেলা করতে পারবে না।

তার পূর্বে প্রশ্ন, বহুশত বৎসর ধরে এ ভূখণ্ডে কোনওপ্রকারের স্বাধীন ঐক্য যখন নেই তখন আজ হঠাৎ কী প্রকারে এদের ভিতর একতা গড়ে তোলা সম্ভব? উত্তরে শুধু এইটুকু বলা চলে যে, এ ভূখণ্ডে ইতোপূর্বে আর কখনও এমন কট্টর জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত হয়নি। তাই আজ যদি প্রাণের দায়ে এরা এক হয়ে যায়!

www.pathagar.com

ঐক্যের পথে অন্তরায় কী?

প্রথম অন্তরায় ধর্মই। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যেমন বর্মা-চীন এবং অন্যদিকে মুসলিম ভূমি, ঠিক তেমনি শিয়া ইরানের একদিকে সুন্নি আফগানিস্তান-পাকিস্তান এবং ভারতীয় মুসলমান, অন্যদিকেও সুন্নি আরবিস্তান। শিয়া ইরানের সঙ্গে সুন্নি আফগানিস্তানের মনের মিল কখনও ছিল না, এখনও নেই। একটা উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্যটা খোলসা হবে; আফগান বিদগ্ধজনের শিক্ষাদীক্ষা এবং রাষ্ট্রভাষা ফারসি, আর ইরানের ভাষা তো ফারসি বটেই, তৎসত্ত্বেও কাবুলের লোক কস্মিনকালেও ইরানে লেখা-পড়া শেখবার জন্য যায়নি এবং তারচেয়েও আশ্চর্যের বিষয় যে তারা লেখা-পড়া এবং ধর্ম-চর্চার জন্য আসত ভারতবর্ষে, এখনও আসে, যদ্যপি সকলেই জানে যে, ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশের লোকই ফারসিতে কথা বলে না। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেও তাই ছিল— আফগানিস্তান এককালে বৌদ্ধ ছিল, তার পূর্বে সে হিন্দু ছিল, কিন্তু ইরানি জরথুস্ত্র ধর্ম সে কখনও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেনি।

ইরান-আফগানিস্তানে তাই অহরহ মনোমালিন্য। আফগানিস্তান ও ইরান সীমান্ত নিয়ে দুদিন বাদে বাদে ঝগড়া লাগে ও আজ পর্যন্ত সেসব ঝগড়া-কাজিয়া ফৈসালা করার জন্য কত যে কমিশন বসেছে তার ইয়ত্তা নেই। আফগানিস্তানের পশ্চিমতম হিরাত ও ইরানের পূর্বতম শহর মেশেদে প্রায়ই শিয়া-সুন্নিতে হাতাহাতি মারামারি হয়। আফগান-ইরানেতে বিয়ে-শাদি হয় না, কাবুলরাজ কখনও তেহরান যান না, ইরান-অধিপতিও কখনও কাবুলমুখো হন না। ব্যত্যয় আমানউল্লা খান এবং তাঁর ইরান গমনের সংবাদ পেয়ে আফগানরা কিছুমাত্র উল্লসিত হয়নি।

ওদিকে যেমন ইরানের সঙ্গে আফগানিস্তানের মনের মিল নেই, এদিকে তেমনি আফগান-পাকিস্তানিতে মন-কষাকষি চলছে। সিন্ধুর পশ্চিম পার থেকে আসল পাঠানভূমি আরম্ভ হয়, এবং পূর্ব আফগানিস্তানের উপজাতি সম্প্রদায়ও পাঠান। তাই আফগান সরকারের দাবি, পাকিস্তানের পাঠান হিস্যাটা যেন তার জমিদারিতে ফেরত দেওয়া হয়। এ দাবিটা আফগানিস্তান ইংরেজ আমলে মনে মনে পোষণ করত, কিন্তু ইংরেজের ডাণ্ডার ভয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করত না।

এই তো গেল পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরানের মধ্যে হার্দিক সম্পর্ক বা আঁতাত কর্দিয়ালের কেচ্ছা!

ওদিকে আবার ইরান-আরবে দোস্তি হয় না। প্রথমত ধর্মের বাধা ইরান শিয়া, আরব সুন্নি; দ্বিতীয়ত ইরানিরা আর্য, আরবরা সেমিতি, তৃতীয়ত ইরানের ভাষা ফারসি, আরবের ভাষা আরবি।

কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর বাধা হয়েছে এই যে, খুদ আরব ভূখণ্ড ঐক্যসূত্রে গাঁথা নয়। খুদ আরবভূমি যদি এক হয়ে ইরানের ওপর তার বিরাট চাপ ফেলতে পারত তবে হয়তো ইরান প্রাণের দায়ে ভালো হোক মন্দ হোক, কোনওপ্রকারে একটা দোস্তি করে ফেলত (তা সে-'আঁতাত', 'হার্দিক, হার্টি' অর্থাৎ 'কর্দিয়াল' হল আর না-ই হল) কিন্তু তাবৎ আরব ভূখণ্ডকে এক করবার মতো তাগদ আজ কারও ভিতরেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আরবভূমি আজ ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্‌স্‌-জর্ডান, সউদি আরব, প্যালেস্টাইন ও ইয়েমেন এই সাত রাষ্ট্রে বিভক্ত। তাছাড়া, কুয়েত, হাদ্রামুত, অধুনা 'নির্মিত' আদন ইত্যাদি

www.pathagar.com

ক-গণ্ডা উপরাষ্ট্র আছে সে তো অশুমার! এদের সকলেরই ভাষা ও ধর্ম এক ও তৎসত্ত্বেও এদের ভিতর মনের মিল নেই। এবং সে ঐক্যের অভাব এই সেদিন মর্মন্তুদরূপে সপ্রমাণ হয়ে গেল— যেদিন কথা নেই বার্তা নেই আড়াই গণ্ডাই ইহুদি হঠাৎ উড়ে এসে আরবিস্তানের বুকের উপর প্যালেস্টাইনে জুড়ে বসল। যে আরব হাজারো বৎসর ধরে প্যালেস্টাইনের পাথর নিংড়ে সরস জাফা কমলালেবু বানিয়ে নিজে খেত, দুনিয়াকে খাওয়াত, সেই আরবের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করল আড়াই গণ্ডা 'রণভীরু' ইহুদি! আরব রাষ্ট্রেরা আপন গৃহকলহ নিয়ে মশগুল— ওদিকে প্যালেস্টাইন পয়মাল হয়ে গেল।

লেবাননকে বাদ দিয়ে আরব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক— কারণ লেবানন রাষ্ট্রে মুসলিম-আরবের চেয়ে খ্রিস্টান-আরবের সংখ্যা একটুখানি বেশি; লেবাননের খ্রিস্টান আরবেরা ইহুদিদের সঙ্গে দোস্তি করতে চায় না একথা খাঁটি এবং তারা হয়তো বৃহত্তর আরবভূমির পঞ্চায়েতে হাজিরা দিতে রাজি না-ও হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র এসে-যায় না, কারণ লেবানন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ রাষ্ট্র।

আসল লড়াই দুই পালোয়ানে। তাঁদের একজন আমির আব্দুল্লা, ট্রান্স জর্ডনের রাজা, অন্যজন মক্কা-মদিনা, জিদ্দ-নেজদের রাজা ইবনে সউদ। আব্দুল্লার বংশই ইরাকে রাজত্ব করেন, কাজেই এ দু রাষ্ট্রের মিতালি পাক্কা, কিন্তু ইবনে সউদ একাই একশো। কারণ রাজা বলতে আমরা যা বুঝি সে হিসেবে আজকের দুনিয়ায় একমাত্র তিনিই খাঁটি রাজা। আব্দুল্লার পিছনে রয়েছে ইংরেজের অর্থবল, বাহুর দম্ভ; কিন্তু ইবনে সউদ কারও তোয়াক্কা করে আপন রাজ্য চালান না। মার্কিনকে তেল বেচে তিনি এ যাবৎ কয়েকশো মিলিয়ন ডলার পেয়েছেন বটে, তবু মার্কিন তাঁর রাজত্বে কোনও প্রকারের নাম-প্রভুত্ব কায়েম করতে পারেনি। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি মক্কার কাবা শরিফের তদারকদার— বিশ্বমুসলিম, সেই খাতিরে তাঁকে কিছুটা মানেও বটে।

যেন ঘোঁটলাটা যথেষ্ট প্যাঁচালো নয় তাই মিশরকেও এই সম্পর্কে স্মরণ করতে হয়। কারণ মিশরবাসীর শতকরা নব্বুই জন আরবি কথা বলে, ধর্ম তাদের ইসলাম ও তাদের বেশিরভাগের রক্তও আরব-রক্ত। এবং তারচেয়েও বড় কথা, ইসলাম এবং মুসলিম ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় অছি কাইরোর সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় অল-অজহর আরব। আফগানিস্তান, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, মালয়, জাভা এক কথায় তাবৎ দুনিয়ার কুল্লে ধর্মপ্রাণ মুসলিমের আন্তরিক কামনা অজহরে ধর্মশিক্ষা লাভ করবার।

তদুপরি মিশর প্রগতিশীল এবং বিত্তশালী রাষ্ট্রও বটে।

কিন্তু মিশরের উপরে রয়েছে ইংরেজের সরদার।

সেই হল আরেক বখেড়া। আরবদের ভিতর ঝগড়া-কাজিয়া তো রয়েছেই, তার ওপর আবার আরব হাঁড়ির ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে বসে আছেন ইংরেজ এবং স্বয়ং মার্কিন চতুর্দিকে ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হাঁড়ির কিছুটা স্নেহজাতীয় পদার্থ ইতোমধ্যেই তাঁর লাঙ্গুলকে কিঞ্চিৎ চেকনাই এনে দিয়েছে— সেকথা পূর্বেই নিবেদন করেছি।

তাই সবকিছু ছয়লাপ করে দেয় তেলের বন্যা। ইরান-ইরাকের তেল ইংরেজের আর সউদি আরবের তেল মার্কিনের। পাঠক বলবেন, তা হলেই হল, ব্রাদারলি ডিভিশন, কিন্তু সুশীল পাঠক, আপনি উপনিষদ পড়েননি তাই এরকম ধারা বললেন। ভূমৈব সুখম— অল্পে

সুখ নেই। মার্কিন চায় তৈলযজ্ঞের একক পুরোহিত হতে, আর ইংরেজ চায় মার্কিনকে দরিয়ার সে-পারে খেদাতে।

কী দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম আর কোথায় এসে পড়েছি। কোথায় আফগানিস্তানের প্রস্তরময় শৈলশিখর আর কোথায় স্নেহভরে ডগমগ আরবের পাতালতল। এ সবকিছুর হিসেব-নিকেশ করে পররাষ্ট্রনীতির হদিস বানানো তো সোজা কর্ম নয়।

আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এদেশের বিস্তর লোক আরবি এবং ফারসি উভয় ভাষাই জানেন। ইচ্ছে করলে এঁদের সম্বন্ধে আমরা নিজের মুখেই ঝাল খেতে পারি।

তাই বলি খোলো খোলো জানালা খোলো ॥*

অ্যারোপ্লেন

১

পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম অ্যারোপ্লেন চড়েছিলাম। দশ টাকা দিয়ে কলকাতা শহরের উপর পাঁচ মিনিটের জন্য খুশ সোওয়ারি বা 'জয়-রাইড' নয়, রীতিমতো দুশো মাইল রাস্তা— পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নদী-নালা পেরিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহর যেতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এদেশে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না, কাজেই আমার অভিজ্ঞতাটা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে একরকম অভূতপূর্বই হয়েছিল বলতে হবে।**

তার পর ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গায় প্লেনে গিয়েছি এবং যাচ্ছি। একদিন হয়তো পুষ্পক-রথে করেই স্বর্গে যাব, অর্থাৎ প্লেন-ক্র্যাশে অক্কালাভ করব— তাতে আমি আশ্চর্য হব না, কারণ এ তো জানা কথা, 'ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।' সেকথা থাক্।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে প্রতিবারেই লক্ষ করি, পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্লেনে যে সুখ-সুবিধে ছিল আজও প্রায় তাই। ভুল বলা হয়, 'সুখ-সুবিধে' না বলে 'অসুখ-অসুবিধে' বলাই উচিত ছিল। কারণ প্লেনে সফর করার মতো পীড়াদায়ক এবং বর্বরতম পদ্ধতি মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যেসব হতভাগ্য প্লেনে চড়েন তাঁরা ওকিব-হাল, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। উপস্থিত তাই তাঁদেরই উদ্দেশে নিবেদন, প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যাঁদের এ যাবৎ হয়নি।

রেলে কোথাও যেতে হলে আপনি চলে যান সোজা হাওড়া। সেখানে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেন— ব্যস হয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি বার্থ রিজার্ভ করতে চান তবে অন্য কথা, কিন্তু তবু একথা বলব, হঠাৎ খেয়াল হলে আপনি শেষ মুহূর্তেও হাওড়া গিয়ে টিকিট এবং

* এ প্রবন্ধটি লিখি ১৩৫৬ (১৯৪৯ খ্রি.) সালে— (অর্থাৎ *দেশে-বিদেশে* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময়)। ইতোমধ্যে আরব ভূখণ্ডে রাজার বদলে কোনও কোনও জায়গায় ডিকটেটর হয়েছেন, মিশর থেকে ইংরেজ অনেক দূরে হটে গিয়েছে। নইলে এ প্রবন্ধের মূল দর্শন তখন যা ছিল, আজও তাই। আমি তাই প্রবন্ধের কোনও পরিবর্তন করিনি।

** রচনাটি লেখা হয় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

www.pathagar.com

বার্থের জন্য একটা চেষ্টা দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত কোনওগতিকে একটা বার্থ কিংবা নিদেনপক্ষে একটা সিট জুটে যায়ই।

প্লেনে সেটি হবার যো নেই। আপনাকে তিন দিন, পাঁচ দিন, কিংবা সাত দিন পূর্বে যেতে হবে 'অ্যার আপিসে'। এক হাওড়া স্টেশন থেকে আপনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি, গৌহাটি— এমনকি ব্যান্ডেল-হুগলী হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত যেতে পারেন কিন্তু একই 'অ্যার আপিস' আপনাকে সব জায়গার টিকিট দেয় না— কেউ দেবে ঢাকা আর আসাম, কেউ দেবে মাদ্রাজ অঞ্চল, কেউ দেবে দিল্লির।

এবং এসব অ্যার আপিস ছড়ানো রয়েছে বিরাট কলকাতার নানা কোণে, নানা গহ্বরে। এবং বেশিরভাগই ট্রামলাইন, বাসলাইনের উপরে নয়। হাওড়া যান ট্রামে, দিব্য মা গঙ্গার হাওয়া খেয়ে, অ্যার আপিসে যেতে হলে প্রথমেই ট্যাক্সির ধাক্কা।

অ্যার আপিসে ঢুকেই আপনার মনে হবে ভুল করে বুঝি জঙ্গি দফতরে এসে পড়েছেন। পাইলট, রেডিও অফিসার তো উর্দি পরে আছেনই— এমনকি টিকিটবাবু পর্যন্ত শার্টের ঘাড়ে লাগিয়েছেন নীল-সোনালির ব্যাজ-বিল্লা-রিবন-পট্টি— যা খুশি বলতে পারেন। রেলের মাস্টারবাবু, গার্ড সাহেবরা উর্দি পরেন কিন্তু সে উর্দি জঙ্গি কিংবা লস্করি উর্দি থেকে স্বতন্ত্র— অ্যার আপিসে কিন্তু এমনই উর্দি পরা হয়— খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই— যে আমার মতো কুনো বাঙালি সেটাকে মিলিটারি কিংবা নেভির য়ুনিফর্মের সঙ্গে গুবলেট পাকিয়ে আপন অজানাতে দুম্ করে একটা সলুট মেরে ফেলে।

তার পর সেই উর্দি পরা ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে কথা কইবেন ইংরেজিতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আপনি ধুতি-কুর্তা-পরা নিরীহ বাঙালি তবু ইংরেজি বলা চাই। আপনি না হয় সামলে নিলেন— বিএ, এমএ পাস করেছেন— কিন্তু আমি মশাই, পড়ি মহা বিপদে। তিনি আমার ইংরেজি বোঝেন না, আমি তাঁর ইংরেজি বুঝতে পারিনে— কী জ্বালা! এখন অবশ্য অনেক পোড় খাওয়ার পর শিখে গিয়েছি যে, জোর করে বাঙলা চালানোই প্রশস্ততম পন্থা! অন্তত তিনি আমার বক্তব্যটা বুঝতে পারেন।

তখ্খুনি যদি রোক্কা টাকা ঢেলে দিয়ে টিকিট কাটেন তবে তো ল্যাঠা চুকে গেল কিন্তু যদি শুধু 'বুক' করান তবে আপনাকে আবার আসতে হবে টাকা দিতে। নগদা টাকা ঢেলে দেওয়াতে অসুবিধে এই যে, পরে যদি মন বদলান তবে রিফান্ড পেতে অনেক হ্যাঁপা পোয়াতে হয়। সে না হয় হল, রেলের বেলাও হয়।

কিন্তু প্লেনের বেলা আরেকটা বিদকুটে নিয়ম আছে। মনে করুন আপনি ঠিক সময় দমদমা উপস্থিত না হতে পারায় প্লেন মিস করলেন। রেলের বেলা আপনি তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশ টাকা কিংবা তারও কম কম-বেশি খেসারতির আক্কেলসেলামি দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। প্লেনের বেলা সেটি হচ্ছে না। অথচ আপনি পাকা খবর পেলেন, প্লেনে আপনার সিট ফাঁকা যায়নি, আরেক বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোক পুরো ভাড়া দিয়ে আপনার সিটে করে ট্র্যাভেল করেছেন, অ্যার কোম্পানিও স্বীকার করল কিন্তু আপনি একটি কড়িও ফেরত পাবেন না। অ্যার কোম্পানির ডবল লাভ! এ নিয়ে দেওয়ানি মোকদ্দমা লাগালে কী হবে বলতে পারি নে, কারণ আমি আদালতকে ডরাই অ্যার কোম্পানির চেয়ে একটুখানি বেশি।

www.pathagar.com

টিকিট কেটে তো বাড়ি ফিরলেন। তার পর সেই মহামূল্যবান 'মূল্যপত্রিকা'খানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে প্লেন দমদমা থেকে ছাড়বে দশটার সময়, আপনাকে কিন্তু অ্যার আপিসে 'হাজিরা' দিতে হবে আটটার সময়! বলে কী? নিতান্ত থাড্ডো কেলাসে যেতে হলেও তো আমরা একঘণ্টার পূর্বে হাওড়া যাইনে— কাছাকাছির সফর হলে তো আধঘণ্টা পূর্বে গেলেই যথেষ্ট আর যদি ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ডের (প্লেনে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন ফার্স্টের চেয়েও বেশি— অনেক সময় ফার্স্টের দেড়া!) বার্থ রিজার্ভ থাকে তবে তো আধ মিনিট পূর্বে পৌঁছলেই হয়। আপনি হয়তো প্লেনে থাকবেন পৌনে দু ঘণ্টা, অথচ আপনাকে অ্যার আপিসে যেতে হচ্ছে পাকি দু ঘণ্টা পূর্বে (মোকামে পৌঁছে সেখানে আরও কত সময় যাবে সেকথা পরে হবে)।

এইবার মাল নিয়ে শিরঃপীড়া। আপনি চুয়াল্লিশ (কিংবা বিয়াল্লিশ) পৌন্ড লগেজ ফ্রি পাবেন। অতএব,

'সোনা-মুগ সরু চাল সুপারি ও পান,
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল
আমসত্ত্ব আমচুর—'

ইত্যাদি মাথায় থাকুন, বিছানাটি যে নিয়ে যাবেন তারও উপায় নেই। অথচ আপনি গৌহাটি নেমে হয়তো ট্রেনে যাবেন লামডিং, সেখানে উঠবেন ডাকবাঙলোয়। বিছানা— বিশেষ করে মশারি— বিন কী করে গোঁয়াবেন দিন-রাতিয়া?

বিছানাটা নিলেন কি? না। তার ভেতরে যে ভারী জিনিস কিছু কিছু লুকোবেন ভেবেছিলেন সেটিও তা হলে হল না। অবশ্য লুকিয়ে কোনও লাভ হত না। কারণ জিনিসটিকে ওজন তো করা হতই— মালে আপনি ফাঁকি দিতে পারতেন না।

অ্যার ট্রাভেল করবেন— মাত্র বিয়াল্লিশ পৌন্ড ফ্রি লগেজ— অতএব আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের মতো একটি পিচবোর্ডে কিংবা ফাইবারের সুটকেসে মালপত্র পুরে— সেটার অবস্থা কী হবে মোকামে পৌঁছলে পর বলব— রওনা দিলেন অ্যার আপিসের দিকে, ছাতা-বরসাতি এটাচি হাতে, তার জন্য ফালতো ভাড়া দিতে হবে না (থ্যাঙ্ক ইউ!)। ট্যাক্সি যখন নিতেই হবে তখন সঙ্গে চললেন দু-একজন বন্ধু-বান্ধব। যদিস্যাৎ দৈবাৎ প্লেন মিস্ করেন তবে একটি কড়িও ফেরত পাবেন না বলে দু-দশ মিনিট আগেই রওনা দিলেন এবং অ্যার আপিসে পৌঁছুলেন পাকি সোয়া দু ঘণ্টা পূর্বে— আমার জাত-ভাই বাঙালরা যেরকম ইস্‌টিশানে গাড়ি ছাড়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে যায়।

অ্যার আপিসের লোক হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে আপনার মাল নামাবে। সে লোকটা কুলি-চাপরাসির সমন্বয়— তা হোক্ গে, কিন্তু তার বাই সে 'হিন্দি'তে— রাষ্ট্রভাষাতে— অর্থাৎ তার অউন, অরিজিন্যাল হিন্দিতে কথা বলবেই— যেরকম তার বসের ইংরেজি বলার বাই, অথচ উভয় পক্ষই বাঙালি। আমাদের বঙ্কিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা অজ্ঞান, কিন্তু এই বাঙালা দেশের মহানগরী রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের লীলাভূমিতেই আপিস-আদালত, রাস্তা-ঘাটে 'আ মরি বাংলা ভাষার' কী কদর, কী সোহাগ!

www.pathagar.com

২

কলকাতা বাঙালির শহর। বাঙালি বলতে আপনি-আমি মধ্যবিত্ত বাঙালিই বুঝি, তাই আমাদের অ্যার আপিসগুলোর অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মতো। অর্থাৎ মাসের পয়লা তিন দিন ইলিশ-মুরগি তার পর আলুভাতে আর মসুর ডাল।

ঢাক-ঢোল শাক-করতাল বাজিয়ে যখন প্রথম আমাদের অ্যার আপিসগুলো খোলা হয় তখন সেগুলো বানানো হয়েছিল একদম সায়েবি কায়দায়। বড় বড় কৌচ, বিরাট বিরাট সোফা, এন্তার ফ্যান, হ্যাট-স্ট্যান্ড, গ্লাস-টপ টেবিল, তার উপরে থাকত মাসিক, দৈনিক, অ্যাশট্রে আরও কত কী। সাহস হত না বসতে, পাছে জামাকাপড়ের ঘষায় সোফার চামড়া নোংরা হয়ে যায়— চাপরাসিগুলোর উর্দিই তো আমার পোশাকের চেয়ে ঢের বেশি দুরস্ত, ছিমছাম।

আর আজ? চেয়ারগুলোর উপর যা ময়লা জমেছে তাতে বসতে ঘেন্না করে। ফ্যানগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ছুটির আবেদন জানাচ্ছে, দেওয়ালে চুনকাম করা হয়নি সেই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে— সমস্তটা নোংরা, এলোপাতাড়ি আর আবহাওয়াটা ইংরেজিতে যাকে বলে ড্রেয়ারি, ডিসমল্।

একটা অ্যার আপিসে দেখেছি— ভিতরে যাবার দরজায় যেখানে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে হয় সেখানে যা ময়লা জমেছে তার তুলনায় রান্নাঘরের তেলচিটে কালি-মাখা দরজাও পরিষ্কার। আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, আসুন একদিন আমার সঙ্গে, আপনাকে দেখিয়ে দেব।

এইবারে একটু আনন্দের সন্ধান পাবেন। দশাশয়ী লাশদের যখন ওজন করা হবে তখন আড়নয়নে ওজনের কাঁটাটার দিকে নজর রাখবেন। ১৬০ থেকে তামাসা আরম্ভ হয়, তার পর ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়ে কেউ কেউ মুশতাক আলীর মতো ট্রিপলের কাছাকাছি পৌঁছে যান। আমার বন্ধু '— ' মুখুয্যে যখন একবার ওজন নিতে উঠেছিল তখন কাঁটাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় থপ করে শূন্যে এসে ভিরমি গিয়েছিল। মুখুয্যে আমাকে হেসে বলেছিল, 'কিন্তু ভাড়া তুমি যা দাও আমিও তাই।'

কী অন্যায়!

তার পর আবার সেই একটানা একঘেয়ে অপেক্ষা।

তিন কোয়ার্টার পরে খবর আসবে— মালপত্র সব বাসে তোলা হয়ে গিয়েছে। আপনারা গা তুলুন।

রবিঠাকুর কী একটা গান রচেছেন না?

> আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
> তোমার সুরের সুরে সুর মেলাতে—

অ্যার কোম্পানির বাসগুলো কিন্তু আপিসগুলোর সঙ্গে দিব্য সুর মিলিয়ে বসে আছে। লড়াইয়ের বাজারে যখন বিলেত থেকে নতুন মোটর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কচু-বন থেকে কুড়িয়ে-আনা যেসব বাস গ্রামাঞ্চলে চড়েছিলুম আমাদের অ্যার কোম্পানির বাস প্রায় সেইরকম। ওদেরই আপিসের মতো নোংরা, নড়বড়ে আর সিটগুলোর স্প্রিং অনেকটা আরবিস্তানের উটের পিঠের মতো। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন' হওয়ার শখ যদি

www.pathagar.com

আপনার হয়, আরব দেশ না গিয়ে, তবে এই বাসের যে কোনও একটায় দু-দণ্ডের তরে চড়ে নিন। আপনার মনে আর কোনও খেদ থাকবে না।

মধ্য কলকাতা থেকে দমদম ক-মাইল রাস্তা সে খবর বের করা বোধহয় খুব কঠিন নয়; কিন্তু সেই বাসে চড়ে আপনার মনে হবে :

'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।'

মোটর, ট্যাক্সি, স্টেট বাস, বেসরকারি বাস এমনকি দু-চারখানা সাইকেল-রিকশাও আপনাকে পেরিয়ে চলে যাবে। ত্রিশ না চল্লিশ জন যাত্রীকে এক খেপে দমদম নিয়ে যাবার জন্য তৈরি এই ঢাউস বাস— প্রতি পদে সে জাম্ হয়ে যায়, ড্রাইভার করবে কী, আপনিই-বা বলবেন কী?

দিল্লি থেকে কলকাতা আসবার সময় একবার দেখেছিলুম, যে যাত্রী প্লেনের দোলাতে কাতর হয়নি সে এই বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করেছিল।

দমদমা পৌঁছলেন। এবার প্লেন না-ছাড়া পর্যন্ত একটানা প্রতীক্ষা। সে-ও প্রায় তিন কোয়ার্টারের ধাক্কা।

তবে সমস্তটা অত মন্দ কাটবে না। জায়গাটা সাফ-সুতরো, বইয়ের স্টল আছে, দমদম আন্তর্জাতিক অ্যার-পোর্ট বলে জাত-বেজাতের লোক ঘোরাঘুরি করছে, ফুটফুটে ফরাসি মেম থেকে কালো-বোরকায় সর্বাঙ্গ ঢাকা পর্দা-নশিনী হজযাত্রিণী সবকিছুই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে।

তবে একথাও ঠিক হাওড়ার প্ল্যাটফর্মের তুলনায় এখানে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য কম। প্লেনে যখন মাল আর আপনার জায়গা হবেই তখন আর হুতোহুতি গুঁতোগুঁতি করার কী প্রয়োজন?

তবু ভারতবর্ষ তাজ্জব দেশ। দিনকয়েক পূর্বে দমদম অ্যার-পোর্ট রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক গেলাস জল চাইলুম। দেখি জলের রঙ ফিকে হলদে। শুধালুম, শরবত কি ফ্রি বিলোনো হচ্ছে? বয় বলল, জলের টাঁকি সাফ করা হয়েছে তাই জল ঘোলা এবং মৃদুস্বরে উপদেশ দিল ও-জল না-খাওয়াই ভালো।

শুনেছি, ইয়োরোপের কোনও কোনও দেশে নরনারী এমনকি বাচ্চা-কাচ্চারাও নাকি জল খায় না। দমদমাতে যদি কিছুদিন ধরে নিত্যি নিত্যি টাঁকি সাফ করা হয় তবে আমরা সবাই সায়েব হয়ে যাব। শুধু কি তাই, জলের জন্য উদ্বাস্তুরা উদ্ব্যস্ত করে তুলবে না কলকাতা কর্পোরেশনকে। আমরা সবাই তখন রুটির বদলে কেক খাব। সেকথা থাক্!

কিন্তু দমদম অ্যার-পোর্টের সত্যিকার জৌলুস খোলে যেদিন ভোরে কুয়াশা জমে। কাণ্ডটা আমি এই শীতেই দু-বার দেখেছি।

ভোর থেকে যেসব প্লেনের দমদম ছাড়ার কথা ছিল তার একটাও ছাড়তে পারেনি। তার প্যাসেঞ্জার সব বসে আছে অ্যার-পোর্টে। আরও যাত্রী আসছে দলে দলে, তাদেরও প্লেন ছাড়তে পারছে না। করে করে প্রায় দশটা বেজে গেল। একদিক থেকে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে, অন্যদিক থেকে আসছে, এই স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তখন দমদমাতে যে যাত্রীর বন্যা জাগে, তাদের উৎকণ্ঠা, আহারাদির সন্ধান, খবরের জন্য অ্যার কোম্পানির কর্মচারীদের বার বার একই প্রশ্ন শোধানো, 'ড্যাম ক্যালকাটা ওয়েদার' ইত্যাদি কটুবাক্য, নানারকমের গুজব— কোথায় নাকি কোন প্লেন ক্র্যাশ করেছে, কেউ জানে না— যেসব বন্ধুরা 'সি অফ্'

www.pathagar.com

করতে এসেছিলেন তাঁদের আপিসের সময় হয়ে গেল অথচ চলে গেলে খারাপ দেখাবে বলে কষ্টে আত্মসম্বরণ, প্লেন 'টেক অফ্' করতে পারছে না ওদিকে ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের ফ্রি খাওয়ানো হচ্ছে, কঞ্জুস কোম্পানিগুলো গড়িমসি করছে বলে তাদের যাত্রীদের অভিসম্পাত— আরও কত কী?

লাউড স্পিকার ভোর ছ-টা থেকে রা কাড়েনি। খবর দেবেই-বা কী?

দমদমা নর্থ-পোল হলে কী হত জানিনে—শেষটায় কুয়াশা কাটল। হঠাৎ শুনি লাউড স্পিকারটা কুয়াশায়-জমা গলায় কাশি বার কয়েক সাফ করে জানাল, 'অমুক জায়গার প্যাসেঞ্জাররা অমুক প্লেনে (ডিবিজি, হিবিজি, হিজিবিজি কী নম্বর বলল বোঝা গেল না) করে রওনা দিন।'

আমি না হয় ইংরেজি বুঝিনে, আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু লক্ষ করলুম, আরও অনেকে বুঝতে পারেননি। গোবেচারিরা ফ্যাল ফ্যাল করে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল, অপেক্ষাকৃত চালাকেরা অ্যার আফিসে খবর নিল, শেষটায় যে প্লেন ছাড়বে তার কোম্পানির লোক আমাদের ডেকে-ডুকে জড় করে প্লেনের দিকে রওনা করে দিল— পাণ্ডারা যেরকম গাঁইয়া তীর্থযাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ঠিক গাড়িতে তুলে দেয়।

আমার সঙ্গে পাশাপাশি হয়ে যাচ্ছিলেন এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, 'আজকাল তো অনেক ইংরেজি না-জাননেওয়ালা যাত্রী-ভি প্লেন চড়ছে— তব্ বাঙালি জবান মে প্লেনকা খবর বলে না কাহে?'

ওই বুঝলেই তো পাগল সারে।

৩

দেবরাজকে সাহায্য করে রাজা দুষ্মন্ত যখন পুষ্পক রথে চড়ে পৃথিবীতে ফিরছিলেন, তখন যেমন যেমন তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-পর্বত, গৃহ-অট্টালিকা অতিশয় দ্রুতগতিতে তাঁর চক্ষের সম্মুখে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল। যতদূর মনে পড়ছে, রাজা দুষ্মন্ত তখন তাই নিয়ে রথীর কাছে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

পুণার জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারই উল্লেখ করে আমার কাছে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুষ্মন্তের যুগ পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই খপোত নির্মাণ করতে পারতেন, না হলে রাজা ক্রমাসন্ন পৃথিবীর এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন কী প্রকারে?

তার বহু বৎসর পরে একদা রমন মহর্ষি কোনও একটা ঘটনা বিশদভাবে পরিস্ফুট করার জন্য তুলনা দিয়ে বলেন, উপরের থেকে নিচের দিকে দ্রুতগতিতে আসার সময় পৃথিবীর ছোট ছোট জিনিস যেরকম হঠাৎ বৃহৎ অবয়ব নিতে আরম্ভ করে, ঠিক সেইরকম ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহর্ষির এক প্রাচীন ভক্ত আমার কাছে বসে ছিলেন। আমাকে কানে কানে বললেন, 'এখন তো তোমার বিশ্বাস হল যে, মহর্ষি যোগবলে উড্ডীয়মান হতে পারেন।' আমাকে একথাটি তাঁর বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, আমি একদিন অলৌকিক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফারসি প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করে বলেছিলুম—

'পির্‌হা নমিপরন্দ,
শাগিরদার উন্হারা মিপরানন্দ্।'

অর্থাৎ 'পির (মুরশাদ) ওড়েন না, তাঁদের চেলারা ওঁদের ওড়ান (cause them fly)'।

www.pathagar.com

তার কিছুদিন পরে আমি রমন মহর্ষির পীঠস্থল তীরু-আন্নামলাই (শ্রীআন্নামলাই) গ্রামের নিকটবর্তী অরুণাচল পর্বত আরোহণ করি। মহর্ষি এই পর্বতে প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্জনে সাধনা করার পর তীরু-আন্নামলাই গ্রামে অবতরণ করেন— সাধনার ভাষায় অবতীর্ণ হন।

পাহাড়ের উপর থেকে রমনাশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির সবকিছুই খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তার পর নামবার সময় পাহাড়ের সানুদেশে এক জায়গায় খুব সোজা এবং বেশ ঢালু পথ পাওয়ায় আমি ছুটে সেই পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলুম, আশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির কীরকম অদ্ভুত দ্রুতগতিতে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল।

আমার এ অভিজ্ঞতা থেকে এটা কিছু সপ্রমাণ হয় না যে, পুষ্পক রথ কল্পনার সৃষ্টি কিংবা রমন মহর্ষি যোগবলে আকাশে উড্ডীয়মান হননি, কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে দ্রুতগতিতে অবতরণ করার সময় ভূপৃষ্ঠ কিরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে।

কিন্তু এর উল্টোটা করা কঠিন— কঠিন কেন, অসম্ভব। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে উপরের দিকে যাচ্ছি আর দেখছি পৃথিবীর তাবৎ বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে— এ জিনিস অসম্ভব, কারণ দৌড় মেরে উপরের দিকে যাওয়া যায় না।

সেটা সম্ভব হয় অ্যারোপ্লেন চড়ে।

মাটির উপর দিয়ে প্লেন চলছিল মারাত্মক বেগে, সেটা ঠাহর হচ্ছিল অ্যারড্রোমের দ্রুত পলায়মান বাড়িঘর, হাঙ্গার, ল্যাম্পপোস্ট থেকে; কিন্তু যেই প্লেন শ-পাঁচেক ফুট উপরে উঠে গেল, তখন মনে হল আর যেন তেমন জোর গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছিনে।

উপরের থেকে নিচের দিকে তাকাচ্ছি বলে খাড়া নারকোল গাছ, টেলিগ্রাফের খুঁটি, তিনতলা বাড়ি ছোট তো দেখাচ্ছিলই, কিন্তু সবকিছু যে কতখানি ছোট হয়ে গিয়েছে, সেটা মালুম হল পুকুর, ধানক্ষেত আর রেললাইন দেখে। ঠিক পাখির মতো প্লেনও এক-একবার গা-ঝাড়া দিয়ে দিয়ে এক-এক ধাক্কায় উঠে যাচ্ছিল বলে নিচের জিনিস ছোট হয়ে যাচ্ছিল এক-এক ঝটকায়।

জয় মা গঙ্গা! অপরাধ নিও না মা, তোমাকে পবননন্দনপদ্ধতিতে ডিঙিয়ে যাচ্ছি বলে। কিন্তু মা, তুমি যে সত্যি মা, সেটা তো এই আজ বুঝলুম তোমার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। তোমার বুকের উপর কৃষ্ণাম্বরী শাড়ি, আর তার উপর শুয়ে আছে অগুনতি ক্ষুদে ক্ষুদে মানওয়ারি জাহাজ, মহাজনি নৌকা— আর পানসিডিঙির তো লেখা-জোখা নেই। এতদিন এদের পাড় থেকে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছি বলে হামেশাই মনে হয়েছে, জাহাজ-নৌকা এরা তেমন কিছু ছোট নয়, আর তুমিও তেমন কিছু বিরাট নও, কিন্তু 'আজ কী এ দেখি, দেখি, দেখি, আজ কী দেখি?— ' এই যে ছোট ছোট আণ্ডা-বাচ্চারা তোমার বুকের উপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, তারা তোমার বুকের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য! এদের মতো হাজার হাজার সন্তান-সন্ততিকে তুমি অনায়াসে তোমার বুকের আঁচলে আশ্রয় দিতে পার।

প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডের সূর্যরশ্মি এসে পড়ল মা গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এ-পার ও-পার জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু এ আগুন যেন শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইস্পাত বানিয়ে। সেদিকে চোখ ফিরে তাকাই তার কী সাধ্য? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবের— রুদ্রের— মুখের দিকে তাকাচ্ছি; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ রজত-যবনিকা দিয়ে বদন

www.pathagar.com

আচ্ছাদন করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য? কিন্তু এ আমি সইব কী করে? তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও, রুদ্র। হে পূষণ, আমি উপনিষদের জ্যোতির্দ্রষ্টা ঋষি নই, যে বলব,

'হে পূষণ, সংহরণ
করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো
তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ
তোমার আমার মাঝে এক।'

আমি বলি, তব রশ্মিজাল তুমি সংহরণ কর, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে, তোমার রুদ্র রূপে নয়। তোমার বদন-যবনিকা ঘনতর করে দাও।

তাই হল— হয়তো প্লেন তাঁরই আদেশে পরিপ্রেক্ষিতে বদলিয়েছে— এবার দেখি গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ রজত-আচ্ছাদন আর তার উপর লক্ষ কোটি অলস সুরসুন্দরী সব শুধুমাত্র তাঁদের নূপুর দৃশ্যমান করে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ নৃত্য দেখবার অধিকার আমার আছে কি? রুদ্র না হয় অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেলা নন্দীভৃঙ্গীরা তো রয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাদের সমঝে চলতেন, যদিও ওদিকে পূষণের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল— তাই বলেছেন,

'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি!'

অস্ট্রিচ পাখি যেরকম ভয় পেলে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, আমিও ঠিক তেমনি পকেট থেকে কালো চশমা বের করে পরলুম— এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

শুনি, 'স্যর স্যর!' এ কী জ্বালা! চেয়ে দেখি প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রে'তে করে সামনে লজেঞ্চুস ধরেছে। বিশ্বাস করবেন না, সত্যি ল্যাবেঞ্চুস্! লাল, পিলা, ধলা, হরেক রঙের। লোকটা মশকরা করছে নাকি— আমি ছোঁড়ার বাপের বয়সী— আমাকে দেখাচ্ছে লজেঞ্চুস! তার পর কি ঝুমঝুমি দিয়ে বলবে, 'বাপধন এইটে দোলাও দিকিনি, ডাইনে-বাঁয়ে, ডাইনে— আর— বাঁয়ে!'

এদিকে রসভঙ্গ করল, ওদিকে দেখাচ্ছে লজেঞ্চুসের রস। আমি মহা বিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটা আচ্ছা গবেট তো! শুধাল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়েস; অর থ্যাঙ্ক ইউ, নো।' মনে মনে বললুম, 'তোমার মাথায় গোবর।' বাইরে বললুম, 'নো।' কিন্তু এবারে আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললুম না।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মশাইরা, বেশিরভাগ ধেড়েরাই লজেঞ্চুস নিল এবং চুষল।

তবে কি হাওয়ায় চড়ে এদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আর ওই বাচ্চাদের মাল নিয়ে গলা ভেজাচ্ছে? আল্লায় মালুম।

ওমা ততক্ষণে দেখি সামনে আবার গঙ্গা। কাটোয়ার বাঁক।

প্লেন আবার গঙ্গা ডিঙোল। ওকে তো আর খেয়ার পয়সা দিতে হয় না। কে বলেছে,

'ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ-সংসারে
তাই লোকে কড়ি দিয়ে যেতে পারে ও-পারে' ॥

www.pathagar.com

চরিত্র-বিচার

অঙ্কশাস্ত্রে প্রশ্ন ওঠে না, এ বাবদে আপনার কিংবা আমার অভিজ্ঞতা কী? রসনির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন, আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অল্পবিস্তর যাচাই করে নেয়। কিন্তু যখন কোনও জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয় তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অঙ্কশাস্ত্রের মতো— নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না, ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার ওপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না এবং তখন আবার এ প্রশ্নও ওঠে, যেসব লোক আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এ বাবদে কতখানি।

আমার অতি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অনুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। 'বাঙালিচরিত্র' সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুঁথি-প্রবন্ধ থাকত, তবে তারই ওপর নির্ভর করে আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারত। তা নেই। বস্তুত আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালি সম্বন্ধে অকৃপণ, অকরুণ নিন্দাবাদ থেকে। যথা 'বাঙালি বড় দম্ভী', 'বাঙালি অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না,'— সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়— যেমন শুনবেন, 'বাঙালি মেয়ে ভালো চুল বাঁধতে জানে,' কিংবা 'ব্যবসাতে বাঙালিকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল।'

আমি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লিতেই প্রায় চার বৎসর ছিলুম। চোখ-কান খোলা-খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজব শুনতে হয়।

বাঙালির প্রতি আপনার যদি কোনও দরদ থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি কতকগুলি জিনিস স্পষ্ট বুঝে যাবেন।

(১) সিন্ধি-পাঞ্জাবি দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয়নি। সিন্ধিরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবিরা দিল্লি অঞ্চলে আপন ব্যবসা-বাণিজ্যে দিব্য গোছগাছ ছিমছাম করে নিয়েছে। বরঞ্চ অনেক স্থলে এদের সুবিধেই হয়েছে বেশি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লির কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবিরা গাদা গাদা রেস্তোরাঁ খুলেছে। (ফলে খাস দিল্লির মোগলাই রান্না, সেখান থেকে লোপ পেয়েছে— এখন যা পাবেন সে বস্তু পাঞ্জাবি রান্না, লাহোর অঞ্চলের। দিল্লির রান্নার কাছে সে রান্না আজ পাড়াগেঁয়ে)। এই পাঞ্জাবিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট-গিরমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবেসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে— কিন্তু কখনও হাত পাতেনি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি।

তাই অতিশয় সভয়ে শুধুই, পুব-বাংলার লোক পশ্চিম-বাংলায় এসে অনেক করেছে, কিন্তু পাঞ্জাবি-সিন্ধিরা যতখানি পেরেছে ততখানি কি তাদের দ্বারা হয়েছে? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমার ওপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন। আমি নতশিরে সব উত্তর মেনে নিচ্ছি এবং এ স্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাদের উকিল হয়েই এ আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাদেরই সাফাই গাইবার জন্য। একটু ধৈর্য ধরুন।

www.pathagar.com

(২) চাকরি যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যবসাবিশেষের চাকরি, সেখানে সে চাকরির মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দেশের পক্ষে তা যৎসামান্য। কিন্তু চাকরি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হয়, তখন তার গুরুত্ব অসাধারণ। সকলেই জানেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলি বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এসব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ওপর।

তাই প্রশ্ন, এইসব চাকরি পাচ্ছে কজন বাঙালি? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিত রেশিয়ো কী? পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জনসংখ্যার হিসাবে তারা তাদের ন্যায্য হক্কগত রেশিয়ো পাচ্ছে কি?

দিল্লিবাসী বাঙালিমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবেন, 'না, না, না।' পরশ্রীকাতর অবাঙালিও সে ঐক্যতানে যোগ দেয়। মনে মনে হয়তো বলেন, 'ভালোই হয়েছে।' তা সেকথা থাক।

কেন পায়নি তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালির। কেন পারল না, সে সাফাই গাইবার জন্যই এ আলোচনা। একটু ধৈর্য ধরুন।

(৩) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লির সাংস্কৃতিক মজলিশে বাঙালি এখনও তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শম্ভু মিত্র দিল্লিতে যা ভেল্কিবাজি দেখালেন সে কেরামতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অল্পের ভেতর লিটল থিয়েটার চালায় চাটুয্যে। দিল্লিতে যাবতীয় চিত্রভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালি উকিলবাবুর তাঁবেতে। গাওনাবাজনাতে বাঙাল আলাউদ্দিন সায়েব— রবিশঙ্করের কথা নাই-বা তুললুম। শিক্ষাদীক্ষায় মৌলানা আজাদ সায়েব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবির।

ইতোমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা 'পথের পাঁচালী' দিল্লি ছাড়িয়েও কহাঁ কঁহা মুল্লুকে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বুদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, 'কে করে তবে "নটীর পূজা", কাকে ডাকা যায় "চণ্ডালিকা"র জন্য?'

অর্থাৎ বাঙালির রসবোধ আছে, অর্থাৎ স্পর্শকাতর। তাই সে সেনসিটিভ এবং অভিমানী।

আলিপুর বোমা হামলার সময় শমসুল হক (কিংবা ইসলাম) নামক একজন ইন্সপেক্টর আসামিদের সঙ্গে পিরিত জমিয়ে ভেতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুরা তাই তার উল্লেখ করে বলত, 'হে শমসুল, তুমিই আমাদের শ্যাম, আর তুমিই আমাদের শূল।'

স্পর্শকাতরতাই বাঙালির 'শ্যাম' এবং ওই স্পর্শকাতরতাই তার 'শূল'। শুধুমাত্র কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালি তিন দিনের ভেতর যেরকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে, অন্য প্রদেশের লোক সেরকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিন্ধি পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধন্না দেবে সেখানে বাঙালির নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসার করে খেতে হলে ড্রিল-ডিসিপ্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ ভোঁতা, অনুভব-অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়া-ধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্লিন এ-দুটোর সমন্বয় হয় না? বোধহয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর, তাদের ভেতর ডিসিপ্লিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা— তাই তার ডিসিপ্লিনও ভালো।

এ আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্লিন মেনে নিলে কী মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তার সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে,

www.pathagar.com

'অতখানি ডিসিপ্লিন ভালো নয়।' কিন্তু একথা কাউকে বলতে শুনিনি, 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভালো নয়।'

কোনও জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়, সে তো আমরা জানি, কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানব কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্লিন কতখানি? কিংবা শুধাই, উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন বস্তু— স্পর্শকাতরতা না ডিসিপ্লিন?

গুণীরা বিচার করে দেখবেন ॥

দিল্লি
১৩৬৩

গান্ধীজির দেশে ফেরা

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইতালি থেকে জাহাজে ফিরছিলুম; ঝক্ঝকে চকচকে নতুন জাহাজ, তিলটি পড়লে কুড়িয়ে তোলা যায়। যাত্রী-পালের সুখ-সুবিধার তদারক করনেওয়ালা স্টুয়ার্ডের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। তাকে বললুম, 'এরকম সাফ্সফা জাহাজ কখনও দেখিনি।'

সে বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, "হবে না! নতুন জাহাজ! তার ওপর এই কিছুদিন আগে তোমাদের মহাত্মা গাঁধী এই জাহাজে দেশে ফেরেন।"

আমার অদ্ভুত লাগল। মহাত্মাজি শরীর খুব পরিষ্কার রাখেন জানি, কাপড়-চোপড়, বাড়ি-ঘর-দোরও, কিন্তু এত বড় জাহাজখানাও কি তিনি মেজে ঘষে—? বললুম, 'সে কী কথা?'

স্টুয়ার্ড বলল— 'মশায়, সে এক মস্ত ইতিহাস। এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেছি। ইংরেজ যদি ঘন ঘন গোলটেবিল বৈঠক বসায়, আর তোমাদের ওই গাঁধী যদি নিত্যি নিত্যি এই জাহাজে যাওয়া-আসা আরম্ভ করেন, তবে আর বেশিদিন বাঁচতে হবে না।'

আমি বললুম— 'তোমার কথাগুলো নতুন ঠেকছে। গান্ধীজি তো কাউকে কখনও জ্বালাতন করেন না।'

স্টুয়ার্ড বলল— 'আজব কথা কইছেন স্যার; কে বলল গাঁধী জ্বালাতন করেন? কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি। ব্যাপারটা তা হলে শুনুন—

'ইতালির বন্দরে জাহাজ বাঁধা। দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি-ঘুমোচ্ছি, কাজকর্ম চুকে গেছে, এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই, শুনতে পেলুম কাপ্তেন সাহেব পাগল হয়ে গেছেন। ছুটে গেলুম খবর নিতে। গিয়ে দিখি তিনি দু হাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন আর সাতান্নবার করে এই টেলিগ্রাম পড়ছেন। খবর সবাই জেনে গেছে ততক্ষণে। ইল্ দুচে (অর্থাৎ মুস্সোলিনি) তার করেছেন, মহাত্মা গাঁধী এই জাহাজে করে দেশে ফিরছেন। বন্দোবস্তের যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

www.pathagar.com

'তার পর যা কাণ্ড শুরু হল, সে ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। গোটা জাহাজখানাকে চেপে ধরে ঝাড়ামোছা, ধোওয়া-মাজা, মালিশ-পালিশ যা আরম্ভ হল তা দেখে মনে হল ক্ষয়ে গিয়ে জাহাজখানা কপ্‌পুর হয়ে উবে যাবে। কাপ্তেনের খাওয়া নেই, নাওয়া নেই। যেখানে যাও, সেখানেই তিনি তদারক করছেন। দেখছেন, শুনছেন, শুঁকছেন, চাখছেন, আর সবাইকে কানে কানে বলছেন, "গোপনীয় খবর, নিতান্ত তোমাকেই আপনজন জেনে বলছি, মহাত্মা গাঁধী আমাদের জাহাজে করে দেশে ফিরছেন।" এই যে আমি, নগণ্য স্টুয়ার্ড, আমাকেও নিদেনপক্ষে বাহান্নবার বলেছেন ওই খবরটা যদিও ততদিন সব খবরের কাগজে বেরিয়ে গেছে গাঁধীজি এই জাহাজে যাচ্ছেন; কিন্তু কাপ্তেনের কি আর খবরের কাগজ পড়ার ফুরসত আছে?

'আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের শৌখিন কেবিন-(কাবিন্ দ্য ল্যুক্স)গুলো দেখেছেন? সেগুলো ভাড়া নেবার মতো যখের ধন আছে শুধু রাজা-মহারাজাদের আর মার্কিন কারবারিদের। সেবারে যারা ভাড়া নিয়েছিল তাদের তার করে দেওয়া হল, "তোমাদের যাওয়া হবে না, গাঁধীজি যাচ্ছেন।" আধেকখানা জাহাজ গাঁধীজির জন্য রিজার্ভ— পল্টনের একটা দল যাবার মতো জায়গা তাতে আছে।

'শৌখিন কেবিনের আসবাবপত্র দেখেছেন কখনও? সোনার গিল্টি রুপোর পাতে মোড়া সব। দেয়ালে দামি সিল্ক, মেঝেতে ঘন সবুজ রঙের রবর আর ইরানি গাল্‌চে— ছ ইঞ্চি পুরু— পা দিলে পা বসে যায়। সেগুলো পর্যন্ত সরিয়ে ফেলা হল। ইল্ দুচে বিশেষ করে পালাদ্‌সো ভেনেস্‌সিয়া (অর্থাৎ ভেনিসীয় রাজপ্রাসাদ) থেকে চেয়ার-টেবিল, খাটপালঙ্ক পাঠিয়েছেন। আর সে খাট, মশয়, এমন তার সাইজ, ফুটবলের বি-টিমের খেলা তার উপরে চলে। কেবিনের ছোট দরজা দিয়ে ঢোকে কী করে! আন্ মিস্ত্রি, ডাক্ কারিগর, খোল্ কবজা, ঢোকা খাট। হৈ হৈ ব্যাপার— মার-মার কাণ্ড। খাবারদাবার আর বাদবাকি যা সব মালমশলা জোগাড় হল, সে না হয় আরেক হপ্তা ধরে শুনবেন।

'সব তৈরি। ফিট্‌ফাট্। ওই যে বললেন, তিলটি পড়লে কুড়িয়ে তোলা যায়, ছুঁচটি পড়লে মনে হয় হাতি শুয়ে আছে।

'গাঁধীজি যেদিন আসবেন সেদিন কাগ্‌কোকিল ডাকার আগে থেকেই কাপ্তেন সিঁড়ির কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে, পিছনে সেকেন্ড অফিসার, তার পিছনে আর সব বড়কর্তারা, তার পিছনে বড় স্টুয়ার্ড, তার পিছনে লাইব্রেরিয়ান, তার পিছনে শেফ্ দ্য কুইজিন (পাচকদের সর্দার), তার পিছনে ব্যান্ড-বাদ্যির বড়কর্তা, তার পিছনে— এক কথায় শুনে নিন, গোটা জাহাজের বেবাক কর্মচারী। আমি যে নগণ্য স্টুয়ার্ড, আমার ওপর কড়া হুকুম, নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু। বড় স্টুয়ার্ডের কাছে যেন চব্বিশ ঘন্টা থাকি। আমার দোষ? দু-চারটে হিন্দি কথা বলতে পারি। যদি গাঁধীজি হিন্দি বলেন, আমাকে তর্জমা করতে হবে। আমি তো বলির পাঁঠার মতো কাঁপছি।

'গাঁধীজি এলেন। মুখে হাসি, চোখে হাসি। "এদিকে স্যর, ওদিকে স্যর" বলে কাপ্তেন নিয়ে চললেন গাঁধীজিকে তাঁর ঘর— কেবিন দেখাতে। পিছনে আমরা সবাই মিছিল করে চলেছি। কেবিন দেখানো হল— "এটা আপনার বসবার ঘর, এটা আপনার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসবেন তাঁদের অপেক্ষা করার ঘর, এটা আপনার পড়ার, চিঠিপত্র লেখার ঘর, এটা আপনার উপাসনার ঘর, এটা আপনার খাবারঘর যদি বড় খাস কামরায় যেতে না চান, এটা আপনার শোবারঘর, এটা আপনার কাপড় ছাড়ার ঘর, এটা আপনার গোসলখানা, এটা

www.pathagar.com

চাকরবাকরদের ঘর। আর এ অধম তো আছেই— আপনি আমার অতিথি নন, আপনি রাজা ইমানুয়েল ও ইল্ দুচের অতিথি। অধম, রাজা আর দুচের সেবক।"

'গাঁধীজি তো অনেকক্ষণ ধরে ধন্যবাদ দিলেন। তার পর বললেন, "কাপ্তেন সায়েব, আপনার জাহাজখানা ভারি সুন্দর। কেবিনগুলো তো দেখলুম; বাকি গোটা জাহাজটা দেখারও আমার বাসনা হয়েছে। তাতে কোনও আপত্তি—?"

'কাপ্তেন সায়েব তো আহ্লাদে আটখানা, গলে জল। গাঁধীজির মতো লোক যে তাঁর জাহাজ দেখতে চাইবেন এ তিনি আশাই করতে পারেননি। "চলুন চলুন" বলে তো সব দেখাতে শুরু করলেন। গাঁধীজি এটা দেখলেন, ওটা দেখলেন, সবকিছু দেখলেন। ভারি খুশি। তার পর গেলেন এঞ্জিন-ঘরে। জানেন তো সেখানে কী অসহ্য গরম। যে বেচারিরা সেখানে খাটে তাদের ঘেমে ঘেমে যে কী অবস্থা হয় কল্পনা করতে পারবেন না। আপনি গেছেন কখনও?'

আমি বললুম, 'না।'

'গাঁধীজি তাদের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাপ্তেনের মুখেও হাসি নেই। আমাদের কাপ্তেনটির বড় নরম হৃদয়; বুঝতে পারলেন গাঁধীজির কোথায় বেজেছে।

'খানিকক্ষণ পরে গাঁধীজি নিজেই বললেন, "চলুন কাপ্তেন।" তখন তিনি তাকে বাকি সব দেখালেন। সব শেষে নিয়ে গেলেন খোলা ডেকের উপর। সেখানে কাঠফাটা রোদ্দুর। কাপ্তেন বললেন, 'ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না, স্যার। সর্দিগর্মি হতে পারে।'

'গাঁধীজি বললেন, "কাপ্তেন সায়েব, এ জায়গাটি আমার বড় পছন্দ হয়েছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে এখানে একটা তাঁবু খাটিয়ে দিন, আমি তাতেই থাকব।" কাপ্তেনের চক্ষু স্থির! অনেক বোঝালেন, পড়ালেন। গাঁধীজি শুধু বলেন, "অবিশ্যি আ-প-না-র যদি কোনও আপত্তি না থাকে।" কাপ্তেন কী করেন। তাঁবু এল, খাটানো হল। গাঁধী সেই খোলা ছাদের তাঁবুতে ঝাড়া বারোটা দিন কাটালেন।

'কাপ্তেন শয্যাগ্রহণ করলেন। জাহাজের ডাক্তারকে ডেকে বললেন, "তোমার হাতে আমার প্রাণ। গাঁধীজিকে কোনওরকম জ্যান্ত অবস্থায় বোম্বাই পৌঁছিয়ে দাও। তোমাকে তিন ডবল প্রমোশন দেব।"

আমি অবাক হয়ে শুধালুম,— 'সব বন্দোবস্ত?'

স্টুয়ার্ড হাতের তেলো উঁচিয়ে বলল, 'পড়ে রইল। গাঁধীজি খেলেন তো বক্‌রির দুধ আর পেঁয়াজের শুরুয়া। কোথায় বড় বাবুর্চি, আর কোথায় গাওনা-বাজনা। সব ভণ্ডুল। শুধু রোজ সকালবেলা একবার নেবে আসতেন আর জাহাজের সবচেয়ে বড় ঘরে উপাসনা করতেন। তখন সেখানে সকলের অবাধ গতি— কেবিন-বয় পর্যন্ত।

'কাপ্তেনের সব দুঃখ জল হয়ে গেল বোম্বাই পৌঁছে। গাঁধীজি তাঁকে সই করা একখানা ফোটো দিলেন। তখন আর কাপ্তেনকে পায় কে? আপনার সঙ্গে তাঁর বুঝি আলাপ হয়নি? পরিচয় হওয়ার আড়াই সেকেন্ডের ভিতর আপনাকে যদি সেই ছবি উনি না দেখান তবে আমি এখান থেকে ইতালি অবধি নাকে খৎ দিতে রাজি আছি। হিসাব করে দেখা গেছে ইতালির শতকরা ৮৪.২৭১৯ জন লোক সে ছবি দেখেছে।'

স্টুয়ার্ড কতটা লবণ-লঙ্কা গল্পে লাগিয়েছিল জানিনে; তবে সেই কথাগুলো ঠিক যে— গান্ধীজি ওই জাহাজেই দেশে ফিরেছিলেন— পালাদ্‌সো ভেনেদ্‌সিয়া থেকে আসবাব

www.pathagar.com

এসেছিল, গান্ধীজি এঞ্জিনরুমে গিয়েছিলেন, জাহাজের দিনগুলো কাটিয়েছিলেন তাঁবুতে, আর নিচে নাবতেন উপাসনার সময়ে। অন্য লোকের মুখেও শুনেছি।

তপঃশান্ত

শাস্ত্র তো মানি না আজ। হে তরুণ, তব পদাঘাত
দেশের তন্দ্রারে দিল কী রূঢ় চেতনা! ঝঞ্ঝাবাত
ঘূর্ণিবায়ু দিগ্বিদিক আন্দোলিয়া কী মহাপ্রলয়
নটেশ তাণ্ডব-নৃত্য। হে তরুণ! জয়, জয়, জয়
জয় তব; অর্থহীন মূল্যহীন কে বৃথা শুধায়
কোথায় তোমার লক্ষ্য! বন্যা যবে বাঁধ ভেঙে যায়
মিথ্যা প্রশ্ন কোথা তার গতি। হে তরুণ, হে প্লাবন
নহ তো তটিনী। দু'কূলের শাস্ত্র মিথ্যা। চিরন্তন,
মৃত্যুঞ্জয়, হে নবীন, তোমার ধমনী রক্তবীণ,
অন্তহীন, পঞ্চনদে তার শাখা— সে তো নহে ক্ষীণ
সে তো নহে ধর্মে বর্ণে অবরুদ্ধ।

পঞ্চনদবাসী
কিবা হিন্দু কি মুসলিম্ শিখ আর যত শ্বেতত্রাসী
লালকেল্লা অধিবাসী— পাইল তোমার বক্ষে স্থান;
কে বলে বাঙালি তুমি? তব রক্তপাতে অভিযান
দেশের বিশ্বের অনন্ত মঙ্গল লাগি। হে অভয়,
জয় তব জয়।

প্রদোষের অন্ধকারে
নির্জীব নিদ্রায় ছিনু রুদ্ধ; নৈরাশ্যের কারাগারে
অবিশ্বাসে নিমজ্জিত। হেনকালে শুনি বজ্রশঙ্খ
হে পার্থ-সারথি লক্ষ। লৌহের কীলক পেতে অঙ্ক,
বক্ষ, ভাল, কী আদরে নিলে বরি মৃত্যু তুচ্ছ করি।
জীর্ণ এ জীবন মম পুণ্য হল বারে বারে স্মরি।

ক্ষান্ত রণ?
নহে নহে। শিবের তাণ্ডব অন্তহীন অনুক্ষণ,
কখনও বাহিরে কভু অন্তর্মুখী। এবে শান্ত শিব
লহ সংহরিয়া নিগূঢ় ধ্যানেতে, জ্বালো অন্তর্দীপ

www.pathagar.com

জ্যোতির্ময়, গহন সাধন মাঝে হও নিমজ্জিত
যে-শক্তি সঞ্চয় হল চক্রাকারে করুক প্লাবিত
বৃদ্ধি পেয়ে, গতিবেগে, পর্বত কন্দরে নদী যথা
অবরুদ্ধ, কিন্তু বহির্মুখী।

তার পর এক দিন বাহিরিবে তপঃ সাঙ্গ হলে
শৃঙ্খল হবে মুক্ত— এ প্রলয় অভিজ্ঞতা বলে
হবে না তো উচ্ছৃঙ্খল; অচঞ্চল দৃঢ় পদক্ষেপে
সমাহিত, রিপু শান্ত, স্বর্গ মর্ত্য ত্রিভুবন ব্যেপে
চলিবে হে ত্রিবিক্রম। পরিবে দুর্জয় বরমালা
পূত শান্ত স্নিগ্ধ পুণ্য সর্ব-বিশ্ব-প্রেম গন্ধ ঢালা ॥*

২৫/১১/১৯৪৫

মৃত্যু

বুড়ো হওয়াতে নাকি কোনও সুখ নেই।

আমি কিন্তু দেখলুম, একটা মস্ত সুবিধা তাতে আছে। কোনও কিছু একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটলে— যেমন ধরুন প্রিয়-বিয়োগ— মনকে এই বলে চমৎকার সান্ত্বনা দেওয়া যায়— 'যাক্! এটার তিক্ত স্মৃতি আর বেশিদিন বয়ে বেড়াতে হবে না। মৃত্যু তো আসন্ন।' যৌবনে দাগা খেলে তার বেদনার স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হয় সমস্ত জীবন ধরে। কিংবা, এই যে বললুম, প্রিয়-বিয়োগ— আমার যখন বয়স বছর চৌদ্দটাক তখন আমার ছোট ভাই দু বছর বয়সে ওপারে চলে যায়। কালাজ্বরে। তার ছ মাস পরে ব্রহ্মচারীর ইন্‌জেক্‌শন বেরোয়। তার পর যখন গণ্ডায় গণ্ডায় লোক তারই কল্যাণে কালাজ্বরের যমদূতগুলোকে ঠাস ঠাস করে দুগালে চড় কষিয়ে ড্যাং ড্যাং করে শহরময় চষে বেড়াতে লাগল তখন আমার শোক যেন আরও উথলে উঠল। বার বার মনে পড়তে লাগল, ওই চৌদ্দ বছর বয়সেই আমি তার জন্য কত না ডাক্তার, কবরেজ, বদ্যি, হেকিমের বাড়ি ধন্না দিয়েছিলুম। স্কুল থেকে ফিরেই ছুটে যেতুম

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজ সরকার যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সেনানীদের লালকেল্লায় বিচার শুরু করে, তখন তার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। শাহনওয়াজ-ধীলন-ভোঁসলে দিবসে বাংলার তরুণসমাজ কলকাতায় সেদিন যে সম্পূর্ণ অহিংস প্রতিবাদ আন্দোলনের পরাকাষ্ঠা দেখান তার তুলনা বিরল। অথচ সেই অহিংস আন্দোলনকারীদের ওপর ইংরেজ পুলিশ গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি। এই গুলিবর্ষণের ফলে রামেশ্বর নামে একটি তরুণ ছাত্র নিহত হন। সেদিনের ঘটনার পটভূমিকায় এই কবিতা লিখিত হয়।

www.pathagar.com

মায়ের কাছে; শুধাতুম, 'আজ জ্বর এসেছিল?' মা মুখটি মলিন করে ঘাড় ফিরিয়ে নিতেন। একটু পরে বলতেন, 'আজ আরও বেশি।'

আমি চুপ করে বারান্দায় ভাবতে বসতুম— 'নাহ্, এ কবরেজটা কোনও কর্মের নয়। কিন্তু শহরের এই তো নাম-করা শেষ কবরেজ। তবে দেখি হেকিম সায়েবকে দিয়ে কিছু হয় কি না—'

আপনারা হয়তো ভাবছেন, 'চৌদ্দ বছরের ছেলে করবে এসব ডিসিশন! বাড়ির কর্তারা করছিলেন কী?'

আসলে আমি বুঝতে পারতুম না, কর্তারা, দাদারা এমনকি মা পর্যন্ত অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন, আমার ভাইটি বাঁচবে না। তাঁরা আমাকে সে খবরটি দিতে চাননি। আমার জন্মের পূর্বে আমার এক দাদা আর দিদিও ওই ব্যামোতে যায়।

ডাক্তার-কবরেজরাও আমার দিকে এমনভাবে তাকাতেন যে, তার অর্থটা আজ আমার কাছে পরিষ্কার— তখন বুঝতে পারিনি। তবু তাঁদের এই চৌদ্দ বছরের ছেলেটির প্রতি দরদ ছিল বলে আসতেন, নাড়ি টিপতেন, ওষুধ দিতেন।

ওই দুই বছরের ভাইটি কিন্তু আমাকে চিনত সবচেয়ে বেশি— কী করে বলতে পারব না। আমাকে দেখামাত্রই তার রোগজীর্ণ শুকনো মুখে ফুটে উঠত ম্লান হাসি।

সে হাসি একদিন আর রইল না। আমাকে সে ডরাতে আরম্ভ করল। আমাকে দেখলেই মাকে সে আঁকড়ে ধরে রইত। আমার কোলে আসতে চাইত না। আমার দোষ, আমি কবরেজের আদেশমতো তার নাক টিপে, তাকে জোর করে তেতো ওষুধ খাইয়েছিলুম।

ওই ভয় নিয়েই সে ওপারে চলে যায়।

তার সেই ভীত মুখের ছবি আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, বাকি জীবন ধরে।

* * *

ঠিক এক বছর পূর্বে আমার এক প্রিয়-বিয়োগ হয়। এবারেরটা নিদারুণতর। কিন্তু ওই যে বললুম, এটা আর বেশিদিন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন, আমি এসব করুণ কথা পাড়ছি কেন? বিশ্বসংসার না জানুক, আমার যে কটি পাঠক-পাঠিকা আছেন তাঁরা জানেন আমি হাসাতে ভালোবাসি। কিন্তু 'উল্টোরথে'র পাঠক-পাঠিকারা নিত্য নিত্যি সিনেমা দেখতে যান— সেখানে করুণ দৃশ্যের পর করুণ দৃশ্য দেখে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলেন। ভগ্নহৃদয় নায়ক কীরকম খোঁড়াতে খোঁড়াতে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যান, আর সুস্থহৃদয় নায়িকা কীরকম ড্যাং ড্যাং করে বিজয়ী সপত্নের সঙ্গে ক্যাডিলাক গাড়ি চড়ে হানিমুন করতে মন্টিকার্লো পানে রওনা হন। আমার করুণ-কাহিনী তো তাঁদের কাছে ডাল-ভাত।

তবু আমি ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে এ রচনা আরম্ভ করেছি মহত্তর আদর্শ নিয়ে।

আমাদের সবচেয়ে বড় কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি আর পাঁচটা রসের সঙ্গে হাস্যরসও আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন, অথচ কেউ কি কখনও চিন্তা করে, তাঁর জীবনটা কীরকম বিষাদবহুল ঘটনায় পরিপূর্ণ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য যে কোনও সাধারণজন এরকম আঘাতের পর আঘাত পেলে কিছুতেই আর সুস্থ জীবনযাপন করতে পারত না। অথচ

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথকে দেখলে বোঝা যেত না, কতখানি শোক তিনি বুকের ভিতর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি ভেঙে তো পড়েনইনি, এমনকি তীব্র শোকাবেগে কখনও কোনও অধর্মাচরণও করেননি— অর্থাৎ কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি, যা তাঁর 'ধর্ম' সেটি থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর ঋষিতুল্য সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে— রবির কিন্তু কখনও পা পিছলোয়নি'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের আদর পাননি। কিন্তু তাঁর বয়স যখন ৭/৮ তখন তাঁর দাদা বিয়ে করে আনলেন কাদম্বরী দেবীকে। বয়সে দুজনাই প্রায় সমান। কিন্তু মেয়েদের মাতৃত্ব-বোধটি অল্প বয়সেই হয়ে যায় বলে তিনি তাঁর মায়ের অভাব পূর্ণ করে দেন। এই সমবয়সী দেবরটিকে তিনি দিয়েছিলেন সর্বপ্রকারের স্নেহ ভালোবাসা। প্রভাত মুখো-র *রবীন্দ্রজীবনী*তে তার সবিস্তার পরিচয় পাঠক পাবেন।

এই প্রাণাধিকা বউদিটি আত্মহত্যা করেন রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ। কী গভীর শোক তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর কাব্যে বার বার প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর ভ্রাতা আত্মহত্যা করলে পর বৃদ্ধ কবি তাঁকে তখন সান্ত্বনা দিয়ে একখানি চিঠি লেখেন। সেটিও *রবীন্দ্র-জীবনী*তে উদ্ধৃত হয়েছে। পাঠক পড়ে দেখবেন। কী আশ্চর্য চরিত্রবল থাকলে মানুষ এমনতরো গভীর শোককে আপন ধ্যানলোকে শান্ত সমাহিত করে পরে রসরূপে, কাব্যরূপে নানা ছন্দে নানা গানে প্রকাশ করতে পারে,— পাঠক, শ্রোতার হৃদয় অনির্বচনীয় দুঃখে-সুখে মেশানো মাধুর্যে ভরে দিতে পারে। কবির ক্ষয়ক্ষতি বাঙলা কাব্যের অজরামর সম্পদে পরিবর্তিত হল। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গত হলেন, পিতা গত হলেন— এগুলো শুধু বলার জন্যে বললুম, হিসাব নিচ্ছি না।

তার পর পুরো কুড়ি বছর কাটেনি— আরম্ভ হল একটার পর একটা শোকের পালা।

প্রথমে গেলেন স্ত্রী[১]। তাঁর বয়স তখন ত্রিশ পূর্ণ হয়নি। (বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ের কয়েক মাস পরেই।) তিন কন্যা আর দুই পুত্র রেখে। সর্বজ্যেষ্ঠর বয়স পনেরো, সর্বকনিষ্ঠের সাত। মাধুরীলতা ছাড়া আর সব কটি ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ভার রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য অজিত চক্রবর্তীর ('কাব্যপরিক্রমার লেখক) মাতা কবিজায়ার মৃত্যুর কুড়ি বৎসর পর আমাকে বলেন, মৃণালিনী দেবী তাঁর রোগশয্যায় এবং অসুস্থাবস্থায় তাঁর স্বামীর কাছ থেকে যে সেবা পেয়েছিলেন তেমনটি কোনও রমণী কোনওকালে তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে বলে তিনি জানেন না। তিনি বলেন, স্ত্রীর মানা অনুরোধ না শুনে তিনি নাকি রাত্রির পর রাত্রি তাঁকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন, স্পর্শকাতর কবিকে এই মৃত্যু কী নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁকে জীবনের রহস্য শেখায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪০/৪১— দেখাত ৩০/৩১। অটুট স্বাস্থ্য। কিন্তু তিনি পুনরায় দারগ্রহণ করেননি।

এর কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় মেয়ে রেণুকা বারো বছর বয়সেই পড়ল শক্ত অসুখে। যখন ধরা পড়ল ক্ষয় রোগ, তখন কবি তাঁকে বাঁচাবার জন্য যে কী আপ্রাণ পরিশ্রম আর চেষ্টা দিয়েছিলেন তার বর্ণনা দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। কিছুটা বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং

---

১. ইনি কী রোগে গত হন জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'উদরের পীড়া, খুব সম্ভব এপেন্ডিসাইটিস।' আমি বাল্যকালে গুরুজনদের মুখে শুনেছি সূতিকা।

www.pathagar.com

দিয়েছেন— তখনও তিনি জানতেন না, মেয়েটি কিছুদিন পরে তাঁকে ছেড়ে যাবে। অসুস্থ অবস্থায়ও এই মেয়েটির প্রাণ ছিল আনন্দরসে চঞ্চল। পিতা-কন্যায় গাড়িতে করে স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাবার সময় যে মধুর সময় যাপন করেন তার কিছুটা আভাস পাঠক পাবেন 'পলাতকা'র 'ফাঁকি' কবিতাতে।

(বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জর জর
তখন বললে 'হাওয়া বদল করো'।

পাঠক, এই 'তখন' শব্দটির দিকে লক্ষ রাখবেন। রোগের প্রথম অবস্থায় নয়— যখন মৃত্যু আসন্ন। এ নিদারুণ অভিজ্ঞতা ক্ষয়-রুগীর অনেক আত্মীয়-স্বজনের হয়েছে।)

দু বছরের ভিতরই দুইটি অকালমৃত্যু— অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন, যেন মানুষকে নিছক পীড়া দেবার জন্য ভগবান তাকে পীড়া দিচ্ছেন। তার পর চার বছর যেতে না যেতেই সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তেরো বছর বয়সে এক বন্ধুর সঙ্গে ছুটিতে বেড়াতে যায় মুঙ্গেরে। 'সেইখানে শমীন্দ্রের কলেরা হয়; কবি টেলিগ্রাফ পাইয়া কলিকাতা হইতে মুঙ্গের চলিয়া গেলেন।' রবীন্দ্রনাথই এই সময়ের এক চিঠিতে লিখছেন, 'যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল, তাহার পরে আর ফিরিল না।'

অনেকের মুখেই শুনেছি, শমীন্দ্র তার পিতার সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন, সে 'আকৃতিতে প্রকৃতিতে' পিতার অনুরূপ ছিল।

ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্বে ওইদিনে কলিকাতায় শমীন্দ্রের মায়ের মৃত্যু হয়।'— প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

কয়েক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পুত্রের স্মরণে যে কবিতা লেখেন তাতে আছে,

'বিজু যখন চলে গেল মরণপারের দেশে
বাপের বাহু-বাঁধন কেটে।
মনে হল, আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে।'

আবার অকালমৃত্যু! শুধু ভগবান জানেন তাঁর ভূমণ্ডল ব্যবস্থায়, ত্রিলোক নিয়ন্ত্রণে 'ইন হিজ স্কিম অব থিংস'-এর কী প্রয়োজন?'[২] শমী আমাদের পুত্র নয়, কিন্তু এ কবিতাটি পড়ে কার না 'বুক ফাটে'? এ কবিতাটি আমি জীবনে মাত্র একবার পড়েছি। দ্বিতীয়বার পড়তে পারিনি।

এর পর দশ বছর কাটেনি। সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান, বড় মেয়ে মাধুরীলতার হল ক্ষয়রোগ। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, আমিও শুনেছি, মাধুরীর স্বামীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সদ্ভাব ছিল না (যদিও তাঁর পিতার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল বলেই এ বিয়ে হয়। কবি বিহারী চক্রবর্তী ছিলেন কাদম্বরী দেবীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি)। রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা মেয়েকে দেখতে যেতেন বন্ধ গাড়িতে করে। জামাই তখন আদালতে। সমস্ত দুপুর মেয়েকে গল্প শোনাতেন। হয়তো-বা কবিতা পড়তেন। বোধহয় তারই দু-একটি 'পলাতকা' (নামকরণ অবশ্য পরে হয়) বইয়ে স্থান পেয়েছে।

---

২. রবীন্দ্রনাথও পুত্রহারা-মাতা তাঁর কন্যার দিকে তাকিয়ে শুধিয়েছেন, 'তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে/ নির্বাক অপার নির্বাসনে।/ অশ্রুহীন তোমার নয়নে/ অবিরাম প্রশ্ন জাগে যেন— / কেন, ওগো কেন!'/— দুর্ভাগিনী, *বীথিকা*, পৃ. ৩০৯

www.pathagar.com

একদিন দুপুরে বাড়ির সামনে পৌঁছতেই বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। কবি কোচম্যানকে গাড়ি ঘোরাতে হুকুম দিলেন। বাড়িতে প্রবেশ করলেন না। আমি শুনেছি, এই মেয়ে নাকি বড় উৎসুক আগ্রহে পিতার লেখার জন্য প্রতীক্ষা করতেন। ভাগলপুরে, কলকাতায়।

বহু বহু বৎসর পর এঁর সখী ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবী লেখেন, (উভয়ের শ্বশুরবাড়ি ভাগলপুর— বোধহয় সেইসূত্রে পরিচয় ও সখ্য) মেয়ের স্মরণে কবির চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বোধহয় 'পলাতকা'র 'মুক্তি' কবিতায় এ মেয়ের কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়।

* * *

পূর্বেই বলেছি, মাধুরীলতার রোগশয্যায় কবি তাঁকে গল্প বলতেন। এবং শেষের দিকে বোধহয় বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন যে এ মেয়েও বাঁচবে না। তখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন, তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, এঁরা সব তাঁর মায়ার বন্ধন কেটে সময় হবার বহু পূর্বেই পালিয়ে যাচ্ছেন— এঁরা সব 'পলাতকা'। তাই মাধুরীলতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই বেরুল 'পলাতকা'। এই বইয়ের ওপর মাধুরী, রেণুকা, শমী তিনজনের ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। আরও হয়তো কয়েক জনের ছাপ রয়েছে, কিন্তু তাঁরা হয়তো তাঁর পরিবারের কেউ নয়, তাই তাঁদের ঠিক চেনা যায় না।

'পলাতকা'র সর্বশেষের কবিতাটিতে আছে,— কবিতাটির নাম 'শেষ প্রতিষ্ঠা'—

'এই কথা সদা শুনি, "গেছে চলে, গেছে চলে"
তবু রাখি বলে
বোলো না 'সে নাই'।

* * *

"আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে "আছে" "নাই" পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।'

এই কবিতাটি কবির সর্ব পলাতকার উদ্দেশে লেখা। কিন্তু প্রশ্ন, 'আছে' ও 'নাই' দুটোই একসঙ্গে অস্তিত্ব রাখে কী প্রকারে? কবি এর উত্তর দিলেন— অবশ্য সে উত্তরে সবাই সন্তুষ্ট হবেন কি না জানিনে— তাঁর জীবনের শেষ শোকের সময়।

'পলাতকা'র সব কটি পালিয়ে যাবার পর কবির রইলেন, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা। এই মীরাদির একটি পুত্র ও কন্যা। এ নাতিটিকে রবীন্দ্রনাথ যে কীরকম গভীর ভালোবাসা দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিলেন সেকথা ওই সময়ে আশ্রমবাসী সবাই জানে। একটু ব্যক্তিগত কথা বলি— নীতু যদিও আমার চেয়ে বছর নয়েকের ছোট ছিল তবু হস্টেলে সে প্রায়ই আমার ঘরে আসত। ভারি প্রিয়দর্শন ছিল সে। মাঝে মাঝে ফিনফিনে ধুতি কুর্তা পরে এলে মানাত চমৎকার— আমরা শুধাতুম, কে সাজিয়ে দিল রে?

সে উত্তর না দিয়ে শুধু মিট্ মিট্ করে হাসত। চট্টগ্রামের জিতেন হোড় বলত, 'নিশ্চয়ই দাদামশাই'। আমি বলতুম, 'মা'। (আশা করি, এ লেখাটি মীরাদি বা তাঁর মেয়ে 'বুড়ি'র চোখে পড়বে না— তাঁদের শোক জাগাতে আমার কতখানি অনিচ্ছা সেকথা অন্তর্যামী জানেন।) সেই নীতু গেল ইয়োরোপে। ক্ষয়রোগে মারা গেল ১৯/২০ বছর বয়সে। এই শেষ শোকের বর্ণনা দিতে কারওই ইচ্ছা হবে না। কবির বয়স তখন ৭১। একে নিজের শোক, তার ওপর কন্যা— পুত্রহারা মাতার শোক।

www.pathagar.com

শুধু একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করি— শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' থেকে নেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন বরানগরে মহলানবিশদের সঙ্গে। বন্ধু এন্ড্রুজ সায়েবের কাছ থেকে চিঠি পেলেন, নীতুর শরীর আগের চেয়ে একটু ভালো।

'পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজে রয়টারের টেলিগ্রামে দেখলাম, ছ দিন (দু দিন?) আগে ৭ আগস্ট জার্মানিতে নীতুর মৃত্যু হয়েছে।'

এ খবরটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাঙা যায় কী প্রকারে?'

'শেষে স্থির হল খড়দায় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে টেলিফোন করে আনিয়ে আমরা চারজনে একসঙ্গে কবির কাছে গেলে কথাটা বলা হবে। প্রতিমাদিরা এলে সবাই মিলে কবির ঘরে গিয়ে বসা হল। রথীন্দ্রনাথকে কবি প্রশ্ন করলেন, "নীতুর খবর পেয়েছিস, সে এখন ভালো আছে, না?" রথীবাবু বললেন, "না, খবর ভালো না।" কবি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, "ভালো? কাল এন্ড্রুজও আমাকে লিখেছেন যে নীতু অনেকটা ভালো আছে। হয়তো কিছুদিন পরেই ওকে দেশে নিয়ে আসতে পারা যাবে।"[৩] রথীবাবু এবার চেষ্টা করে গলা চড়িয়ে বললেন, "না, খবর ভালো নয়। আজকের কাগজে বেরিয়েছে।" কবি শুনেই একেবারে স্তব্ধ, রথীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। একটু পরেই শান্তভাবে সহজ গলায় বললেন, "বৌমা আজই শান্তিনিকেতন চলে যান, সেখানে বুড়ি একা রয়েছে। আমি আজ না গিয়ে কাল যাব, তুই আমার সঙ্গে যাস"।'

নীতুর মা জর্মনি গিয়েছিলেন পুত্রের অসুস্থতার খবর পেয়ে। তিনি যেদিন বোম্বাই পৌঁছবেন, তার কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বোম্বাইয়ের ঠিকানায় চিঠি লেখেন। তাতে সেই 'আছে' ও 'নাই'-য়ের উত্তর আছে। তাতে এক জায়গায় তিনি লেখেন, 'যে রাত্রে শমী গিয়েছিল,[৪] সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও পিছনে যেন না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেছি, আর তো আমার কোনও কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি, সেখানে তার কল্যাণ হোক। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো-বা পৌঁছয়— নইলে ভালোবাসা এখনও টিকে থাকে কেন?'

এই সেই মূল কথা। সে নেই কিন্তু আমার ভালোবাসার মধ্যে সে 'আছে'। বার বার নমস্কার করি গুরুকে, গুরুদেবকে। বার বার দূরদৃষ্টের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে তিনি কাতর হয়েছেন, কিন্তু কখনও পরাজয় স্বীকার করেননি।

---

৩. এর আগের দিন রথীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত মহলানবিশকেও বলেন, 'কাল এন্ড্রুজের চিঠি পেয়ে অবধি নীতুর জন্য মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, যদিও তিনি লিখেছেন, ও এখন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সাহেব লিখেছেন, নীতুকে হয়তো শিগ্‌গিরই দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তা হলে ভাবছি তাকে একটা কোনও ভালো জায়গায় অনেকদিন ধরে রেখে দেব। ভাওয়ালি কি কোনও পাহাড়ে বেশ কিছুদিন থাকলেই সেরে উঠবে।' পৃ. ২৮

৪. এর মৃত্যুর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এবং আরও বলেছি মাতা ও পুত্র যান একই দিনে, এবং আশ্চর্য, দাদামশাই ও নাতি যান একই দিনে। (২২ শ্রাবণ)।

www.pathagar.com

এবং পাঠক-পাঠিকাদের উপদেশ দিই, প্রিয়-বিয়োগ— এমনকি প্রিয়বিচ্ছেদ— হলে তাঁরা যেন উপরে বর্ণিত এই চিঠিখানা পড়েন। এ চিঠি মুক্তপুরুষের লেখা চিঠি নয়। কারণ গীতায় আছে মুক্তপুরুষ 'দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন'। রবীন্দ্রনাথ দুঃখে আমাদের মতোই কাতর হতেন— হয়তো-বা আরও বেশি; কারণ তাঁর দিলের দরদ, হৃদয়ের স্পর্শকাতরতা ছিল আমাদের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি— কিন্তু তিনি পরাজয় মানতেন না। আমরা পরাজয় মেনে নিই। এ চিঠি যদি একজনকেও পরাজয়-স্বীকৃতি থেকে নিষ্কৃতি দেয় তবে অন্যলোকে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হবেন।

সহৃদয় পাঠক, তুমি সিনেমা দেখতে যাও। সেখানে যদি কোনও ছবিতে তোমার হিরোর জীবনে পরপর এতগুলো শোকাবহ ঘটনা ঘটত তবে তুমি বলতে, 'এ যে বড্ড বাড়াবাড়ি। এ যে অত্যন্ত অবাস্তব, আন্‌রিয়ালিস্টিক।'

তাই বটে। যা জীবনে বাস্তব তা হয়ে যায় সিনেমায় অবাস্তব! আশ্চর্য! আমার কাছে আবার সিনেমাটা অত্যন্ত অবাস্তব *ঠেকে*।

তাই সিনেমাওয়ালাদের কাছেই রবীন্দ্র-জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর অধ্যায় তুলে ধরলুম। নইলে 'রবীন্দ্রনাথের শোক ও কাব্যে তার প্রতিচ্ছবি' এ জাতীয় ডক্টরেট থিসিস লেখবার বয়স আমার গেছে। আর তাই এ 'রম্যরচনাটি' আরম্ভ করেছি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। কারণ আমার জীবন আর তোমাদের পাঁচজনের জীবনের লেশমাত্র পার্থক্য নেই। তফাৎ যদি থাকে, তবে শুধু এইটুকু যে, তোমরা মনোবেদনা গুছিয়ে বলতে পার না বলে গুমরে গুমরে মরো বেশি। কিন্তু তোমাদের এই বলে সান্ত্বনা জানাই, যতদিন তোমার প্রিয়জন তোমার প্রতি সহৃদয় ততদিন তোমার না বলা সত্ত্বেও সে তোমার হৃদয়ের সব কথাই বোঝে। আর যেদিন তার হৃদয় বিমুখ হয়ে যায়, সেদিন যতই গুছিয়ে বল না কেন, সে শুনবে না। কাজেই না-বলতে পারাটা তোমাকে গুছিয়ে-বলতে-পারার বিড়ম্বনা থেকে অন্তত বাঁচাবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কত না অশ্রুজল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্নেহভাজন শ্রীমান ফণী দেব ও আমাদের উভয়ের সখা
শ্রীমান সাগরময় ঘোষের করকমলে—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এই পুস্তকের সব লেখাই 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বেরোয়। সেসময় আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অগণিত চিঠি আমার কাছে আসে। তাদের অনেকগুলি 'কত না অশ্রুজলে' ভরা ছিল। একাধিক মাতা, ভগ্নী আমাকে পুত্রের, ভ্রাতার শেষ পত্র পাঠান। বস্তুত যখন 'দেশ' পত্রিকায় অধমের 'দেশে-বিদেশে' প্রকাশিত হয় তখনও এত পত্র আমি পাইনি।

সেসব রচনা আমার বান্ধবী অখণ্ড-সৌভাগ্যবতী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নিরুপমা ও তাঁর সিঁথির সিঁদুর শ্রীমান্ পশুপতি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে সঞ্চয় করে, কেটে ছেঁটে পুস্তকরূপে প্রকাশ করলেন। ওঁদের প্রতি আমি কী সাধুবাদ জানাব! প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন দীর্ঘজীবী হয়ে উত্তমোত্তম লেখকের সম্পাদনা করেন।

পরিশেষে শ্রীমান্ ব্রজকিশোরের কল্যাণ কামনা করি। শঙ্কর তাকে জয়যুক্ত করুন।

সৈয়দ মুজতবা আলী

কলকাতা

নববর্ষ ১৩৭৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কত না অশ্রুজল

১

একখানা অপূর্ব সংকলনগ্রন্থ অধীনের হাতে এসে পৌঁছেছে। পুনরায়, বার বার বলছি অপূর্ব, অপূর্ব! এ বইখানিতে আছে, মানুষের আপন মনের আপন হৃদয়ের গভীরতম আত্মপ্রকাশ। কারণ মৃত্যুর সম্মুখীন মানুষ অতি অল্প অবস্থাতেই মিথ্যা কয় বা সত্য গোপন করে। এবং একটি দেশের একজন মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী নয়; বহু দেশের বহুজনের। ফ্রান্স, জর্মনি, ভারতবর্ষ, বেলজিয়াম, হলান্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, ফিনল্যান্ড, ইংল্যান্ড, চীন, জাপান, কানাডা ইত্যাদি ইত্যাদি— বস্তুত হেন দেশ প্রায় নেই যার বহু লোকের বহু কণ্ঠস্বর এই গ্রন্থে নেই।

যুদ্ধের সময় সৈন্য তো জানে না কোন মুহূর্তে তার মৃত্যু আসবে। সে যখন ওই সময় ট্রেন্‌চে বসে আপন মা, বউ, প্রিয়া বা বোনকে চিঠি বা তাঁদের জন্যে ডাইরি লেখে তখনও সে মিথ্যা কথা বলছে, এ সন্দেহ করার মতো সিনিক বা ব্যঙ্গপ্রবণ অবিশ্বাসী আমি নই।

এ বইয়ে আছে গত বিশ্বযুদ্ধে যারা জড়িয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সৈনিকরূপে একে-অন্যকে নিধন করতে হয়েছিল, তাদের শেষ চিঠি, ডাইরির শেষ পাতা। এ বিশ্বযুদ্ধ থেকে অল্প দেশই রেহাই পেয়েছিল সেকথা আমরা জানি। শান্তিকামী ভারত, এমনকি যুদ্ধে যোগদান না করেও নিরীহ এস্‌কিমোও এর থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

এবং শুধু তাদেরই লেখা নেওয়া হয়েছে যারা এ যুদ্ধে নিহত হয় বা যুদ্ধে মারাত্মকরূপে আহত হওয়ার ফলে যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই মারা যায় কিংবা যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে শান্তিপূর্ণ দেশে বাস করার সময় যুদ্ধের বীভৎসতা, আত্মজন বিয়োগের শোকে কাতর হয়ে আত্মহত্যা করে।

কিন্তু এত দীর্ঘ অবতরণিকা করার কণামাত্র প্রয়োজন নেই। দু-একটি চিঠির অনুবাদ পড়ে সহৃদয় পাঠক বুঝে যাবেন, এ অবতরণিকা কতখানি বেকার।

গত যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হলে পর জর্মন সৈন্যরা সেখানে কায়েম হয়ে দেশটাকে 'অকুপাই' করে। সঙ্গে সঙ্গে বহু ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গড়ে তোলে 'আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্ট'। তারা মোকা পেলে জর্মন সৈন্যকে গুলি করে মারে, রেললাইন, তাদের বন্দুক-কামানের কারখানা ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় এবং আরও কত কী! এ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের আপন দেশেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অজানা নয়।

www.pathagar.com

এই আন্দোলনে যোগদান করার ফলে একটি ষোল বছরের ফরাসি বালক জর্মনদের হাতে ধরা পড়ে এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্বে সে তার জনক-জননীকে একখানি চিঠি লেখে। এবারে আমি সেটি অনুবাদ করে দিচ্ছি :

'...আমার প্রতি যাঁরা সহানুভূতিশীল, বিশেষ করে আমার আত্মীয় ও বন্ধুদের আমার ধন্যবাদ জানিও; তাদের বলো যে (মাতৃভূমি) ফ্রান্সের প্রতি আমার অনন্ত বিশ্বাস। আমার হয়ে ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, কাকারা, মাসিরা ও ওদের মেয়ে— আমার বোনেদের প্রগাঢ় আলিঙ্গন করো। আমার পাদ্রিসাহেবকে বলো আমি বিশেষ করে তাঁকে ও তাঁর আত্মজনকে স্মরণে রেখেছি; আমি মসেন্নোর (প্রধান পাদ্রি)-কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আমাকে যেভাবে গৌরবান্বিত করেছেন, আশা করি, আমি যে তার উপযুক্ত পাত্র সেটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। মৃত্যুর সময় আমি আমার স্কুলের বন্ধুদেরও আদর-সম্ভাষণ জানাই। আমার ক্ষুদ্র পুস্তক সঞ্চয়ন (লাইব্রেরিটি) পিয়েরকে,[১] আমার ইস্কুলের বই বাবাকে, আমার অন্যান্য সঞ্চয়ন আমার সবচেয়ে প্রিয় আমার মাকে দিয়ে গেলুম। আমার বাসনার ধন স্বাধীন ফরাসিভূমি এবং সুখী ফ্রান্সবাদী দম্ভী ফ্রান্স, পৃথিবীর সর্বাগ্রণী নেশন ফ্রান্স আমার কাম্য নয়; বরঞ্চ কর্মনিষ্ঠ ফ্রান্স,[২]— কর্মনিষ্ঠ এবং আত্মমর্যাদাশীল ফ্রান্স। আমি প্রার্থনা করি ফ্রান্সবাসী যেন সুখী হয়— সেইটেই সবচেয়ে বড় সত্য। তারা যেন শেখে জীবনে শিবম্‌কে আলিঙ্গন করতে।[৩]

আমার জন্য তোমরা কোনও চিন্তা কর না; জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার সাহস ও সহজ রসবোধ (গুড হিউমার) বজায় রেখে যাব; আমি যাবার সময় সেই 'সাঁব্‌র্-এ-ম্যজ্'[৪] গানটি গেয়ে যাব, যেটি তুমি, আমার আদরের মা আমাকে শিখিয়েছিলে।

পিয়েরকে[৫] শাসনে রেখ কিন্তু স্নেহের সঙ্গে। আর লেখাপড়ার কাজ চেক্ আপ্ করে নিও এবং সে যেন ঠিকমতো খাটে[৬] তার ওপর জোর দিও। তাকে আলস্য-অবহেলা করতে দিও না। আমি যেন তার শ্লাঘার পাত্র হই। সেপাইরা আসছে আমাকে নিয়ে যেতে। আমার

একাধিক পাঠক অনুযোগ করেছেন, অধমের রচনা ইদানীং বড্ডই টীকা কণ্টকাকীর্ণ। আমার নিবেদন, টীকা না পড়লে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। যাঁরা নিতান্ত একটু-আধটু আশকথা-পাশকথা জানতে চান কিংবা এই আক্রাগণ্ডার বাজারে 'বই' কিনেছেন বলে প্রতিটি পিঁপড়ে নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে গুড় বের করতে চান— এ টীকা শুধু তাদের জন্য।

১. পিয়ের খুব সম্ভব পত্রলেখক আঁরির (Henri=Henry) ছোট ভাই। তাই পিয়েরকে তার ছোটখাটো পুস্তক সঞ্চয়ন দিয়ে যাচ্ছে।
২. ফ্রান্সে যুদ্ধ হবার পর অনেকেই বিশ্বাস করত, ফরাসিদের আলসেমিই তাদের ওই পরাজয়ের কারণ।
৩. 'শিবম্‌কে আলিঙ্গন'— এটা মনে হচ্ছে, জর্মন কবি গ্যোটে থেকে উদ্ধৃত। পত্রলেখক আঁরি জর্মনদের হাতে নিহত হচ্ছে, অথচ সে বিশ্বপ্রেমিক বলে বিশ্বকবি— জর্মন-গ্যোটেকে উদ্ধৃত করছে।
৪. সাঁব্‌র্ এবং ম্যজ্ ফ্রান্সের দুই নদী। আমাদের যেরকম গঙ্গা-যমুনা। 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' তুলনীয়।
৫. এক নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।
৬. দুই নম্বর ও পাঁচ নম্বর দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

হাতের লেখা হয়তো অল্প একটু কাঁপা-কাঁপা হয়ে গেল; তার কারণ পেনসিলটি বড্ড ছোট্ট; মৃত্যুভয় আমার আদৌ নেই; আমার আত্মা অত্যন্ত শান্ত।

বাবা, আমি তোমাকে অতিশয় অনুরোধ জানাই, প্রার্থনা করো। শুধু এই কথাটুকু বিবেচনা করো, এই যে আমি এখানে মরতে যাচ্ছি, সেটি আমাদের সক্কলের জন্য। এরচেয়ে শ্লাঘনীয় আমার কী মৃত্যু হতে পারত? আমি স্বেচ্ছায় পিতৃভূমির জন্য মৃত্যুবরণ করছি; স্বর্গভূমিতে আমাদের চারজনাতে[৭] ফের দেখা হবে। প্রতিহিংসাকামীদের মৃত্যুর পরও তাদের অনুগামী পাবে। বিদায় বিদায়! মৃত্যু আমাকে ডাকছে। আমার চোখে ফেটা বেঁধে আমাদের গুলি করবে সে আমি চাইনে, আমাকে হাতে-পায়ে বাঁধতেও হবে না। আমি তোমাকে সবাইকে আলিঙ্গন করি। তৎসত্ত্বেও কিন্তু বলি, বাধ্য হয়ে মরাটা কঠিন কাজ। সহস্র চুম্বন।

ফ্রান্স— জিন্দাবাদ!

ষোড়শ বৎসরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

এচ্ ফের্‌তে

হাতের লেখা আর ভুলচুকের জন্য মাফ চাইছি; আবার পড়ার সময় নেই।

পত্র-প্রেরক : আঁরি ফের্‌তে, স্বর্গলোক, কেয়ার অব ভগবান।[৮]

২

এবারে একজন জাপানির চিঠি তুলে দিচ্ছি :

জিরুকু ইওয়াগায়া (Jiroku Iwagaya), শিক্ষক,

জন্ম ১৯২৩ সালে। ১৯৪৪ সালে ফিলিপাইন যাবার সময় যুদ্ধজাহাজ-ডুবিতে সলিলসমাধি।

শিজুয়োকা, ১২ জুন ১৯৪৩

বুগাঁভিস[১] দ্বীপের কাছে যে নৌযুদ্ধ হয়ে গেল তার খবর আজ কাগজে বেরিয়েছে। প্রকাশ, একখানা বিরাট সৈন্যবাহী জাহাজ গুরুতরভাবে জখম হয়েছে ও একখানা জঙ্গি-জাহাজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। এভাবে মানুষ কেন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে অতলে লীন হবে? জাপানিরা মারা গেলে শুধু জাপানিরাই, বিদেশিরা মারা গেলে শুধু বিদেশিরাই অশ্রুবর্ষণ করে কেন? মানুষ শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে সম্মিলিত হয়ে অশ্রুবর্ষণ করে না কেন, আনন্দের সময়

---

৭. স্বর্গে বাপ, মা, পিয়ের ও সে নিজে এই চারজন সম্মিলিত হবে আশা করছে।

৮. কনটিনেন্টে পত্রলেখককে তার ঠিকানা দিতে হয় (যেমন আমাদের ইনল্যান্ড-লেটার)। তাই আঁরি তার ঠিকানা দিয়েছে। এর থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন, সে যে গর্ব করেছে জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি (তার) হিউমার বজায় রেখে যাবে, সেটা কিছুমাত্র মিথ্যা দম্ভ নয়। কারণ এই-কটি শব্দই ইহজীবনে তার শেষ বাক্য।

যে-বই থেকে এই পত্রটি অনুবাদ করেছি তার নাম-ঠিকানা :

Die Stimme des Menschen Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt। 1939-1945 Gesam melt und herausgegeben von Hans Walter Baenl Piper Verlag, 1961, Muenchen.

১. সলমন দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ— অস্ট্রেলিয়ার অধীনে।

www.pathagar.com

সম্মিলিতভাবে আনন্দ প্রকাশ করে না কেন? এ তত্ত্বটি যে কোনও শান্তিকামী জনের চিত্ত আলোড়িত করবে। যেহেতু একটা বিদেশি মরেছে অতএব জাপানিরা বেশ পরিতৃপ্ত। এটা আমার কাছে চিরকাল অবোধ্য থেকে যাবে। তিন দিন চার দিন ধরে একটা লোক সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে শেষটায় অবসন্ন হয়ে জলে ডুবে গেল এটা কী নিদারুণ! মৃত্যুর সঙ্গে আমার যদি সমুদ্রে কখনও দেখা হয় তবে কি আমি তাকে সজ্ঞানে চিনতে পারব?

৩ মার্চ ১৯৪৪

বিদায় নেবার পূর্বে আমি ক্লাসের ছেলেদের দিয়ে 'তাজিমামরি'[২] গানটি গাওয়ালুম। আমি জানি না কেন, শুনে আমার বড় আনন্দ হল। এ গানটি আমি কখনওই ভুলব না; এটি আমাকে সবসময়ই স্মরণ করিয়ে দেবে যে আমি শিক্ষক ছিলুম।

মার্চ ১৯৪৪

আমি যুদ্ধে চললুম, কিন্তু আমি যুদ্ধ চাইনি। হয়তো আমার এ কথাটা কেউই বুঝবে না। কিন্তু কোনও মানুষকে হত্যা করার জন্য আমি কোনও তাগিদ অনুভব করি না। আমার মনে হয়, আমাকে যেন একটা দ' টেনে নিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

একাধিক জাতের বিশ্বাস এবং তারা যুদ্ধের সময় প্রোপাগান্ডা করে যে, জাপানিমাত্রই যুদ্ধের জন্য হামেহাল মারমুখো। এ চিঠি পড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ ধরনের আরও চিঠি আছে। স্থানাভাবে তার অল্পাংশও তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন টাইপের চিঠি অনুবাদ মারফত বহুবিধ মানবের চিন্তাধারা, হৃদয়ানুভূতি— এবং তৎসত্ত্বেও সেগুলো সর্বজনীন— এগুলোর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

যুগোস্লাভিয়ার জনৈক নাম-না-জানা সৈনিক,
অজাত শিশুর প্রতি পত্র,

[যুদ্ধের সময়ে]

হে আমার সন্তান, এখনও তুমি অন্ধকারে ঘুমুচ্ছ এবং ভূমিষ্ঠ হবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছ; আমি তোমার সর্বমঙ্গল কামনা করি। তুমি এখনও তোমার প্রকৃত রূপ (Gestalt) পাওনি; তুমি এখনও শ্বাসগ্রহণ করছ না; তুমি এখনও অন্ধ। তবু, যখন তোমার সে লগ্ন আসবে, তোমার এবং তোমার মাতার সে লগ্ন আসবে (তোমার সে মাতাকে আমি সর্বহৃদয় দিয়ে ভালোবাসি) তখন তুমি বাতাস এবং আলো পাবার জন্য সংগ্রাম করার মতো শক্তিও পাবে। আলোকের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করার অধিকার তোমার ন্যায্য প্রাপ্য। সেই কারণেই তুমি নারীদেহ থেকে শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করবে, অবশ্যই তুমি প্রকৃত কারণ না জেনেই জন্মগ্রহণ করবে।

বেঁচে থাকতে যে আনন্দ আছে সেটাকে তুমি রক্ষা কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুভয় ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিও। এই যে জীবন— এটাকে ভালোবাসা উচিত, নইলে এটা বৃথাই নষ্ট হয়, কিন্তু এটাকে মাত্রাধিক ভালোবাসা উচিত নয়।

নতুন নতুন জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য হৃদয় সর্বদা উন্মুক্ত রেখ; মিথ্যাকে ঘৃণা করার জন্য হৃদয় প্রস্তুত রেখ; অশিবকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বর্জন করার মতো শক্তি সর্বথা হৃদয়ে ধারণ কর।

---

২. 'তাজিমামরি' গীতটি আমি জোগাড় করতে পারিনি। কোনও গুণীন পাঠক যদি সেটি সংগ্রহ করে অনুবাদসহ প্রকাশক মহাশয়কে পাঠান তবে লেখক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

www.pathagar.com

আমি জানি, আমাকে এখন মরতে হবে, এবং তোমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং আমার যতসব ভুলত্রুটির জঞ্জালের উপর তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আমাকে ক্ষমা করো। আমি নিজের কাছে নিজে লজ্জিত যে তোমাকে এই অরাজক আরামহীন সংসারের পিছনে রেখে চলে যাচ্ছি। কিন্তু এছাড়া তো কোনও গতি নেই। আমি কল্পনায় তোমার কপালে চুম্বন রাখছি— শেষবারের মতো তোমাকে আশীর্বাদ জানাবার জন্য। গুড্‌নাইট, বাছা আমার— গুড্‌ মরনিং এবং শুভ প্রভাতে তুমি জাগ্রত হও।

মিসাক মানুচিয়ান, তুরস্ক

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আদি-ইয়মনে (তুর্কি— আরমেনিয়ায়) জন্ম; ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪-এ প্যারিসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ [প্যারিস]

[আমার মৃত্যুর পর] যাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁরাই ধন্য, কারণ তাঁরা মধুর স্বাধীনতা উপভোগ করবেন। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে ফরাসি জাতি এবং অন্যান্য স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী আমাদের স্মৃতিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেবে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আমি জর্মন জাতের প্রতি কোনও ঘৃণা অনুভব করি না... প্রত্যেক মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী তিরস্কার পাবে। জর্মন ও অন্যান্য জাত যুদ্ধশেষে শান্তিতে, ভ্রাতৃভাবে জীবনধারণ করবে; এ যুদ্ধ শেষ হতে আর বিলম্ব নেই। বিশ্বজন সুখী হোক।

গভীর বেদনা অনুভব করি আমি যে, আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি। আমি চেয়েছিলুম, তুমি আমাকে একটি সন্তান দেবে, এবং তুমিও সবসময় তাই চেয়েছিলে। তোমার প্রতি তাই আমার অনুরোধ, আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য যুদ্ধের পর তুমি অতি-অবশ্য পুনরায় পরিণয় করে সন্তান লাভ করবে।

আজ রোদ উঠেছে। এরকম দৃশ্য আর সুন্দর প্রকৃতির পানে তাকিয়ে আমি তোমাকে নিত্যদিন কতই না ভালোবেসেছি। তাই বিদায় বিদায়! বিদায় নিচ্ছি এ জীবনের কাছ থেকে, তোমাদের সকলের কাছ থেকে, আমার প্রিয়াপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীর থেকে, এবং আমার ভালোবাসার বন্ধুজনের কাছ থেকে। আমি তোমাকে নিবিড় আলিঙ্গন করছি, তোমার ছোট বোনকেও এবং দূরের এবং নিকটের পরিচিত সর্ব বন্ধুজনকে।

৩

একথা অনেকের কাছেই অবিদিত নয় যে, প্রাচ্যে মাতার প্রতি বয়স্ক পুত্রের যতখানি টান থাকে, পশ্চিমে— বিশেষ করে ফ্রান্স জর্মনি ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে— পুত্রের টান তার চেয়ে অনেক কম। এসব দেশের কবিরা মাতার উদ্দেশে কবিতা রচেছেন অত্যল্পই। তার একটা কারণ বোধহয় এরা বিয়ে করে মার সঙ্গে বাস করে না— বউ নিয়ে আলাদা সংসার পাতে। আমাদের বড় এবং মাঝারি শহরেও এ রীতি কিছুটা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

তা সে যাই হোক, যুদ্ধের সময় অনেক সৈন্যই মাতাকে বার বার স্মরণ করে। হৃদয় খুলে তার সব কথা জানায়। তাই যুদ্ধের সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে লেখা চিঠিতে পাঠক মানব-হৃদয়ের নতুন নতুন মর্মস্পর্শী পরিচয় পাবেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধ তার রুদ্রতম নিকটতম বদন দেখায় সিভিল উয়োর বা ভ্রাতৃযুদ্ধের সময় এবং আশ্চর্য সেসময় মানুষের করুণাধারাও যে কীরকম উছলে পড়ে সেটা বহু চিঠিতে বহুভাবে প্রকাশ পায়।

গত বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ইতালিতে ভ্রাতৃযুদ্ধ চলেছে। এ চিঠিটা সে সময়কার।

রবের্তো নান্নি : ইতালি, বল্না স্কুলের ছাত্র।

জন্ম ১৯২৮। প্যারাশুট থেকে ভূপৃষ্ঠে সংঘর্ষে ২৮ মার্চ ১৯৪৫[১] সালে নিহত।

২১ জানুয়ারি ১৯৪৫

(মাতাকে লিখিত)

আজ এই প্রথম ইউনিফর্ম পরে গির্জের উপাসনায় আমি যোগ দিয়েছিলুম।[২] আর বিশ্বাস কর মা আমার হৃদয় কী অনুভূতিতেই না ভরে উঠেছিল। ছেলেবেলায় তুমি যে আমাকে সঙ্গে করে গির্জেয় নিয়ে যেতে সে-সময়কার কথা ভাবছিলুম। আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যত দিন যায় মানুষের বয়স বাড়ে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের গভীরে সে ছেলেমানুষই থেকে যায়। আমরা সমবেত কণ্ঠে 'অসংখ্য জনের প্রার্থনা গীতি' গাইবার সময় যখন পুণ্যময়ী 'মাতা'র নাম এল তখন শুধু যে আমারই দু চোখ জলে ভিজে গেল তাই নয়, আমার বন্ধুদেরও তাই হল। তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবার যে সুযোগ সুবিধা ও আনন্দ পাবার অধিকার আমার আছে তার মূল্য আমি তখন বুঝতে পারলুম কারণ আমার বহু সাথীর পরিবারবর্গ শত্রু-অধিকৃত এলাকায় আছে বলে তারা কোনও চিঠি পায় না।

আমার বিশ্বাস, যে নাম মানুষ বিপদের মুখোমুখি হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ডেকে ওঠে সে নাম 'মা'।

শত্রুপক্ষের যাকে আমি দুবাহুতে করে ফার্স্ট এডের ঘাঁটিতে নিয়ে যাচ্ছিলুম সে চেঁচিয়ে ডেকেছিল 'মা'। যেতে যেতে তার মনের মধ্যে শুধু ছিল একটিমাত্র চিন্তা : তার মা। কাতর হয়ে আমাকে শুধোচ্ছিল, আমরা তার মাকে কিছু করিনি তো? আমি যতই 'না' বলছিলুম সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমাকে মিনতি জানাচ্ছিল আমি যেন সদা আমার মাকে অবশ্য স্মরণে রাখি, তোমার সম্বন্ধে খবর জানতে অনুরোধ করছিল, জিগ্যেস করছিল আমি তোমার কাছ থেকে চিঠি পাই কি না, তোমার কোনও ফটো আমার কাছে আছে কি না, কারণ তার আপন মায়ের কোনও ছবি তার কাছে ছিল না এবং তাই তোমার ফটোতে সে তার আপন মায়ের ছবিও দেখতে চেয়েছিল।

৮ সেপ্টেম্বর[৩] নিয়ে যারা অবহেলার সঙ্গে আলোচনা করে— কণামাত্র জানে না ওইদিন আমাদের পিতৃভূমির জন্য কী দুর্ভাগ্য আর পরিপূর্ণ বিনাশ নিয়ে এসেছে— তারা যদি আমি যা এইমাত্র বর্ণনা করলুম সে দৃশ্যের সম্মুখে থাকত! কারণ, বুঝলে মা, যে লোকটাকে আমি

---

১. এর ঠিক এক মাস পরে ইতালিতে যুদ্ধের অবসান হয়। তাই ভাবলে দুঃখ হয় যে সতেরো বছরের ছেলেটির মা যখনই একথাটা ভাববে তখনই তার শোক কত না গভীর হবে।

২. জর্মন ইতালির ফ্যাসি সম্প্রদায় সৈন্যদের উর্দি পরে গির্জে যাওয়াটা পছন্দ করত না। তারা গির্জেকে রাষ্ট্রের শত্রুভাবে দেখত এবং উর্দি না পরে গির্জে যাওয়াটাও অতি কষ্টে বরদাস্ত করত।

৩. ওইদিনই প্রথম খবর প্রকাশ পায়, ইতালির রাজা তাঁর মিত্রশক্তি জর্মনিকে ত্যাগ করে মার্কিন-ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলেছেন, ফলে দেশে ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যে সৈন্য আহত হয় সে ছিল পার্টিজান দলের। (বর্তমান লেখকের ভেন্দেত্তা দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

গুলি করে আহত করতে বাধ্য হয়েছিলুম, যাতে করে সে আমার উপর আগেই গুলি না করতে পারে; সে আর আমি তো একই ভাষাতে কথা বলি, এবং 'মা' বলে সে ডেকে উঠেছিল, এই এখন আমি তোমাকে যে নাম ধরে ডাকছি...

এবারে একটি কবিতার গদ্যানুবাদ

আমি হামজা : মালয়, রাজপরিবারজাত কবি।

জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১১, সুমাত্রায়। যুদ্ধাবসানের অরাজকতার সময় ১৯৪৬ সালে সুমাত্রায় নিহত।

(প্রিয়মিলন তৃষ্ণা)

কী মধুর! হে সমারোহময় মেঘরাশির শোভাযাত্রা
তুমি ঢেকে নিয়েছ সুনীল আকাশের নীলাঞ্জন।
দাঁড়াও ক্ষণেক তরে এই কুটিরের 'পরে
দূরের প্রবাসী তিয়াসী এক পথিকের কুটিরের 'পরে—
এক লহমার তরে, এক পলকের তরে—
আমি তোমাকে শুধু শুধোতে চাই,
তোমাকে হে মেঘ তোমাকে শুধোতে চাই
তুমি কোন দিকে যাবে মনস্থির করেছ?
কোন দেশে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে?
হে মেঘ, আমার প্রিয়ার কাছে নিয়ে যাও আমার বিরহ ব্যথা
তাকে কানে কানে বলো আমার বিরহ বেদনা
তার তরুণ সোনালি হাঁটু দুটিকে তুমি আলিঙ্গন করো,
যেন আমি নিজে সে দুটিকে আলিঙ্গন করছি।

এ কবিতা তো আমাদের বহুদিনকার চেনা কবিতা!!

৪

ইভান ভ্লাদ্‌কফ : বুলগারিয়া।

জন্ম দ্রিয়ানভো-তে ১ জানুয়ারি ১৯১৫।

মৃত্যু ২২ নভেম্বর ১৯৪৩, বুলগারিয়ার পুলিশ কর্তৃক নিহত।

২১ নভেম্বর ১৯৪৩

যে একটিমাত্র বাসনা আমার আছে সেটি বেঁচে থাকার। তোমার শ্বাস চেপে ধরে বন্ধ করে দিল, তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, ধীরে ধীরে তোমার চৈতন্য লোপ পেল; গারদের কুটুরি আরও ছোট হয়ে গেল, এ কুটুরিতে কখনও বাতাস ঢোকে না। তৎসত্ত্বেও বেঁচে থাকবার জন্য কী অদম্য স্পৃহা!

আর আমার ছোট ছেলেটি! এখন থেকেই সে আমার অভাব অনুভব করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যে কথাগুলো সে আমায় বলেছিল সেগুলো এখনও আমার মনকে চঞ্চল করে

www.pathagar.com

তোলে : বাবা, তুমি যখন ফিরে আসবে তখন আমার জন্য একটা ট্রাম-লাইন কিনে দেবে আর ছোট একটি গাড়ি, আর একজোড়া জুতো!

আমার পুত্র আমার অনুপস্থিতি অনুভব করে। আমার আদরসোহাগ সে কামনা করে, আমার কথা ভেবে সে ব্যাকুল হয়। আমি যখন তাকে বললুম, এরা আমাকে তোর কাছে যেতে দেয় না, তখন সে আমাকে বলল, 'তুমি যে আমার কাছে আসতে চাও না, তার মানে তুমি আমাকে ভালোবাসো না— না বাবা?' শিশুসন্তানের এ কী সরল ভালোবাসা, তার আত্মাটি কত না বিরাট ভালোবাসা ধরতে জানে!

কিন্তু এই এঁরা যাঁরা আমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন, এঁদের কি তবে শিশুসন্তান নেই? এঁরা কি নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন না, অন্যের প্রতি কি এঁদের কোনও সমবেদনা নেই? অতি অবশ্যই সর্বদাই এঁরা কোনও কিছু দিয়ে নিজের মনকে বোঝাতে জানেন। যখন তাঁদের উচিত আমাদের মৃত্যুর চরম দণ্ডাদেশ না দিয়ে লঘুতর দণ্ড দেওয়া— অন্যসব কারণ বাদ দিয়ে হোক না সে শুধু আমাদের শিশুসন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে— তখন তাঁরা বলেন, শাসনদণ্ডের আইন সে অনুমতি দেয় না। এ কী মূর্খতা। কিন্তু বোধহয় এঁরা আপন শিশুসন্তানের প্রতি আমাদের মতো এ গভীর ভালোবাসা পোষণ করেননি। কারণ তাই যদি হত তবে তাঁদের আচরণ অন্য রকমের হত। আমার এখনও স্মরণে আসছে জেনারেল কচো স্টয়ানফের কথা— আমাকে কী বলেছিলেন : 'বিচারকেরা সন্তানদের কথা স্মরণ রাখেন।' কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছিনে, হয়তো কখনওই বুঝতে পারব না, তাই যদি হবে, সন্তানদের কথা যদি তাঁরা স্মরণে রাখেন তবে এরকম দণ্ডাদেশ দেন কী প্রকারে?

'রাষ্ট্র শক্তিমান এবং রাষ্ট্র কাউকে পরোয়া করে না (ডিফাই)।' কিন্তু তাই যদি হবে তবে এরা আমাকে গুলি করে মারছে কেন?

২১ নভেম্বর ১৯৪৩

পুত্রকে—

আমি জানি পিতৃহীন হয়ে তোমার জীবনধারণ কঠিন হবে এবং তোমাকে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা সইতে হবে। কিন্তু যে সমাজতন্ত্রের জন্যে আমি এ জীবন আহুতি দিচ্ছি সে ব্যবস্থা আসবে[১] এবং তোমাদের জীবনযাপনের জন্য মহত্তর পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

তুমিও সংগ্রামী হও এবং ন্যায়ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। তোমার মাকে ভালোবাসবে, হে প্রিয়পুত্র! জীবনের বিপদ-আপদে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

বুলগারিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি বড়ই জটিল। পাঁচশো বৎসর তুর্কদের কবলে পরাধীনতার পর বুলগারিয়া ১৮৭২-এ রুশদের সাহায্যে স্বাধীনতা পায়, কিন্তু গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকে।

---

১. কিন্তু পত্রলেখকের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। এর ঠিক এক বৎসর পর বিজয়ী রুশ সেনা নাৎসিদের বিতাড়িত করে বুলগারিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। ওই সময় বিস্তর নাৎসিমিত্র নবীন রাষ্ট্র কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আশা করি, পত্রলেখক যে কামনা করেছিলেন এবারে সেটা পূর্ণ হয়েছিল অর্থাৎ নবীন রাষ্ট্র পত্রলেখক বৈরী-নাৎসিমিত্রদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার পূর্বে তাদের শিশুসন্তানদের কথা ভেবেছিল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভে বুলগারিয়ার জনসাধারণ ছিল রুশ-মিত্র, পক্ষান্তরে রাজা বরিস ও তাঁর ফৌজি অফিসাররা ছিলেন হিটলার-প্রেমী। কারণ এই রাজ্যবিস্তার— লোভী দলকে হিটলার অনেক লোভ দেখিয়ে হাত করেন এবং প্রকৃতপক্ষে সেখানে তাঁরই চেলাচামুণ্ডারা বুলগার অফিসারদের সাহায্যে নৃশংসভাবে রাজত্ব চালাত। পত্রলেখক স্পষ্টত নাৎসিবৈরী জনসাধারণের অন্যতম ও নাৎসিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য মৃত্যুবরণ করেন।

জনৈক জর্মন সৈন্যদ্বারা লিখিত :
হেরবের্ট্ ড্রুকস্টাইন : জর্মনি।
জন্ম ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ মাগডেবুর্গ্।
মৃত্যু ২ জুন, ১৯৪৪, যো আন্নিনা, গ্রিস-এ যুদ্ধে নিহত।

গ্রীষ্ম ১৯৪৪

ডিটমার বা মণিকা— আমার অজাত সন্তান!

যাত্রা এখনও আরম্ভ হয়নি— তোমার যাত্রা আমার যাত্রা কারওরই না। সেই বিরাট ঘটনার প্রাক্কালে আমরা উভয়েই প্রতীক্ষমাণ, তুমি তোমার— তোমার জন্মগ্রহণ করার, আর আমি আমার— যুদ্ধ এবং কাল-ঘূর্ণাবর্ত আমাকে যেখানে টেনে নিয়ে যাবে। সেইহেতু এ পত্র প্রধানত তোমার মায়ের উদ্দেশে লেখা— যে মাতা তাঁর আপন দেহ দিয়ে তোমার আমার মধ্যে সংযোগ স্থাপনা করেছেন। আমি তোমাকে ভালোবাসি— যতদিন তোমার হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন তোমাকে নিয়তি-নির্দিষ্ট যে পথে যেতে হবে সে পথ দেখিয়ে দিয়ে যায়।

আমার হৃদয় সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে, যতখানি শক্তি সে ধরে— কিন্তু হায়, সে শক্তি বুঝিবা তার নেই যে তোমার বিরাট অভিযানের প্রথম পদক্ষেপগুলো দেখা যাবে— শুভেচ্ছা জানায় তোমার মাতাকে ইহসংসারে তোমার সর্বশ্রেয়া যিনি এবং তোমাকে—

— এখনও যার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি, তোমার পিতা।

হ্স্যু হ্সিআও-হ্সিঅ্যান, চীন।
১৯৪৩-এ যুদ্ধে নিহত।

(একটি ক্ষুদ্র কবিতা)
সংঘ-প্রাচীরের পিছনে

আমাদের বন্ধুত্ব হল নিবিড়তর।
আমরা বিরাট বিরাট যত সব প্ল্যান করলুম
আমাদের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা ছিল সুদূরব্যাপী...
কিন্তু বিদায়ের সময় শুধু নাড়লাম মাথা—
একটি মাত্র কথা না বলে— একে অন্যের দিকে।
কেননা সেনাবাহিনী তখন এসে দাঁড়িয়েছে
প্রাচীর দুর্গতোরণের সম্মুখে ॥

www.pathagar.com

৫

যুদ্ধের সময় মাতারাই যে তাদের সন্তান হারিয়েছে তাই নয়, শিশুও মাকে হারিয়েছে— বিশেষ করে গত যুদ্ধের সময়। তাই এ যুদ্ধে মাকে লেখা মেয়ের চিঠিও আছে।

হিটলার গদিতে বসার আগে থেকেই তাঁর শত্রু কম্যুনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এবং গোপনে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যাঁরা ধরা পড়েন তাঁদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিচারের নামে পরিহাস করা হত বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই বিনা-বিচারে কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্‌পে বন্ধ করে তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হত।

যুদ্ধ না লাগলে হয়তো হিমলার হিটলার এদের অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতেন না। কিন্তু হিটলার রুশ-রণাঙ্গনে যতই হারতে লাগলেন ততই তাঁর নিষ্ঠুরতা জিঘাংসা উত্তেজিত হতে লাগল— এই বিদ্রোহী পক্ষের প্রতি। হিটলার তখন স্ত্রী-পুরুষে আর কোনও পার্থক্য রাখলেন না। এমনকি নবজাত শিশুর মাতাও তাঁর বর্বরতা থেকে নিষ্কৃতি পেল না।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী হান্‌স্ কপ্‌পিসহ স্ত্রী হিল্‌ডে কপ্‌পি গ্রেপ্তার হন। এঁরা দুজনেই হিটলারের বিরুদ্ধে সক্রিয় সোশ্যালিস্ট ছিলেন। কারাগারে হিল্‌ডে একটি শিশুপুত্রের জন্ম দেন। পিতা নামেই এই শিশুর নামকরণ করা হয় 'হান্‌স্'— এ রেওয়াজ পৃথিবীর বহু দেশে আছে। 'ছোট' হান্‌সের ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক মাস পর পিতা 'বড়' হান্‌স্‌কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এবং মাতা হিল্‌ডেকে আট মাস পরে ১৯৪৩ সালের ৫ আগস্ট। তখন তাঁর বয়স ৩৪।

মাতাকে লেখা কন্যার পত্র

আমার মা, গভীরতম ভালোবাসার মা-মণি,

সময় প্রায় এসে গিয়েছে যখন আমাদের একে অন্যের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিতে হবে। এর ভিতর কঠিনতম ছিল আমার ছোট হান্‌সের কাছ থেকে চিরবিদায় নেওয়া— সেটা হয়ে গিয়েছে। সে আমাকে কী আনন্দই না দিয়েছে! আমি জানি, সে তোমার স্নেহনিষ্ঠ মাতৃহস্তে অতি উত্তম রক্ষণাবেক্ষণ পাবে এবং আমার তরে মা-মণি— প্রতিজ্ঞা কর— তুমি সাহসে বুক বাঁধবে। আমি জানি, তোমার বুকে বাজছে, এই বুঝি তোমার হৃদয় ভেঙে পড়বে, কিন্তু তুমি নিজেকে শক্ত করে নিজের হাতে চেপে ধর— খুব শক্ত করে। তুমি ঠিক পারবে— তুমি তো কঠিনতম বাধাবিঘ্নের সামনে সর্বদাই জয়ী হয়েছ— এবারেও পারবে না মা? তোমার কথা যতই ভাবি, তোমাকে যে নির্মম বেদনা আমি দিতে যাচ্ছি সেই কথা— এটাই আমার কাছে সবকিছুর চাইতে অসহনীয়— এই ভাবনা যে, জীবনের যে বয়সে আমাকে দিয়ে তোমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখনই আমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে তোমাকে। তুমি কি কখনও— কোনওদিন— আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? তুমি তো জান মা, আমার যখন বয়স কম ছিল— অনেকরাত্রে ঘুম আসত না— তখন যে-চিন্তা আমার মনকে সজীব করে তুলত সেটা— আমি যেন তোমার আগে ও-পারে যেতে পাই। এবং তার পরবর্তীকালে আমার মাত্র একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল; সে আকাঙ্ক্ষা দিবারাত্র, জানা-অজানায় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত— এ সংসারে একটি সন্তান না এনে কিছুতেই আমি মরব না। তা হলে দেখ মা, আমার এই দুই মহান কামনা এবং তাই দিয়ে আমার জীবন পরিপূর্ণ সফলতা পেয়েছে। এখন আমি যাচ্ছি আমার বড় হান্‌সের মিলনে। ছোট হান্‌স্— আমি আশা ধরি— আমাদের দুজনার ভিতর যা

www.pathagar.com

ছিল ভালো, সেইটে পেয়েছে। এবং যখনই তুমি তাকে তোমার বুকে চেপে ধরবে, তোমার এই শিশুটি সর্বদাই তোমাকে সঙ্গ দেবে— আমার চেয়ে বেশি, আমি তো আর কখনও তোমার অত কাছে আসতে পারব না। ছোট হান্স্— আমার আশা— যেন সুদৃঢ় শক্তিশালী হয়, সে যেন মুক্তহৃদয় হয়, দরদী সেবাশীল হৃদয় ধরে এবং তার বাপের অকলঙ্ক ভদ্রচরিত্র পায়। আমরা একে অন্যকে নিবিড়, বড় নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলুম। প্রেমই আমাদের সর্বকর্ম নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

শক্তি দিয়ে যুঝে যেবা দেহ করে দান,
প্রভু রাখে তার তরে মহান নির্বাণ—

মা আমার, আমার অদ্বিতীয় কল্যাণী মা, আর আমার ছোট হান্স্— আমার সর্ব ভালোবাসা সর্বকাল তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে; সাহস ধর— আমি যেরকম সাহস রাখব বলে দৃঢ়প্রত্যয়।

নিত্যকালের
তোমার মেয়ে হিল্‌ডে

মাতাকে নিহত করে যারা শিশুকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করে তাদের কী নাম দিয়ে ডাকি? হিটলার সর্বদাই ইহুদি বেদের পরিচয় দিতেন তাদের Untermensch= Undermen নাম দিয়ে অর্থাৎ মানুষ যে স্তরে আছে ইহুদি বেদে তাদের নিচের স্তরে। তাই তাদের গ্যাসচেম্বারে পুরে মারা হয়। অথচ আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তার থেকে বলতে পারি, এই দুই জাতই মাতা মাত্রকেই অবর্ণনীয় অসাধারণ প্রীতিস্নেহের চোখে দেখে। এইবারে পাঠক চিন্তা করুন Untermensch পদবি ধরার হক সবচেয়ে বেশি কার?

মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে হিল্‌ডের যে দুটি চরম কামনা ছিল সে-দুটি পূর্ণ।

আর সান্ত্বনা দিই যে তাকে দীর্ঘকাল বৈধব্যশোক সইতে হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন ওই-কটি মাসই তার কী করে কেটেছে? আর ওই-কটি মাসেই তার পিতা বড় হান্স্ কী গর্ব, কী বেদনাই না অনুভব করেছিল!

আর সান্ত্বনা দিই এই ভেবে যে মাত্র ন মাসের শিশু মাতৃবিচ্ছেদের শোক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। কিন্তু প্রশ্ন, সে যে মাতৃদুগ্ধ না খেয়ে অন্য দুগ্ধ খাচ্ছে সেটা কি সে ইন্‌স্টিন্‌ক্ট দিয়ে (অনুভূতি-জাত সরাসরি জ্ঞান) বুঝতে পেরেছিল?

মনকে যতই চোখের ঠার মারি না কেন, যতই সান্ত্বনা খুঁজি না কেন, এ চিঠি গিলতে গিয়ে আমাদের সর্ব বুদ্ধি বিবেচনা সর্ব অনুভূতি চেতনা অসাড় হয়ে যায়।

এই পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃস্মরণীয় কন্যা মৈত্রেয়ীর অনুজা। তিনি অমৃতের সন্ধানে ইহবৈভব ত্যাগ করেছিলেন (যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহমং তেন কুর্যাম্)। ইনি মাতা ত্যাগ পুত্র ত্যাগ করলেন সত্যশিবের সন্ধানে।

এই অতিশয় অসাধারণ পত্রের পর অন্যের পত্র কি পাঠকের মনে সাড়া জাগাবে? কি আমি তো কোনও ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করার জন্য চিঠিগুলো বাছাই করে করে ফুলের তোড়া সাজাচ্ছি না। যেমন যেমন পড়ে যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আমার হৃদয় স্পর্শ করছে সেগুলো অনুবাদ করে দিচ্ছি এবং আমি বাঙালি বলে আশা করছি বাঙালি হৃদয়ও এগুলো গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

তাই চীন দেশের একটি কবিতা।

বাচ্চাটির বয়স যখন পাঁচ তখন তার বাপ যুদ্ধে মারা যায়। এবং তাকেও কৈশোরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যুদ্ধে যেতে হল। কবিতাটি ঈষৎ মডার্ন স্টাইলে ফ্লাশ-ব্যাক করে রচিত। মডার্নদের বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না, ভূমিকা হিসেবে উপরের দুটি ছত্র লিখতে বাধ্য হলুম প্রাচীনপন্থী পাঠকদের জন্য।

য়েন যুই : চীন।

যুদ্ধের সময় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে আহত, তারই ফলে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু।

(সমরাঙ্গনের পুরোভূমিতে তরুণ)

এ তো একফোঁটা ছেলেমাত্র— আর এরি মধ্যে যুদ্ধ।
হিম্মতে সে ভরপুর তবু হৃদয় থেকে যেন রক্ত ঝরছে।
তার বয়স তখন মাত্র পাঁচটি হেমন্ত— যখন বাপ যুদ্ধে মারা গেল।
বাড়ি দৈন্যে ঢাকা পড়ল, খাদ্য বস্ত্র খেলনা নেই।

ছেলেটির বয়স ক্রমে চোদ্দ হল, তাকেও যুদ্ধে নিয়ে গেল।
দুঃখ-বেদনায় মাতৃহৃদয় খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।
সমস্ত গ্রীষ্মকাল জুড়ে চলল রক্তপাত আর বহ্নি-দাহনের তাণ্ডব,
ছেলের সংবাদ— সে কোন সুদূরে মরে গেছে না জয়ী হবে?

তখন— বিদায় নেবার সময় হায় রে নিষ্ঠুর নিয়তি—
ছেলেটি জামাকাপড় পরেছিল বাচ্চাদের মতন তখনও।
তার পর সে বাড়ি ফিরল— বাপেরই মতো হয়েছে লম্বা
মায়ের চোখের দিকে তাকাল, মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ল।

চোখের জল ঝরে পড়ে মায়ের কাপড় দিলে ভিজিয়ে
অতীত কি কেউ কখনও ভুলতে পারে?
বাপ যা চেয়েছিল ছেলেকে সেটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হল
আবার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল— একটি কথাও বলেনি সে—

৬

জাঁদরেল থেকে জোয়ান— তা তিনি জর্মন হন বা ফিনই— বস্তুত যারাই রুশদের বিরুদ্ধে লড়েছে তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে কষ্টসহিষ্ণুতা আর দার্ঢ্যে রুশ সৈন্যের জুড়ি নেই। যে অবস্থায় অন্য যে কোনও দেশের সৈন্য ভেঙে পড়বে— বোধহয় একমাত্র জাপানি ছাড়া— সেখানে রুশ জোয়ান খানিকক্ষণ ঘাড় চুলকোবে— কোনও কিছু ঠিক ঠিক ঠাহর করতে তার বেশ একটু সময় লাগে— তার পর এক হাতের তেলোতে আর এক হাত দিয়ে যেন অদৃশ্য ধুলো ঝাড়ছে ওই 'মুদ্রাটি' এঁকে বলবে 'নিচ্ছিভো'। 'ইট ইজ নাথিং', 'ডাজ্‌নট ম্যাটার'-এর দূরের অনুবাদ। 'কুছ পরোয়া নহি' 'কই বাত নহি' তবু অনেক কাছের অনুবাদ।

কিন্তু দার্ঢ্য— ওইটেই আসল কথা। কিন্তু ওইটেই কি শেষ কথা?

www.pathagar.com

(কবিতা)

সেমেন গোদসেন্‌কো : সোভিয়েত ইউনিয়ন।

জন্ম ১৯২২। মে ১৯৪২-এর যুদ্ধে আহত হওয়ার ফলে ১৯৫৩ সালে মৃত্যু।

কুড়িটি বচ্ছর আমাদের বয়স বল,
তার পর এই যুদ্ধের বৎসরে,
সর্বপ্রথম আমরা দেখলুম রক্ত, দেখলুম মৃত্যু—
সরল, সোজাসুজি, মানুষ যেরকম স্বপ্ন দেখে অক্লেশে।
আমার স্মৃতিপট থেকে কিছুই মুছে যাবে না,
যুদ্ধে প্রথম মৃত জনের সঙ্গে দেখা,
বরফের উপর প্রথম রাত্রিযাপন, শীতে জমে গিয়ে
একে অন্যকে পিঠ দিয়ে ঘুমুলুম।
আমি আমার পুত্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব মৈত্রীর দিকে—
তাকে যেন কক্‌খনো যুদ্ধ করতে না হয়—
সে যেন আমাদের মতো কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে
মিত্রগণের সঙ্গে ধরণীর বুকে পা ফেলে চলে।
সে যেন শেখে : ন্যায্যভাবে
রুটির শেষ টুকরো ভাগাভাগি করতে।
...মস্‌কোর হেমন্ত, স্মলেনস্কের শীত ঋতু,
আমাদের অনেকেই মারা গিয়েছে।
কিন্তু সৈন্যবাহিনীর ঝঞ্ঝা, বসন্তের ঝঞ্ঝা
পরিপূর্ণ করে দিয়েছে এই নব ফাল্গুন।
বিরাট যুদ্ধ এই করে
মানুষের বুকের পাটা ভরে দেয় সাহস দিয়ে।
মুষ্টি হয় দৃঢ়তর, বাক্য হয় গুরু-ভার।
এবং বহু কিছু তখন হয়ে যায় পরিষ্কার।
...কিন্তু এখনও তুমি বুঝতে পারনি—
এইসব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি হয়েছি আগের চেয়ে কোমলতর।

অর্থাৎ বাইরের কার্যকলাপে, সংগ্রামে শান্তিতে রুশজন যতই দার্ঢ্য ধরুক না কেন, অন্তরে সে পুষে রাখে কোমলতা, করুণা, মৈত্রী। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বিশ্বাস ধরি।

আধুনিক রুশ সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্প। কাজেই বলতে পারব না, কবি গোদসেন্‌কো রুশ দেশে কতখানি খ্যাতিপ্রতিপত্তি ধরেন। তবে তাঁর আর একটি কবিতা আমার বড় ভালো লেগেছে।

বাইরে যতই বড়ফট্টাই করুক না কেন, হিটলারের অনেক চেলাই যে ভিতরে ভিতরে গড়্‌ড্যাম্‌ কাপুরুষ ছিল সেইটে কবি প্রকাশ করেছেন অতি অল্পতেই। ভল্‌গা-অঞ্চলের স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ তখন (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩) শেষ হয়ে গিয়েছে। বিশ্বজন, এমনকি জর্মন

www.pathagar.com

জাঁদরেলরাও তখন জেনে গিয়েছেন যে জর্মনির জয়াশা আর নেই। জয়াশা ত্যাগ করে মুণ্ডহীন দেহে যত্রতত্র বিচরণ করাটা তখন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ছিল না। কবিতাটি স্তালিনগ্রাদে লেখা।

স্তালিনগ্রাদ, মে— নভেম্বর, ১৯৪৩

ফেব্রুয়ারি শেষ হল।
নীলাকাশ
দেওয়ালের ফুটোগুলোর ভিতর দিয়ে
যেন চিৎকার করছে।
প্রতি চৌরাস্তায় তীরের চিহ্ন—
জর্মন সৈন্যদের পথনির্দেশ করছে
কোথায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে।
এ তো ইতিহাস।
এ তো স্মরণের কাহিনী।
সংগ্রামের চিৎকার ভল্গা-অঞ্চল থেকে সরে গিয়েছে।
এখন, কীভাবে ইস্কুলগুলো ফের বানাতে হবে
তাই নিয়ে দিবারাত্তির মহকুমা-শহরে গভীর আলোচনা হচ্ছে
বাচ্চারা নিয়ে এল অতিশয় সযত্নে
একখানা বেঞ্চি— কোনও জখম-চোট লাগেনি
যেন কাচের তৈরি পলকা মাল— মাটির নিচের ঘর থেকে।
...সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল
— হঠাৎ আলোতে-অন্ধপ্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল।
এক জর্মন সৈন্য।
ওহ্! কী কাঁপতে কাঁপতে সে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল!
তার ওভারকোট ছেঁড়া, টেনা টেনা— পা দুটো নড়বড়ে।
ওই শেষ জর্মন সৈন্য স্তালিনগ্রাদে।
একদা বার্লিনে সে যে হামাগুড়ি দিত হুবহু সেইভাবে।

(নাৎসি-প্রধানদের সম্মুখে —অনুবাদক)

এভালট্ ফন্ ক্রাইস্ট-শ্লেনৎসিন।
জন্ম ২২ মার্চ ১৮৮৯।
ফাঁসিতে মৃত্যু ১৫ এপ্রিল ১৯৪৫।

জনৈক ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ক্রিশ্চানের পত্রাংশ। ইনি হিটলারের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন :

'ভগবানের দিকে যে জাত যতখানি নিয়োজিত করেছে, সেই দিয়ে তার মূল্য বিচার করতে হয়। একটা অ-ক্রিশ্চান জাতও ক্রিশ্চানদের তুলনায় (যেমন আমরা— অনুবাদক)

www.pathagar.com

ভগবানের অনেক নিকটতর হতে পারে। আজকের দিনের ক্রিশ্চানরা ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে।'

৭

কনসানট্রেশন ক্যাম্পের (ক. ক) কেলেঙ্কারি কেচ্ছা এতদিনে হটেনটটরাও শুনে গিয়ে থাকবে কিন্তু তার 'গৌরবময়' যুগে সে তার কীর্তিকলাপ এতই ঢেকে চেপে সারতে পেরেছিল যে সাধারণ নিরীহ জর্মন ক-ক'র ভিতরে কী হয় না-হয় সে সম্বন্ধে নানারকম গুজব শুনতে পেত বটে, পাকা খবর পাবার কোনও উপায় ছিল না। তদুপরি সুবুদ্ধিমান জর্মনমাত্রই জানত, এ বাবদে অত্যধিক কৌতূহল প্রকাশ করা আপন স্বাস্থ্যের জন্য প্রকৃষ্টতম পন্থা নয়। যেমন ১৯৪৫-এ যখন যুদ্ধ জয়ের কোনও আশাই ছিল না তখন হিটলার-হিমলার আইন জারি করেন যে, কেউ যদি বলে যে এ যুদ্ধে জর্মনির জয়াশা নেই তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে; ওই সময় এক জর্মন তার বউকে গোপনে বলে, 'যুদ্ধে জয়লাভ করার ভরসাটা বরঞ্চ ভালো। মুণ্ডুহীন ধড় নিয়ে হেথাহোথা ছুটোছুটি করাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে আদপেই ভালো নয়।'

গল্পটি সেই সময়কার।

ট্যুনিস আর শ্যেল দুই নিরীহ, সদাশান্ত জর্মন। দুজনাতে দোস্তি। পথিমধ্যে দেখা। ট্যুনিস শুধোল, 'হ্যাঁ রে শ্যেল, অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি বল তো!'

'হুঁহু!'

'সে কী রে? কথা কইছিস না কেন? আমি তো শুনলুম, তোকে কনসানট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওই জায়গাটা সম্বন্ধে তো নানান কথা শুনি! কীরকম ছিলি সেখানে?'

শ্যেল বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস। উত্তম আহারাদি। পরিপাটি ব্যবস্থা। সকালে বেড্-টি। জামবাটি ভর্তি চা। একটি আপেল, দুখানা খাস্তা বিস্কুট। তার পর আটটা-ন'টায় ব্রেকফাস্ট। ডাবরভরা সর-দুধ, কর্ন্‌ফ্লেক, চাকতি চাকতি কলা, উত্তম মধু। সঙ্গে তো টোস্ট, মাখন, চিজ আছেই। তার পর দুখানা অ্যাব্‌বড়া আস্ত মাছভাজা— ফ্রেশ মাখমে। তার পর দুটো ফুল-সাইজ পোচ, ডিম ভাজা বা মমলেট— যা তোর প্রাণ চায়— বেকনসহ, কিংবা হ্যামও নিতে পারিস। তার পর— '

ট্যুনিস সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বলল, 'সে কী করে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ন-সিকে খাঁটি কথা কইছি। ক-ক'র বাইরে বসে তোরা তো নিত্যি নিত্যি খাচ্ছিস lunch-এর নামে লাঞ্ছনা, supper-এর নামে suffer। আমরা খাচ্ছিলুম...' পুনরায় সসিজ, কটলেট, এস্‌পেরেগাস, চিকেন রোসটের সবিস্তর বর্ণনা।

ট্যুনিস বলল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। হালে ম্যুলারের সঙ্গে দেখা। সে-ও মাস ছয় ক-ক'তে কাটিয়ে এসেছে। সে তো বলল সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী। সে বলল—'

বাধা দিয়ে বাঁকা হাসি হেসে শ্যেল বলল, 'বলতে হবে না, সে আমি জানি। তাই তো বাবুকে ফের ওখানে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

শ্যেল আর ওখানে ফিরে যেতে চায় না। তাই ইংরেজিতে যাকে বলে সে তার বর্ণনা-টোস্টে প্রেমসে লাগাচ্ছে প্রয়োজনাতিরিক্ত গাদা গাদা মাখন।

www.pathagar.com

কিন্তু শ্যেল-বর্ণিত ঘটনা সত্য সত্যই ঘটেছিল ক-ক'তে তবে ভিন্নভাবে। যাকে বলে—

উল্টো বুঝলি রাম, ওরে উল্টো বুঝলি রাম।
কালে করলি ঘোড়া, আর কার মুখে লাগাম ॥

১৯৪৫-এর মে মাসে যুদ্ধশেষে বিজয়ী রুশ সেনা যেমন যেমন জর্মনির অন্তর্দেশে ঢুকল, সঙ্গে সঙ্গে ক-ক'র বন্দিদের খালাস করে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করল— কারণ এই বন্দিরা ছিল হিটলারবৈরী, জর্মনের দুশমন।

ওই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে চিঠি লিখছে এক চেকোস্লোভাক বন্দি। চিঠিখানি দীর্ঘ। আমি কাটছাঁট করে অনুবাদ দিচ্ছি :

য়ারোস্লাভ য়ান পাউলিক; চেকোস্লোভাকিয়া।
জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।
মৃত্যু ১৩ মে ১৯৪৫।

উত্তর জর্মনি, মে ১৯৪৫

ওলাফ ঝড়ের বেগে, যেন হোঁচট খেয়ে ঢুকল আমার গারদে। রুপোলি চুলে মাথাভরা ওলাফ। খোঁড়া-পা ওলাফ, তার ক্রাচ ছুটিয়ে নিয়ে। তার সেই মধুর হাসি হেসে সে আমায় আলিঙ্গন করল।

মুক্তি মুক্তি মুক্তি।

স্বাধীনতা স্বাধীনতা।

আমরা সবাই এখন মুক্ত, স্বাধীন। এমনকি ডাকাত, খুনিরাও মুক্তি পেয়েছে। সবাই মিলে লেগে গেল আশপাশে ডাকাতি লুটতরাজ করতে। আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না। ওই যে পেটুক ম্যুলার বলে, আমি ওসব ব্যাপারে একটা আস্ত বুদ্ধু। তদুপরি আমি ভুগে ভুগে অত্যন্ত দুর্বল; রোগে কাতর, সর্ব নড়নচড়নে অথর্ব। আর এই হট্টগোলের মাঝখানে এই প্রথম অনুভব করছি সেটা কতখানি। এদিকে আসছে বাসন বাসন ভর্তি আলু, রুটি, চিনি। অমুক (পত্রলেখক ইচ্ছে করেই নামটা ফাঁস করেননি— অনুবাদক) একটা খাসা, বেড়ে সুটকেস লুট করেছে— ভেতরে আছে, শার্ট-কলার-গেঞ্জি-রুমাল এবং চিনি, কোকো, সিগার, মাখন, এক বোতল 'হৃদয়ভেদী' ব্র্যান্ডি, হেনেসি ব্র্যান্ডির চেয়েও উৎকৃষ্ট। তার সোওয়াদটা আমার জিভে এখনও লেগে আছে।

ওদিকে আঙিনার উপর ডাঁই ডাঁই আলু। তন্দুরের ভিতর গাদা গাদা পাউরুটি ছুড়ে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে, তৈরি হয়ে উড়ে উড়ে বাইরে চলে আসছে। পেপে আমাকে একটা ছেঁড়া সুয়েটার, একটা ছোরা আর একজোড়া জুতো দিয়েছে (ক-ক'র বন্দিরা দুরন্ত শীতে খড়, ন্যাকড়া দিয়ে পা বাঁধত —অনুবাদক)। সত্যিকার জুতো! যতই চেয়ে দেখি প্রাণটা কী যে আনন্দে ভরে আসে!

রুশ সৈন্যবাহিনীর ট্যাঙ্ক, মোটরগাড়ি, বাইসিকল আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। 'নমস্কার নমস্কার! কীরকম আছেন?' (জদ্রাসভুইয়েতে, কাক্ পজিভাইয়িতে?) বলছে তারা। তারা তাদের গাড়ির থেকে আমাদের দিকে ছুড়ে ফেলছে সিগারেট, রুপোলি-মোড়কে প্যাঁচানো ৫০ গ্রামের তামাক, মিষ্টি, মাখন-চর্বি, টিনের যাবতীয় খাদ্য, প্যাঁজ, টুথ-পেস্ট, দুধের গুঁড়ো, সিরাপ।

www.pathagar.com

সকালবেলা খেলুম; আন্ডাবেকন, জামবাটি ভর্তি পরিজ, সঙ্গে বিস্তর মার্মালেড, রুটি মাখন পঁ্যাজ, সত্যিকার কফি, চিনিসহ।

(দ্বিতীয় চিঠি)

.হয়েছে। আমার একটি অনবদ্য, পুরো পাক্কা আমাশা হয়েছে। ফরাসি পাচকরা কালকের দিনে যা রেঁধেছিল (ওই সময়ে একাধিক ফরাসি পাচকও ক-ক'তে বন্দি ছিল ও দ্রব্যাদি তথা মালমসলা পেয়ে বহুদিন পর মুখরোচক জিনিস তৈরি করছিল— অনুবাদক)— কলিজা-ভাজা তার সঙ্গে সরে-দুধে মাখানো আলুভাতে, তাবত বস্তু পঁ্যাজ-ফোঁড়নে, ওহ্, সে কী সুন্দর, কী মধুর!

এখন আমাকে কী করতে হচ্ছে, ওইসবের সামনে দাঁড়িয়ে?

দুধ আর আঙুর রস! ওই আমার পথ্যি।

দুপুরের খাবার সময় হয়ে এসেছে।

হায় আমার খিদে নেই, রুচি নেই। আমার প্রিয়া, আমার ছোট্ট বউটি এখন কী করছে, কী ভাবছে?

কাল তাকে পাবার জন্য আমার বুক যা আকুলি-বিকুলি করছিল।

মনে হচ্ছে, এইবারেই নাক-বরাবর ওরই দিকে ছুটে যাব।

হায়, যুদ্ধশেষের পাঁচ দিন পরই হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

৮

ভিন্ন ভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু চুটকিলা প্রচলিত আছে।

জর্মনির দুই নম্বরের মোড়ল হ্যারমান গ্যোরিঙ যখন বন্দি অবস্থায় ন্যুরন্‌বের্‌গ মোকদ্দমায় আসামি তখন জেলের গারদে যেসব মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে আসতেন তাঁদের সঙ্গে দু-দণ্ড রসালাপ করে নিতেন। এক মোকায় তিনি বলেন,

'তোমরা মার্কিন। ইয়োরোপীয় জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য বুঝবে কী প্রকারে? শোন :

একজন ইংরেজ— শিকারি (স্পোর্টস্‌ম্যান)

দুজন ইংরেজ— একটা ক্লাব স্থাপন,

তিনজন ইংরেজ— হার ম্যাজেস্‌টি কুইনের জন্য একটা কলোনি জয়।'

তার পর হেসে বলতেন,

'একজন ইতালীয়— গাইয়ে,

দুজন ইতালীয়— ডুয়েট গাইয়ে

তিনজন ইতালীয়— যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন!' হাঃ হাঃ হাঃ।

'এবারে শুনুন,

একজন জর্মন— পণ্ডিত,

দুজন জর্মন— একটি নতুন পলিটিকাল পার্টি স্থাপনা (এ বাবদে অবশ্য আমরা, বাঙালিরা এখন হেসে-খেলে জর্মনদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি)।

www.pathagar.com

তিনজন জর্মন? হাঃ হাঃ— বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা!' তার পর ফিসফিস করে বলতেন, 'আর জাপানিরা?

একজন জাপানি— রহস্যময়!

দুজন জাপানি— সে-ও রহস্যময়!

তিনজন জাপানি?' এবারে এসে গ্যোরিঙ 'রহস্য'পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রোতাদের দিকে তাকাতেন, তার পর বলতেন,

'তিনজন জাপনি— সে-ও রহস্যময়।' বলেই ঠা ঠা করে উচ্চহাস্য করতেন— সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভালুকি থাবা দুটো দিয়ে তাঁর বিশাল উরুতে থাবড়াতেন— যে উরুর একটা দিয়ে অক্লেশে যে কোনও বঙ্গসন্তানের দুটো কোমর হোতে পারে।

আমার এবং আমার বন্ধুজনেরও ওই ধারণা। যেন অনুভূতির কোনও বালাই-ই জাপানিদের আদৌ নেই। কিন্তু পরের পৃষ্ঠার চিঠিটি পড়ুন :

গরু কিকিয়ু

জন্ম : ১৯১০

মৃত্যু : ফিলিপিনের যুদ্ধে, ২০ আগস্ট ১৯৫৪

স্ত্রী য়াকোকে লেখা :

মানচুরিয়া

বেশিদিন তো হয়নি তোমার সঙ্গে ছিলুম অথচ ইতোমধ্যেই তোমার সঙ্গ পাবার জন্য আবার আমার কী দুরন্ত আকুলি-বিকুলি। আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি অল্পকালই, তবু তোমার সে-সময়কার চলাফেরা-ওঠাবসার কত না ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। আর সবচেয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠ তুমি, যেখানে তুমি কোমল, মৃদু। আমাদের উভয়ের শিশুসন্তানটি জন্ম দেবার পর থেকে তুমি আরও সুন্দর হয়ে উঠেছ। তোমার সৌন্দর্যে যেটুকু শুষ্কতা ছিল সেটা রসঘন হয়ে গিয়েছে, তুমি পেয়ে গেলে এক নবীন পবিত্র সৌন্দর্য— মাতৃত্বের সৌন্দর্য। আমার স্মরণে আছে সেদিনকার ছবি, যেদিন আমি টোকিও ছেড়ে চলে এলুম— সামান্য একটু প্রসাধন করে তুমি তখন বসে আছ খাটের উপর।

তখন কী সরল হাসিটি তোমার! অথচ যখন তুমি আমার কল্যাণ কামনা করে বিদায় নিতে এলে আমাদের আঙিনায়, তখন, এই বুঝি, এই বুঝি তুমি কান্নায় ভেঙে পড়বে। নিতান্ত সেই নীরবতা ভাঙবার জন্য আমি তোমাকে বললুম, 'সাবধান থেক।' তার পর আমি ইজুমি আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়লুম। আমি তখন মনে মনে আমাদের বাড়ির দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমার ভাবনাচিন্তা তখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। আমি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করছিলাম, আমার মাতৃভূমির সবকিছু যেন সেই সময়েই অন্তর্হিত হল। আমার এই অনুভূতিটি তোমার পক্ষে বোঝাটা হয়তো কঠিন হবে কিন্তু তুমি আমার হয়ে একবার আমার এই অবস্থাটি কল্পনায় বুঝতে চেষ্টা কর। আমার মনে হয়েছিল, ওই বিদায়মুহূর্তে যেন আমার দেহ ঊর্ধ্বপানে ধেয়ে গিয়ে অনন্তে চলে গেল।

কিন্তু এখন? আজ রবিবারের এই সকালে আমার সর্ব দেহমন ধেয়ে চলেছে তোমা পানে।

www.pathagar.com

বুঝিয়ে বলি; আমার হৃদয় কামনা করছে, তোমার অক্ষিপল্লব মৃদু মৃদু স্পর্শ করতে, তোমাকে শান্ত আলিঙ্গনে ভরে নিতে। তুমি যখন স্মিতহাস্য কর তখন তুমি বড় সুন্দর এবং সবচেয়ে সুন্দর তোমার দন্তপঙ্ক্তি। হ্যাঁ, তোমার বর্ণ উজ্জ্বল শুভ্র নয়, কিন্তু মানতেই হবে, সে বর্ণ পরিপক্ক গোধূম বর্ণ— তোমার চর্ম সম্পূর্ণ অকুঞ্চিত— কোমল। তোমার বক্ষ পূর্ণস্তন— মাতৃত্বের স্ফীতবক্ষ। এবং বর্ণ সেখানে প্রায় স্বচ্ছ শুভ্র। আমি তোমার বুকের উপর শিশুটির মতো ঘুমিয়ে পড়তে চাই। বহুবার কামনা করেছি, তোমার সুডৌল গোল বাহুতে মাথা রেখে আরাম লাভ করতে। তোমার সুন্দর সুবিন্যস্ত ওষ্ঠাধরে চুম্বন দিতে দিতে আমি মৃদু হাস্য করি আর তুমি প্রত্যুত্তরে মোহনীয়া মৃদু হাস্য দিয়ে আমাকে জাদু করছ। এরকমধারা যত আমার কামনা এগিয়ে যায় ততই তোমাকে কাছে পাবার বাসনা দুর্বার হয়ে ওঠে। না— এরকম ধরনে আমি আর লিখতে পারব না। এ লাইনটি পড়ে তুমি হয়তো হেসে উঠবে, কারণ এটা আমার স্বভাবের বিপরীত। কিংবা হয়তো তুমি আশ্চর্য হচ্ছ, তোমার কাছে আমার মূল্য বেড়ে যাচ্ছে— নয় কি? কিংবা হয়তো ভাবছ, আমি শিশু— 'বুড়ো খোকা' এবং তাই আমাকে সোহাগ করতে চাইছ— না?

এসব নির্মল স্মৃতি আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে ওঠে আর সে-সময়কার কথা বার বার মনে পড়ে।

তোমার পূর্ণ বক্ষ আমার চোখের সামনে মায়াময় কায়া ধরে ফুটে ওঠে। আমার ইচ্ছে যায় যে নিটোল বক্ষে হাত বুলোই— ধীরে অতি ধীরে— তোমার মধুর নাসিকা, তোমার মুখ চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিই। তুমি তখন মধুর হাসি হেসে উঠবে, আমাকে আদর-সোহাগ করবে। বল দেখি, অন্য কোথা; কোথায় আছে এই বিশ্বভুবনে, এরকম হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য?

সুস্থ শরীর-মনে থেক। তোমার চিত্তটিকে সৌন্দর্যময়, প্রেমময় করে রেখ। এরকম যে-মা তার কাছে আমি ফিরে আসছি শিগগিরই।

আমাকে আলিঙ্গন কর, তোমার পূর্ণ বক্ষ, উষ্ণ স্তন দিয়ে।

একটুখানি ধৈর্য ধরে থাক— ব্যস, ওইটুকু শুধু।

হায়! বহু যুগ পূর্বে শ্রীরাধার সখী তাঁকে বলেছিলেন, 'ধৈর্যং কুরু, ধৈর্যং কুরু গচ্ছং মম মথুরাবে' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসেননি।

পূর্বে নিবেদন করেছি জাপানিরা রহস্যময়। কিন্তু এ চিঠি তো আদৌ রহস্যময় নয়। এ তো সেই রামগিরির বিরহী যক্ষ, মালয়ের কবি আমির হামজার মতো উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে!

আর এ পত্রে প্রেম ও কামের কী অনবদ্য সমন্বয়।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মে ফ্রান্সে সৈন্য অবতরণ করে জর্মনি জয়ের জন্য, ইংলন্ড তার তাবৎ কমনওয়েলথের এবং অন্যান্য সৈন্য সেখানে জমায়েত করেছিল। তারা এসেছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আরও মেলা দেশ এবং প্রধানত, সবচেয়ে বেশি আমেরিকা থেকে।

ওই সময়ে জনৈক ক্যানাডাবাসীর পত্র— তার বউকে।

ডনাল্ড্ আলবেরট ডানকান, কানাডা।

১৯৪৪ সালে, জুলাই মাসের শেষের দিকে, ফ্রান্সে সৈন্যাবতরণের সময় নিহত।

www.pathagar.com

ইংল্যান্ড, ১৪ মে ১৯৪৪

...ইংল্যান্ড এখন আর ইংরেজের (জমিদারি) নয়। এ দেশটা এখন সম্পূর্ণ দখল করেছে মার্কিনরা। একই সঙ্গে চার-চারটে বেস্ বল খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে হাইড পার্কে। ইংরেজরা অবশ্যই অনেকখানি সহিষ্ণু, কিন্তু একথা নিশ্চিত মনে বলা যেতে পারে, তারা মার্কিনদের সঙ্গে গভীর পীরিতি-সায়রে নিমজ্জমান হয়নি! মার্কিনদের কাঁড়ি কাঁড়ি কড়ি! তদুপরি কেড়ে নিয়েছে ছুঁড়িদের, বাসা বেঁধেছে সেরা সেরা হোটেলে। (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ইংরেজও কড়ির তাগদে প্যারিসে তাই করেছিল। এই কলকাতাতেই আমরা মার্কিনদের সে রোওয়াব দেখেছি!) কিন্তু ইংরেজ করবে কী? ফ্রান্সে নেমে জর্মনিকে পরাজিত করতে হলে যে ইয়াংকিদের প্রয়োজন।

ইংল্যান্ড, ২৪ জুন ১৯৪৪

...এসব তো হল, ওলো, প্রাচীন প্রিয়া (ওল্ড গারল)! বাচ্চাদের আমার হয়ে আদর দিয়ে বল, আমি ইউরোপ থেকে ওদের জন্য সুন্দর টুকিটাকি নিয়ে ফিরে আসব— যখন নিষ্প্রদীপ বিশ্ব আবার আলোকোজ্জ্বল হবে।

ফেরেনি। এক মাস পরে রণাঙ্গনে তার মৃত্যু।

৯

আডাম ফন্ ট্রট্‌ৎসু (Zu) জল্‌ৎসু, জর্মন।

জন্ম : ১৯০৯

মৃত্যু : ২৬ আগস্ট ১৯৪৪

হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য বার্লিনের প্লোৎসেন্‌জে কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

ইহলোক থেকে মাতার কাছে বিদায় জানিয়ে মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্বে লেখা শেষ পত্র।

বার্লিন-প্লোৎসেনজে, ২৬ আগস্ট ১৯৪৪

সবচেয়ে আদরের মা!

তবু ভালো, তোমাকে সামান্য কয়টি ক্ষুদ্র ছত্র লেখার সুযোগ শেষটায় আমি পেয়েছি— তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; তুমি সবসময়ই আমার কাছে ছিলে, এবং এখনও আছ— আরও নিবিড় হয়ে কাছে আছ। তুমি-আমি যে অনন্ত অনন্তকালীন যোগসূত্রে বাঁধা, আমি সেটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জোর আঁকড়ে ধরে আছি। এ কয়েক সপ্তাহ ধরে ঈশ্বর আমাকে তাঁর দাক্ষিণ্য দিয়ে ভরে রেখেছেন এবং সব— প্রায় সবকিছুর জন্য— আমাকে আনন্দময় সরল-স্বচ্ছ শক্তি দিয়েছেন। এবং তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এ জীবনে আমি কীভাবে, কোন কোন বিষয়ে কৃতকার্য হতে সক্ষম হইনি। কিন্তু এসবের চেয়েও সবচেয়ে বড় কথা : এই যে তোমাকে কঠিন শোক পেতে হবে, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, এবং বৃদ্ধ বয়সে তুমি যে আমার ওপর নির্ভর করতে, সেই নির্ভর থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

www.pathagar.com

তোমায়-আমায় আবার মিলন হওয়ার পূর্বে একটি শেষ চুম্বন— কৃতজ্ঞতা আর স্নেহ ভরা।
তোমার পুত্র তোমাকে যে বড্ড ভালোবাসে।

— আডাম

'তোমার পূত আত্মায়, হে প্রভু আমি নিজেকে সমর্পণ করি...'

ইহলোক থেকে পত্নীর কাছে বিদায় জানিয়ে মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্বে লেখা শেষ পত্র।

বার্লিন-প্লোৎসেনজে, ২৬ আগস্ট ১৯৪৪

প্রিয়া কণিকা ক্লারিটা,

দুঃখের বিষয়, সম্ভবত এই আমার শেষ চিঠি। আশা করি ইতোপূর্বে লেখা আমার দীর্ঘতর পত্রগুলো তোমার কাছে পৌঁছেছে।

আর কিছু বলার পূর্বে এবং সর্বোপরি আমি যা বলতে চাই : নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে তোমাকে যে গভীর শোক দিতে হল, তার জন্য আমি মাফ চাইছি।

আমি প্রত্যয় দিচ্ছি, আমি চিন্ময়রূপে পূর্বেরই মতো তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, এবং দৃঢ়তম প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করছি।

আকাশ আজ নির্মল, ঘন নীল (পিকক্ ব্লু) এবং গাছে গাছে মর্মরধ্বনি। আমাদের আদর-সোহাগের মিষ্টি মিষ্টি কথা বাচ্চা দুটোকে শিখিয়ো, তারা যেন পরমেশ্বরের এ প্রতীকগুলো বুঝতে পারে এবং তাদেরও গভীরে যে-প্রতীকগুলো আছে, সেগুলোও চিনতে শেখে। — কৃতজ্ঞতাসহ, কিন্তু গ্রহণ করার সময় যেন থাকে সক্রিয় বীর্যবান সাহস।

আমি তোমাকে বড় ভালোবাসি।

তার পর অনেক অনেক কিছু বলার রইল। কিন্তু তার জন্য আর সময় নেই।

ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন (আমাদের 'ঈশ্বর রক্ষতু'—অনুবাদক) আমি জানি, তুমি কক্ষনও পরাজয় স্বীকার করবে না। আমি জানি, তুমি জীবনসংগ্রামে ক্রমাগত এগিয়ে যাবে, এবং যদিও সে সংগ্রামে তোমার মনে হয় তুমি একা, তবু জেনো, আমার অদেহী স্বরূপ অহরহ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি প্রার্থনা করছি, তুমি যেন শক্তিলাভ কর, তুমিও আমার জন্য সেই সেই প্রার্থনা করো। এই শেষের ক-দিনে পুরগাতোরিয়ো এবং মেরি স্টুয়ার্ট পড়বার সুযোগ আমার হয়েছিল।... এছাড়া পড়বার মতো এ ধরনের বিশেষ কিছু আমার ছিল না— কিন্তু মনের ভিতর অনেককিছু উল্টে-পাল্টে দেখেছি এবং শান্তচিত্তে সেগুলো পরিষ্কার করে বুঝে নিয়েছি। তাই বলছি, আমার জন্য অত্যধিক শোক করো না— কারণ তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, সবকিছুই অত্যন্ত সরল, পরিষ্কার, যদিও সেগুলো গভীর বেদনাদায়ক।

আমার জানতে বড় ইচ্ছে করে, এই যা সব ঘটল, তার ফলে তোমাদের জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্তন হল কি না? তুমি কি রাইনবেক্ যাবে, না যেখানে আছ, সেখানেই থাকবে? অবশ্যই তাঁরা সকলে তোমাকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন— আমার প্রিয়া, ছোট্ট বউটি আমার! আমার পূর্বের পত্রগুলোতে তোমাকে বলেছিলুম আমার যে বহু বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে— এটা আমার অন্তরতম কামনা। তুমি ওদের সকলের সঙ্গে সুপরিচিত; তাই আমার সাহায্য ছাড়াও তুমি আমার শুভেচ্ছা ঠিকমতো তাঁদের জানাতে পারবে।

www.pathagar.com

আমি সর্ব হৃদয় দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করছি, অনুভব করছি তুমি আমার সঙ্গে আছ।
ভগবান তোমাকে ও বাচ্চাদের আশীর্বাদ করুন।
তোমার প্রতি অবিচল প্রেমনিষ্ঠ,

— আডাম

এ চিঠি দুটি অন্যান্য চিঠির তুলনায় অসাধারণ বলে না-ও মনে হতে পারে। কিন্তু আডাম ছিলেন অতিশয় অসাধারণ পুরুষ। অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন তিনি ছেলেবেলা থেকেই এবং হিটলার তাঁর অভিযান আরম্ভ করার সময় থেকেই তিনি বুঝে যান, এইসব নীতি-বিবর্জিত অখ্রিস্টান আন্দোলন জর্মনি তথা তাবৎ ইয়োরোপকে মহতী বিনষ্টির পথে নিয়ে যাবে। আপন দেশে লেখাপড়া করার পর তিনি অক্সফোর্ডে রোর্ডস্ স্কলাররূপে বেলিয়েল কলেজে খ্যাতিলাভ করেন। খোলা-দিল সাদা মনের মানুষ ছিলেন বলে সেসময় তিনি একাধিক ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন। যুদ্ধের পর যখন তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা হচ্ছিল তখন তাঁর অক্সফোর্ডের বন্ধু শ্রীযুত হুমায়ুন কবীরকেও মাল-মসলা দিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হয়।

হিটলারকে সরাবার জন্য গ্রাফ ফন্ স্টাউনফেনবের্গ তাঁর পায়ের কাছে, টেবিলের তলায়, পোর্টফোলিওর ভিতর একটি মারাত্মক টাইম বম্ রেখে বাইরে চলে যান। কিন্তু কিস্মৎ হিটলারকে বাঁচিয়ে দিল। যদ্যপি সেই কনফারেন্সরুমের একাধিক লোক সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন, হিটলারের বিশেষ কিছুই হল না।

ক্রোধোন্মত্ত হিটলার এই চক্রান্তকারীদের ওপর দাদ নেবার জন্য দোষী-নির্দোষী প্রায় পাঁচ হাজার জনকে ফাঁসি দেন। আডাম ছিলেন স্টাউনফেনবের্গের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁকে এই কর্মে সর্বপ্রকারের সাহায্য করেছিলেন। তাঁরও ফাঁসি হয়।

অসাধারণ দৃঢ়-চরিত্র ধরতেন বলেই আডাম তাঁর মা-বউকে শেষ চিঠি লেখার সময় সজ্ঞানে যতখানি পারেন অনুভূতি চেপে রেখেছিলেন— পাছে ওঁদের মনে আরও না লাগে। অথচ তিনি লিখতে পারতেন বড় সুন্দর মরমিয়া জর্মন।

ওই সময়ের অল্প পূর্বে একদল ছাত্র ম্যুনিকে প্রথমত গোপনে, পরে অর্ধপ্রকাশ্যে হিটলারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। তারই একজন ধরা পড়ে ফাঁসি যাওয়ার পূর্বে তার মাকে লেখে—

'মামণি,

তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি যখন আদ্যন্ত চিন্তা করে দেখি তখন মনে হয় আমার সমস্ত জীবন একই রাস্তা ধরে চলেছিল যার অন্তে আছেন— স্বয়ং ভগবান। এখন কিন্তু শোক করো না, যে, রাস্তার শেষাংশটুকু আমাকে এক লম্ফে পেরুতে হল। শিগগিরই আমি এ জীবনে তোমার যত না কাছে ছিলুম, তারচেয়ে অনেক বেশি কাছে চলে আসব।

ইতোমধ্যে তোমাদের সকলের জন্য একটি রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করছি।'

মৃত্যুর প্রাক্কালেও এরকম চিঠি! এতখানি রসবোধ! ফাঁসিতে 'লম্ফ' দিতে হয় বই কি, আর স্বর্গপুরীতে মায়ের জন্য রাজসিক অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবে সে।

www.pathagar.com

১০

শিশুকন্যাকে লেখা মায়ের চিঠি।

রোজে (গোলাপ) শ্লোএজিন্‌গারের জন্ম ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। নাৎসিবিরোধী আন্দোলন চালানোর সময় ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ তিনি বন্দি হন এবং ৫ আগস্ট ১৯৪৩-এ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর স্বামী বোডো শ্লোএজিন্‌গার ছিলেন জর্মন মিলিটারি পুলিশে দোভাষী। তাঁর স্ত্রীর প্রাণদণ্ড হয়েছে, এ খবর পেয়ে তিনি পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

'আমার সোহাগের ক্ষুদে, দড়[১] মারিয়াননে

অনুমান করতে পারছিনে তুমি কবে এ চিঠি পড়তে পারবে। তাই এটি তোমার ঠাকুরমা বা বাবার কাছে রেখে যাচ্ছি, যাতে করে তুমি বড় হয়ে এটি পড়তে পার। এখন তোমার কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে, কারণ খুব সম্ভব আমরা একে অন্যকে আর দেখতে পাব না।

তা সে যাই হোক না কেন, তুমি যেন স্বাস্থ্যবতী, সুখী এবং সবলা হয়ে বড় হয়ে ওঠো। আমি আশা করছি, পৃথিবী তার যেসব সুন্দরতম জিনিস দিতে পারে সেগুলো তুমি উপভোগ করবে— আমি যেরকম উপভোগ করেছি— এবং তোমাকে যেন সেসব দুঃখ-বেদনার ভিতর দিয়ে না যেতে হয়— যেগুলোর ভিতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা : তোমাকে কর্মদক্ষ ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। এ দুটি থাকলে বাকি সব আনন্দ-সুখ আপনার থেকেই আসে।

তোমার স্নেহ-ভালোবাসা মুক্ত হস্তে বিলিয়ে দিও না। এ সংসারে তোমার বাবার মতো কম লোকই আছে যারা তাঁর মতো সৎ এবং প্রেমে নির্মল। তাই সমস্ত প্রেম উজাড় করে দেবার আগে একটু ধৈর্য ধরতে শেখো। তা হলে প্রেমে ধোঁকা খাওয়ার যন্ত্রণা থেকে তুমি বেঁচে যাবে। কিন্তু এমন একজন যেদিন আসবে, যে তোমাকে এতই গভীর ভালোবাসে যে, তোমার সর্ব যন্ত্রণা সে-ও সঙ্গে সঙ্গে সইবে— এবং যার জন্য তুমিও সইতে প্রস্তুত— এরকম পুরুষকে তুমি তোমার প্রেম নিবেদন করতে পারো। আমি প্রত্যয় দিচ্ছি, তাকে পেয়ে তার সঙ্গে যে আনন্দ তৃপ্তি তুমি উপভোগ করবে তার থেকে তুমি বুঝতে পারবে, তার প্রতীক্ষায় তুমি যে ধৈর্য ধরে ছিলে, সেটা নিষ্ফল হয়নি।

তোমার জন্যে আমি বহু বৎসরের আনন্দ প্রার্থনা করছি; আমার কপাল মন্দ, আমি পেয়েছি অল্প কয়েক বৎসরই। এবং তোমাকে সন্তানের জন্ম দিয়ে মা হতে হবে : যখন তোমার নবজাত শিশুটিকে তোমার বুকের উপর রাখবে তখন হয়তো আমার কথা তোমার স্মরণে আসবে। তোমাকে যখন আমি প্রথমবারের মতো দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলুম সেটি আমার জীবনের চরম মুহূর্ত— তুমি তখন মাত্র একটি গোলাপি পুঁটুলি।

তার পরে স্মরণে আন, আমরা রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে জীবনের কত না গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি— আমি চেষ্টা করেছিলুম তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে। আবার স্মরণে

---

১. মূলে আছে ক্লাইন গ্রোস (ইংরেজিতে হবে লিট্‌ল্ বিগ) স্পষ্টত পরস্পরবিরোধী। তবে জর্মনরা আদর করার সময় অনেক ক্ষেত্রে এরকমধারা বলে। কিংবা হয়তো মেয়েটি বয়সে শিশু হলেও গঠনে দার্ঢ্য ধরত, যার থেকে মা অনুমান করে যে, কালে সে তন্বঙ্গী না হয়ে পূর্ণাঙ্গী হবে।

www.pathagar.com

আন, আমরা যে সমুদ্রপারে তিন হপ্তা কাটিয়েছিলুম— তিন মধুর সপ্তাহ। সেখানকার সূর্যোদয় এবং তোমাতে-আমাতে খালি পায়ে বেলাভূমি বেয়ে বেয়ে বানসিন থেকে উকেরিৎস্ গিয়েছিলুম; তার পর জলে রবারের দোলনাতে তোমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলুম; তার পর আমরা দুজনাতে একসঙ্গে বই পড়তুম। বাছা, তোমাতে-আমাতে কতই না সৌন্দর্য উপভোগ করেছি এবং এগুলো তোমাকে নতুন করে উপভোগ করতে হবে, এবং তারও বাড়া অনেককিছু বেশি।

হ্যাঁ, তোমাকে আরও একটি কথা বলতে চাই, মৃত্যুবরণ করার সময় আমাদের মনে বড় বেদনা লাগে যে আমাদের প্রিয়জনকে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি; আমরা যদি দীর্ঘতর দিন বেঁচে থাকতে পারতুম তা হলে আমরা সেটা স্মরণে এনে নিজেদের অনেক বেশি সংযত করতে পারতুম। হয়তো আমার এ কথাটি তুমি স্মরণে রাখবে তাতে করে তোমার জীবন— এবং সর্বশেষে তোমার মৃত্যু— তুমি নিজের জন্যে এবং অন্যদের জন্যেও সহজতর করে তুলতে পারবে।

এবং যতবার পার সুখী হও, আনন্দে থাক— প্রত্যেকটি দিন মহামূল্যবান!

যে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা দুঃখে কাটাই তার জন্য হাহাকার!

আমার স্নেহ তোমার সমস্ত জীবনভর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে— আমি তোমাকে চুমু খাচ্ছি— এবং যারা সব্বাই তোমাকে ভালোবাসে। বিদায়! বিদায়!! ও আমার সোহাগের ধন— জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমারই কথা আমার গভীরতম স্নেহের সঙ্গে হৃদয়ে রেখে,

তোমার মা

১১

য়োরমা হাইসকানেনে, ফিন্ল্যান্ড

জন্ম : ৩১ জুলাই ১৯১৪

মৃত্যু : জুন ১৯৪১

সোভিয়েত-ফিন্ সংগ্রামে সীমান্তে নিহত সৈনিকের রোজনামচা থেকে উদ্ধৃত।

ডিসেম্বর ১৯৩৯ (ফিনিশ সীমান্তে) যুদ্ধের প্রথমদিনই আমি সুভিলাহতির গির্জা-চূড়োয় উঠলুম; সেখান থেকে আবার পর্যবেক্ষণ করব সীমান্তে যেখানে সংগ্রাম চলছে... এখান থেকে স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির শব্দ; অকস্মাৎ একটা চিন্তা আমাকে যেন ঝাঁকুনি দিল : ওই যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে যে কোনও মুহূর্তে আমাদেরই একজন নিহত হতে পারে। তখন লক্ষ করলুম গির্জা-চূড়োতে আমি একা নই।

প্রতিরক্ষার জন্য রাখা একটা বালুর বস্তায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নাবালক বাচ্চা— বয়স এই এগারো-বারো। পরনে চামড়ার কোট, হাতে একটা দুরবিন। ওইটে দিয়ে সে দক্ষিণ পানে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল— সেখান থেকে যুদ্ধের ক্ষীণ কোলাহল-ধ্বনি আসছিল। আমি তো অবাক— এরকম অকুস্থলে তো ওর মতো ছোট্ট একটা বাচ্চার থাকার কথা নয়। বনের গাছগুলো ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠেছে এই গির্জা-চূড়ো; যে কোনও মুহূর্তে শত্রুপক্ষের কামানের গোলা এটাকে হানতে পারে।

'এখানে তুমি কী করছ?'

www.pathagar.com

বড় সুন্দর তাজা গলায় উত্তর এল : 'কেন? আমাকে তো জঙ্গি হাওয়াই জাহাজের গতিবিধি পাহারা দেবার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'হাউটাভারা-য়।'

আমি তাড়াতাড়ি শুধোলুম, 'তোমার বাপ-মা...?'

অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, যেন এ নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না— 'বাড়িতে বইকি!'

বাচ্চাটি আমার দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাল— দুরবিন দিয়ে তদারকি-কর্ম সে তখনকার মতো ক্ষান্ত দিয়েছে।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি আর কোনও প্রশ্ন শুধোতে পারছিনে। বাচ্চাটি কি জানে তার বসতগ্রাম হাউটাভারা শব্দার্থে সম্পূর্ণ চিহ্নিচিহ্ন হয়ে গিয়েছে? ওই তো সীমান্তের শেষ গ্রাম। এটাতে কোনও সেনা-সেনানী নেই। কিন্তু ওরই উপর সকাল থেকে শত্রুপক্ষ সব কামান একজোট করে গোলা হেনেছে। এ গ্রাম তো সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেখানেই তো তার বাড়ি— সে বাড়ি কি আর আছে? তার বাপ-মা পরিবারের আর পাঁচজন? তাদের সঙ্গে এর কি আর কখনও দেখা হবে?

কিন্তু সে কি জানে এ সব? না, না, আমি এ প্রশ্ন ওকে শুধোতে পারব না।

ইতোমধ্যে যুদ্ধের আগুন আরও জোরে জ্বলে উঠেছে।

'তুই কি এখানেই থাকবি না অন্য কোথাও যেতে চাস?'

'কেন? এখানেই তো আমার থাকবার কথা— নয় কি? তবে আমাকে দিয়ে আর কোনও দরকার নেই?' (অর্থাৎ সে চলে যেতে চায়নি —অনুবাদক)

বহুকাল ধরে তার এই শেষ কথাগুলো আমার কানে বেজে যেতে লাগল— বহুকাল ধরে, তার কাছ থেকে, সেখান থেকে বিদায় নেবার পরও।

জানেন শুধু ভগবান, এই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন শিশু যুদ্ধের তাড়নায় কোথায় ঘুরে মরেছিল— ফিনল্যান্ডের ডিসেম্বরের দারুণ শীতে— প্রভুই জানেন, সে অন্তত আশ্রয়টুকু পেয়েছিল কি না।

জেলে থেকে বোনেদের প্রতি লেখা বোনের শেষ পত্র— কবিতায়।

... আটদিন ধরে আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ
আমার এ অবস্থা কি কখনও ভুলতে পারব?
শেকলগুলো আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছে।

আমাকে নির্জন কারাগারে দণ্ডিত করা হয়েছে। হে প্রভু, তুমি আমাকে ত্যাগ করছ কেন?... (খ্রিস্ট নাকি ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় এই হাহাকারই করেছিলেন —অনুবাদক)

আমার বোনেরা— মিমি, মিনা— তোমরা কি এখনও তোমাদের বোন লোরেনস্‌কে স্মরণে আন,

সে তোমাদের ভালোবাসে।

www.pathagar.com

দুঃখবেদনা আমাদের সম্মিলিত করে একই পথে চালাবে,
এই তো ছিল আমাদের শপথ এবং একই অনুভূতি আমরা ভাগাভাগি করে নেব।
আমাকে তারা শিকল দিয়ে বেঁধেছে, কিন্তু আমার হৃদয়টাকে নয়।
আমি আশা রাখি, আমি বিশ্বাস রাখি, আলোকে আলোকে আলোকিত সূর্যরশ্মিময় ভবিষ্যৎ।
কাল যদি আমার মৃত্যু হয়!
তবে কীই-বা হবে?
শুধু আমি মুক্তি পাব আমার পায়ের শৃঙ্খল থেকে!

এই মেয়েটির নাম লোরেনস্— বোনেদের নাম মিমি, মিনা। কিন্তু পারিবারিক নাম চিঠিতে নেই বলে এঁদের কাউকেই শনাক্ত করা যায়নি। যেটুকু জানা গিয়েছে তা এই :

ফ্রান্স জয় করার পর জর্মনি তার বৃহদংশে আপন রাজত্ব চালায়। তখন সে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে আন্ডারগ্রাউন্ড সংগ্রাম চলে মাদমোয়াজেল লোরেনস্ তারই একজন।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য মৃত্যু আসন্ন জেনে এই তার শেষ পত্র।

১২

রণদামামা বাজিয়ে সগর্বে যখন ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে হিটলার পোলান্ড আক্রমণ করলেন তখন তিনি বার্লিনের প্রধানতম রাজপথের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হলেন। তাঁর মনে পড়ল ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সূচনার কথা। তখন কী উৎসাহ-উত্তেজনার সঙ্গে কাইজারের সেই 'যুদ্ধং দেহি' আহ্বানে জর্মনির জনগণ সাড়া দিয়েছিল।[১] তারা যে এবারে— তাঁর এবং গ্যোবেল্স্-এর কর্ণপটহবিদারক শত প্রোপাগান্ডা সত্ত্বেও— এরকম জড়ভরতের মতো চোখেমুখে নির্বিকার ঔদাসীন্য মেখে পোলান্ডগামী যুযুধানদের দিকে শুধুমাত্র তাকিয়েই থাকবে— ঘন ঘন সাধুবাদ, করতালি, স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম-সঙ্গীত, প্রজ্বলিত মশালসহ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে 'কদম কদম বাড়িয়ে' তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানানো, সৈন্যদের ধরে ধরে পথমধ্যে তরুণী যুবতীদের যদৃচ্ছা চুম্বনালিঙ্গন— কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সব ঝুট সব ঝুট— ; হিটলার ও ইয়ার গ্যোবেল্স তো রীতিমতো মুষড়ে পড়েছিলেন।

আসলে জনগণ সংগ্রাম চায়নি; তারা চেয়েছিল শান্তি। বিশেষ করে হিটলার তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা, দূরদৃষ্টি-প্রসাদাৎ, বছর তিনেক পূর্বে দেশকে যে আর্থিক সাচ্ছল্য এনে দিয়েছিলেন তারা চেয়েছিল নির্বিঘ্নে শান্তিতে সেটি দীর্ঘকালব্যাপী উপভোগ করতে। আর ভবিষ্যতে সুখভোগের জন্য হিটলার যেসব গণ্ডায় গণ্ডায় অঙ্গীকার করে বসে আছেন, সেগুলোর তো কথাই নেই। তার অন্যতম, বছর তিনেকের মধ্যে তিনি জর্মনির চাষি-মজুর প্রত্যেক পরিবারকে এক-একখানি সরেস 'ফল্কস্ভাগেন' (Volkswagen-folk-car—

১. হিটলার স্বয়ং সেই জনতায় ছিলেন। অধুনা এই মহানগরীতে প্রদর্শিত একটি 'হিটলার-ছবি'তে সেটি দেখানো হয়েছে। আসলে যে ফটো থেকে এ অংশ তোলা হয়েছে সেটি পাঠক পাবেন, ফটোগ্রাফার হফমান রচিত 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' পুস্তকে।

www.pathagar.com

জনগণরথ) দেবেন— বস্তুত তখন থেকেই অনেকে আগাম কিস্তি-আমানত দিতে শুরু করেছে। মোটরগাড়ি তা হলে শিকেয় উঠল!

বললে প্রত্যয় যাবে না, সুশীল পাঠক, এই যে জর্মনির প্রাশান অফিসারগোষ্ঠীকে বহু বহু যুগ ধরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রণবিশারদ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাদেরও অধিকাংশই এ সংগ্রাম চাননি। এঁদের একাধিক জন সংগ্রাম আসন্ন জেনে, এরই এক বৎসর পূর্বে, হিটলারের সম্মুখে তীব্র প্রতিবাদ তুলে নিরাশ হয়ে আপন আপন পদে ইস্তফা দেন। আর অর্থনৈতিকদের তো কথাই নেই। শাখ্‌ট্‌-এর মতো 'অর্থনৈতিক জাদুকর'ও যখন দেখলেন হিটলার তাঁর সাবধান-বাণী শুনলেন না তখন তিনিও অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল হিটলার ক্ষুদ্র রাজ্য পোলান্ডকে আক্রমণ করে যদি আশা করেন যুদ্ধ সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে তবে সেটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক দুরাশা। সেই খণ্ড-যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবেই হবে। এবং সেই সুদূরপ্রসারী দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বসংগ্রাম চালাবার মতো কাঁচামাল-মেটিরিয়েল জর্মনির নেই। (এবং শেষটায় প্রধানত এই কারণেই হিটলারের পতন হয়, এবং তিনি ক্রোধোন্মত্ত স্যামসনের ন্যায় সমস্ত 'গাজা'— এস্থলে তাবৎ ইয়োরোপ— তাঁর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে রসাতলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।)

শুনেছি, যেখানে হোক, যে কোনও প্রকারেই হোক একটা লড়াই বাধিয়ে দেবার জন্য হামেহাল তৈরিয়া হয়ে থাকে একটি গোদা দল— অস্ত্রশস্ত্র-নির্মাণকারী বিরাট বিরাট কারখানার মালিকগণ। শুনেছি এরা নাকি গ্যাঁটের কড়ি খরচা করে অনুন্নত দেশে সিভিল উয়োর লাগিয়ে দিয়ে পরে হরষিত হৃদয়ে উভয় পক্ষকেই বন্দুক কামান বোমা বিক্রি করে খরচার হাজারগুণ মুনাফা তুলে নেয়। (শকুনির যদি এ প্রকারের 'সুবুদ্ধি' থাকত তবে সে নিশ্চয়ই গো-কুলে মড়ক লাগাত।)

এস্থলে কিন্তু শুনেছি, সমরাস্ত্র-নির্মাণকারী জর্মনরাও হিটলারের যুদ্ধ কামনা করেননি। এঁদের অধিকাংশই জানতেন, এ যুদ্ধে জয়াশা নেই। ফলে মুনাফা তো যাবেই যাবে, তদুপরি শত্রুপক্ষ দেশ দখল করে এন্তেক কারখানাগুলোর সমুচা যন্ত্রপাতি— লক্‌ স্টক্‌ ব্যারেল— আপন আপন দেশে চালান দেবে।

তাঁরা অবশ্য তখন জানতেন না, ধন তো যাবেই, প্রাণ নিয়েও টানাটানি লাগবে।

এবং তা-ও হয়েছিল— ইতোপূর্বে যা কখনও হয়নি— যুদ্ধ শেষে মিত্রপক্ষ এইসব ডাঙর ডাঙর অস্ত্রপতিদের বিরুদ্ধে জোর মকদ্দমা চালায়; রিবেনট্রপ, কাইটেল ইত্যাদিকে ফাঁসি দেবার পর। জেল তো এঁদের অনেকেরই হয়েছিল— ফাঁসি হয়েছিল কি না, আমার মনে নেই। (অবশ্য শুনেছি, এখন ফের তাঁরা, অথবা তাঁদের বংশধররা— বন্দুক কামান তৈরি করে ক্ষণে বেচেন মিশরকে ক্ষণে ইজরাএলকে!)

এবং পাঠক আরও প্রত্যয় যাবেন, হিটলারের আপন খাস চেলা-চামুণ্ডাদের অনেকেই এ যুদ্ধ চাননি!— মায় তাঁর দু নম্বরি ইয়ার বিমান-বহরাধিপতি গ্যোরিং। এঁরা মোকা পেয়ে কলাকৌশলে তখন এতই ধনদৌলত জমিয়েছেন যে, বার্লিনের কৃষ্টি সম্প্রদায় এঁদের ঢপ-বেঢপের ঢাউস মেরৎসেডেজ মোটর দেখতে পেলে কখনও চেঁচিয়ে, কখনও আপসে মৃদুস্বরে বলত 'মহারাট্‌শা!'— মহারাজা শব্দের জর্মন উচ্চারণ। গ্যোবেল্‌স তো একবার উচ্চ কণ্ঠেই বললেন, 'এদের যদি এখন 'জ্যুস্‌ প্রিমে নক্‌টিস্‌' দেওয়া হয় তবেই এরা সর্বার্থে মধ্যযুগের ব্যারন হয়ে

www.pathagar.com

যাবে।' জ্যুস প্রিমে নক্‌টিস্ আইনের অর্থ : 'প্রথম রাত্রির অধিকার'। মধ্যযুগের বহু ব্যারনের 'অধিকার' ছিল তাঁর জমিদারিতে যত কুমারী কন্যা বিয়ে করবে, বিয়ের প্রথম রাত্রি তাদের কাটাতে হবে ব্যারনের শয্যায়।[২]

এরা অবশ্যই অন্তরে অন্তরে যুদ্ধ কামনা করেনি— বাইরে যতই লম্বা কোঁচা চড়াক।

তবে একথা ঠিক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হিটলারমন্ত্রে আবাল্য দীক্ষিত 'উষ্ণমস্তক' (মস্তিষ্ক এদের ধোলাই করে ফেলা হয়েছে, যাকে বলে ব্রেনওয়াশ, তাই বললুম 'মস্তক', 'খুলি' আরও ভালো) নিম্ন সরকারি সেনাদলের এস-এস-এ-র অনেকেই যুদ্ধ কামনা করেছিল।

কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের ওই তো একটা মস্ত সুবিধা— বা অসুবিধা— যা খুশি বলুন। ক্যাবিনেট ডাকতে হয় না, পার্লিমেন্ট নেই, আর প্লেবিসিটের তো কথাই ওঠে না। হিটলার, নেপোলিওন, স্তালিনকে রোকে কে?

মুসসোলিনির যুদ্ধ ঘোষণাটা হয়েছিল আরও মারাত্মক জনমতের বিরুদ্ধে। এমনকি তাঁর আপন জামাই, তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী চানো পর্যন্ত জর্মনদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে নামতে রাজি হননি। মুসসালিনি শেষটায় তাঁকে ভাতিকান-এ রাজদূত বানিয়ে দেন। আর ইতালির রাজা এবং রাজপরিবার যে কট্টর হিটলারবিরোধী ছিলেন সেকথা ইতালির মাক্কারনি-খেকো চাষাটা পর্যন্ত জানত, স্বয়ং হিটলারের তো কথাই নেই। বার্লিনে যখন ইতালির রাষ্ট্রদূত হয়ে এলেন জর্মনির প্রতি মোটামুটি সহানুভূতিশীল— দুষ্টবুদ্ধিতে অবশ্য 'রামপণ্টক'— দিনো আলফিয়েরি, তাঁকে পর্যন্ত কি হিটলার কি রিবেনট্রপ্ তাঁদের পক্ষে কন্‌ভারট করতে পারেননি।

মুসসোলিনির চলল একটানা পরাজয়ের পর পরাজয়। শেষটায় তাঁর আপন ফাশি-মণ্ডলী দলীয় সভায় তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব পাস করল (এটা অবশ্য নাৎসি জর্মনিতে ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়)— এবং তাঁর প্যারা মেয়ের স্বামী শ্রীমান চানো ছিলেন দুই নম্বরের ষড়যন্ত্রকারী। মোকা পেয়ে ইতালির রাজা মুসসোলিনিকে বন্দি করলেন। ফাশি রাজ্য লোপ পেল। কিছুদিনের মধ্যেই রাজা যুদ্ধবিরতির আদেশ দিলেন (৮ সেপ্টেম্বর— ইতালির ভ্রাতৃযুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে আমি পূর্ববর্তী অনুবাদে এ তারিখের গুরুত্বের কথা বলেছি)।

ইতোমধ্যে মিত্রশক্তি সম্পূর্ণ উত্তর আফ্রিকা জয় করে নেমেছে খাস ইতালিতে।

কিন্তু হিটলারও কিছু কম যান না। তাঁর ছলাকৌশল ও দুঃসাহস পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করে যে প্ল্যান বানালেন সেইটে প্রয়োগ করে, গত বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে দুঃসাহসী জর্মন বিমানচালক স্করদ্‌জেনি এক পাহাড়ের চুড়োয় অ্যারোপ্লেন নামিয়ে মুসসোলিনিকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন হিটলার সমীপে।

মুসসোলিনির তুবড়িতে কিন্তু এখন আর রত্তিভর বারুদ নেই। তিনি নির্বিবাদে জীবনের শেষ কটা দিন তাঁর প্রিয়া কারা পেতাচ্চির সঙ্গে কাটাতে চান। কিন্তু হিটলার খাণ্ডার হয়ে আছেন; বাধ্য হয়ে মুসসোলিনিকে নতুন ফাশি পার্টি নির্মাণ করে উত্তর ইতালিতে রাজ্যস্থাপনা করতে হল। সেটা চলল পরিপূর্ণ জর্মন তাঁবেতে।

২. অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ সঙ্গে *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা* কেতাবের গুরুপ্রসাদী অংশটুকু পড়ে দেখবেন।

www.pathagar.com

ইতালি তখন মার খাচ্ছে চতুর্দিক থেকে। মিত্রশক্তি জর্মনদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে এগিয়ে চলেছে ইতালির ভিতরে। ইতালীয়রা লড়তে চায় না। দুই কুত্তা যখন একটা হাড্ডি নিয়ে লড়ে তখন হাড্ডিটা (অর্থাৎ ইতালি) তো কোনও পক্ষ নিয়ে লড়ে না। কিন্তু জর্মন সৈন্য ইতালীয়দের জোর করে ধরে নিয়ে পিছনে সঙিন বসিয়ে তাদের লড়াল।

আর যারা বাধ্য হয়ে লড়ল তাদের মা-বউকে গাঁয়ে গাঁয়ে বিনা বিচারে গুলি করে মারল প্রধানত ফাশিবিরোধী কম্যুনিস্টরা। এরই একটি নিদারুণ কাহিনী আমি প্রকাশ করি ১৯৬১-৬২ সালে।

তখন অবতরণিকায় লিখি :

মিত্রপক্ষে ও জর্মনিতে তখন— জুলাই ১৯৪৪— জোর লড়াই চলছে। এবং জর্মনদের পিছনে ইতালীয় গেরিলারা (এদের কিছুটা কম্যুনিস্ট, বাকিটা ফ্যাসিস্ট ও নাৎসি-বিরোধী) যেমন জর্মনদের বিরুদ্ধে তীব্র গোপন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তেমনি আপন দেশবাসী ফ্যাশিস্ট ও জর্মন মিত্রদের (অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'গুঁতোর চোটে') বিরুদ্ধেও। এবং দেশবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইটাই হয়ে উঠেছিল তীব্রতর, তিক্ততর। 'রাজনৈতিক আদর্শবাদে'র জিগির তুলে সবাই আপন আপন শত্রুনিধনে লেগে আছে। ইতালি প্রতিশোধের দেশ এমনিতেই— আইন আদালত থাকাকালীনও— আর এই অরাজকতার সময় তো কথাই নেই।

এমনিতে কিন্তু ইতালীয়রা শান্তিকামী।

তাই তারা খেল গত যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মার।

১৩

ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধে। কিন্তু প্রাগুক্ত মহিলা তাঁর শোক সংবরণ করে তাঁর সম-দুঃখে-দুঃখী হৃদয়ের প্রকাশ দেওয়াতে আমিও কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে আপন অভিজ্ঞতা নিবেদন করি।

আমি বার্লিন যাই ১৯২৯-এ। হিটলার তখন ম্যুনিকের স্থানীয় উষ্ণমস্তিষ্ক রাজনৈতিক পাণ্ডা মাত্র। ১৯৩০-এ আমি রাইনল্যান্ডের বন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি। সেখানে হিটলারের কোনও প্রতিপত্তি ছিল না বললেই চলে।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হয় আমার এক সতীর্থ পাউল (Paul) হর্স্টারের সঙ্গে। সে পড়ত আইনশাস্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে তুর্কি ও আরবি— ইচ্ছা ছিল ডক্টরেট নেবার পর ফরেন আপিসে ঢুকবে। আমারও অপ্‌শনাল ছিল আরবি। সেই সূত্রে উভয়ের পরিচয় ও অত্যল্পকালের মধ্যেই গভীর সখ্য...। পাউলের বাপ-মা বাস করতেন নিকটবর্তী ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ শহরে। এক উইক-এন্ডে সে আমায় নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে। মা কখনও ইন্ডিয়ান দেখেননি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মন স্থির করতে পারছেন না, আমার জন্য কোন কোন বস্তু রান্না করবেন। আমরা সবাই রান্নাঘরে বসে— কোন একটা কথাচ্ছলে পাউল বলল যে, আমার মা সুদূর ভারতে প্রতিদিন আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছে। শোনামাত্র পাউলের মা তাঁর দু হাত দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে দ্রুতপদে চলে গেলেন পাশের ঘরে।

www.pathagar.com

অনেকক্ষণ পর ফিরে এসে ফের রান্নায় মন দিলেন।

সন্ধেবেলা ড্রয়িংরুমে কফি আর গৃহনির্মিত অতুলনীয় ক্রিমবান্ (পাটিসাপটার অতি দূর-সম্পর্কের ভাই) খাচ্ছি এমন সময় একটি অতিশয় সুপুরুষ যুবক এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে একটি সুন্দরী। কিন্তু এ যুবক যত্রতত্র সর্বত্র যেরকম পুরুষ-নারী উভয়ের বিমোহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সঙ্গের যুবতীটি ততখানি না। পরস্পরের পরিচয়াদির লৌকিকতা অবহেলে, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সোজাসুজি আমার কাছে এসে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমি আপনাকে চিনি; পাউলের বন্ধু। আর আমি ওই রাসকেলটার দাদা কার্ল। এবং এই রমণীটি আমার শিরঃপীড়া, অর্থাৎ আমার ভামিনী।'

আমি ঘন ঘন হাত ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললুম, 'আমার কাছে শিরঃপীড়ার অত্যুত্তম ভারতীয় হেকিমি দাওয়াই আছে। দেব আপনাকে? কিন্তু ডাক্তারের ফিজ দিতে হবে। শিরঃপীড়াটি দূরীভূত হলে সেটি— অপরাধ নেবেন না, স্যর— সেটি কি আমি পেতে পারি?'

কার্ল তো তার পাঁজরের দু পাশ দু হাত দিয়ে চেপে ধরে, কোমরে দু ভাঁজ হয়ে দুলে দুলে গমগম করে হাসে আর বার বার বলল, 'আমার তো ধারণা ছিল, পুরবীয়ারা (প্রাচ্যদেশীরা) রসিকতা করতে জানে না— সর্বক্ষণ মোক্ষ, নির্বাণ, স্যাল্‌ভেশনের চিন্তায় মশগুল!— তা, ব্রাদার, কিছু মনে কর না। আমার 'শিরঃপীড়া'র একটি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে— এক্কেবারে কামানের গোলা। গেল বছরে মিস্ রাইনল্যান্ড হয়েছেন। নেবে সেটি?'

ইতোমধ্যে লক্ষ করলুম কার্লের বউ লজ্জায় একেবারে পাকা টমাটো!

ঝপ করে একটা সোফাতে বসে বলল, 'কিন্তু তোমাতে-আমাতে আর 'আপনি' চলবে না। বুঝলে? তার পর, হ্যাঁ, কী যেন বলতে এসেছিলুম। আজ সন্ধ্যায় আমার ফ্ল্যাটে পার্টি। পাউল তোমাকে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে তো!'

আমি বললুম, 'অতি অবশ্যই। প্লেজার অনার! কিন্তু সেই যে আরেকটি শিরঃপীড়ার কথা বলছিলেন, তিনিও আসবেন কি?'

তার পর আর কার্লকে পায় কে? তার হাসি আর কিছুতেই থামতে চায় না।

শেষটায় কার্ল তার বউকে আমার পাশে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'মায়ের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নিই।' তার পর বউকে ফিসফিস করে শুধোল, 'ওকে তো ডাকা হয়নি। লাস্ট মোমেন্টে আসতে পারবে কি? তুমি দেখ তো।'

উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সোজা গিয়ে মায়ের কোলে দুম্ করে বসে পড়ল— ট্যারচা হয়ে। বাঁ হাত দিয়ে মায়ের বাঁ বাহু চেপে ধরে, ডান হাত দিয়ে মায়ের ঘাড় পেঁচিয়ে নিয়ে মায়ের গালে ঘন ঘন চুম্বন।

স্পষ্ট শুনতে পেলুম, মা বলছেন, 'ওরে গরিল্লা, ওঠ, ওঠ, আমার লাগছে!'

আমি জানতুম, তখন সে ঘরে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় জন আমি— যদ্যপি আমি কোনও পির প্যাকম্বর্ নই— নিতান্ত বিদেশি এবং তারও বাড়া ভারতীয় বলে। তাই আমি অক্লেশে বুঝতে পারলাম, কার্ল আমাকে ছেড়ে তার মায়ের কাছে চলে গেল কেন। সামান্য ড্রইংরুমে 'কে কার পাশে বসে, তাতে কি-বা যায়-আসে!' কিন্তু সে তার মাকে বোঝাতে চেয়েছিল, যে-ই আসুক যে-ই থাক, তার কাছে তার মা-ই সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

www.pathagar.com

কার্লের বউ ক্লারা আমাকে বলল, 'আমার বোন নিশ্চয়ই আসবে। তার অন্য এনগেজমেন্ট থাক আর না-ই থাক।'

আমি বললুম, 'তার অন্য এনগেজমেন্ট হয়তো তার লাভার, তার ইয়ংম্যানের সঙ্গে। তাকে নিরাশ করাটা কি উচিত হবে, এই আনন্দের দিনে? তাকেও ডাকুন না— অবশ্য যদি আপনাদের অন্য কোনও সুবিধা না থাকে।'

ক্লারা আমার দিকে বিস্মিত নয়নে তাকাল।

আমি বুঝতে পেরেছি।

আমি শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'আপনি ঘাবড়াচ্ছেন যে আমাতে আর আপনার বোনের লাভারেতে খুনোখুনি হবে— না? নিশ্চিন্ত থাকুন, কিচ্ছুটি হবে না। সে কি আপনার বোনকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেড়েছিল?'

'এ যাবৎ করেনি। কেমন যেন গড়িমসি করছে।'

দৃঢ় কণ্ঠে আমি বললুম, 'আজ রাত্রেই সে প্রস্তাব পাড়বে।'

'???'

'আমি আপনার বোনের সঙ্গে একটুখানি ভাবসাব করতেই সে রেগে, চটে, হিংসায় জর্জর হয়ে, আমাকে টিড দেবার জন্য আজ রাতদুপুরেই সে প্রস্তাব পাড়বে। হল?'

সে সন্ধ্যায় কার্লের বাড়িতে জব্বর পার্টি হল। আমার তিনটি জিনিস মনে আছে।

কার্ল যখন আমাদের নাচের জন্য পিয়ানো বাজাচ্ছিল তখন আমার নজর গেল তার হাত দু খানির দিকে। সেই হাতের আঙুলগুলো তন্বঙ্গী দীর্ঘ, অথচ সেগুলোর তুলনায় বাকি হাত আরও ছোট। এতে যেন কোনও প্রোপরশন নেই। কিন্তু কী সুন্দর! এরকম হাতের বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। বারবার আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল আমার মায়ের হাত দুটি।

গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছি।

এমন সময় কে যেন আমার খাটের বাজুতে এসে বসল। আধো ঘুমে শুধালুম, 'কে?'

'আমি পাউলের মা। আমি শুধু বলতে এসেছিলুম, এই যে আমার পাউল, সে সপ্তাহের ছ দিন থাকে বন শহরে, প্রতি শনিবার ছুটে আসে আমার কাছে। আর বন তো এখান থেকে দূরে নয়। ডাকগাড়িতে আধঘণ্টার পথ মাত্র। তবু আমি এই ছ দিন কী ছটফটই না করি।

'আর তোমার মা? তিনি থাকেন কত সমুদ্রের ওপার।

'তাঁর দিন কাটে কী করে?

'তুমি খুব তাড়াতাড়ি পাস দিয়ে বাড়ি চলে যাও।'

তার পর আমার কপালে চুমো দিলেন। আমার মনে হল, এ তো আমারই মায়ের চুমো।

১৪

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে অকস্মাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে হিটলারের দল জর্মন পার্লিমেনটে এত অধিক সংখ্যক আসন পেয়ে গেল যে তার গুরুত্ব জর্মনির বাইরে তো বটেই, ভিতরে অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। কম্যুনিস্টরা ঠিক-ঠিকই বুঝেছিলেন কিন্তু স্তালিন তখন

www.pathagar.com

আপন ঘর সামলাতে ব্যস্ত এবং বিশ্বভুবনজোড়া প্রলেতোরিয়া রাজ্য স্থাপনের সদিচ্ছা তিনি তখন প্রায় ত্যাগ করেছেন। জর্মন কম্যুনিস্টরা বাতুশকা স্তালিনের কাছ থেকে সাহায্য পেল অত্যল্পই।

পাঠক হয়তো আশ্চর্য হবে যে, আমার সতীর্থ পাউল হর্স্টারের অগ্রজ কার্ল কিন্তু ঠিক-ঠিক বুঝে গিয়েছিল, দেয়ালে কী লিখন লেখা হয়ে গেল—

'আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি কোন অভিশাপ গেল লিখি।'

১৯৩২-এর বড়দিনের পরবে গেলুম ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ।

রান্নাঘরে বসে কার্ল-পাউলের মার সঙ্গে রসালাপ করছি।

এমন সময় কার্ল এসে ঘরে ঢুকল। প্রথম মাকে গণ্ডা দুই চুমো খেয়ে আমাকে দিল গণ্ডাখানেক। কুশলাদির লৌকিকতা বর্জন করে সরাসরি শুধাল—

'হেই, ভাইয়া, জর্মন পলিটিক্স কিছু রপ্ত করতে পেরেছিস?— এক বছর তো হয়ে গেল এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে এসেছিস!'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, 'পফুই (অর্থাৎ ছিঃ!), এমন কথা বলতে নেই। মুখে ঘা ('কুষ্ঠ' ঘা-টা আর বললুম না) হবে। জর্মনি কান্ট-গ্যোটে, বেটোফেন ড্যুরারের দেশ। কিন্তু, বাওয়া, তোমাদের পলিটিক্সের জট ছাড়ানো আমাদের গান্ধীরও কম্ম নয়। হালে একখানা চটিবই কিনেছি। জর্মনের ছাব্বিশ না আঠাশখানা পার্টির (বাপ্‌স!) ঠিকুজি-কুলজি দপে দপে তাতে বয়ান আছে। পড়েছিলুম কবে! এখনও মাথাটা তাজ্জিম-মাজ্জিম করছে।'

পরম অবহেলা ভরে বলল, 'ছোঃ! তোদের না থ্রি হান্‌ড্রেড মিলিয়ান গডেসেস্ আছে! হিসাব রাখিস কী করে? তোদের আবার 'লাকি' দেশ— কার্ড ইনডেক্‌সিঙের গব্বযন্তনা সেখানে এখনও পৌঁছয়নি। তা সেসব কথা যাক। ইতোমধ্যে তোকে একটি মহামূল্যবান সদুপদেশ দিচ্ছি— তোর সেই রাম আহাম্মুখীর সাক্ষাৎ ডক্টরেট্‌-সার্টিফিকেট ওই পার্টি পঞ্জিটি সিকি দরে বিক্রি করে দে— তোর চেয়েও প্রাইজ-ইম্বেসাইল এ দেশে রাইন নদের সামোন মাছের মতো আবজাব করছে। নইলে শিকের হাঁড়িতে (ওদের ভাষায় মাটির নিচের সেলারের কয়লা গুদোমে) তুলে রেখে দে। দরকার মাফিক ওরই পাতা ছিঁড়ে ঘরের স্টোভে আগুন ধরাবি। কিন্তু সেকথাও থাক। আসল তত্ত্বকথাটা শোন্।'

তার পর সত্যি অত্যন্ত সিরিয়াস মুখে বলল— কার্লকে এই প্রথম আমি গম্ভীর হতে দেখলুম— 'বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। জানিস, হিটলার রাইখস্টাগে অনেকগুলো সিট পেয়ে গিয়েছে?'

আমি হেসে উঠলুম। এ যেন পর্বতের মূষিকপ্রসব!

ইতোমধ্যে পাউল রান্নাঘরে ঢুকে মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। লক্ষ করলুম, আমার হাসির সঙ্গে হামদরদী দেখিয়ে দোহারের মতো স্মিত হাস্য সে করল না— যা সে আকছারই করে থাকে। মায়ের মুখে কোনও ভাবের খেলা নেই।

কার্ল কোনওদিকে খেয়াল না করে আমাকে সরাসরি শুধোল, 'তুই হিটলারের "মাইন কাম্‌পফ্" (বাঙলাতে মোটামুটি আমার সংগ্রাম) পড়েছিস?'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'রক্ষে দাও বাবা! ও বই আদ্যন্ত পড়া আমার কর্ম নয়। একে তো তোমাদের এই জর্মন ভাষাটি এমনই প্যাঁচানো-জড়ানো, ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড, এবং নিদেন বিশ-ত্রিশটি লাইনের ন্যাজ না খেলিয়ে তোমাদের একটা সেন্‌টেন্স

সম্পূর্ণ হয় না, তদুপরি তোমাদের ওই হিটলারবাবু যেন মাথায় গামছা বেঁধে বেল্ট টাইট করে, মোজা উপর বাগে টেনে নিয়ে, গণ্ডারের চর্বির টনিক খেয়ে উঠেপড়ে লেগে গেছেন, সরল জিনিস কী কৌশলে দুরূহ করা যায়— অবশ্য আমার জর্মন জ্ঞান যা, সেটা তো 'নাথিং টু রাইট হোম এবাউট'! তবে, হ্যাঁ, বিস্তর হোঁচট খেয়ে চোট-জখম হজম করে খাবলা মেরে মেরে মোদ্দা কথা কটি ধরে নিয়েছি।'

কার্ল 'মাইন কাম্‌পফ্‌'-এর ভাষা বাবদ সায় দিয়ে বলল, 'তোর জর্মন ভাষা-জ্ঞানের কথা উঠছে না। ওই আকাট ব্যাটা হিটলার তো আসলে কথা কয় পশ্চিম অস্ট্রিয়ার অতিশয় চোতা জর্মন ডাইলেক্টে। তদুপরি তার গায়ে রয়েছে চেক রক্ত, কেউ-বা বলে দু-চার ফোঁটা ভ্যাগাবন্ড জিপসি 'নাপাক' খুনও তাতে মেশানো রয়েছে। এরকম দু-আশলা, সাড়ে তিন আশলা লোক, তদুপরি 'উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে'— সে আবার লিখবে জর্মন! তা তার লেখার ধরন যত না মারাত্মক, তার চেয়ে তার প্রোগ্রামটা ঢের ঢের বেশি মারাত্মক। ইহুদি জাতটাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, ফ্রান্স দেশটাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে এবং সর্বশেষে রাশার বৃহদংশ দখল করে সেখানকার চাষাভুষোদের রীতিমতো গোলাম বানিয়ে, যাকে বলে স্লেভ লেবার, জর্মনদের জন্য ফোকটে দেদার দেদার রুটি মাখন আণ্ডা বেকন লুট করতে হবে। সে-ও না হয় বুঝি, এই বিরাট দুনিয়ায় কত না তরো-বেতরো গুণ্ডা-গ্যাংগস্টার হয়— অতি অবশ্য আমার ধর্ম-বুদ্ধি এতে একদম সায় দেয় না, কিন্তু যে করাল বিভীষিকা আমি চোখের সামনে দেখছি সেটা এই যে, হিটলারের এই শয়তানি স্বপ্ন সফল তো হবেই না, মাঝখান থেকে লক্ষ লক্ষ জর্মন যুদ্ধে মারা যাবে, তাবৎ জর্মন দেশটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে এই যে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ব্রাদার কার্ল, এসবের অধিকাংশ ভোট পাবার জন্য পোলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা। আমাদের রাজা ইংরেজ বলে, তাদের খেদমত করলে খুব শিগগিরই আমরা সবাই রাজা হয়ে যাব, কংগ্রেস বলে, ইংরেজকে তাড়িয়ে দিলে আমরা রাজা না, মহারাজা হয়ে যাব। আমি অবশ্য জিনিসটা বড্ড ক্রুড ভাষায় বলছি। কম্যুনিস্টরা বলে—'

হঠাৎ লক্ষ করলুম, কার্লের মুখের উপর দিয়ে যেন একটা উড়ো মেঘের ছায়া পড়ে মিলিয়ে গেল। আমি শুধালুম, 'কার্ল, তুমি কি কম্যুনিস্ট?'

'এককালে ছিলুম। বছর দুই হল পার্টি মেম্বারশিপ রিজাইন দিয়েছি। ওই সময় থেকে চাঁদাও আর দিইনি।'

'কেন?'

'সেকথা আরেকদিন হবে।'

গোটা ১৯৩১টা আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে আমি এমনই ব্যস্ত ছিলুম যে, ডুস্‌ল্‌ডর্ফ যেতে পারিনি। এমনকি ১৯৩১-এর বড়দিনটাতেও ফুরসত করে উঠতে পারলুম না।

১৯৩২ পরীক্ষা পাস করে জর্মনি ত্যাগ করার পূর্বে একদিনের তরে ডুস্‌ল্‌ডর্ফ গেলুম হরস্টার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য। আমার কপাল মন্দ, কার্ল শহরে ছিল না। বড় বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, বন হয়ে ইতালিতে এসে জাহাজ ধরলুম।

১৯৩২ কেটে গেল। পাউলের চিঠিপত্র পাই।

www.pathagar.com

১৯৩৩-এর জানুয়ারি মাসে হিটলার জর্মনির চ্যান্সেলর বা কর্ণধার হলেন।

তার দু মাস পরে পাউলের একখানা অতি ক্ষুদ্র চিঠি পড়ে আমি স্তম্ভিত। কার্লকে জর্মনির 'গোপন পুলিশ' অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়ে নির্জন কারাবাসে রেখেছে। বেল পাওয়ার কোনওই আশা নেই। তার বিরুদ্ধে গোপন বা প্রকাশ্য কোনও আদালতে যে মকদ্দমা উঠবে তার সম্ভাবনাও অতিশয় ক্ষীণ।

১৫

১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফেরার পর ৩৩-এর সম্পূর্ণ বছরটি কাটাই দেশের ছোট শহরে মায়ের সঙ্গে। সুদীর্ঘ, প্রায় তিন বছর পর ফের মায়ের কাছে ফিরে এসেছি। এর পূর্বেও, অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত আমি মায়ের কাছে এসেছি পুজো আর গরমের ছুটিতে, মাত্র কয়েকদিনের, কয়েক সপ্তাহের জন্য। আমি পেয়েছি মায়ের সঙ্গ-সুখ, মা-ও পেয়েছে আমার সঙ্গ-সুখ— ফের আমাকে দেশ ছাড়তে হবে, এই আসন্ন বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ তলওয়ার সূক্ষ্ম একটি চুলে ঝুলছে অবশ্য অহরহ মায়ের মাথার উপর। কে বেশি আনন্দ পেয়েছিল সেটির মীমাংসা আমি নিজে করবার হক ধরিনে। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যেসব মাতা ও সন্তান আছেন তাঁদের হাতেই শেষরায়ের জিম্মেদারি ছেড়ে দিলুম। আর যেসব সন্তানের মা তাদের অল্প বয়সে স্বর্গলোকে চলে গেছেন সেসব দুঃখীদের কথা আমি মোটেই ভাবতে চাইনে।

আমি জানি, আমার যেসব পাঠিকা মা, তাঁরা আমাকে একটা মূর্খ ধরে নিয়ে (এবং আমি সে 'ধরে-নেওয়াটা'র বিরুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ আপত্তি মুহূর্তেক তরে তুলব না, কারণ আমার পিঠপিঠ দাদা এখনও আমাকে নিত্যনিয়ত অকাট্য যুক্তিপ্রমাণসহ 'পদ্মভূষণে'র পরিবর্তে 'গণ্ডমূর্খ' 'অলিম্পিক ইডিয়েট' খেতাব দেয়) বলবেন, 'অতি অবশ্যই মাতা পুত্রের সঙ্গ-সুখ পুত্রের তুলনায় বহুগুণে, বহু উৎকর্ষে, বহুতর আনন্দ-ঘন চরমা তৃপ্তি পরমারাম পায়। শুধু তাই নয়, পুত্রের জন্যও সে সঙ্গে সঙ্গে এক মহামিলনের মহানন্দময় মহোৎসবের সৃষ্টি করে— কারণ মা তার স্বভাবজনিত নিঃস্বার্থপরায়ণতায় চায়, সন্তানও যেন তারই মতো— এমনকি তারও বেশি পরিপূর্ণানন্দ লাভ করে। কিন্তু সন্তান কি সেটা পারে? পুত্র যুবা। সে চায়, মায়ের ভালোবাসার বাইরেও অনেক-কিছু— খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থবৈভব; তদুপরি সে কামনা করে অন্য রমণীর যৌবন-মদিরাভরা প্রণয়— এ-ও কি তখন সম্ভবে, যে, সে তখন শিশুকালে যেরকম একাগ্রচিত্তে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মাতৃস্তন শোষণ করেছিল আজও সেইরকম : তার মাতৃস্নেহসিক্ত সঙ্গসুজাত আনন্দযজ্ঞ থেকে সেই প্রকারেই একাগ্রচিত্তে বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রতিটি মধুকণার সৌরভঘন আনন্দরস নিঃশেষে শোষণ করবে? সেই শিশু জন্মলাভের পরই মায়ের বামস্তন ওষ্ঠাধর দ্বারা অবিরত নিষ্পিষ্ট করে যেন মাতৃদেহের শেষ রক্তবিন্দু লুণ্ঠন করে নিয়েছে, তার বামহস্ত মাতার দক্ষিণ স্তনের উপর রেখে সেই ক্ষুদ্র হস্তাঙ্গুলির কোমল পরশ ছুঁইয়ে আরও দুগ্ধ আরও অমৃতের আহ্বান জানাচ্ছে।

ইতোমধ্যে মধ্যে মধ্যে তার অতিহ্রস্ব, অতিশয় স্ফীত বাম পদ দিয়ে মাতার দেহে মধুর মধুর পদাঘাত করছে।

www.pathagar.com

সুশীল পাঠক! তুমি হয়তো ভাবছ, আমি যশোদানন্দন শ্রীশ্রীবালকৃষ্ণের কাব্যচ্ছন্দে বাঁধা মাতৃদুগ্ধ পান এতশত যুগ পরে কেন গদ্যময় নীরস ভাষায় পুনরায় পরিবেশন করছি! (কিন্তু আমি জানি, প্রকৃত বৈষ্ণবজন বিশেষ করে আমার মুরুব্বি শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ, আমার এ অনধিকার চর্চা অবহেলে এবং সস্নেহে ক্ষমা করবেন।) নিবেদন, আমার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

এই যে আমি আমার মাকে অনেকখানি হতাশ-নিরাশ করলুম (অবশ্য সব মা-ই সেটা মাফ করে দেয়), তার তুলনায় আমার মা কী করল?

আমার বয়স যখন চৌত্রিশ তখন আমার মা ১৯৩৮ সালে আমাকে ছেড়ে ওপারে চলে গেল। সেই বিচ্ছেদের পর আমি আরও চৌত্রিশ বৎসর ধরে এ সংসারে সেই মায়ের বিরহযন্ত্রণা কতখানি নিতে পারি, তারই চেষ্টা করছি।

এইবারে আমি পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্য খুলে বলছি—

যে-মা আমার ছ মাস এক বৎসর এবং সর্বাধিক, পৌনে তিন বৎসরের বিচ্ছেদ সইতে পারত না বলে দিনে দিনে ফরিয়াদ করত, সেই মা-ই আমার জন্য রেখে গেল চৌত্রিশ বৎসরের বিচ্ছেদ-বেদনা।

করজোড়ে স্বীকার করছি আমার মা আমাকে যতখানি ভালোবেসেছিল তার তুলনায় আমার ভালোবাসা নগণ্য। কিন্তু মাকে দিয়েছিলুম মাত্র পৌনে তিন বৎসরের বেদনা। তার বদলে মা আমাকে দিল চৌত্রিশ বৎসরের বিরহ। আমি কোনও ফরিয়াদ, কোনও নালিশ করছিনে। আল্লা আমার মায়ের পূতাত্মা তাঁর পদপ্রান্তে নিয়ে মাকে তাঁর বহু দুঃখ বহু বিরহযন্ত্রণা থেকে শাশ্বত নিষ্কৃতি দিয়ে তাঁকে সর্বানন্দাতীত চরমানন্দ দিয়েছেন।

স্পর্শকাতরতাহীন পাঠক শুধোবেন, কার্লের কথা কও। তোমার মায়ের কথা এ স্থলে টেনে আনছ কেন?

কার্লকে জেলে নিয়ে যায় ১৯৩৩-এর বসন্তে। তার পর এল ইস্টারের পরব। ওই সময় আমি পাউলের সঙ্গে প্রতি বছর ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ গিয়ে সপরিবারে কার্ল এবং পাউল পরিবারের সঙ্গে পরব পালন করতুম। ওই সময়ে প্রভু যিশু ক্রুশবিদ্ধ হন এবং সপ্তাহান্তে তিনি পুনরুত্থান করেন।

১৯৩২-এর পরবের সময় আমি দেশে। কার্ল-পাউল আমাকে রঙিন কার্ড পাঠায়; সঙ্গে দীর্ঘ আবোল-তাবোল-ভরা নানাপ্রকারের কেচ্ছা-কাহিনী।

১৯৩৩, কার্ল জেলে। কিন্তু মানুষ অসম্ভবের আশা ত্যাগ করতে পারে? আমার ছিল দুরাশা, হয়তো হিটলার-রাজ এই সময়ে একটা মহানুভব ব্যত্যয় করে কার্লকে চিঠি লিখতে দেবে।

না। এমনকি পাউলও চিঠি লেখেনি। শুধু কার্ল-পাউলের পিতা আমাকে একটি পিকচার কার্ড পাঠিয়েছে। তার উপরে বৃদ্ধ পিতার কম্পিত হস্তে, কোনওগতিকে লেখা আমার প্রতি আশীর্বচন।

ইতোমধ্যে প্রতি সপ্তাহে প্রতি চিঠিতে বার বার পাউলকে শুধোই (তখন অ্যারমেল হয়নি), 'কার্লের খবর কী? কার্লের খবর জানাও।'

পাউল উত্তরে আমার মূল প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। তার বাপ-মা, কার্লের বউ-বাচ্চা সম্বন্ধে অনেককিছু লেখে।

www.pathagar.com

তার পর একটা চিঠিতে লিখল, 'ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফের জেলে সুপারিনটেনডেন্ট আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে নিভৃতে বলেছে, আমি যেন আমার দাদার অতখানি তত্ত্বতাবাশ না করি। নইলে আমাকেও তারা জেলে পুরতে বাধ্য হবে। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি।'

তখনও নাৎসি পার্টি পরবর্তী যুগের চরমতম পৈশাচিক বর্বরতায় পৌঁছয়নি। তাই জেলের কর্তা পাউলকে এই সহানুভূতির উপদেশ দিয়েছিল।

এ চিঠি পেয়ে আমি দুর্ভাবনা দুর্ভাবনায় কাতর হয়ে পড়লুম।

তার পর দু মাস ধরে, পূর্ণ দু মাস ধরে পাউল সম্পূর্ণ নীরব। আমার তখন কী অবস্থা সেটা বোঝাই কী প্রকারে?

আমার মা আমার মনমরা ভাব বেশ লক্ষ করেছে। একদিন শুধোল, 'হ্যাঁ রে, তোর কী হয়েছে! বিদেশি চিঠি পেলেই তুই শুয়ে পড়িস কেন?'

আমি সবকথা খুলে বললুম।

কার্লের মা-ও মা, আমার মা-ও মা।

আমার মা বলল, সে কার্লের জন্যে দোওয়া মেঙে তার জন্য নফল নামাজ পড়বে।

ততদিনে বড়দিন এসে গেছে। বড়দিন শেষ হল।

কিন্তু পাউল কিংবা তার বাপ-মা কারও কোনও চিঠি নেই।

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে পাউলের চিঠি এল।

সংক্ষেপে লিখেছে :

'ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় দাদা আত্মহত্যা করেছে। কোনও এক সদাশয় জেলগার্ড দাদাকে এক প্যাকেট সিগারেট দেয়— গোপনে। দেশলাই পুড়িয়ে পুড়িয়ে সিগারেটের খোলে সে লিখে গিয়েছে, 'মাকে সান্ত্বনা দিও।' গার্ডটিই আমাকে সেটা পৌঁছিয়ে দেয়।'

চিঠি যখন পড়ছি আমার মা তখন সম্মুখে ছিল। শুধোল, 'হ্যাঁ রে, কী খবর পেলি? তোর বন্ধু ভালো আছে তো?'

আমি সত্য গোপন করিনি।

মা দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নামাজের ঘরের দিকে চলে গেল।

১৬

কার্ল-এর কথা শেষ হয়েছে। তথাপি বিবেচনা করি কোনও কোনও সহানুভূতিশীল তথা কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা জানতে চাইবেন যে, কীসব দুর্দৈব কোন সব নিপীড়নের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে একদিন কারাগারের পাষাণপ্রাচীর ভেদ করে কার্লের কাছে দিব্য-জ্যোতি উদ্ভাসিত হল যে এ জীবন নিরর্থক; কিংবা হয়তো কোনও কোনও মনস্তত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা প্রকাশ করে বললেন, কার্ল অংশত মতিচ্ছন্ন অবস্থায় স্বেচ্ছায় এ সংসার থেকে বিদায় নেয়— কার্ল সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় কি কখনও তার সে মায়ের কাছ থেকে চিরবিদায় নিতে পারত, যে-মাকে সে এতখানি প্রাণঢালা সোহাগ করত, তার জায়া তার শিশুকন্যাকে সে প্রাণাধিক ভালোবাসত? কবি বলেছেন—

'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?'

www.pathagar.com

এরই কাছাকাছি একটি অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, কার্লেরই সমগোত্রীয় হিটলারবিরোধী এক শহিদ। ইনি জর্মনিতে কার্লের মতো অজানা-অচেনা জন নন। উলরিব ফন্ হাসেল ছিলেন ইতালিতে জর্মন রাজ্যের মহামান্য রাষ্ট্রদূত। বিদগ্ধ পণ্ডিতরূপে তিনি ইংল্যান্ড থেকে বুলগেরিয়া, রুমানিয়া পর্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন এবং বহু দেশে বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর আমন্ত্রণে বহু জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। হিটলারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়ামাত্রই তিনি সেই সম্মানিত রাষ্ট্রদূতের পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে হিটলারকে নিধন করার যে ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হয় তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। অর্থাৎ কার্লের আত্মহত্যার এগারো বৎসর পর।

ফন্ হাসেল কিন্তু এক হিসেবে কার্লের চেয়ে সৌভাগ্যবান ছিলেন। নির্জন কারাগারে তিনি কাগজ-কলম পেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর 'আত্মচিন্তা'র কিছুটা লিখে যাবার সুযোগ পান।

সেই 'আত্মচিন্তা' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে আসন্ন মৃত্যু অনিবার্য জেনে তিনি মাত্র তিনটি ছন্দে গাথা ছত্রে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর আশাভরা অনুভূতি প্রকাশ করেন :

'তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারো মৃত্যুদ্বার দিয়ে
আমরা তখন যেন স্বপ্ন-সম্মোহিত
এবং অকস্মাৎ আমাদের করে দিলে মুক্ত।'[১]

সেই রবীন্দ্রনাথের 'এই দুয়ারটুকু'। এটি 'পার হতে' কার্ল, ফন্ হাসেল কারও কোনও সংশয় ছিল না।

১৯৩৩-এর বড়দিনে কার্ল ওপারে চলে যায়।

১৯৬৪-এর গ্রীষ্মে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে ফের জর্মনি যাই।

বন শহরের আমার এক প্রাক্তন অধ্যাপকের সঙ্গে বাস করছি। পাউলকে চিঠি লিখলুম। সে জানাল, ইতোমধ্যে তার মা কার্লের সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। তার বাপ পেনশন পেয়েছেন। পাউল লিখেছে, 'না পেলেই ভালো হতো, বুড়ো একটা কিছু নিয়ে থাকতে পারত। এখন সে তার জাগ্রতাবস্থার অধিকাংশ সময় কাটায় রান্নাঘরের সেই ভাঙা কৌচটার উপর যেখানে বসে বসে মাকে সঙ্গ দিত; পূর্বেরই মতো— কিন্তু এখন একা একা, এবং প্রায় সমস্ত দিনরাত্রি— আগে অন্তত ন ঘণ্টাটাক আপিসে কাজকর্ম করত। আর সমস্তক্ষণ আগেরই মতো সিগার ফোঁকে। তবে আগে ফুঁকত তামাম দিনে গোটা ছয় মোলায়েম সিগার; এখন গোটা আঠারো এবং এ দেশের সবচেয়ে কড়া সিগার। আমি অনুরোধ করাতে মাসি এসেছে। মাসি মায়েরই মতো ভালো রাঁধতে পারে। আগে বাবাই সেকথা বার বার স্বীকার করেছে। এখন শুধু খুঁত-খুঁত করে।' লক্ষ করলুম, পূর্বের প্রথামতো পাউল যথারীতি আমাকে ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ যাবার নিমন্ত্রণ জানায়নি।

বেদনা পাওয়ার কথা ছিল; আমি পেলুম শান্তি-স্বস্তি।

পাউল বন শহরে এসে আমাদের ছাত্রাবস্থার পাব-এ রাঁদেভু স্থির করল।

---

১. অধুনা অনেকেই জর্মন শিখছেন, তাই মূল পাঠ তুলে দিলুম;—

'Du kannst uns durch des Todes Nueren
Trtaumend fuehren
Und machest uns Uns auf einmal frel.'

www.pathagar.com

কুশল আলিঙ্গনাদির পর পূর্বের প্রথামতো সে আধলিটার বিয়ার অর্ডার দিয়ে গেলাসটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শেষটায় একচুমুকে আধগেলাস শেষ করে বলল, 'কীই-বা তোকে বলি, যা তুই শুনতে চাস। কার্ল ধরা পড়ার একমাস পর এল ইস্টার পরব। কর্মে তার বিশেষ মতিগতি ছিল না কিন্তু ধর্মের পরব, লৌকিকতা নিয়ে সে হই-হুল্লোড় করতে বড় ভালোবাসত। নানা রঙের কাগজের ডিম মুড়ে সেগুলোকে চিত্র-বিচিত্র করা থেকে শুরু করে, নিতান্ত বাচ্চাদের মতো সেগুলোকে কল্পনাতীত অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় লুকনো, তার পর আমাদের সব্বাইকে নিয়ে বিকট চিৎকার লাফালাফি দাপাদাপি করে সেগুলো খোঁজা, তার বউ যেগুলো লুকিয়েছিল সেগুলো খুঁজে পাওয়াতে রেড-ইন্ডিয়ান স্টাইলে তার তাণ্ডব নৃত্য, তার উৎকট উদ্দাম জয়োল্লাস— এসব কথা সে নিশ্চয়ই জেলে বসে বসে ভেবেছিল।'

আমার চোখে জল এল। বললুম, 'পাউল, তোর মনে আছে '৩২-এর পরবে কার্ল তোর মারফত আমাকে এক ডজন রঙিন ডিম পাঠিয়েছিল?'

পাউল মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বলল, 'তুই তো সর্ব ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করিস তোর অজানা নয়, অনেক ক্যাথলিক ইস্টারকে বড়দিনের চেয়ে বেশি সম্মান দেয়। ওই সময় প্রভু যিশু মৃত্যুবরণ করার সময়েও তাঁর নিপীড়নকারীদের ক্ষমা করে যান। এই ইস্টার সপ্তাহটি ক্ষমতা, দয়া, মৈত্রীর সপ্তাহ। আমার সব নৈরাশ্য তখন দুরাশা দিয়ে চেপে ধরে ইস্টার ফ্রাইডে থেকে ইস্টার মানডে অবধি চারদিন রোজ গিয়েছি জেলখানায়, যদি এই ক্ষমাদয়ার সপ্তাহে ওরা একটু নরম হয়। মাকে না জানিয়ে।' পাউল থামল।

আমি বললুম, 'বুঝেছি, তুই বলে যা। আমি দেশে থাকতে সব শুনতে চেয়েছিলুম। এখন আর না। তুই সংক্ষেপে সার।'

পাউল বলল, 'তার দু মাস পরে এল তার মেয়ের নামকরণ দিবস।[১]

কার্ল ওইদিনই করত তার বাড়ির সবচেয়ে জব্বর পরব। মেয়েকে সাজাত শুভ্রাতিশুভ্র সাদা রেশমি জামা-কাপড়ে আর হল্যান্ড থেকে কেনা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লেস্ ঝালরে।

কার্ল জেলে। হয়তো ভাবছে মা কী করে বাচ্চাটিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে আজ সেরকম পরব হচ্ছে না কেন?

তার পর এল কার্লের বাৎসরিক বিবাহোৎসব।

এসব কটা পরব পড়ে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসে। শুধু তার বউ আর আমাদের মার নামকরণ দিবস পড়ে জানুয়ারি থেকে মার্চে।

এ সব কটা দিনে কার্ল কারাগারে কী বেদনা অনুভব করেছিল তার খানিকটা কল্পনা আমি করতে পারি। আর সেই দরদী গার্ড আমাকে তার শেষ মেসেজ দিয়েছিল সে আমাকে কিছুটা বলেছিল। কার্ল নাকি তাকে তার পরিবারের প্রতি পর্বদিন ওকে ওই সম্বন্ধে একটু-আধটু বলত।

তার পর বড়দিন এল। সে আর যে সইতে পারল না। সেকথা তোকে তো চিঠিতে লিখেছিলুম।'

---

১. ক্যাথলিকরা জন্মদিন পালন করে না। ঠাট্টা করে বলে, শ্যাল-কুকুরেরও তো জন্মদিন আছে। তারা পালন করে যে সন্তের নামে বাচ্চার নাম দেওয়া হয়েছে (যেমন পাউল, মারিয়া—মেরি, ইত্যাদি) তাঁর সেন্ট পদবি প্রাপ্তির দিন। এটাকে বলে, নামেন্সটাখ্।

www.pathagar.com

তার দু-একদিন পর আমি একটু সুযোগ পেয়ে পাউলকে শুধালুম, 'আচ্ছা পাউল, কার্ল তো হিটলার জর্মনির সর্বেশ্বর হওয়ার দু বৎসর পূর্বে পার্টি ছেড়ে দেয়, চাঁদা বন্ধ করে! তবে ওকে ধরল কেন?'

পাউল ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বলল, 'কিন্তু পার্টি কি ছাড়ে (আমাদের ভাষায় কমলি নহি ছোড়তি)? কার্ল ছিল পার্টির সবচেয়ে সেরা যুক্তিতর্কসিদ্ধ মেম্বার এবং উত্তম বক্তা। হিটলার ফুয়্যার হওয়ার পর যেসব মাতব্বর কম্যুনিস্টদের গ্রেফতার করা হয় তাঁদের প্রায় সক্কলেরই নোটবুকে কার্লের নাম-ঠিকানা পাওয়া গেল। আমি ওদের দোষ দিইনে; কিন্তু নাৎসিরা স্বভাবতই ধরে নিল এরকম একজন সর্ব-কম্যুনিস্ট-মান্য লোককে বন্ধ করে রাখাই সেফার।'

পাঠক হয় তো শুধোবেন 'কত না অশ্রুজল'-এ আমি কার্লের শেষ চিঠিকে যথাযথ মূল্য দিয়ে গোড়ার দিকেই ছাপালুম না কেন? কিন্তু যেখানে আমি অত্যুৎকৃষ্ট শেষ বিদায়ের চিঠিগুলো অনুবাদ করছি, সেখানে মাকে সান্ত্বনা জানিয়ে তিনটিমাত্র শব্দ, সেগুলোর কী অধিকার ওদের সঙ্গে সমাসনে বসার?

আন্ ফ্রাঙ্ক

অনেকেই জিগ্যেস করেন, নাৎসি পার্টির কি কোনও গুণ ছিল না, তারা কি সুদ্দুমাত্র পাপাচারই করেছে? এর উত্তরে একটি ক্লাসিক্যাল নীতিবাক্য সংবলিত ছোট্ট কাহিনী মনে আসে। এক দরিদ্র গ্রাম্য পাদ্রি গিয়েছেন শহরে— বিশপের সঙ্গে দেখা করতে, সকালবেলা বিশপ তাঁর চেহারা দেখেই বুঝে গেলেন, বেচারির পেটে তখনও কিছু পড়েনি। বাটলারকে হুকুম দিলে সে রুটি মাখন আর একটি ডিম-সেদ্ধ নিয়ে এল। পাদ্রি মৃদু আপত্তি জানিয়ে খেতে আরম্ভ করলে হঠাৎ বিশপের নাকে গেল পচা ডিমের গন্ধ। চশমার উপর দিকে অর্ধোন্মুক্ত পচা ডিম ও পাদ্রির দিকে যুগপৎ তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আপনাকে একটা পচা ডিম দিয়েছে!' পাদ্রি সাহেব তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বললেন, 'না হুজুর না, ইট্ ইজ অলরাইট—' তার পর একটু থেমে বললেন, '— অ্যাট প্লেসেস্'— অর্থাৎ কোনও কোনও জায়গায়।

তাই 'পাদ্রি সাহেবের ডিম' বলতে বোঝায়, পৃথিবীতে কি এমন কোনও পচা ডিম পাওয়া যাবে, যার সর্বশেষ অণুটুকুও পচে গিয়েছে? তেমন করে খুঁজলে অন্তত দু-একটি পরমাণু পাওয়া যাবে, যেগুলো সম্পূর্ণ পচে যায়নি।

নির্গলিতার্থ : ইহভুবনে এমন কোনও ব্যক্তি, বস্তু, প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না যার ভিতর 'নেই কোনও গুণ, শুধু কপালে আগুন'।

বস্তুত হিটলার তথা নাৎসি পার্টির অনেক গুণই ছিল, এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, গত বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত শ্মশান-মশানে পরিণত জর্মনি যে বছর-পাঁচেকের ভিতর আপন পায়ে দাঁড়াতে পারল, তার জন্য কিছুটা ধন্যবাদ পাবেন হিটলার ও তাঁর নাৎসি পার্টি। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কঠোর তপস্যা দ্বারা কী প্রকারে একটা দেউলে দেশকে (১৯৩৩-এর জর্মনি) মাত্র পাঁচটি

www.pathagar.com

বৎসরের ভিতর পরিপূর্ণ শক্তিমান বিত্তবান করা যায় (১৯৩৮-এর জর্মনি) সেই ভানুমতীর খেল দেখিয়েছিলেন স্বয়ং হিটলার। সেই সঙ্ঘবদ্ধ তপস্যালব্ধ চরিত্রবল বহুলাংশে প্রয়োগ করে যুদ্ধশেষে বিধ্বংসিত-জর্মনি পুনরায় শ্রী-সমৃদ্ধি লাভ করে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভুললে চলবে না, নাৎসিরা পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদিকে নিহত করে।

আবার তার পর এটা ভুলে গেলে আরও একটা মারাত্মক ভ্রম করা হবে যে, হিটলারের দৃষ্টান্ত থেকে বিশ্বমানবের মোক্ষম শিক্ষালাভ হয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। বস্তুত ন্যুরন্‌বের্গের মোকদ্দমার সময় যে-সেরা মার্কিন মনোসমীক্ষণবিদ্‌, ডাক্তার কেলি প্রধান প্রধান আসামি গ্যোরিঙ, রিবেনট্রেপ, কাইটেল ইত্যাদির মনোসমীক্ষণ (সাইকো-অ্যানালেসিস) দীর্ঘকাল ধরে করেন, হিটলার সম্বন্ধে নানা দ্ব্যর্থহীন তত্ত্ব ও তথ্য এদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন (আসামিদের সকলেই হিটলারকে বহু বৎসর ধরে অব্যবহিত অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন) এই ডাক্তার কেলি আপন 'সোনার দেশ', ইহলোকে 'গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ' মার্কিন মুলুকে ফিরে গিয়ে প্রামাণিক পুস্তক মারফত বলেন, এই মার্কিন মুলুকেই যে কোনও দিন এক নয়া-হিটলার নয়া-তাণ্ডব নৃত্য নাচাতে পারে, নাচতে পারে।

কেলি তাঁর পুস্তক প্রকাশ করেন সম্ভবত ১৯৪৭-৪৮-এ। তার পর দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে, খবরের কাগজে পড়লুম, এক গণ্যমান্য মার্কিন অধ্যাপক অস্ট্রেলিয়াতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, (কাটিং রাখিনি, মোদ্দাটা সাদামাটা ভাষায় বলছি) এখনও বিস্তর হিটলার রয়েছে; তারা সুযোগ পেলেই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

এই মোক্ষম হক বাক্যটি আমরা যেন কখনও না ভুলি।

অনেকেই জিগ্যেস করেন, হিটলার কি শুধু ইহুদি এবং তাঁর জর্মন-বৈরীদেরই (যেমন আমার সখা কার্ল, তথা কবীর-সখা ট্রটৎস্যু জল্‌ৎস্) নির্যাতন করেছেন? দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, শুধু তাই নয়। পোলিশ, চেকস্লোভাক-বুদ্ধিজীবী, যুদ্ধে বন্দি রাশান অফিসার আরও বহুবিধ লোক তাঁর দীর্ঘ হস্ত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। এমনকি, কয়েক হাজার নিতান্ত নিরীহ বেদের পালও কনসানট্রেশন ক্যাম্পে, গ্যাস-চেম্বারে প্রাণ দেয়; কী-এক অজ্ঞাত অখ্যাত ককেশাস না কোন এক অঞ্চলে ধৃত এক অতিশয় ক্ষুদ্র উপজাতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তারা স্লাভ না 'আর্য'? জর্মন তথা বিশ্বের সর্ব বিশ্বকোষ এদের সম্বন্ধে কোনও খবর দেয় না। শেষটায় হিটলারের খাস-প্যারা হিমলার-চিত্রগুপ্ত— যিনি কনসানট্রেশন-নরকের কার্ড ইনডেক্‌সিং-এর চিফ সেক্রেটারি— তিনি রায় দিলেন, আল্লায় মালুম কোন দলিলদস্তাবেজ 'বিদ্যাবুদ্ধি'র ওপর নির্ভর করে— যে, এরা স্লাভ, অর্থাৎ নাৎসি 'ধর্মানুযায়ী', বেকসুর বধ্য। ওরা মরে। যুদ্ধ শেষে তাবৎ খবর পাওয়ার পর বিশ্বপণ্ডিতরা নাকি ফতোয়া দিয়েছেন এরা আর্যদেরই কোন এক নাম-না-জানা উপজাতি। এবং কেউ কেউ বলেন, এই উপজাতি সমূলে নির্বংশ হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, না, দু-একটা উটকো হেথা-হোথা বেঁচে আছে এবং বংশরক্ষার জন্য বধূ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি সঠিক জানিনে।

কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ইহুদিরাই— শুদ্ধমাত্র ইহুদি পরিবারে জন্ম নেবার 'অপরাধ'-এর ফলেই— প্রাণ দিয়ে খেসারত দেয় সর্বাধিক।

www.pathagar.com

এ বাবদে অন্যতম উৎকৃষ্ট দলিল সৌভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষাতেই উৎকৃষ্টরূপে অনূদিত হয়েছে। একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের ইহুদি মেয়ের ডাইরি বা রোজনামচা। যুদ্ধের সময় লেখা। বাংলাতে বইখানির নাম 'আন্ ফ্রাঙ্কের ডায়ারি', অনুবাদক শ্রীঅরুণকুমার সরকার ও শ্রীঅংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমি মেয়েটির রোজনামচা থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি; পরে সুযোগ পেলে সবিস্তার আলোচনা হবে। ডাইরিকে উদ্দেশ্য করে মেয়েটি লিখছে—

'শুক্রবার, ৯ অক্টোবর, ১৯৪২

আজ তোমাকে কেবল খারাপ খবর শোনাব। আমাদের ইহুদি বন্ধুদের দলে দলে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইসব হতভাগ্য ইহুদিদের সাথে গেস্টাপো পুলিশ যে কী নির্দয় ব্যবহার করছে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এদের গরু-ছাগলের গাড়িতে বোঝাই করে ড্রেন্টের (Drente) ওয়েস্টারবর্ক (Westerbark) বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওয়েস্টারবর্কের নাম শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একশো লোকের জন্য মাত্র একটি হাত-মুখ ধোবার কল। পায়খানা নেই বললেই চলে। স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের একই জায়গায় শোবার ব্যবস্থা। এর ফলে, ব্যাপকভাবে নরনারীর চরিত্রস্খলন হচ্ছে। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক, এমনকি অল্পবয়সী মেয়েরাও গর্ভবতী হয়ে পড়ছে।

বন্দিশালা থেকে পালানো অসম্ভব। বন্দিশালার অধিবাসীর মার্কা হিসেবে এদের সকলের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে। খাস হল্যান্ডেই যখন এই অবস্থা তখন দূরদেশে স্থানান্তরিত করে এদের ওপর যে কী অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। আমাদের বিশ্বাস যে, তাদের অধিকাংশকে হত্যা করা হচ্ছে। ব্রিটিশ রেডিও থেকে বলা হচ্ছে যে, তাদের গ্যাস দিয়ে মারা হচ্ছে।

বোধ করি, এইটিই হত্যা করার সবচেয়ে সহজ পন্থা। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। মিয়েপের মুখে এইসব ভয়ঙ্কর গল্প শোনার সময়, আমার রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল, অথচ না শুনেও পারছিলাম না।

সম্প্রতি একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তার বাড়ির দরজার সামনে বসে ছিল। হঠাৎ পুলিশের গাড়ি তার বাড়ির সামনে এসে থামল, আর গাড়ি থেকে গেস্টাপো পুলিশ নেমে তাকে হুকুম করল, 'গাড়িতে উঠে এস'। পঙ্গু হতভাগিনী চলতে পারে না, কোনওরকমে হামাগুড়ি দিয়ে গাড়িতে উঠতে গিয়ে চাকার তলায় পড়ে গেল। জর্মনরা তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তাকে পিষে মেরে ফেলল।

জর্মনদের আর একরকম অত্যাচারের নাম হল প্রতিশোধমূলক হত্যা। ব্যাপারটা এইরকম— নিরীহ নাগরিকদের জামিনস্বরূপ জেলে পুরে রাখা হয়। যখনই হল্যান্ডের কোথাও জর্মনদের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তার প্রতিশোধস্বরূপ, নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে জেল থেকে টেনে বের করে গুলি করা হয়। তার পর তাদের মৃত্যুসংবাদ কাগজে ছাপানো হয়। এই হল হিটলারতন্ত্রের আসল রূপ। এরা আবার নিজেদের আর্য বলে গর্ব করে।

তোমারই আন'

www.pathagar.com

ভরাডুবি (আন্ ফ্রাঙ্ক)

আজকালের মধ্যেই তো ৬ জুন। শুধু ইয়োরোপের না, বিশ্বের ইতিহাসেও এটি একটি অবিস্মরণীয় দিন। আজ থেকে পঁচিশ বৎসর পূর্বে ওইদিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সৈন্যে জাহাজ ভর্তি করে ফ্রান্সের নরমাঁদি উপকূলে মার্কিন-ইংরেজ অবতরণ করে। এরকম বিরাট নৌবহর নিয়ে এ আকারের একটা অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে ইতোপূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সারা বিশ্বে এটা 'ডি ডে' নামে পরিচিত এবং সুদ্ধমাত্র কূলে অবতরণের ওই একটি দিবস নিয়েই এত কেতাব লেখা হয়েছে যে, একটা মানুষ দশ বছরেও সেগুলো পড়ে শেষ করতে পারবে না। এবং নতুন নতুন বই লেখা হচ্ছে। এর বুঝি শেষ নেই। তাই বোধহয় এটাকে 'দীর্ঘতম দিবসও' বলা হয়, যদ্যপি জ্যোতিষ অনুযায়ী এটি দীর্ঘতম দিবস নয়।

ফিল্মও হয়েছে। তারই বদৌলত যাঁদের যুদ্ধ বাবদে কৌতূহল সীমাবদ্ধ তাঁরাও অনেকখানি ওয়াকিফহাল হয়ে গিয়েছেন। যদ্যপি ফিল্মটি বড্ডই একপেশে ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সুশীল পাঠক তোমাকে অভয় দিচ্ছি, আমি এ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করব না— যেসব মহারথীরা এ বিষয়ে বিরাট বিরাট ভলুম ভলুম কেতাব লিখেছেন পার্কার শিফার মঁ ব্লাঁ ফাউনটেন পেন দিয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেবে আমার ভোঁতা কঞ্চির কলম!

আমার বর্তমান উদ্দেশ্য ভিন্ন।

ওই ১৯৪৪ সালের মার্কিনিংরেজ অভিযানের প্রায় দেড়-দুই বৎসর পূর্বের থেকেই সারা ইয়োরোপময়— এমনকি প্রাচ্যে— জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল ওরা জর্মনিকে হুড়ো দেবার জন্য ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করে জর্মন নির্মিত আটলানটিক উয়োলে হানা দেবে কবে, কোন জায়গায়? এই জল্পনা-কল্পনা সর্বাপেক্ষা উৎকণ্ঠ আকণ্ঠ আগ্রহে, আশা-নিরাশার দোদুল্যমান ইয়োরোপের সর্বত্র লুক্কায়িত কিংবা কনসানট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি ইহুদিরাই ছিল প্রধানতম।

আন্ ফ্রাঙ্ক তার ডাইরিতে মার্চ মাসে অর্থাৎ 'ডি ডে'র তিন মাস পূর্বে লিখছে : 'সেটা ছিল রবিবার, রাত্রি নটা। উইনস্টন চার্চিল সেদিন বেতার বক্তৃতা দিয়েছিলেন— সে বক্তৃতার মধ্যে সত্যিকারের আশার আলো দেখতে পেয়েছিলাম। তার মধ্যে মিথ্যা বাগাড়ম্বর ছিল না— ছিল হিটলার-নিপীড়িত অগণিত নরনারীর প্রতি আশ্বাসের বাণী। সেই সময়টা মনে হয়েছিল যে আমাদের এই গোপন-আবাসে আমরা অসহায় ও নিঃসঙ্গ নই। এক বিশাল দুনিয়া জুড়ে আমাদের উদ্ধার করার জন্য তোড়জোড় চলছে।'

কিন্তু আন্ সরলা হলেও এ বাবদে রীতিমতো বুদ্ধিমতী। ওই গোপন আবাসে যে আটটি প্রাণী প্রতিদিন জল্পনা-কল্পনা করছে তার নীর সরিয়ে ক্ষীরটুকু সযত্নে সংগ্রহ করে তার ডাইরিতে লিখে রাখছে, এদের ভিতর বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, সেই আন্। আর খাসা রসিয়ে রসিয়ে—

একজন হয়তো বলল, কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হবে। ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে আক্রমণ করা কি এতই সোজা! আবার একজন বলল, 'একবার ফ্রান্সে নামতে পারলে, এক মাসের মধ্যে বার্লিন পৌঁছে যাবে।' আর একজন রণবিশারদ বলে উঠলেন, 'এক

www.pathagar.com

বৎসরের কম কিছুতেই বার্লিন পৌঁছতে পারবে না।' আন্ এর অভিমত দিয়ে এ অনুচ্ছেদ শেষ করেছে। এবং এর কথা আখেরে ফলেছিল। 'ডি ডে' হয় ৬ জুন; তার এগারো মাস পরে ৮ মে জর্মনি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন, ইংরেজিতে নাকি সিক্সেস্ অ্যান্ড সেভেনস্, ফারসিতে শশ্ (ষষ্ঠ) ও পন্‌জ (পঞ্চ) বলে— অবশ্য অল্প ভিন্নার্থে। মোদ্দা : এগারো মাস যা, বারো মাস তা।

কিন্তু এইমাত্র বলেছি, আন্ সুচতুরা বালা।

কারণ যদ্যপি সে বলেছে, 'এক বিশাল দুনিয়া জুড়ে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য তোড়জোড় চলেছে', তথাপি যে অন্তরে অন্তরে জানে মার্কিনিংরেজ বাবুরা নিছক খয়রাতি কর্ম করার জন্য, দুহাতে চ্যারিটেবল হসপিটাল ছড়াতে ছড়াতে 'ডি ডে'তে ফ্রান্সে নামবেন না। তাই ওই দিবসের এক মাস পূর্বে লিখছে, 'আমাদের এখানে সকলেই এখন আশা করছে যে, মিত্রপক্ষের (অর্থাৎ মার্কিনিংরেজ) অভিযান খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ হবে; কারণ রাশিয়া সমস্ত ইউরোপ দখল করে নেবে, এ তারা কিছুতেই হতে দেবে না।'

অতিশয় হক্ কথা। আন্ ওই বয়সেই বাবুদের 'সচ্চরিত্রে'র কিছুটা চিনে গিয়েছে, নিছক ঈশ্বরপ্রসাদাৎ! আমরা ইংরেজকে বিলক্ষণ চিনি, চোখের জলে নাকের জলে হাড়ে হাড়ে।

কিন্তু মুক্তি পাবার আশা উৎকণ্ঠা উত্তেজনার মাঝখানেও দেখুন, এই কুমারীটি কীরকম শান্তভাবে উভয় পক্ষের দায়িত্ব ওজন করে দেখছে। 'ডি ডে'র ঠিক এক পক্ষ পূর্বে সে লিখছে : '...আশা এবং উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছে গেছে। কেন এখনও আক্রমণ হচ্ছে না, ইংরেজরা কেন এত দেরি করছে, তারা কি কেবল তাদের নিজের দেশের জন্য লড়ছে, হল্যান্ডের প্রতি কি তাদের কোনও দায়িত্ব নেই? কিন্তু ইংরেজদের আমাদের প্রতি কীই-বা দায়িত্ব আছে? আমরা আমাদের নিজেদের মুক্তির জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছি? জর্মন অধিকৃত দেশগুলোর মধ্যে কবার কটা বিদ্রোহ হয়েছে? নিজের মুক্তি নিজেরই অর্জন করতে হয়— অন্য দেশের কী মাথাব্যথা পড়েছে যে, কেবলমাত্র আমাদের উদ্ধার করার জন্যে সৈন্যসামন্ত পাঠাবে? আক্রমণ একদিন হবেই, কিন্তু তা আমরা চাইছি বলে নয়, ইংরেজ এবং আমেরিকার নিজেদের স্বার্থে।'

এই চরম দ্বন্দ্বের মাঝখানে মেয়েটির ভগবানে বিশ্বাস, অন্তিমে সত্যের সর্বজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রত্যয় এবং সর্বোপরি তমসাচ্ছন্ন পাশ্চাত্যে নবীন উষার উদয়, নবীন জীবনের অভ্যুদয় সম্বন্ধে এ বালাটির পরিপূর্ণ আশাবাদ— তার পরিচয় আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কিছুতেই প্রকাশ পাবে না।

তবু মাঝে মাঝে মেয়েটি কিন্তু ভেঙে পড়ত।

একদিন লিখছে, 'প্রিয় কিটি, এক নিদারুণ হতাশা এবং অবসাদ আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এখন মনে হচ্ছে যে এ যুদ্ধ বুঝি আর কখনও শেষ হবে না। যুদ্ধ মিটে যাওয়া যেন বহু দূরের রূপকথার রাজ্যের ব্যাপার বলে এখন মনে হচ্ছে।' তার দেড় মাস পরে বলছে, 'আবার আমার অবস্থা ভেঙে পড়বার মতো হয়েছে। এই গোপন আবাসে এখন সবই বিষাদময়।... হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু— দুটোর যে কোনও একটা তাড়াতাড়ি ঘটুক। ভগবান এই আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা থেকে আমাদের রেহাই দাও।

তোমারই আন্'

www.pathagar.com

কিন্তু এর মাত্র এগার দিন পরেই—

কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ—
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥

'মঙ্গলবার, ৬ জুন, ১৯৪৪ (অর্থাৎ ডি ডে—লেখক)

প্রিয় কিটি,

আজ একটি অবিস্মরণীয় দিন। অবশেষে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হল। ফরাসি উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় মিত্রপক্ষের সৈন্যদল অবতরণ করছে।...

জর্মনির খবরেও স্বীকার করা হয়েছে যে, ফরাসি উপকূলে ব্রিটিশ প্যারাশুট বাহিনী অবতরণ করেছে।...

আমাদের গোপন আবাস চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই বহু প্রতীক্ষিত মুক্তি যা এতদিন আমাদের কাছে ছিল সুদূর স্বপ্নরাজ্যের কাহিনীর মতো, তা কি সত্যিই আমাদের কাছে এল? সত্যিই কি ১৯৪৪ সালের মধ্যে বিজয়লাভ করব?

হতাশার অন্ধকার ছিন্ন করে আবার আশার আলোক জেগেছে।'

কিন্তু পাঠক, এর পর দিনের পর দিন, মিত্রশক্তি যেমন যেমন ফ্রান্স জয় করে এগিয়ে আসতে লাগল, আর আন্ সোল্লাসে তার ডাইরিতে সেগুলো লিপিবদ্ধ করল তার উদ্ধৃতি আমি দেব না। আপনারা ডাইরিখানা পড়ে দেখবেন। সে প্রতিদিন আশা করছে মিত্রশক্তি হল্যান্ড জয় করে তাদের মুক্তিদান করবে। এবং এইটুকু বলব, এ যুদ্ধের শেষাঙ্ক সম্বন্ধে যেসব বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে আন্ ফ্রাঙ্কের ডাইরি সর্বপ্রথম সর্বপ্রধান পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু হায়! হায়! শেষরক্ষা হল না।

২১ জুলাই আন্ বেতারে শুনল, হিটলারকে হত্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, আর হিটলার হন্যে হয়ে দোষী-নির্দোষী হাজার হাজার জর্মনকে ফাঁসি দিচ্ছেন। আন্ লিখছে, 'এইরকম করে হতভাগারা যদি নিজেরা মারামারি করে মরে, তা হলে ইংরেজ-আমেরিকা আর রুশদের কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়। আমাকে কি বড় খুশি মনে হচ্ছে? সত্যি, আমি যে আনন্দ চেপে রাখতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে এই অক্টোবর মাসেই আবার আমার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।

একে তুমি আকাশ-কুসুম কল্পনা বলছ? বার্লিনের দিকে ধাবমান সৈন্যদের পদধ্বনি বলছে, না এ আকাশ-কুসুম নয়। এ সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।'

কিন্তু হায়, পাড়ে এসে ভরাডুবি হল। এর কয়েকদিন পরেই জর্মন পুলিশ আন্‌দের গুপ্তাবাস আবিষ্কার করে সবাইকে গ্রেফতার করে কনসানট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাল। তার পর কী হয়েছিল সেটা, কঠোর পাঠক, দয়া করে আমাকে পুনরাবৃত্তি করার হুকুম দিও না।

আন্ ফ্রাঙ্ক সম্বন্ধে আমার হয়তো আরও অধিক কিছু লেখাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কারণ ইতোমধ্যেই হাতে-কলমে সপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, একাধিক দরদী পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আন্-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ বাবদে আমার মতো নগণ্য লেখক একজন প্রখ্যাত বাঙালি লেখকের সহৃদয় একখানি চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন :

www.pathagar.com

সম্প্রতি এর্নাকুলাম থেকে একটি মহিলা (ইনি আমার '— '-এর মালায়ালাম অনুবাদ প্রকাশ করেছেন) জানতে চেয়েছেন— আন্ ফ্রাঙ্কের লেখা The Diary of a Young Girl বইখানার বাংলা অনুবাদ কে করেছেন, তাঁর ঠিকানা কী এবং প্রকাশক কারা। এখানে বসে কী করে খবরটা সংগ্রহ করা যায় যখন ভাবছি, 'দেশ' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় আপনার 'পঞ্চতন্ত্রে' এ বিষয়ে অনুবাদকের নাম পেয়ে গেলাম। এঁদের ঠিকানা কি আপনি জানেন?— ইত্যাদি।

আন্ সম্বন্ধে যখন সেই সুদূর কেরালায়ও এতখানি কৌতূহল রয়েছে তখন আমার পক্ষে হয়তো এ নিয়ে আর অত্যধিক বাগ্‌বিন্যাস করা উচিত হবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে কোনও কোনও কাঁচা লেখক একটি বিষয়েই এমনি মজে যান যে, সে দ' থেকে আর সহজে বেরুতে পারেন না। আমার হয়েছে তাই। কিংবা বলতে পারেন, 'একে তো ছিল নাচপাগলী বুড়ি, তার ওপর পেল মৃদঙ্গের তাল।' কিংবা তারও বাড়া :

> কী কল পাতাইছ তুমি
> বিনা বাইদ্দে (বাদ্যে) নাচি আমি!!

অতএব বরদাস্তশীল পাঠকের সামনে আন্-এর আরও একটু সামান্য পরিচয় নিবেদন করি।

আন্-এর রসিকতাবোধ ছিল অসাধারণ। তার তেরো বৎসর বয়সে ক্লাস টিচার আদেশ দিয়েছেন 'বাচালতা' সম্বন্ধে রচনা লিখতে। আন্-এর 'বাচালতা'র শাস্তিস্বরূপ!

'ফাউন্টেন পেনের ডগা কামড়াতে কামড়াতে ভাবতে লাগলাম— কী লেখা যায়? হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, বরাদ্দ তিন পাতা লিখে ফেলে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলুম। আমার যুক্তি হল, বক বক করা নারীজাতির বৈশিষ্ট্য। যদিও বাচালতাকে সংযত করার চেষ্টা করা উচিত, তবুও এই দোষ থেকে আমার একেবারে মুক্ত হওয়া উচিত হবে না, কারণ আমার মা, আমারই মতো এবং সময় সময় আমার চেয়েও বেশি কথা বলেন। সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বভাবধর্ম কী করে ত্যাগ করতে পারি? আমার যুক্তি শুনে মি. কেপ্টরকে (শিক্ষককে) হাসতে হল।'

আমরাও হাসছি। কিন্তু আন্-এর শেষ দুর্গতির কথা স্মরণে আছে বলে চোখের জলের ফাঁকে ফাঁকে। সেই প্রাচীন দিনের এক হতভাগ্যের গান,

> 'I am dancing with tears in my eyes.'

সবেমাত্র চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আন্ তাদেরই সঙ্গে লুক্কায়িত একটি ইহুদি ছোকরার প্রেমে পড়ে। তখন লিখছে— আমি কেটে-ছেঁটে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

'রবিবার, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৪

প্রিয় কিটি,

কালকের দিনটা আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। প্রথম চুম্বন। প্রত্যেক মেয়ের জীবনেই এক স্মরণীয় ঘটনা এবং সেই জন্যেই কালকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। কাল সন্ধ্যাবেলা পিটারের ঘরে আমরা দুজনা চৌকির উপর বসে ছিলাম। খানিকক্ষণ পরে ও আমার কাঁধের উপর হাত রাখল। আমিও ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। ও তখন আমাকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। এর আগেও আমরা অনেকবার এইরকম পরস্পরকে জড়িয়ে বসেছি, কিন্তু এবার আমার সান্নিধ্য অনেক নিবিড় ও উষ্ণ। আমার বুকের

www.pathagar.com

ভিতর টিপটিপ করছিল।... ওই সময় আমার যে কী আনন্দ হচ্ছিল, তা লিখে বোঝাতে পারব না... তার পরের মুহূর্তগুলো আমার ঠিক মনে নেই। নিচের দিকে যাবার জন্য যখন পা বাড়িয়েছি, ও তখন হঠাৎ আমায় চেপে ধরে আমার কপাল, গালে, গলায় এবং বুকে বার বার চুমু খেতে লাগল। আমি কোনওরকমে ওর হাত ছাড়িয়ে ছুটে নিচে পালিয়ে এলাম।

আজকে আবার ওই মুহূর্তগুলোর জন্য প্রতীক্ষা করছি।

তোমারই আন্।'

ছেলেটির বয়স তখন মাত্র সাড়ে সতেরো। মনে হচ্ছে, এটি নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীর প্রথম প্রণয়।

এর পূর্বে আন্ অতিশয় সরলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছে তার 'দেহের বহির্ভাগে বিস্ময়কর যা ঘটেছে', কিন্তু বলছে : 'দেহের অভ্যন্তরে যা ঘটেছে তা আরও রহস্যঘন বিস্ময়। ইতোমধ্যে আমি তিনবার ঋতুমতী হয়েছি।...এখন আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত সব কামনা জাগছে। কোনও কোনও দিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে নিজের স্তনদুটোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়। এ বক্ষের ছন্দোময় স্পন্দন শোনবার জন্য আমি কান পেতে থাকি।...'

এস্থলে উদ্ধৃতিটি অসম্পূর্ণ রেখে বলি, ধন্য ধন্য কবীন্দ্র রবীন্দ্র। তিনি কী করে জানলেন বালিকা যখন কিশোরী হয় তখন তার দেহানুভূতি হৃদয়ানুভূতি!

'ওগো তুমি পঞ্চদশী,
পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।
মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস তব বিহ্বল রাতে ॥
ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলী
তব নবযৌবনে উঠিছে আকুলি ক্ষণে ক্ষণে।
প্রথম আষাঢ়ের কেতকীসৌরভ তব নিদ্রাতে ॥
যেন অরণ্যমর্মর
গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষে থরথর।
অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে,
ছলো ছলো জল এনে দেয় তব নয়নপাতে ॥'

এই যে 'যেন অরণ্যমর্মর/ গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষে থরথর' ঠিক সেই অনুভূতিই তো আন্ প্রকাশ করছে যখন সে বলছে 'এ বক্ষের ছন্দোময় স্পন্দন শোনবার জন্য আমি কান পেতে থাকি।'

ততোধিক আশ্চর্য, ঠিক ওই সময়েই প্রেমবোধের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মবোধও জাগ্রত হয়েছে। তার দয়িত পিটারের কথা ভাবতে ভাবতে বলছে,

'এর ওপর আরও বিপদ, ও ধর্ম ও ভগবান মানে। ধর্ম মানুষের এক বিরাট অবলম্বন— স্বর্গীয় বিধানের ওপর কজন লোক পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারে?

(রবীন্দ্রনাথের 'আমার গুরুর আসন কাছে/ সুবোধ ছেলে কজন আছে?'—লেখক) কিন্তু যারা পারে, তারা সত্যিই সুখী। আর নিজের বিবেক যখন ধর্মের বিধানের সঙ্গে যোগ খেয়ে যায় তখন যে শক্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়, তার তুলনা নেই!'

www.pathagar.com

এ অধম স্তম্ভিত। 'ধর্মের বিধানে'র সঙ্গে যে প্রায়ই বিবেকের দ্বন্দ্ব লাগে সেটা সে ওই অতি অল্প বয়সে হৃদয়ঙ্গম করল কী করে!

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপীয় ইহুদিদের অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল রাইন নদীর পারের ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর। এরই এক পরিবারে আন্ ফ্রাঙ্কের জন্ম ১২ জুন, ১৯২৯-এ[১]। ১৯৩৩-এ হিটলার গদিনশীন হলে পর আন্-এর পিতা সপরিবার হল্যান্ডের আম্স্টের্ডাম চলে যান। (আইনস্টাইনও ওই বছরে আমেরিকা যান)।

স্বয়ং আন্ লিখছেন (তখন তাঁর বয়স তেরো) : 'আমাদের অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, যাঁরা জর্মনিতে রয়ে গেছেন তাঁরা নাৎসিদের হাতে নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে লাগলেন। তখন আমার দু-মামা আমেরিকায় পালিয়ে গেলেন। তাঁদের জন্য আমরা সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকতাম। ১৯৩৮ সালে যখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা লাগানো শুরু হল, তখন আমার বুড়ি দিদিমা আমাদের কাছে চলে এলেন। তাঁর বয়স ৭৩।'

১৯৪০-এর মে মাস থেকে আরম্ভ হল হল্যান্ডবাসী তাবৎ ইহুদিদের বিপর্যয়। হিটলার হল্যান্ড দখল করে এমন সব আইন পাস করলেন যাতে করে ইহুদিদের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে উঠল।

হিটলার হল্যান্ড বিজয়ের দুই বৎসর পরও আন্ লিখছেন :

'হাজাররকম বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন কাটতে লাগল। আমাদের স্বাধীনতা বলতে কিছুই রইল না। তবুও তখন অবস্থাটা একেবারে অসহ্য হয়নি।'

বেচারি আন্— আন্ কেন, কজন ওই ১৯৪২-এ জানত যে হিটলার ১৯৩৯ সালেই মনস্থির করে গোপনে হুকুম দিয়েছেন, নির্যাতন উৎপীড়ন দিয়ে আরম্ভ করে শেষটায় ইহুদিদের সবংশে ও সমূলে নিধন করতে হবে। বিশেষ করে হল্যান্ড দেশটিতে যেন একটি ইহুদিও জীবন্ত না থাকে।

কিন্তু আন্-এর পিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। ৫ জুলাই ১৯৪২ সালে আন্ লিখেছেন,

"একদিন বাবার সঙ্গে পার্কে বেড়াচ্ছিলাম, বাবা হঠাৎ আমাকে বললেন, 'শোন আন্, এখন যত পারো আনন্দ করে নাও, কেননা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এখান থেকে চলে গিয়ে কোনও নতুন জায়গায় লুকোতে হবে।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন বাবা, এখান থেকে কোথায় যাব? লুকোতেই-বা হবে কেন?' তিনি বললেন, 'জর্মনরা এসে আমাদের ধরবার আগেই আমরা লুকিয়ে পড়ব।' ব্যাপারটা এখনও ভালো করে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু একটা অস্পষ্ট বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।"

এর পাঁচ-সাত দিন পরই ফ্রাঙ্ক পরিবারকে তাঁদের বাসস্থান ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে শহরের অন্যপ্রান্তে চারতলার পিছনের দিকে গুটিকয়েক কুঠুরিতে গোপন আশ্রয় নিতে

১. আন্ তিন-তিনবার তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন তাঁর জন্মদিন ১২ জুন। অথচ প্রামাণিক জর্মন্ বিশ্বকোষ ড্যার-গ্রসে ব্রহহাউস (১৯৫৮, অ্যারগান্ৎসুংসবান্ট, পৃ. ১৫৭) লিখছেন ১৪ জুন। জর্মন-প্রবাসী কোনও বঙ্গসন্তান যদি অনুসন্ধান করে পাকা খবর জানান তবে উপকৃত হই। তবে কি ইহুদি ক্যালেন্ডারের সঙ্গে চালু ক্যালেন্ডারের কোনও ফেরফার আছে?

www.pathagar.com

হল। এদের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ইহুদি পরিবারও আশ্রয় নেয়। সবসুদ্ধ আটটি প্রাণী। প্রায় দুই বৎসর এখানে লুকিয়ে থাকার পর এদের সকলেই ধরা পড়ে। এর পরের কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ।

এই দুই বৎসর ধরে আন্ তাঁর ডাইরিটি লিখে যান। যখন ডাইরিটিতে লিখতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স তেরো, যখন ধরা পড়েন তখন তাঁর বয়স পনেরো বৎসর। ষোল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আন্ জর্মন কনসানট্রেশন ক্যাম্পে টাইফাস জ্বরে অসহ্য যন্ত্রণা ভুগে মারা যান। তাঁর আঠারো বছরের দিদি মারগট (মারগারেট)-এরও টাইফাস হয়েছিল এবং ক্যাম্পের একই কামরায় রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে উপরের বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। ওই একই সময়ে এঁদের মা-ও ক্যাম্পে মারা যান। তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশের মতো। পরিবারের মাত্র একজন, পিতা অটো দৈববলে অবলীলাক্রমে বেঁচে যান।

এই ডাইরিখানার বৈশিষ্ট্য কী?

যুদ্ধশেষে মোটামুটি ১৯৪৯ সালে ডাইরিখানা ডাচ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালে বইখানি জর্মনে অনূদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়োরোপ-আমেরিকাতে প্রচুরতম খ্যাতিলাভ করে। কয়েক বছরের ভিতরই বইখানা ন্যূনাধিক ত্রিশ-চল্লিশটি ভাষায় অনূদিত হয়। অনবদ্য বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রীঅরুণ সরকার ও শ্রীঅংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ইতোমধ্যে ডাইরিটি অবলম্বন করে যে নাটকটি রচিত হয়— সেই জর্মন বিশ্বকোষের ভাষায়— বিশ্বের সর্বমঞ্চে অভিনীত হয়েছে (য়্যুবার ডি ব্যুনেন ড্যার ভেল্ট্)। ফিল্মজগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম, তবে শুনেছি এর ফিল্ম নাকি এদেশেও এসেছিল।

ভাবতে আশ্চর্য বোধহয়, চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ের লেখা একটি রোজনামচা কী করে এতখানি খ্যাতি অর্জন করল। এ যেন সেই 'বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়, এ কী গো বিস্ময়!'

বইখানা যতবার পড়ি ততবার মনে হয় এর পাতার পর পাতা তুলে দিয়ে 'কত না অশ্রুজল' পর্যায়ের সমাপ্তি টানি। কিন্তু স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে সেটা সম্ভবপর নয়। তবে আন্-এর কিছুটা ব্যক্তিগত পরিচয় দেবার জন্য অত্যল্প তুলে দিচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে তুলে দিই আন্ কীভাবে রোজনামচা লেখা শুরু করেন।

শনিবার, ২০ জুন ১৯৪২ (জর্মনি কর্তৃক হল্যান্ড দখলের দুই বৎসর পরে— লেখক)

"আমার ডায়েরি লেখার খেয়াল একটু অদ্ভুত। আমার বয়সী কোনও মেয়ে ডাইরি লেখে বলে তো আমি শুনিনি। আর তেরো বছরের মেয়ের মনের কথা জানবার কারই-বা মাথাব্যথা পড়েছে? কিন্তু তবুও আমি লিখছি। আমার মনের গহনে যেসব ভাব রয়েছে, সেগুলোকে আমি প্রকাশ করতে চাই।

একটি প্রবাদ আছে : 'মানুষের থেকে কাগজ অনেক বেশি সহিষ্ণু'। একদিন নিরানন্দ আলস্যের মধ্যে গালে হাত দিয়ে যখন ভাবছিলাম, কী করে সময় কাটানো যায়, সেই সময় এই কথাটা আমার মনে এল।

এখন আমার সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই।"

www.pathagar.com

এর পর আন্ বলছেন তাঁর বাপ, মা, বোন এবং প্রায় ত্রিশজন বন্ধু আছেন। এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে আমাদেরই মতো 'গুষ্টিসুখ' অনুভব করতে খুবই ভালোবাসে।

তবু আন্ বলেছেন, 'কিন্তু তবু আমি নিঃসঙ্গ। সুতরাং এই নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আমি এই ডাইরি লিখছি; কিন্তু এই ডাইরি আমি চিঠির আকারে লিখব। আমি এক কাল্পনিক বন্ধু ঠিক করেছি— তার নাম কিটি (ইংরেজিতেও কিটি, ক্যাথরিন— লেখক), আমার এই ডায়েরি কিটিকে লেখা চিঠির আকারে লিপিবদ্ধ হবে।'

পাঠকের মনে এস্থলে প্রশ্ন উঠতে পারে, আন্ কি জানতেন তাঁর এ রোজনামচা একদিন প্রকাশিত হবে?

আন্‌কেই বলতে দিন :

'বুধবার, ২৯ মার্চ ১৯৪৪

প্রিয় কিটি,

বলকেস্টাইন নামে একজন মন্ত্রী লন্ডন থেকে একদিন বেতার-বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল— হল্যান্ডের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন— জর্মন অধিকৃত অঞ্চলের লোকেদের ডায়েরি জোগাড় করতে হবে; তা যদি হয় তা হলে আমার এই ডায়েরির খুব কদর হবে। ভাবতে কী মজাই না লাগছে! বাস্তবিক দশ বছর পরে আমার এই ডাইরি যদি লোক পড়ে (প্রকৃত প্রস্তাবে দশ নয় পাঁচ বছর পরেই বিশ্বজন এই বইখানিকে হৃদয়ে টেনে নিয়ে তার প্রভূততম 'কদর' দিয়েছে —লেখক) তা হলে আমরা এখানে কী অবস্থায় কাটিয়েছি, তা জেনে তারা অবাক হবে।'

এর দেড় মাস পর আন্ আবার কিটিকে জানাচ্ছেন :

'কিন্তু জীবনের চরম লক্ষ্য সাংবাদিক ও বড় লেখিকা হওয়া— সেকথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলি না। আমার এই অলীক আশা কোনওদিন সফল হবে কি না, তা ভবিষ্যৎই জানে। কিন্তু আমার ডাইরি যুদ্ধ শেষ হলে আমি ছাপিয়ে বার করব— এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

তোমারই আন্'

বস্তুত লেখিকা হতে হলে যে কটি গুণের প্রয়োজন আন্-এর সবকটিই ছিল, কিন্তু বিধাতা তাঁর জন্য রেখেছিলেন অকালমৃত্যু।

জানি না, আমার দরদী পাঠক এর থেকে কোনও সান্ত্বনা পাবেন কি না। যে আন্-এর মৃত্যুর জন্য হিটলার-হিমলার দায়ী, তাদের দুজনকেই আত্মহত্যা করতে হয় আন্-এর মৃত্যুর দু মাসের মধ্যে।

যে নাৎসি নেতা সাইস-ইন্‌ক্‌ভারট ফ্রাঙ্ক পরিবার গ্রেফতার হওয়ার সময় হল্যান্ডের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি প্রধানত হল্যান্ডে কৃত তাঁর কুকীর্তির জন্য ন্যুরন্‌বের্গ মোকদ্দমার বিচারের পর— আন্-এর মৃত্যুর দেড় বৎসর পর— ঝোলেন ফাঁসি কাঠে। গেস্তাপো নেতা কাটলেন ব্রুনারও ওইদিন একই পন্থায় ওপারে যান এবং তাঁর সহকর্মী আইকমানকে ফাঁসি দেয় ইহুদিরা কয়েক বৎসর পরে— ইজরায়েলে।

www.pathagar.com

ধন্য অবাঙালি!

ভিন্ন ভিন্ন জাত সম্বন্ধে পৃথিবীর লোক কতকগুলি ধারণা করে বসে আছে। যেমন স্কচ্ কিপ্টে, ফরাসি দুশ্চরিত্র, জর্মন ভোঁতা, ইংরেজ অবিশ্বাসী, এমনকি প্রখ্যাত ফরাসি সাংবাদিক মাদাম তাবুই-এর একখানা বই আছে যার শিরোনামা 'লা পেরফিড আলবিয়োঁ' (বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ) দিয়ে আরম্ভ। (অবশ্য তিনি তাঁর পুস্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা দিয়েছেন যে, এ 'কুসংস্কারে'র জন্য ইংরেজ সম্পূর্ণ দায়ী নয়, ফরাসিও অনেকখানি)।

এরকম ঢালাও 'জাতিবিচার' থেকে ওই যে ধারকর্জ দেনেওলা আমাদের নিরীহ কলকাত্তাই পাঠানও (চলতি ভাষায় কাবুলিওয়ালা) মুক্ত নয়। আমাদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আসত দুই ঈদের দিনে এক পাঠান। একবার কথায় কথায় বলল, 'আপকা কলকাত্তা শহরমে বহুৎ আচ্ছা আলু, চান্না হোতা হৈ।' আমরা তো অবাক— কলকাতা শহরের রাস্তার উপর যত লক্ষ লক্ষ গভীর গর্ত থাক না কেন, কোনওটাতেই তো আজ অবধি আলু বা চানা ফলতে দেখিনি— সরকারের 'অধিক ফসল ফলাও' কান ঝালাপালা-করা প্রপাগান্ডা সত্ত্বেও! পাঠান ফের বলল, 'ঘর ঘর মেঁ।' আমরা তো আরও সাত হাত পানিমেঁ। শেষটায় বোঝা গেল পাঠান 'আলু চান্না' বলতে 'আলোচনা' বোঝাতে চেয়েছিল।

পাঠানের এই ঢালাও জাতিবিচার কিন্তু এস্থলে ভুল নয়। রকবাজি আড্ডাবাজিতে কলকাত্তাইয়া এখনও অলিম্পিকের গোল্ড মেডেল ধারণ করে। এই যে হালে আমরা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ক্রিকেট 'খেললুম' ঠিক তার উল্টোটি। ক্রিকেটের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে হলে আমাদের রক-আড্ডাবাজির টিমে আছেন চারটে রণজি, তিনটে ব্রাডম্যান, দুটো লারউড, একটা নিসার আর গুগ্‌লির জন্য ওই একটা বসান্‌কে। তা সে-কথা থাক। পাঠান বাস করে খাঁটি বাঙালিপাড়ায়— সাম্‌-বাজারে। রাস্তার পর রাস্তা পেরুতে পেরুতে সুবোশাম নিত্যি নিত্যি দু-পাশে দেখে রকের পর রক— মহাসভা, কানে যায় আলু চান্না।

কিন্তু পাঠানের দ্বিতীয় জাতবিচারটা একদম ভুল বেরুল। বলল, 'কলকত্তেমে বহুত অচ্ছি ফারসি বোলি জাতি— হর রাস্তে পর।' বলে কী? আলু আর চানা তবু না হয় বুঝি, হয়তো-বা পাঠান কলকাতার মুদির দোকানে ওই দুই বস্তু অত্যুত্তম সরেস জাতের পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় 'অচ্ছি ফারসি' বলা হয় এটা কেমনতর? পাঠান বোঝাল, দিনে অন্তত একশোবার সে শুনতে পায় বহু কণ্ঠে, কিন্তু সর্বদাই অনবদ্য ফারসি উচ্চারণে 'ব্‌-তালাশে বক্রি'। এস্থলে বাঙালি পাঠককে বোঝাই 'ব্‌' = with এবং for (যেমন ব্‌ কলমে— বকলমে শেখ ফিরোজ, বা ব্‌হাল = বহাল তবিয়ৎ, ব্‌মল = বমাল গ্রেফতার) 'তালাশ' = তল্লাসি; এবং 'বক্রি' = ছাগল। অর্থাৎ কোনও লোক বক্রির তল্লাসিতে (for বক্রি) বেরিয়েছে।

এ কী কথা! আমরা তো কখনও শুনিনি।

এমন সময় বাইরে ফেরিওয়ালার হাঁক শোনা গেল। পাঠান লম্ফ দিয়ে সোল্লাসে বলল, ওই তো বলছে ব্‌-তালাশে বক্রি।'

ওমা! ইয়াল্লা! ও হরি! ফেরিওলা চেঁচাচ্ছে 'বোতল আছে বিক্রি!'

www.pathagar.com

তাই বলছিলুম, এস্থলে পাঠানের জাতবিচারে ভুল হয়ে গেল।

এগুলোর নিষ্পত্তি তো সহজেই হয়ে গেল কিন্তু অন্যগুলোর বেলা? যেমন মনে করুন, লোকে বলে ফ্রান্সের লোক অসচ্চরিত্র। এবং সেই সূত্রে বহু বহু চুটকিলা প্রচলিত আছে। তারই একটি :

এক ফরাসি নিমন্ত্রিত হয়েছে এক মার্কিন পরিবারে। বিস্তর হইহুল্লোড়। ফরাসি সঠিক বুঝতে পারেনি পরবটা কিসের। পাশে বসেছিল এক মার্কিন। তাকে কানে কানে শুধোল, 'ব্যাপারটা কী?' মার্কিন বুঝিয়ে বলল, 'ওই যে দেখতে পাচ্ছেন বুড়ো-বুড়ি— এঁরা পঞ্চাশ বৎসর সুখে সহবাস করার পর আজ তাঁদের 'বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী' পালন করছেন।' ফরাসি বলল, 'অ বুঝেছি। এঁরা পঞ্চাশ বছর সহবাস করার পরই এই এখন বিয়ে করতে যাচ্ছেন।' তার পর খানিকক্ষণ ঘাড় চুলকে বলল, 'তা— তা ওই নিয়ে এত তুলকালাম কাণ্ড কেন? আমরা তো আকছারই করে থাকি।'

পাঠানের গল্প যেরকম 'জাতিবিচারে'র ব্যাপারে পরখ করা গেল, এখানে তো তা করা যাচ্ছে না। তবে কি সত্যিই হুদো হুদো ফরাসি ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর সহবাস করার পর বিয়ে করে? প্রধানত জারজ সন্তানদের আইনত সন্তানরূপে স্বীকৃতি দেবার জন্যে?

কিন্তু এ বিষয়ে ফরাসিদের নিয়েই এ গল্পটা তৈরি হল কেন? আমরা একটি সত্য ঘটনা জানি, এবং সেটা অস্ট্রিয়া দেশের ব্যাপার।

জনৈক অস্ট্রিয়ার লোক, য়োহান গেওর্গ হিটলার যখন একটি 'কুমারী'কে বিয়ে করলেন, তখন সেই 'কুমারী'র একটি পাঁচ বছর বয়সের ছেলে ছিল। বিয়ের পাঁচ বছর পর ওই মহিলার মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে য়োহান হিটলার অস্ট্রিয়া থেকে অন্তর্ধান করলেন। তার সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর তিনি আবার ফিরে এলেন মাতৃভূমিতে এবং একজন উকিল ও দুজন সাক্ষীর সামনে শপথ নিয়ে বললেন, তাঁর বিয়ের পাঁচ বছর পূর্বে ওই যে সন্তান জন্মেছিল সে তাঁরই ঔরসের সন্তান।

এই লোকটি জর্মনির ফ্যুরার আডলফ হিটলারের পিতা।*

এতক্ষণ ধরে আমি শুধু পটভূমি নির্মাণ করেছিলুম। এইবারে দেখি, সেয়ানা পাঠক, তোমার পেটে এলেম কতখানি।

মার্কিনরা চাঁদে গেছে শুনে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসম্মানবোধ হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'ভারতীয়েরাও যাবে।' কিন্তু শ্রীযুত সত্যেন বসু এ বাবদে উদাসীন। তাই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল, 'চাঁদে যাঁরা যেতে চান তাঁরা আবেদন করুন।' বিস্তর দরখাস্ত এল। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনজনকে ইন্টারভ্যুর জন্য ডাকা হল, একজন বাঙালি, বাকি দুজন ভিন্ন প্রদেশের।

যে কর্তা ইন্টারভ্যু নিচ্ছিলেন তিনি প্রথম ডেকে পাঠালেন বাঙালিকে। শুধোলেন, 'চাঁদে যাওয়ার জন্য কত টাকা চান?'

'পাঁচ লাখ।'

'অত কেন?'

---

* W. Shirer; Aufsteg unid Fall in S. W. পৃষ্ঠা ৭।

www.pathagar.com

'এজ্ঞে, বুড়ো মা-বাপ রয়েছে। বোনটির বিয়ে দিতে হবে। দুটো ছোট ভাই ইস্কুলে যায়। বিধবা পিসিও রয়েছেন। চাঁদ থেকে ফিরে না আসতে পারলে ওই টাকাতেই তাদের চলে যাবে।'

কর্তা : 'আচ্ছা, পরে জানাব।'

তার পর ডাকা হল দ্বিতীয় জনকে। সে প্রদেশের লোক, একটু ফুর্তিফার্তি করতে ভালোবাসে। বলল, 'দশ লাখ।'

কর্তা : 'অত কেন?'

'হানজি পাঁচ লাখ দিয়ে মদ্যপানাদি, কাবারে গমন, হেঁ হেঁ— রমণীসঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফিরে তো না-ও আসতে পারি; তাই সর্বশেষ শখটখ। বাকি পাঁচ লাখ রেখে যাব বুড়ো মা, বাপ, অবিবাহিত ভগ্নী, দুই ভাই, বিধবা পিসির জন্য!'

কর্তা : 'আচ্ছা, পরে জানাব।'

এর পর এলেন তৃতীয় এক প্রদেশের লোক। ইনি চাইলেন পনেরো লাখ।

কর্তা তাজ্জব মেনে বললেন, 'অত বেশি কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ডাইনে-বাঁয়ে দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল—

'বাবুজি, পনেরো লাখের পাঁচ লাখ তো তোমার। পাঁচ লাখ আমার। আর বাকি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে ওই ব্যাটা বাঙালিকে চাঁদে পাঠিয়ে দেব।'

এইবারে পাঠক, বের কর তো, দোসরা আর তেসরা ওমেদার কোন কোন প্রদেশের লোক? কিন্তু সাবধান! 'প্রকাশককে' এ বাবদে চিঠি দেবে না। তিনি ছাপাবেন না। আমাকেও লিখবে না। আম্মো উত্তর দেব না।

নট গিলটি

সর্বপ্রথম যেদিন আমার লেখা ছাপাতে বেরুল তার কয়েক দিন পরই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মহাশয় আমাকে একখানি চিঠি রিডাইরেক্ট করে পাঠালেন। চিঠিখানা আমার উদ্দেশে লেখা। পত্রলেখক আমার ঠিকানা জানেন না বলে সেটি সম্পাদকের C/o করে লিখেছেন। এইটেই বিচক্ষণের লক্ষণ। এবং বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিবলে, যেসব স্পর্শকাতর পাঠকপাঠিকা কারও লেখা পড়ে মুগ্ধ হন, বিরক্ত হন বা বিচলিত হন তাঁরা যেন তাঁদের মানসিক, হার্দিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদকের মারফতে লেখকের কাছে পাঠান। এবারে বাকিটা বলছি।

প্রথম গোটা পাঁচেক চিঠি তো আমাকে অভিনন্দন জানাল। তার ধরন অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও পত্রলেখক আমাকে সবিনয়, সসম্মান, সশ্রদ্ধ আনন্দাভিবাদন জানাল, আর কোনও কোনও লেখক আমার পিঠ চাপড়ে মুরুব্বিয়ানা মোগলাই কণ্ঠে বললেন, 'বেশ লিখেছিস ছোঁড়া, খাসা লিখেছিস। লেগে থাক। আখেরে টু-পাইস্ কামাতেও পারবি।'

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পক্ষের মুরুব্বিয়ানা আমাকে ঈষৎ বিরক্ত করেছিল, সেকথা আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু সেটা ক্ষণতরে। কারণ, আমি কাগজে লেখা আরম্ভ করি, বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। ততদিনে বাস্তব জীবনে নানা প্রকারের চড়-চাপাটি খেয়ে খেয়ে আমার দেহে তখন দিব্য একখানা গণ্ডারের চামড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিস্তর মুরুব্বি এতদিন ধরে, আমার কর্মজীবনে আমার পিঠ চাপড়ে আমাকে এন্তের সদুপদেশ দিয়েছেন। কই? আমি তো তখন চটিনি। অবশ্য এনারা উপদেশ দিয়েছিলেন বাচনিক; উপস্থিত যেসব ওই জাতীয় মুরুব্বিয়ানার চিঠি আসছে সেগুলো 'লেখনিক'।

তাতে কীই-বা যায়-আসে!

কিন্তু আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগল, এসব তাবৎ ব্যক্তিগত চিঠির প্রত্যেকটির উত্তর আমাকে স্বহস্তে লিখতে হবে কি না?

তা হলেই তো হয়েছে! কতখানি সময়, শক্তিক্ষয়, ডাকটিকিটের ব্যয়, কে জানে?

আমার টাইপরাইটার আছে। আমি অবশ্যই আধঘন্টার ভিতর খান তিরিশেক কার্বন কপি তৈরি করতে পারি। তার বক্তব্য হবে 'Many Thanks for your good wishes.'

উঁহু! হল না।

যাঁরা চিঠি লিখেছেন তাঁরা সাহিত্যরসিক-রসিকা। তাঁরা চান, সাহিত্যিক উত্তর। লন্ড্রির চিঠিতে প্রশ্ন, 'আপনার অত অত নম্বরের জামাকাপড় ছাড়াচ্ছেন না কেন?' আপনি তখনই ওই গদ্যময় বেরসিক ভাষায়ই উত্তর দেবেন। কিন্তু এনারা তো সাহিত্যিক উত্তর চান।

ইতোমধ্যে আরেকখানি মোলায়েম চিঠি। তার বক্তব্য, মোটামুটি যা মনে আসছে, কারণ চিঠিখানি আমার বউ পুড়িয়ে ফেলেছেন :

'মহাশয়, আমার মনের গভীরতম কথাটি আপনি কী মরমিয়া ভাষায়ই না প্রকাশ করেছেন!' ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় তিন পাতা জুড়ে। পড়ে আমিও রোমাঞ্চিত হলুম। লেখিকাকে মনে মনে শুক্‌রিয়া জানালুম।

কিন্তু ইয়াল্লা! আমি খেজুরগাছের শেষ আড়াই হাতের দিকে আদৌ খেয়াল করিনি। কিংবা বলতে পারেন, বন থেকে বেরুবার পূর্বেই হর্ষধ্বনি করে বসে আছি।

চিঠির সর্বশেষে আছে, 'আমি পঞ্চদশী। এ চিঠির উত্তর আপনাকে স্বহস্তে দিতেই হবে!' এবং তার পরেই, সর্বশেষে মোক্ষম কথা : 'এখন থেকে আমি পিওনের পদধ্বনির প্রতীক্ষায় প্রহর গুনব।'

সর্বনাশ, এস্থলে আপনি কী করবেন? আরবি ভাষায় প্রবাদ আছে : 'অল ইন্‌তিজারু আশাদ্দু মিনাল্‌ মউত্‌।' অর্থাৎ 'প্রতীক্ষা করাটা (ইন্‌তিজার) মৃত্যুর চেয়েও কঠোরতর।'

অনেক ভেবেচিন্তে একটি হ্রস্ব চিঠি লিখে পত্রলেখিকাকে ধন্যবাদ জানালুম এবং সর্বশেষে একটা অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিলুম যে, আমার বয়স বাড়তির দিকে, শক্তি কমতির দিকে, অতএব চিঠিচাপাটি লেখা বাবদে আমাকে যেন একটু সদয় নিষ্কৃতি দেওয়া হয়— ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার পর কী হল? আমি আশা করেছিলুম, এখানেই শেষ। মূর্খ আমি, জানতুম না, এইখানেই আরম্ভ।

www.pathagar.com

দিন পনেরো পর ওই 'পঞ্চদশী'র পাড়া থেকে এল আরও পাঁচখানা চিঠি! সবকটা চিঠি যে একই পাড়া থেকে, সেটা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাকে ব্যোমকেশ-হোম্‌স্ হতে হয়নি। মসজিদবাড়ি পাড়া, কলকাতা-৬ আমার বিলক্ষণ চেনা।

স্পষ্ট বোঝা গেল, পঞ্চদশীটি আমার চিঠিখানা তাঁর পাড়ার তাবৎ বান্ধবীকে দেখিয়েছেন।

এস্থলে পাঠকদের কাছে আমার একটি অতিশয় ক্ষুদ্র আরজি আছে। এবং সেটি যদি তাঁরা মঞ্জুর না করেন তবে আমি সত্য সত্যই মর্মাহত হব। এটা কথার কথা নয়, হৃদয়ের কথা। আমি জানি, আমি মোকা-বেমোকায় ঠাট্টা-মশকরা করি, কিন্তু আমার এ আরজি মোটেই মশকরা-রসিকতা নয়— সিরিয়াস। আমার নিবেদন :

এই যে এতক্ষণ ধরে আমি আমাকে লেখা চিঠিপত্র নিয়ে যে আলোচনা করেছি সেটা আমার মূল্য বাড়াবার জন্য নয়।

আমি আল্লা মানি। আল্লার কসম খেয়ে একথা বলছি।

আপনারা তারাশঙ্করাদি প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের শুধোন— মিথ্যা বিনয় নয়, আমি তো ওঁদের অনেক পিছনে— তাঁরা কত না কত রঙের কত ঢঙের, কত না কল্পনাতীত জায়গা থেকে, কত না অবিশ্বাস্য ধরনের চিঠি পান।

ওঁরা যত চিঠি পান, তার শতাংশের একাংশও আমি পাই না।

এখানে এসে আমাকে আরেকটি কথা বেশ জোর গলায় বলতে হবে।

অদ্যাবধি কি দেশে, কি বিদেশে আমি একটি লেখকও পাইনি যিনি অপরিচিত পাঠকের স্বতঃপ্রবৃত্ত পত্র পেয়ে আনন্দিত হন না। এমনকি কড়া চিঠি পেয়েও লেখকরা খুব একটা বিমুখ হন না। তবে এ ধরনের চিঠি আসে কমই। কারণ স্বয়ং কবিগুরু বলেছেন,

'আমার মতে জগৎটাতে
ভালোটারই প্রাধান্য—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ
ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।'

তবে লেখককুল 'তিন-চল্লিশ'খানা 'মন্দ' চিঠি পান না, পান তার চেয়ে ঢের ঢের কম। তবে অন্য 'মন্দ' চিঠিগুলো যায় কোথায়? সেগুলো যায় সোজা সম্পাদক মহাশয়ের নামে। সেগুলোতে থাকে নানা প্রকারের প্রতিবাদ, মন্দমধুর সমালোচনা বা তীব্র কঠোর মন্তব্য। সম্পাদক আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন বলে কোনওটা ছাপান, কোনওটা ছাপান না।

এই ব্যবস্থাই উত্তম। বুঝিয়ে বলি :

আপনি আমাকে সরাসরি চিঠি লিখলেন (সম্পাদক মহাশয়কে না), 'মহাশয়, আপনার শহর্-ইয়ার নিতান্তই কাল্পনিক রচনা। এরকম মুসলমান মেয়ে বাঙালা দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব।' তার পর আপনি সুচারুরূপে আপন অভিজ্ঞতাপ্রসূত সম্পদ যুক্তিযুক্তভাবে প্রকাশ করলেন।

এস্থলে আমি করি কী?

আপনি এস্থলে বলেছেন, 'তুমি, আলী, অপরাধী!'

এস্থলে চিন্তা করুন তো, কোন অপরাধী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, আমি অপরাধী, স্যার!— গিল্‌টি, মিলাট্ (মাই লর্ড)!'

www.pathagar.com

ব্যাপার যদি এতই সরল হবে তবে তো আদালতের শতকরা নব্বইটি মোকদ্দমা সঙ্গে সঙ্গে ফৈসালা হয়ে যেত।

কিন্তু আমি 'নট্ গিলটি' বললেই তো অনুযোগকারী পত্রলেখক (প্রসিকিউশন, ফরিয়াদি) সঙ্গে সঙ্গে সেটা মেনে নেবেন না।

তাই পুনরায় প্রশ্ন, এস্থলে আমি করি কী?

এইবারে আমি আমার মোদ্দা কথাতে এসে গিয়েছি।

পত্রলেখক যদি তাঁর অনুযোগ আমাকে সরাসরি না লিখে সম্পাদক মশাইকে জানাতেন, তবে আমি বেঁচে যেতুম। সম্পাদকমশাই না ছাপালে তো ল্যাঠাই চুকে যেত। অর্থাৎ মোকদ্দমা আদৌ আদালতে উঠল না।

কিন্তু তিনি ছাপালেও আমি খুশি। কারণ, তখন যাঁরা এ বাবদে ভিন্নমত পোষণ করেন তাঁরা আমার পক্ষ নিয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ভূরি ভূরি প্রমাণ পেশ করবেন যে, শহ্‌র্-ইয়ার আদৌ কাল্পনিক নয়।

আমার মনে হয়, এই পন্থাই (প্রসিডিয়র) সর্বোত্তম।

এ বাবদ ভবিষ্যতেও লেখার আশা পোষণ করি।

ইতোমধ্যে, দোহাই পাঠক, তুমি আদৌ ভেবো না, আমি সরাসরি চিঠি পেতে আদপেই পছন্দ করি না। খুব পছন্দ করি, বিলক্ষণ পছন্দ করি।

কিন্তু সেগুলোর উত্তর দেওয়াটা যে বড়—।

ব্রেন-ড্রেন

যাঁরা এদেশে গবেষণা করার সুযোগ পান না, তাঁদের অনেকেই ইংলন্ডে চলে যান। আবার বিলিতি খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পাবেন, সেখানেও ওই একই ব্যাপার; মেধাবী বৈজ্ঞানিক তার জুতো থেকে ইংলন্ডের ধুলো ঝেড়ে ফেলে মার্কিন মুলুকে চলে যায়। সেখানে বেশি মাইনে তো পাবেই, এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেখানে গবেষণা করার জন্য পাবে আশাতিরিক্ত অর্থানুকূল্য। অধুনা 'গৌরীসেন' মার্কিন সিটিজেন্‌শিপ গ্রহণ করে সেখানেই ডলার ঢালেন।... জর্মন কাগজেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই, ওদের তরুণ বৈজ্ঞানিকদেরও কিছু কিছু মার্কিন-মক্কায় চলে যাচ্ছে।

থাকি মফস্বলে। কলকাতায় পৌঁছলুম ল্যাটে। তবু দেখি, পাড়ায় ঝাণ্ডুতম রক খুরানা সায়েবের মার্কিন নাগরিকতা গ্রহণ নিয়ে সরগরম, মালুম হল, মতভেদ ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ। রকের খলিফে-বেঞ্চ বলছেন, যে-যেখানে কাজের সুযোগ পাবে, সে সেখানে যাবে— বাংলা কথা। পক্ষান্তরে তালেবর-বেঞ্চ যুক্তিতর্কসহ সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, 'খুরানা মহাশয়ের উচিত ছিল দেশে থেকে দেশের সেবা করা। এবং উচিত-অনুচিতের কথাই যখন উঠল তখন বলতে হবে এদেশের কর্তৃপক্ষই পয়লা নম্বরের আসামি। নিজেরা

www.pathagar.com

তো কিছু করবেনই না, যারা করতে চায় তাদেরও কিছু করতে দেবেন না। এক্কেবারে ডগ অ্যানড দি ম্যানেজার—'

তালেবর পক্ষেরই এক ব্যাক-বেঞ্চার ক্ষীণকণ্ঠে শুধোল, প্রবাদটা কি 'ডগ অ্যানড দি মেইনজার—' নয়?

'আলবৎ নয়। এখন এঁরা সব ম্যানেজার!'

এর পর কর্তাদের নিয়ে আরম্ভ হল কটুকাটব্য। আমি প্রাচীনযুগের লোক— ডাইনে-বাঁয়ে চট করে একবার তাকিয়ে নিলুম। টেগার্ট সায়েবের প্রেতাত্মা আবার কোথাও পঞ্চভূত ধারণ করেননি তো!

খলিফে পক্ষের এক চাঁই মাথা দুলোতে দুলোতে বললেন, "সেই কথাই তো হচ্ছে। কাজ করতেও দেবে না। তবে শোনো আমাদেরই এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নীতি— যদিও সেটা তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেন না— ভিন্ন রাষ্ট্রের কাউকে আপন রাষ্ট্রে চাকরি দেবেন না। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও এক সাবজেক্টে ঝাড়া বিশটি বছর ধরে কেউ মাস্টার্স ডিগ্রিতে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। বুড়ো-হাবড়া অধ্যাপকরা রিটায়ার করতে চান না। ওদিকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে কাউকে লেকচারার তক নেবেন না— যদি ফার্স্ট ক্লাসের 'হরিনাম' তার সর্বাঙ্গে ছাপা না থাকে। এদিকে চন্দনের বাটিটি বিশটি বচ্ছর ধরে তাঁরা ঝুলিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন সযত্নে। শুধোলে অবশ্য বলেন, 'ঘোর কলিকাল মোশয়, ঘোর কলিকাল। পাষণ্ড, পাষণ্ড, পাষণ্ডের পাল। অধ্যয়নে কি এঁদের কোনওপ্রকারের আসক্তি আছে? পড়েননি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থানের প্রতিবেদন?— স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে 'ছাত্রসমাজে, বিশেষ করে ছাত্রসমাজে, মদ্যাদি সেবন দ্রুতগতিতে শনৈঃ শনৈঃ বর্ধমান!'— এদের গায়ে কাটব হরিনামের ছাপ! মাথা খারাপ!"

খলিফে পক্ষের আরেক 'খাজা' বললেন, 'বিলক্ষণ! ভাল্লুকের সর্বাঙ্গে লোম। এম-এর তেড়ি কাটবে কোথায়?'

প্রথম চাঁই সোল্লাসে বললেন, 'বিলকুল! সে দেশের মেস্টার পুত্রবৎ ছাত্রকে স্নাতকোত্তর করতে চায় না, সে দেবে তাকে রিসার্চ করতে! ওই আনন্দেই থাকো।'

খলিফের খাজা বললেন, 'যথা, পিতার প্রেতাত্মা দাবড়ে বেড়াবেন বিশ্বময়, কিন্তু পুত্রকে দেবেন না— এস্তেক পিণ্ড-দাদনদানে— পিণ্ড দিয়ে অশৌচ সমাপ্তি করতে।'

তালেবর বেঞ্চ ঢিড্ খেয়ে যাবার খাবি খাচ্ছে দেখে তাদের এক ঝানু তখন 'ফিলিঙে'র শরণাপন্ন হলেন।

এস্থলে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হয়। দরদ, সহানুভূতি, সমবেদনা, সহব্যথা, হৃদয়বেদনা এ শব্দগুলো বড্ডই মোলায়েম মরমিয়া। অপিচ 'ফিলিঙ' কথাটা 'ফ' হরফে কট্টর জোর দিয়ে (অবশ্যই ইংরাজি 'F'-এর মতো উচ্চারণ না করে) শব্দটা বললে তবেই না গভীর ভাবানুভূতির খানিকটে প্রকাশ পায়![১]

সেই 'ফ' উচ্চারণ করে ঝানু-তালেবর ভাবাবেগে বললেন 'pfi-লিঙ নেই, pfi-লিঙ নেই, সব ফলানা ফলানা খুরানাদের কারওরই ফিলিঙ নেই দেশের প্রতি। দেশে বসে কী রিসার্চ করা যায়—'

---

১. অর্থাৎ 'প্রফুল্ল' শব্দ আমরা যেভাবে উচ্চারণ করি সেভাবে নয়। মারওয়াড়িরা যেভাবে 'পর-ফু (pf) ল্ল' উচ্চারণ করেন তারই 'ফ'।

www.pathagar.com

কথা শেষ না হতেই খলিফে পক্ষের আরেক গুণীন্ মিনমিনিয়ে বললেন, 'নৌকোতে বসে কি গুন টানা যায় না!'

ওই পক্ষের আরেক জাঁহাবাজ বললেন, 'কিংবা মাতৃগর্ভে শুয়ে শুয়ে দেশভ্রমণ!'

এইবারে রকের বারোয়ারি 'মামা' মুখ খুললেন। ইনি আমাদের রকের প্রেসিডেন্ট! এঁরই রকে আমরা দু-দণ্ড রসালাপ করি। কিন্তু ইনি থাকেন প্রাচীন দিনের একটি সোফাতে শুয়ে ঘরের ভিতরে। অনেকটা কবিগুরুর 'রাজা' নাটকের রাজার মতো। অবরে-সবরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-একটি লবজো ছাড়েন।

বললেন, 'সেরকম নিষ্ঠা থাকলে কি দেশে থেকেই রিসার্চ করা যায় না? সেইটেই হচ্ছে মোদ্দা কথা।'

বিজ্ঞানের বেলা অর্থাৎ এপ্লায়েড সায়েন্সের বেলা আজকাল বিস্তর যন্ত্রপাতি, মালমসলার প্রয়োজন। তার জন্য প্রচুর আয়োজন প্রচুরতর অর্থ না থাকলে এসব হয় না। অবশ্য, একথাও সত্য জগদীশচন্দ্র বসু, মার্কনি এবং আরও মেলা লোক এসব না থাকা সত্ত্বেও এন্তের কেরামতি দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু সেসব দিন হয়তো গেছে। আজকের দিন স্বয়ং লেওনারদো দা ভিন্‌চিও সরকারি গৌরীসেনের সাহায্য ছাড়া এটম্ বম্ বানাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু পিওর সায়েন্স? পিওর ফিজিক্স, ম্যাথ্‌মিটিক্স, আরও বিস্তর বিষয়বস্তু আছে যার জন্যে কোনওই যন্ত্রপাতি টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় না— সেগুলোর বেলা কী? তা হলে শোন, একটা গল্প বলি, সত্যি-মিথ্যে জানিনে, বাবা! একদা কালিফর্‌নিয়ার এক বিরাট ইন্‌স্টিটুটে বিরাটতর টেলিস্কোপ লাগানো উপলক্ষে মাদাম আইনস্টাইনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সরলা মাদাম সেই দানবপ্রমাণ যন্ত্রটা দেখে তো একেবারে স্তম্ভিত।

'যেহোভার দোহাই!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মাদাম : 'এ যন্তরটা লাগে কোন কাজে?'

বড় কর্তা হাত কচলাতে কচলাতে খুশিতে ফাটোফাটো হয়ে বললেন, 'মাদাম, এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তার পরিপূর্ণ স্বরূপ (Gestalt) হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এটি অপরিহার্য। এ বাবদে আপনার স্বামী, আমাদের গুরুর অবদানও তো হেঁ, হেঁ—।'

ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করে মাদাম বললেন, 'সে কী! আমার কর্তা তো ওয়েস্ট পেপার বাসকেট থেকে একটা পুরনো খাম তুলে নিয়ে তার উল্টো পিঠে এসব করে থাকেন।'

'তবেই দেখ, হয়ও অনেক কিছুই যন্ত্রপাতি ছাড়াও।'

কিন্তু এসব বাদ দাও এবং চিন্তা কর দর্শন, ন্যায়, ইতিহাস, প্রাচ্যতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অলঙ্কার শব্দতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি এন্তের এন্তের সবজেক্ট রয়েছে যার জন্য কোনও ক্ষুদে গৌরীসেনেরও প্রয়োজন হয় না।

মামা দম নিয়ে বললেন, "এবারে বাবারা বল, তোমরা তো অনেক সবজেক্টে অনেক পাস দিয়েছ; গত তিরিশ বছরে এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে কোন কোন মহাপ্রভুর দর্শন ইত্যাদি সবজেক্টে গবেষণার বিশল্যকরণী সমেত গন্ধমাদন উত্তোলন করে ভুবন 'ভির্খ্যাতো' হয়েছেন? বাঙালা দেশের কথা বিশেষ করে বলুন, কারণ একদা এদেশ হিন্দুস্থানের লিডার ছিল।"

মামার চোখে-মুখে ব্যঙ্গভরা বেদনা।

www.pathagar.com

এইবারে আমি মুখ খোলার একটু মোকা পেয়ে বললুম, 'তা মামু-সায়েব— রিসার্চের জন্য কড়ি লাগুক আর না-ই লাগুক, যে লোকটা রিসার্চ করবে তার পেটে, তার সমাজের আর পাঁচজনের পেটে যদি দু মুঠো অন্ন না থাকে তবে কি রিসার্চ হয়? আজ এই কলকাতা শহরে আর সকলের পেটেই অন্ন আছে— নেই শুধু বাঙালির।

মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যেন আপন মনে বিড়বিড় করে— '১৮২০ থেকে ১৯২০। ওই সময়টায় কলকাতায় বাঙালি সচ্ছল ছিল। যা কিছু করেছে ওই সময়েই করেছে। আজকের দিনে দু-পাঁচটা প্রফেসরের দু-মুঠো অন্ন জোটে, একথা সত্যি। কিন্তু তার আর পাঁচটা ভাইবেরাদর, মোদ্দাকথা তার গোটা সমাজ (Gestalt) যদি নিরন্ন হয় তবে এই দু-পাঁচটা প্রফেসরও কোনওকিছু দেখাবার মতো করে উঠতে পারে না। সি-লেভেল থেকে আচমকা এভারেস্ট মাথা উঁচু করে খাড়া হয় না; তবে লেভেল অর্থাৎ তার সমাজ অনেকখানি উঁচু না হলে সে আকাশচুম্বী হবে কী করে?'

আস্তে আস্তে মামা চোখ খুললেন। কড়া গলায় বললেন, '১৮২০ থেকে ১৯০০ কিংবা ১৯২০ পর্যন্ত কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য— আর ওইটেই তো সমাজের সচ্ছলতা আনে— কাদের হাত থেকে কাদের হাতে গেল সেইটে একটু খুঁজে দেখ তো।' হেসে বললেন, 'ওই নিয়ে একটা রিসার্চ কর না।'

বনে ভূত না মনে ভূত

আমাকে অনেকেই জিগ্যেস করেন, দেশ-বিদেশ তো অনেক ঘুরলেন, বয়সও হয়েছে, অতিপ্রাকৃত অলৌকিক কিছু দেখেছেন কি? সোজা বাংলায় ভূত, প্রেত, মামদো (মানুষ মরে ভূত হয় এটা ইসলাম অস্বীকার করে কিন্তু কোনও কোনও হিন্দুর বিশ্বাস 'অয়, অয় Zানতি পার না।' মুহম্মদি মানুষ— অর্থাৎ মুসলমান— মরে গিয়ে মামদো হয়— মুহম্মদি শব্দ গ্রাম্য বাংলায় হয়ে গিয়েছে 'মামদো'। এস্থলে Zানতি কথাটা ঠিক ঠিক ব্যবহৃত হয়েছে— কারণ মামদো বলুন, ভূত বলুন, এনাদের তো চট করে চোখে দেখা যায় না— অতএব এনারা আছেন, ওনারাও আছেন, শুধু আমরা Zানতি পারি না) এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতবেজাতের ভূতের কোনও একটা আমি দেখেছি কি না?

জর্মন ভাষায় দুটি শব্দ বাংলায় বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। একটা 'কিন্ডারগার্টেন' আরেকটা— যদিও অতখানি চালু না— 'রিন্ডারপেস্ট' পশুচিকিৎসক মাত্রই চেনেন। আরেকটি শব্দ প্রচলিত হওয়ার বড়ই প্রয়োজন— 'পল্টারগাইস্ট'। ভুতুড়ে বাড়িতে যে দমাদ্দম ইটপাটকেল এবং মাঝেমধ্যে কচুপাতায় মোড়া নোংরা বস্তুও বর্ষিত হয় সেটি করেন পল্টারগাইস্ট। 'পল্টারন্' ক্রিয়ার অর্থ দুদ্দাড় দুমদাম শব্দ করা আর গাইস্ট = ইংরিজি গোস্ট (ghost)।

এর থেকে আরেকটা তত্ত্ব সুস্পষ্ট হয়। ভূত-প্রেত সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের যেখান থেকেই হোক না কেন, কোনও গুজব, জনরব— একুনে গুজোরব— পৌঁছনোমাত্রই সরল মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিশ্বাস করে ফেলে এবং সেই নয়া ভূতকে অবিচারে জাতে তুলে নেয়। ইংরেজের

www.pathagar.com

মতো অবিশ্বাসী (অনবিলিভিং টমাস) জাতও তাই তার দুশমন জর্মন জাতের পল্‌টারগাইস্টকে আলিঙ্গন করে আপন ভাষায় স্থান দিয়েছে। বিশ্বাস না হয়, যে কোনও ইংরেজি দিকসুন্দরীর (যে সুন্দরী নারী দিক দেখিয়ে দেন, অর্থাৎ ডিক্‌শনারি) আশ্রয় গ্রহণ করে সন্দেহ ভঞ্জন করুন। প্রেতসিদ্ধ কোনও কোনও গুণীন নাকি ভূতপ্রেতকে দিয়ে অনেক কিছু কাজকর্ম করিয়ে নেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন তাঁর নক্‌শাতে এঁদের সম্বন্ধে সবিস্তার তাজ্জব বয়ান দিয়েছেন। কোনও কোনও পীর সাহেবও নাকি এখনও এই অলৌকিক তিলিসমাৎ দেখাতে পারেন। শীতকালে বোম্বাই আম, যে কোনও কালে কাবুলি মেওয়া পয়দা করতে পারেন।

দুঃখের বিষয় মহাকবি গ্যোটের সেই সুন্দর কবিতাটি আমি ভুলে গিয়েছি। যদ্দূর মনে পড়ছে তাতে এক চেলা পরিপূর্ণ ভূতসিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই উচাটন মন্ত্রে ভূতকে আবাহন জানায়। তার পর কী একটা হুকুম করে— খুব সম্ভব জল আনতে— তার পর ভূত জল আনছে তো আনছেই, জলে জলে ছয়লাপ। ওদিকে বিপদ হয়েছে কী, চেলা কিন্তু গুরুর কাছ থেকে শেষ উচাটন মন্ত্রটি যেটি দিয়ে ভূতকে ঠেকাবে, সেটি শেখার পূর্বেই চলে এসেছে। এখন বন্যার জলে ডুবে মরে আর কি!... শেষটায় কাতরকণ্ঠে সে গুরুকে স্মরণ করল। গুরু এসে এই ভূতকে অন্য হুকুম দিলেন, 'আমি এসব চ্যাংড়াদের গুরু। প্রথমে আমার মোক্ষম হুকুম শোন। তার পর অন্য কাজ।' এই বলে তিনি ভূতকে অন্য হুকুম দিয়ে বন্যা বন্ধ করলেন।

কিন্তু এ বাবদে আমাদের দেশে প্রচলিত গল্পটি এরচেয়ে ঢের ঢের ভালো। সে গল্পের গোড়াপত্তন ওই একই। আমাদের গল্পে গুরুর কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিদ্যা আয়ত্ত করার পূর্বেই চেলা তার ভূতকে আবাহন করেছে। ভূতের সঙ্গে তার কিন্তু একটা শর্ত ছিল। ভূতকে সর্বক্ষণ কোনওকিছু একটা কাজ দিতে হবে। সে বেকার থাকতে পারে না। কাজ না দিতে পারলে সে ওর ঘাড়টি মটকে দেবে।

অস্মদ্দেশীয় কাহিনীতে চেলা ভূতকে ডেকে বলল, 'আমার জন্য একটা রাজপ্রাসাদ তৈরি করে দাও।' দু-মিনিট যেতে না যেতেই রাজপ্রাসাদ চোখের সামনে তৈরি। ভূত বলল, 'তার পরের হুকুম?' চেলা তো তাজ্জব। তাড়াতাড়ি বলল, 'গোটা দশেক সুন্দরী রমণী।' ভূত কটমটিয়ে তাকিয়ে বলল, 'সে তো প্রাসাদে অলরেডি রয়েছে। বুদ্দু! হেরেম ভিন্ন প্রাসাদ হয় নাকি?' চেলা বলল, 'তা হলে প্রাসাদের সামনে একটা হ্রদ তৈরি করে দাও।' এক মিনিটে তৈরি। ভূত শুধোল, 'তার পরের কাজ?' চেলা তখন আরও মেলাই অর্ডার দিল। সেগুলোও ঝটপট হয়ে গেল। আর প্রতিবারেই ভূত তার কাছে এসে কটমটিয়ে তাকায়। ভাবখানা সুস্পষ্ট। কাজ না দিতে পারলে শর্তানুযায়ী তোমার ঘাড়টা মটাস করে ভাঙব। চেলা তখন পড়েছে মহাসঙ্কটে। নতুন অর্ডার খুঁজে পায় না। কবি গ্যোটের চেলার মতোই সে ভূত বিদায় দিতে জানে না। তখন হন্নে হয়ে, না পেরে, কবি গ্যোটেরই চেলার মতো সে তার গুরুকে স্মরণ করল।

এইখানেই আমাদের কাহিনী গ্যোটের কাহিনীর চেয়ে ঢের সরেস।

আমাদের গুরু তাঁর প্রাচীনতার, ফার্স্ট প্রেফারেন্সের দোহাই পাড়লেন না। চেলাকে বললেন, 'ভূতকে হুকুম দাও একটা বাঁশ পুঁততে।' সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। গুরু চেলাকে বললেন, 'এবারে ভূতকে হুকুম দাও, সে যেন ওই বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠে। এবং উপরে ওঠামাত্রই যেন নিচে বেয়ে নামে। ফের উপর। ফের নিচে। ফের উপর। ফের নিচ।'

www.pathagar.com

গুরু চেলাকে কানে কানে বললেন, 'ওই করুক, ব্যাটা অনন্ত কাল অবধি। অবশ্য যখন তোমার অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় তখন তাকে ওঠানামা ক্ষণতরে ক্ষান্ত দিয়ে সে কাজ করতে বলবে। তার পর ফের হুকুম দেবে, ওঠো নামো, ওঠো নামো।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

এ-গল্পের একটা গভীর অর্থ আছে।

মানুষের মন ওই ভূতের মতো। তাকে সর্বক্ষণ কোনও কর্মে নিয়োজিত না করতে পারলে সে তোমার ঘাড় মটকাবে। ইংরেজিতে তাই প্রবাদ 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।' অতএব যখন যা দরকার মনকে দিয়ে তাই করিয়ে নিয়ে ফের তাকে একটা বাঁশে ওঠানামার মতো মেকানিকাল কাজে লাগিয়ে দিতে হয়। মানুষ সর্বক্ষণ মনের জন্য নতুন নতুন কাজ সৃষ্টি করতে পারে না।

এইবারে, সর্বশেষে, আমি শান্তনু পাঠকের হাতে খাবো কিল।

মহাত্মাজি চরকা কাটতেন।

রবীন্দ্রনাথ আপন লেখার কপি করতেন। গোরার মতো বিরাট গ্রন্থ তিনি তিন-তিনবার কপি করেছেন। যদিও ওই মেকানিকাল কর্ম করার জন্য আশ্রমে লোকাভাব ছিল না।

আইনস্টাইন ব্যালা বাজাতেন।

স্পাই

আশ্চর্য!

মানুষ কত সহজে বিশ্বকুখ্যাত লোককে ভুলে যায়— বিশ্ববিখ্যাত লোককে ভোলাটা মানুষের পক্ষে অবশ্যই স্বাভাবিক।

মাতা হারিকে সচরাচর পৃথিবীর লোকে পয়লা নম্বরি স্পাই খেতাব দিয়েছে কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সে খ্যাতির চৌদ্দ আনা পরিমাণ গুজব আর কিংবদন্তির ওপর নির্ভর করছে। বাকি দু-আনাও বিশ্বাসযোগ্য কি না বলা সুকঠিন।

কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধের স্পাইদের রাজার রাজা রিষার্ট জরগে সম্বন্ধে অনেক কিছু পাকা খবর জানা গিয়েছে। অবশ্য এ সত্য প্রতিভাসিত যে, যে কোনও স্পাই সম্বন্ধে সব খবর কোনওদিনই পাওয়া যায় না। স্পাই ধরা পড়ার পর তার সম্বন্ধে সব খবর যদি খুঁড়ে বের করা যায় তবে সে ওঁচা স্পাই।

কিন্তু তার পূর্বে আরেকটি কথা বলে নিই। গুপ্তচরবৃত্তি বা এসপিয়োনাজের প্রথম অলিখিত আইন, গুপ্তচর যদি বিদেশে ধরা পড়ে তবে যেদেশের হয়ে সে কাজ করছিল সেদেশ কিছুতেই স্বীকার করে না যে ওই লোক তাদের গুপ্তচর। তার কারণ, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে এক দেশ অন্য দেশে সরকারিভাবে গুপ্তচর রাখতে পারে না— অথচ আশ্চর্য, প্রায় সব দেশই সেটা করে থাকে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর ইতিহাসে জর্‌গে একমাত্র ব্যত্যয়। রুশের হয়ে ইনি জাপানে সুদীর্ঘ দশ বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে স্পাইগিরি করে ১৯৪১-এ ধরা পড়েন এবং ১৯৪৪-এ তাঁর ফাঁসি হয়। যুদ্ধশেষে যখন তাঁর কর্মকীর্তির অনেকখানি প্রকাশ পেল তখন তাবৎ ইয়োরোপে হইচই পড়ে গেল এবং বহু ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে বিস্তর সিরিয়াল রগরগে কেতাব, সিনেমা, নাট্য ইত্যাদি তাবৎ পূর্ব-পশ্চিমকে রোমাঞ্চিত করে তুলল। বিশেষ করে জাপানকে। কারণ এইমাত্র বলেছি তার শেষ কর্মভূমি ছিল জাপান।

এবং এই ডামাডোলের মধ্যিখানে কোথায় না রুশ তার গোরস্তানের নৈস্তব্ধ্য বজায় রেখে 'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়'— সাইলেন্‌স্ ইজ গোল্ডেন— নীতি পুনরায় সপ্রমাণ করবে, উল্টো পৃথিবীর সর্ব রাজনৈতিক-ঐতিহ্য ধূলিসাৎ করে সগর্বে সদম্ভে সরকারিভাবে স্পাই জর্‌গের স্মৃতির উদ্দেশে বলশেভিক রুশ দেশের সর্বাধিপতি সর্বোচ্চ সম্মান মেডেল ইত্যাদি অর্পণ করলেন— এ মেডেল রুশ দেশের যুদ্ধকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদেরই দেওয়া হয় মাত্র। যতদূর মনে পড়ছে তার ছবিসহ স্ট্যাম্পও বেরিয়েছিল।[১] কিন্তু হায়, সে মেডেল গ্রহণ করার জন্য জর্‌গের দারাপুত্র পরিবার কেউ ছিল না। তাঁর স্ত্রীকে তিনি বহু পূর্বেই তালাক দিয়েছিলেন— তাঁর গুপ্তচরবৃত্তিতে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগ করার জন্য। অনেকটা হিটলারের মতো। তিনিও ওই কারণে আদৌ বিয়ে করেননি— করলেন, যখন তাঁর রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চের বৃহৎ কৃষ্ণ যবনিকা নটগুরু মহাকাল কামান গর্জনের অট্ট করতালির মাঝখানে নামিয়ে দিলেন, এবং সে বিবাহ সেই কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে। আত্মহত্যার পিস্তলধ্বনি সে বিবাহের আতশবাজির বোমা। স্ত্রীও নাট্যমঞ্চের জুলিয়েতের মতো বিষপান করলেন।... মার্কিন খবরের কাগজের নেকড়েরা এড়ি (পূর্ব বাঙলার মুসলমানি ভাষায়, তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে এড়ি— ডিভোর্সে— এবং বিধবাকে রাড়ি বলে) জর্‌গেকে খুঁজে বের করল। রমণী স্বল্প- তথা সত্য-ভাষিণী। তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ন-সিকে খাঁটি স্পাইদের মতো জর্‌গে তাঁর স্ত্রীকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে দেননি তিনি কী নিয়ে দিবারাত্র লিপ্ত থাকেন।

জর্‌গের জীবন এমনই বৈচিত্র্যময় এবং ঘটনাবহুল যে, সুদ্ধমাত্র তার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা মিনি সাইজের মহাভারত লিখতে হয়।... আমি গুপ্তচর জর্‌গেকে নিয়ে 'গুপ্ত' পদ্ধতিতে দিব্য একখানা রগরগে সিরিয়াল লিখতে পারি— যত কাঁচা ভাষা ততোধিক বেঢপ শৈলীতে লিখলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যবশত সেটা উৎরে যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু বয়স হয়েছে। আমার জীবনদুর্গে প্রাচীরের বাইরে, গভীর রাত্রে যমদূতের পদধ্বনি প্রায়ই শুনতে পাই। মাঝে মাঝে— ইদানীং ক্রমেই টেম্পো বেড়ে যাচ্ছে— প্রাচীরের উপর সাহেবি কায়দায় নক্‌ও করে। এহেন অবস্থায় সিরিয়াল অসম্পূর্ণ রেখে উল্টোরথহীন রথযাত্রায় বেরুতে চাইনে— মমেকসদয় সম্পাদকমণ্ডলীকে ক্ষিপ্ত পাঠক সম্প্রদায়ের অভিসম্পাতকুণ্ডে নিমজ্জিত করে। কাজেই সম্ভাব্য ক্ষিপ্ত পাঠকমণ্ডলীর জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠ দিচ্ছি— সাতিশয় সংক্ষিপ্ত।[২]

---

১. কোনও ফিলাটেলিস্ট পাকা খবর জানালে বাধিত হব।

২. শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী-লেখকের উপকারার্থে মসলা নিবেদন। একখানা বৃহৎ ব্যাকরণ রচনা করার কয়েক বৎসর পর তিনি তারই একখানি 'সংক্ষিপ্ত' সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে পর দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, 'এটা হল "সংক্ষিপ্ত" ব্যাকরণ; আগেরটা ছিল "ক্ষিপ্ত" ব্যাকরণ।'

www.pathagar.com

দুই কারণে সোভিয়েত দেশ জর্গের কাছে চিরঋণী। অবশ্য রুশের আরও বহু সেবা তিনি করেছেন।

প্রথম : হিটলার রুশদের আক্রমণ করার বেশ কয়েক মাস অর্থাৎ পর্যাপ্তকাল পূর্বে জর্গে জাপান থেকে গোপন বেতারযোগে (বেতারযন্ত্রটি চালাতেন তাঁর এক সহ-স্পাই) স্তালিনকে খবর পাঠান, হিটলার চুক্তিভঙ্গ করে রুশ আক্রমণ করবে। শুধু তাই নয়, কোন মাসে, কোন সপ্তাহে সে খবরও পাকাপাকিভাবে জানান। আশ্চর্য, যখন খুদ জর্মনির মাত্র গুটিকয়েক ডাঙর ডাঙর জাঁদরেল জানতেন যে হিটলার রুশ আক্রমণ করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছেন এবং তাঁরাও জানতেন না, কবে কোন মাসে হিটলার সে হামলা শুরু করবেন, তখন জর্মনি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের জাপানে বসে জর্গে এই পাকা খবরটি পেলেন কী করে? মনে রাখা উচিত, ১৯৩৯-এ যুদ্ধারম্ভের পর থেকে জাপান এবং জর্মনির মধ্যে কোনও যাতায়াত পথ ছিল না। (সুভাষচন্দ্র যে কতখানি বিপদের ঝুঁকি মাথায় তুলে জর্মনি থেকে জাপান পাড়ি দিয়েছিলেন সেকথা সবাই জানেন।) সুইজারল্যান্ড থেকে গোপন বেতারেও— যেমন মনে করুন— খবরটা প্রথম জর্মনি থেকে নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ডে গুপ্তচর মারফত গেল— সেটা পাঠানো প্রায় অসম্ভব ছিল। ওরকম বেআইনি জোরদার বেতার ট্রান্সমিটার সুইস সরকার ধরে ফেলতই ফেলত। এস্থলে আরও বলি, হিটলার তাঁর যুদ্ধের প্ল্যান তাঁর দূর-মিত্র জাপানকে তো বলতেনই না, তাঁর অতিশয় নিকট-মিত্র— ভৌগোলিক ও হার্দিক উভয়ার্থে— মুসসোলিনিকেও আগেভাগে জানাতেন না। এবং জাপানে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসও আর-পঞ্চাশটা দেশে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসের মতোই যে এ ব্যাপারে কিছুই জানত না সে তো বহু ক্ষেত্রে সপ্রমাণ হয়ে গেছে। হিটলার যে তাঁর ফরেন আপিস এবং তাঁর রাজদূতদের অবিশ্বাস করতেন তাই নয়, এদের রীতিমতো ঘৃণা করতেন। এবং এ তত্ত্বটি হিটলার কোনওদিন গোপন রাখার কণামাত্র প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র তাঁর আপন খাস প্যারা ফরেন মিনিস্টার রিবেনট্রপকে। ইনি জাতে শুঁড়ি। কূটনীতিতে তাঁর কোনও শিক্ষাদীক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তৎসত্ত্বেও হিটলার গদিনশিন হওয়ার সামান্য কয়েক বৎসর পর তাঁর পার্টি, ফরেন আপিস, এমনকি তাঁর দক্ষিণ হস্ত গ্যোরিঙ, বাম হস্ত গ্যোবেলস সক্কলের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে রিবেনট্রপকে দুম করে বসিয়ে দিলেন ফরেন আপিসের মাথার উপর মহামান্য পররাষ্ট্র সচিবরূপে।

জর্গের দ্বিতীয় অবদান : যে রাত্রে জাপানি মন্ত্রিসভা এক অতিশয় গোপন বৈঠকে স্থির করলেন— হিটলার রুশ আক্রমণ করার পর জাপানকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, তারা যেন রুশের পূর্বসীমান্ত আক্রমণ করে— যে তাঁরা কোনও অবস্থাতেই রুশ দেশ আক্রমণ করবেন না, তার পরদিন ভোরবেলা জর্গে সেই সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গোপনতম সিদ্ধান্তটির খবর পেয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তালিনকে পূর্ব পদ্ধতিতে সংবাদটি জানান। স্তালিনের বুকের উপর থেকে জগদ্দল 'জগরনট' নেমে গেল। জাপানি আক্রমণের ভয়ে পূর্ব সীমান্তে তাঁর যে সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল সেটাকে তদ্দণ্ডেই পশ্চিম সীমান্তে এনে হানলেন হিটলারের উপর মোক্ষম হামলা। দুই সীমান্তে একইসঙ্গে কে লড়তে চায়? ওই করে সর্বনাশ হল কাইজারের। হিটলারেরও আখেরে সেই গতিই হয়েছিল। রুশ বেঁচে গেল।

www.pathagar.com

পত্রান্তরে বেরিয়েছে : গত ৬ নভেম্বর পূর্ব জর্মনির পূর্ব বার্লিনের একটি রাস্তার উপর প্রাক্তন রুশ স্পাইদের একটি সম্মিলিত অনুষ্ঠান হয়— প্রকাশ্যে। রয়টার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন : স্পাইদের সম্মেলন— তা-ও প্রকাশ্যে।

এঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের গুরুর গুরু জর্গের স্মরণে।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে বিশ্ব কম্যুনিজমের জন্য টোকিয়োতে প্রাণ দেন।

যে রাস্তাতে তাঁরা সমবেত হন সেখানে সেনাবাহিনীর ব্রাস্‌ব্যান্ডের সঙ্গীতসহ রাস্তাটির নতুন নামকরণ হয়।

'রিষার্ট জর্গে স্ট্রাসে'।

রিষার্ট জর্গে খাঁটি জর্মন নাম। রিষার্টের পিতা ছিলেন খাঁটি জর্মন, মা রুশ। জর্গের জন্ম রুশদেশে। জাপানে থাকাকালীন জর্গে সর্বজনসমক্ষে বলতে কসুর করতেন না যে, রুশের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে। তৎসত্ত্বেও কেউ কখনও সন্দেহ করেননি যে তিনি রুশের স্পাই, অতখানি কী করে হয়। ওদিকে তাঁর মূল কর্ম ছিল জাপান সম্বন্ধে স্তালিনকে খবর দেওয়া এবং দ্বিতীয় সেই সুদূর জাপান থেকে জর্মনির অভ্যন্তরীণ গুপ্ত খবরও সংগ্রহ করে তাঁকে জানানো— কী করে তিনি সংগ্রহ করতেন সেটা প্লাঁশাটে (প্ল্যানচেটে) শার্লক হোমসকে আবাহন জানালে হয়তো জানা যেতে পারে। জর্গে ধরা পড়ার পর জাপানে প্রবাসী জর্মন-অজর্মন সবাই একবাক্যে বলেছেন, জর্গে কস্মিনকালেও তাদের কাছ থেকে জর্মনি সম্বন্ধে কোনও খবরাখবর পাম্প তো করতেনই না, উল্টো নয়া নয়া খবর দিয়ে তাদের পিলে চমকে দিতেন; পরে সেগুলো কনফারম্‌ড হত।

জর্গের চেহারাটি ছিল সুন্দর এবং পুরুষত্বব্যঞ্জক। দীর্ঘ বলীয়ান দেহ। নাক চোখ ঠোঁট যেন পাথরে খোদাই অতি তীক্ষ্ণ। তাঁকে দেখে মনে হতো যেন চ্যাম্পিয়ন বক্সার বিরাট কোনও মেলাতে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াচ্ছেন, কেউ তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজি আছে কি না—

বলছেন এরিষ কর্‌ট্‌, জাপানে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসের দুই নম্বরের কর্মচারী। অবশ্য টোকিয়োতে তিনি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করতেন তর্কযুদ্ধে এবং জিততেন হামেশাই। কারণ তাঁর তূণীর ভর্তি থাকত তথ্যের লেটেস্ট ইনটেলিজেন্সের শরগুচ্ছে। অর্থাৎ নেকেড্ ফ্যাক্টস।

সেই যে গল্প আছে, গ্রামাঞ্চলের দুই ইরাকি জমিদার মোকদ্দমা লড়তে লড়তে আপিল করেছেন বাগদাদের শেষ আদালতে অর্থাৎ স্বয়ং খলিফা হারুন-উর-রশিদ এর শেষ ফাইনাল বিচার করবেন। এক জমিদার বাগদাদে এসে উঠলেন তাঁর সখা বাদশার প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে। প্রতিবাদী উঠলেন তাঁর বাল্যের বান্ধবী বাদশার খাস প্যারা রক্ষিতার বাড়িতে। বাদী মোকদ্দমা হেরে গ্রামে ফিরলে পর সবাই বিস্ময় মেনে শুধোল, 'প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে উঠেও আপনি মোকদ্দমার সুরাহা করতে পারলেন না?' তিনি বিজ্ঞজনোচিত কণ্ঠে বললেন, 'তাঁরা যে উঠেছিলেন রাজরক্ষিতার বাড়িতে। আমার কোনও যুক্তি কোনও নজির দাঁড়াতে পারে 'উলঙ্গ' যুক্তির বিরুদ্ধে, এগেনস্ট নেকেড আরগুমেন্‌ট!'

জর্গের বেশভূষা ছিল অপরিপাটি; তিনি বাস করতেন টোকিওর সবচেয়ে খাঁটির খাঁটি ঘিঞ্জি জাপানি মহল্লায় এবং বাড়িটা চোখে পড়ার মতো নোংরা। কিন্তু জাপানিদের আকর্ষণ করার মতো কেমন যেন একটু চুম্বকের শক্তি তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হত। তারা তাঁকে

www.pathagar.com

পুজো করত বললে কমই বলা হয়। ওদিকে তাঁর চালচলন ছিল ভ্যাগাবন্ড, বেদে বা বোহেমিয়ান ধরনের। রমণীবাজি করতেন প্রচুর এবং মদ্যপান করতেন বেহদ্দ। তিনটে বোতল হুইস্কি ঘণ্টা কয়েকের ভিতর সাবড়ে দিতেন তিনি অক্লেশে— চোখের পাতাটি না কাঁপিয়ে এবং তাঁর চোখের সেই তীক্ষ্ণ জ্যোতিটির উপর সামান্যতম ঘোলাটে পোঁছ পড়ত না।

অর্থাভাব তাঁর লেগেই থাকত। ধরা পড়ার পর অনুসন্ধান করে জানা যায়, তাঁর আমদানি যে কোনও মাঝারি রাজ-দূতাবাসের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের মতো অতি সাধারণ। পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি কখনও তাঁর স্পাইবৃত্তি এক্সপ্লয়েট করেননি। তিনি স্পাই হয়েছিলেন কম্যুনিজমের প্রতি তাঁর আন্তরিক আদর্শবাদে প্রবুদ্ধ হয়ে।

জর্‌গে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন রুশ এবং জর্মনি উভয় দেশে। তার স্বর্গত ঠাকুর্দা ছিলেন কার্ল মার্কসের সেক্রেটারি। শিক্ষা সমাপনান্তে, প্রথম যৌবনে, এ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি পশ্চিম জর্মনিতে একটি কম্যুনিস্ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর তাঁকে তৃতীয় ইন্টারনেশনালের বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগে কর্ম দিয়ে স্কানডিনেভিয়া ও পরে তুর্কিতে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পাঠানো হয়। তুর্কিরা এসব বাবদে অসাধারণ চালাক। গন্ধ পেয়ে যায় অচিরায়। জর্‌গে কিয়ৎকাল জেল খাটলেন— তাঁর গুপ্তচরবৃত্তিতে এই একটিমাত্র কলঙ্ক; সর্বসাধারণ অবশ্য যুদ্ধশেষের অনেক পরে এসব জানতে পায়। ১৯৩০ সালে রুশ সরকারের আদেশে তাঁকে পাঠানো হয় সাংহাইয়ে। এখান থেকে আরম্ভ হয় তাঁর কৃতিত্বময় জীবন। ...জর্‌গেকে যে জাপানি কোর্ট মারশালের সামনে দাঁড়াতে হয় সে মোকদ্দমার নথিপত্র মার্কিনরা জাপান অধিকার করার পর হস্তগত করে। তার থেকে জানা যায়, জর্‌গে সাংহাইয়ে যেসব দেশি-বিদেশি কম্যুনিস্টদের সংস্পর্শে আসেন তাঁদের অন্যতম হজুমি ওসাকি নামের জনৈক জাপানি। এরপর এঁরা মস্কোর আদেশে টোকিও চলে আসেন।

প্রকাশ্যে তাঁর পেশা ছিল নাৎসি-নির্দেশচালিত (অবশ্য তখন তাবৎ জর্মন প্রেসই গ্যোবেলসের কব্জাতে) ফ্রাঙ্কফুর্টের আলগে-মাইনে ৎসাইটুঙের সংবাদদাতারূপে। তবে তাঁর অনেক প্রবন্ধই ছাপাবার মতো সাহস সম্পাদকমণ্ডলীর ছিল না। তাঁরা সেগুলো না ছেপে চেপে যেতেন। সহকর্মীরূপে তাঁকে ক্লাউজেন নামক আরেক জর্মন গুপ্তচর দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ্যে তাঁর ব্যবসা ছিল মোটর মেরামতি। ওদিকে ছিলেন সেরার সেরা রেডিয়োর ওস্তাদ। অবশ্য জাপান থেকে রুশের পূর্বতম সীমান্তে রেডিয়োবার্তা পাঠাতে জোরদার ট্রান্সমিটারের দরকার হয় না— ধরা পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। ক্লাউজেনও ধরা পড়েছিল কিন্তু তাকে জাপানিরা ফাঁসি দেয়নি; যুদ্ধশেষে রুশ দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়।

জর্‌গে যখন ধরা পড়লেন এবং সামান্যমাত্র অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে তিনি বাঘা স্পাই, তখনই জাপান মন্ত্রিমণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক্। এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য! এইমাত্র যে জাপানি হজুমি ওসাকির নাম বললুম সে লোকটি কী করে হয়ে গিয়েছিলেন প্রিন্স কনোয়ের সাতিশয় বিশ্বাসভাজন সহকর্মী। এই কনোয়েটি যে-সে ব্যক্তি নন। একে তো জাপানের তিন-চারটি খানদানিতম ঘরের একটির প্রিন্স ডিউক, তদুপরি তিনি তিন-তিনবার জাপানের প্রধানমন্ত্রিত্ব করেছেন— এঁর আদেশেই জাপান ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগ দেয়, হিটলার ও মুসসোলিনির সঙ্গে এবং এঁরই রাজত্বকালে পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে— যদিও ঘোষণা করা হয় তাঁর পদত্যাগের পরে। এবারে পাঠক তারিখগুলো

www.pathagar.com

লক্ষ করবেন। ১৯৪০-এর জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত (ক্যাবিনেট পুনর্গঠনের জন্য মাত্র দুটি দিন বাদ দিয়ে) কনোয়ে ছিলেন জাপানের সর্বময় কর্তা এবং হজুমি ওসাকি ছিলেন তাঁর পরম বিশ্বাসী অন্তরঙ্গজন। বলা বাহুল্য গোপন মন্ত্রণাসভার আলোচনা— সিদ্ধান্ত ওসাকি কনোয়ের কাছে পেয়ে কমরেড জর্‌গেকে গরম-গরম সরবরাহ্ করতেন এবং এই চোদ্দ মাসেই জাপানের এ যুগের ইতিহাসে সবচেয়ে মোক্ষম-মোক্ষম মরণ-বাঁচন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (হিটলারের সঙ্গে দোস্তি, মার্কিনের সঙ্গে লড়াই)। একেবারে গাঁজাখুরি অবিশ্বাস্য ঠেকে যে, হিটলার-সখা কনোয়ের পরম বিশ্বাসী সহচর ছিলেন হিটলারবৈরী রুশের গুপ্তচর এবং তিনি জাপানের গোপনতম সিদ্ধান্ত স্তালিনকে পাঠাচ্ছেন হিটলারের বিনাশসাধনের জন্য। এবং হিটলার বিনষ্ট হলে যে আপন মাতৃভূমি জাপানেরও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সে তত্ত্বটি বোঝার মতো এলেম নিশ্চয়ই এই ঝানু গুপ্তচরের পেটে ছিল। তিনি নাকি গুপ্তচরবৃত্তিতে তালিম পেয়েছিলেন জর্‌গের কাছ থেকে। জর্‌গে যে স্পাইদের গুরুর গুরু সেকথা তো পূর্বেই বলেছি।

১৭ অক্টোবর ১৯৪১-এ জর্‌গে গ্রেফতার হন। ঠিক তার ৩২ দিন পূর্বে কনোয়ে মন্ত্রিত্ব পদে ইস্তফা দেন। এ দুটোতে কোনও যোগসূত্র আছে কি না— আমার কাগজপত্র কেতাবাদি সে সম্বন্ধে নীরব। আমার মনে হয় পুলিশ কোনও গুপ্তচর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ামাত্রই তাকে গ্রেফতার করে না। বেশ কিছুদিন তাকে অবাধে চলাফেরা করতে দেয়। তার সহকর্মী চরদের চিনে নেয়। তার পর এক 'শুভ প্রভাতে' বিরাট খেয়াজাল ফেলে সবকটা মাছ ধরে। ইতোমধ্যে কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান কনোয়েকে অবশ্যই জানানো হয়েছে যে, তাঁর বিশ্বাসী ওসাকিই অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী/ তার চেয়ে বেশি পাপী বিশ্বাসঘাতকী।

এত বড় কেলেঙ্কারির পর প্রধানমন্ত্রী থাকা যায় না। কনোয়ের রাজনৈতিক জীবন এখানেই চিরতরে খতম। ১৯৪৫-এ তিনি আত্মহত্যা করেন। কনোয়ে ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি খানদানি উচ্চকর্মচারীকে, জর্‌গের নির্দেশে ওসাকি পারদর্শিতার সঙ্গে দিনের পর দিন পাম্প করেছিলেন।

সামসনের মতো জর্‌গে পুরো এমারত ধূলিসাৎ না করতে পারলেও জাপান রাষ্ট্রের ভিতে যে ফাটল ফাটিয়ে যান সেটা কখনও মেরামত হয়নি।

আধুনিকের আত্মহত্যা

১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দের কথা। ১৯১৪-১৮র বিশ্বযুদ্ধে যত যুবক ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ, খ্রিস্টধর্মের ব্যর্থতা এবং স্ব স্ব আদর্শবাদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, কেন জানিনে, তার দশমাংশও করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন নগর, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার করে বক্তৃতা দেন তখন বিশেষ করে মুগ্ধ হন তাঁরাই, যাঁরা একদা খ্রিস্টধর্মে গভীর বিশ্বাস ধরতেন কিন্তু যুদ্ধের কল্পনাতীত বর্বরতা দেখে সে ধর্মের কার্যকারিতা অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম ইয়োরোপের খ্রিস্টানগণকে ভদ্রমানুষে পরিবর্তিত করতে পারবে কি না, সে-বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন। অনেকেই নৈরাশ্যবশত সাতিশয় বিরক্তিসহ চার্চে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমনকি তাঁদের ঈশ্বরবিশ্বাসের দৃঢ়ভূমি পর্যন্ত যেন তাঁদের পায়ের তলা থেকে ক্রমেই শিথিল হয়ে সরে যাচ্ছিল। শুধু যুবক সম্প্রদায়ই নয়, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতরা পর্যন্ত ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন— ভিক্টোরীয় যুগে তাঁদের যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্যজাতি, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গগণ সভ্য থেকে সভ্যতর পর্যায়ে উঠছে এবং ফলে একদিন আর এ-সংসারে দুঃখদৈন্য অনাচার-উৎপীড়ন থাকবে না, সেটি লোপ পেল। বিশেষ করে যাঁরা ইতিহাসের দর্শন নিয়ে হেগেলের যুগ থেকে প্রশ্ন করছেন যে, ইতিহাসে আমরা শুধু অসংলগ্ন, চৈতন্যহীন মূঢ় কতকগুলি ঘটনা-সমষ্টি পাই, না এর পিছনে কোনও সচেতন সত্তা ঘটনাপরম্পরাগত ক্রমবিকাশের মাধ্যমে শুধু যে মানুষকে উন্নততর এবং সভ্যতর পন্থায় নিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, নিজেকেও সপ্রকাশ করছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অনেকেই দ্বিতীয় সমাধানটি অগ্রাহ্য করলেন, এবং অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-দর্শনের সুপণ্ডিত অসভাল্ট স্পেঙলার তাই লিখলেন, 'য়ুরোপের সূর্যাস্ত' (ড্যার উন্টেরগাঙ ডেস্ আবেন্টলান্ডের)। বইখানার খ্যাতি সে যুগে পঞ্চমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু আমি যুবকদের কথা বলছিলুম। তাদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের বাণীর মাধ্যমে অনুভব করল যে প্রচলিত খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস না করেও শাশ্বত সত্য ধর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরবিশ্বাসের উচ্চতম পর্যায়ে ওঠা যায়, এঁদের একাধিক জন তখন প্রাচ্যভূমিতে এসে স্থায়ী বসবাস নির্মাণ করতে উদ্গ্রীব হন।

এঁদেরই একজন মসিয়ো ফের্না বেনওয়া। রবীন্দ্রনাথ যে-কজন ইয়োরোপীয়কে বিশ্বভারতীতে— কয়েকজনকে অন্তত সাময়িকভাবে— শিক্ষাদানের জন্য আহ্বান করেছিলেন তাঁদের সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন : যেমন লেভি, ভিন্টারনিৎস, তুচ্চি ইত্যাদি। খাঁটি সাহিত্যিক ছিলেন একমাত্র অধ্যাপক বেনওয়া এবং তিনি ফ্রান্সেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই, যখন মনীষী রমাঁ রলাঁ তাঁর জীবনের ষষ্টিতম বৎসরে পদার্পণ করার শুভলগ্নে বিশ্ববাসী গুণীজ্ঞানীগণ একখানা পুস্তক তাঁকে উৎসর্গ করেন। বইখানার নাম তাঁরা দেন লাতিনে 'লিবার আমিকরুম্'— অর্থাৎ 'সখাগণপ্রদত্ত (উৎসর্গিত) পুস্তক।' এদেশ থেকে লেখেন মহাত্মা গান্ধী, জগদীশচন্দ্র বসু ইত্যাদি। পৃথিবীর প্রায় সর্ব সভ্যদেশ থেকে কেউ-না-কেউ ওই শুভলগ্নে রলাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। আমার এখনও মনে আছে এক আরব রলাঁকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন, 'তুমি লৌহসম্মার্জনী দ্বারা ইয়োরোপের কুসংস্কার জঞ্জাল দূর করেছ।' বলা বাহুল্য, ওই লেখনী সঞ্চয়নে আপন রচনা দিয়ে শ্লাঘাপ্রাপ্তির জন্য যখন সর্ববিশ্বের সহস্র সহস্র গুণীজ্ঞানী উদ্গ্রীব, তখন প্যারিস থেকে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানানো হয় অধ্যাপক বেনওয়াকে, তাঁর রচনার জন্য। তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিনয়বশত আশ্রমের কাউকে কিছু বলেননি, কিন্তু ওই 'লিবার আমিকরুম্' যখন আমাদের লাইব্রেরিতে পৌঁছল তখন আমরা সেটিতে আমাদেরই অধ্যাপকের রচনা দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হই। তিনিও আবার তাঁর প্রবন্ধে কোনও গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করেননি— আমরা ঠিক সেই সময়ে তাঁর ক্লাসে রলাঁর এক স্বল্পখ্যাত পুস্তিকা 'পিয়ের এ ল্যুস'— 'পিটার ও ল্যুসি' পড়ছিলাম। চটি বই। বিরাট *জ্যাঁ ক্রিস্তফ* লেখার পর রলাঁ দুই তরুণ-তরুণীর একটি বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিনী লিখে *জ্যাঁ ক্রিস্তফের* মতো বিরাট পুস্তকের কঠিন কঠিন সমস্যা,

www.pathagar.com

ইয়োরোপীয় সভ্যতা নিয়ে আলোড়ন-বিলোড়ন থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন। বেনওয়া তাঁর প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'শান্তিনিকেতনে পিয়ের এ ল্যুস'— যতদূর মনে পড়ছে, এই শিরোনামা দিয়ে, এবং 'পিয়ের এ ল্যুস' পড়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার সবিস্তার বর্ণনা দেন। রলাঁকে উৎসর্গিত 'লিবার আমিকরুম্' পুস্তকের কোনও কোনও অংশ সেসময়ে কালিদাস নাগ অনুবাদ করে এদেশে প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক বেনওয়ার গত হওয়ার দিবস বিস্ময়সূচক। যে গুরুর কাছ থেকে তিনি অকৃপণ স্নেহ ও সম্মান পেয়েছিলেন তাঁরই জন্মশতবার্ষিকীর দিনে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

এস্থলে আমি অধ্যাপক বেনওয়ার জীবনী লিখতে যাচ্ছিনে। বস্তুত ১৯২১ থেকে এবং সঠিক বলতে গেলে যবে থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় থেকে ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত যেসব গুণীজ্ঞানীরা এখানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছিলেন তাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার ভার আমার স্কন্ধে নয়। কার, সেটা বলা বাহুল্য। বছর দশেক পূর্বে লাইপৎসিক্ বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রভবনকে লেখে, তাঁরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের জীবনী প্রকাশ করছেন, জনৈক মার্ক কলিন্স সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনের কেউ কিছু জানে কি না? (কলিন্স এখানে অধ্যাপনা করেছিলেন।) অন্যরা তাদের ছাত্রদের সম্বন্ধে লেখে আর আমরা আমাদের অধ্যাপকদের— 'বৃথা বাক্য থাক'! (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন।)[১]

সেই বেনওয়া সাহেব কয়েকদিন ফরাসি ক্লাস নেওয়ার পর বললেন, 'তোমরা যে মলিয়ের, ফ্লবের, য়্যুগো (Hugo), জিদ, ফ্রাঁস পড়তে চাও সে তো খুব ভালো কথা। কারণ আজকালকার ইয়োরোপীয় ছাত্রছাত্রীদের এসব লেখকের বই পড়ানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা লাতিন-গ্রিক তো শিখতেই চায় না, তার অনুবাদেও বিরাগ, এমনকি এই একটু আগে যাঁদের নাম করলুম, তাঁদের লেখার প্রতিও কোনও উৎসাহ নেই, তাদের কারণ তাঁরা লেখেন ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে। তার অন্যতম মূল সূত্র "যে জিনিস স্বচ্ছ (ক্লিয়ার, পরিষ্কার যার অর্থ অতি সহজেই বোঝা যায়) নয়, সে জিনিস ফরাসি নয়" (স্ কি নে পা ক্ল্যার নে পা ফ্রাঁসে!) আর এ-যুগের পাঠকরা চায় আধা-আলো-অন্ধকার। তাদের বক্তব্য, "তোমরা জীবনটাকে যতখানি সহজ সরল স্বচ্ছ ধরে নিয়েছ এবং ফলে স্বচ্ছ সরল পদ্ধতিতে প্রকাশ করো জীবনটাকে— বাস্তবে সে তা নয়, জীবন ওরকম হয় না। সর্ব মানবজীবনেই আছে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব— তাই তার প্রকাশও পরিষ্কার হয়ে ধরা দেবে না। আমরা আজ যা লিখছি সেটা পুরনো স্টাইলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে, এবং তোমরা যারা প্রাচীন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত— তারা তো এটাকে দুর্বোধ্য, অবোধ্য এমনকি অর্থহীন প্রলাপ বললেও বলতে পারো, কিন্তু আমরা তার কোনওই পরোয়া করিনে। আমরা আমাদের "অপক্ষে" এগিয়ে যাব, এবং এই করেই নতুন পথ বানাব"।

---

১. এইসব অধ্যাপকদের সম্বন্ধে যেটুকু সামান্য বিবরণ পাঠক পাবেন সেটুকু শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীতে। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ছিল বলে, বাধ্য হয়ে অধ্যাপকদের সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছেন সংক্ষিপ্তরূপে।

www.pathagar.com

এতদিন পরে কী আর সবকথা মনে থাকে! এটা হচ্ছে ১৯২১/২২/২৩-এর কাহিনী। তখনও এদেশে মডার্ন কবিতা জন্ম নেয়নি, (পরবর্তী যুগে যখন নিল, তখন হিসাব নিয়ে দেখা গেল, এসব মডার্ন কবিতাতে যে শব্দটি বার বার, এমনকি বলা যায় সর্বাধিকবার আসে সেটি 'ধূসর'। তখন মনে পড়ল, ফ্রান্সের মডার্নদের সম্বন্ধে অধ্যাপক বেনওয়ার প্রাচীন দিনের বিবৃতি— সেখানে মূল কথা ছিল 'অস্পষ্ট' 'দ্বন্দ্বমুখর' এবং সর্বোপরি 'আধা-আলো-অন্ধকার'। সেই বস্তুই এদেশে এসে পরেছে 'ধূসর' আলখাল্লা! তা হবেই-না কেন? এদেশটা তো বৈরাগ্যের গেরুয়া বসনধারী, আর গেরুয়া যা ধূসরও তা!) তবে মোটামুটি যা বলেছিলেন, সেটা মনে আছে— এবং চোখের জলে নাকের জলে মনে আছে!

কারণ সর্বশেষে সাহেব বললেন, 'অতএব এই নতুন ফ্রান্সকেও তোমাদের চেনা উচিত; বিশেষ করে তার কাব্যপ্রচেষ্টাকে।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফ্রান্স থেকে আনালেন— তখনকার দিনে জাহাজ-রেলে প্রায় ছ সপ্তাহ লাগত— বেশ মোটা মোটা দু-ভল্যুমে সম্পূর্ণ মডার্ন কবিতার চয়নিকা। শিরোনাম, 'পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই', 'পোয়েটস্ অব্ টুডে',— 'হালের কবি', 'আজকের কবি' যেটা আপনার প্যারা লাগে বাংলাতে সেইটেই বেছে নিন।

বলছিলুম না, 'চোখের জলে নাকের জলে?' পড়েই যাচ্ছি, পড়েই যাচ্ছি, কোনও হদিস আর পাইনে। ক্লাসের পড়া তৈরি করতে আগে আমার লাগত তিন পো ঘণ্টাটাক, এখন দু-ঘণ্টা তিন-ঘণ্টা অভিধান ঘেঁটেও কোনও হদিস পাইনে। একটা তুলনা দিয়ে জিনিসটা পরিষ্কার করি। আপনি কোনও বিষয়বস্তু পড়ছেন যেটা সরল, এবং লেখকের উদ্দেশ্যও সরল। সেখানে মনে করুন হঠাৎ এল একটা শব্দ যার অর্থ আপনি জানেন না, যেমন ধরুন 'কর'। অভিধান খুলে মানে পেলেন 'করা ধাতুর রূপ বিশেষ', 'খাজনা' 'হাত' 'কিরণ' 'হাতির শুঁড়' 'হিন্দুর উপাধি বিশেষ'। এতক্ষণ ধরে লেখকের সবকথাই আপনার কাছে পরিষ্কার ছিল বলে, পূর্বাপর প্রসঙ্গ বিবেচনা করে আপনি চট করে বুঝে গেলেন কোন অর্থটা লাগবে, লেগেও গেল ক্লিক করে। তাই বোধহয় অভিধানকে কুঞ্চিকাও বলা হয়। সেখানে আপনি পাবেন চাবি— এটা প্রয়োগ করে আপনি যে অচেনা শব্দরূপ খুলতে চান, সেটি খুলতে পারেন। এর পরে তুলনাটা হয়তো টায়-টায় মিলবে না, আমার বক্তব্য কিঞ্চিৎ খোলসা করবে। আপনার নিজের যে তালা আপনি নিত্যি নিত্যি খোলেন তার চাবি যদি হারিয়ে যায়, আর কেউ এসে একগুচ্ছ জাত-বেজাতের চাবি দেয়, তা হলে কোন চাবিটি দিয়ে আপনার তালাটি খোলা যাবে সেটা চট করে বেছে নেবেন— জোর, নিতান্ত একাকার হলে, দু-তিনটে ট্রায়েল নিয়েই কর্মসিদ্ধি।

আর এখানে, অর্থাৎ এই মডার্ন কবিতা নিয়ে হালটা কী? যেন তালাটিই দেখতে পাচ্ছিনে ভালো করে— আদৌ আছে কি না সো ভি কসম খেয়ে বলতে পারব না, অর্থাৎ বিসমিল্লাতেই গয়লৎ (গলৎ)— কেমন যেন আবছা-আবছা গোছ, ওই যে সায়েব অধ্যাপক স্বয়ং বলেছিলেন কেমন যেন আধা-আলো-অন্ধকার, ফরাসিতে বলে 'ক্রেপ্যুস্‌ক্যুল' (ইংরেজিতে বিশেষ্যটা চলে না বটে, কিন্তু বিশেষণটা— crepuscular— মাঝে মাঝে পাওয়া যায়) এদেশের পরবর্তী যুগের 'ধূসর'! এদিকে তালাটাই দেখতে পাচ্ছিনে ভালো করে, ওদিকে অভিধান আমার হাতে তুলে দিলেন চারটে চাবি— এখন লাগাই কোনটা? এমনকি 'রাজাকে হাতির শুঁড় (কর) দিলুম' অর্থও যদি 'রাজাকে খাজনা (কর) দিলুম' এর বদলে বেরোয় তাতেও আমি খুশি। কথায় বলে 'হাতের একটা পাখি কানা মামার চেয়ে ভালো'— ঐফ্ যা, দুটো প্রবাদে

www.pathagar.com

গোবলেট করে ফেললুম নাকি? তা সঙ্গগুণে সবই হয়। অর্থাৎ সে-যুগের ফরাসি মডার্ন কবিতা শব্দ, অর্থ, অনুপ্রাস, এমনকি বানান নিয়েও, এক্ষুনি আমি যা গোবলেট পাকালুম, তার চেয়ে কোটি গুণে (ইনফিনিটি সিম্বলটি দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সেটি বোধহয় ছাপাখানায় নেই) ওস্তাদ ছিল— গোবলেট পাকাতে!

বেশ কয়েকদিন, গলদঘর্ম পরিশ্রম করার পর আমি স্থিরনিশ্চয় হলুম, আমার মনে সন্দেহের অবকাশ মাত্র রইল না, এ বস্তু কাব্য নয়, এটা নিশ্চয়ই দর্শন। কারণ দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দার্শনিকশ্রেষ্ঠ শোপেনহাওয়ার বলেছেন (আমি অনুবাদের খাতিরে একটুখানি কনসুরা লাগাচ্ছি) :

দর্শন হল গিয়ে 'অমানিশার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্ব অণ্ডের অনুসন্ধান।'

কিন্তু এ তত্ত্বে পৌঁছনোর পরও আমি অত সহজে হাল ছাড়িনি— তার জন্য বয়সটাই দায়ী; ওটা জেদির বয়স।

কারণ আমার মনে পড়ল, ছেলেবেলায় কাকার কাছে শোনা একটি তত্ত্বোপদেশমূলক কাহিনী। এক রাজার ছিল একটি অতি বিরল মহামূল্যবান, সাদা হাতি। সে দিন দিন কেন শুকিয়ে যাচ্ছে তার অনুসন্ধান করার ফলে ধরা পড়ল যে, তার মাহুত শত সাবধানবাণী সত্ত্বেও অতি সঙ্গোপনে হাতির দানা চুরি করছে। রাজা ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে তার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। মাহুত যখন দেখল এ-হুকুম কিছুতেই রদ হবে না, রাজার সামনে নিবেদন করল, তাকে যদি এক বছরের সময় দেওয়া হয় তবে, একমাত্র তারই জানা গোপন কৌশল প্রয়োগ করে ওই সাদা হাতিটাকে দিয়ে মানুষের মতো কথা বলাতে পারবে। রাজা সম্মত হলেন। মাহুতের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যখন তাকে শুধাল হাতিকে দিয়ে সে কথা বলাবে কী করে, তখন সে বলল, 'ভাইরা সব, এক বছরের ভিতর কতকিছুই-না ঘটতে পারে। এক বছরের ভিতর রাজা মারা যেতে পারেন, কিংবা হাতি মারা যেতে পারে, কিংবা আমি মারা যেতে পারি— এবং কে জানে, কিংবা হয়তো হাতিটা শেষমেশ কথাই বলে ফেলতে পারে!'

আমিও সেই আশাতেই রইলুম, কে জানে এসব কবিতার মানে একদিন হয়তো বেরিয়ে গেলে যেতেও পারে। যদিও অকপট চিত্তে স্বীকার করছি, আমার তখন মনে হয়েছিল, এবং আজও মনে হয়, আচম্বিতে হাতির মানুষের মতো কথা বলতে পারাটার সম্ভাবনা এসব কবিতার অর্থ বোঝার সম্ভাবনার চেয়ে ঢের ঢের বেশি।

সত্যের অপলাপ হবে বলে স্বীকার করছি, সাহেব আমাদের বলেও ছিলেন, প্রাচীন যুগের ল্য কঁৎ দ্য লিল্ বা য়্যুগোর কবিতার অর্থ যেরকম বর্ণে বর্ণে বোঝা যায়, এসব 'পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই'— 'হালের কবি'দের কাছ থেকে সেটা যেন প্রত্যাশা না করি— এর নাকি অনেকখানি সরাসরি, সোজাসুজি অনুভূতির যোগে চিত্তে গ্রহণ করতে হয়। কী প্রকারে সে 'যোগ' করতে হয় সেটা অধ্যাপককে শুধিয়ে তাঁকে বৃথা হয়রান করতে চাইনি— কারণ যেখানে অনুভূতির কারবার সেখানে সে রসে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া তো আর সিলজিজ্‌ম্ দিয়ে বাৎলানো যায় না। যেমন মাকে কী করে ভালোবাসতে হয় এটা তো আর কাউকে ইন্সট্রাকশন দিয়ে শেখানো যায় না— যেরকম বিস্কুটের টিনের উপরে ছাপা নির্দেশনানুযায়ী-প্রক্রিয়ায় টিনটি পরিপাটিরূপে খোলা যায়।

www.pathagar.com

পাঠক শুধোবেন, তা হলে ক্লাসে কি অধ্যাপক সেগুলো বুঝিয়ে দিতেন না? এবারে ফেললেন মুশকিলে। সাহেব মোটামুটি একটি ইংরেজি অনুবাদ খাড়া করে দিতেন— কারণ ইংরেজি ও ফরাসির শব্দসম্পদ— বিশেষ করে চিন্তা ও অনুভূতি সংশ্লিষ্ট বিমূর্ত শব্দ একই ভাণ্ডার থেকে নেওয়া হয় বলে বহু কবিতার শতকরা ষাটটি শব্দ দুই ভাষাতেই এক। অনুবাদ করা কঠিন নয়। কিন্তু তাই বলেই কি জিনিসটা সরল হয়ে যাবে? মডার্ন বাংলা কবিতার শব্দগুলো তো আপনি চেনেন, তাই বলে কি অর্থ বোধগম্য হয়? তার ওপর সর্বক্ষণ ভয়, এখনও তো মামুলি ফরাসিটাই ঠিকমতো রপ্ত হয়নি, হয়তো গাড়োলের মতো এমন প্রশ্ন শুধিয়ে বসব যেটা বাঙলায় প্রকাশ করতে হলে বলি, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে— ইত্যাদি'।

তবে দুটো জিনিস লক্ষ করলুম। 'শোল্ডার শ্রাগ্' করা বা কাঁধ উঠিয়ে-নামিয়ে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করার অভ্যাস সর্ব ইয়োরোপীয়েরই আছে, কিন্তু এর সবচাইতে বেশি কনজাম্শন্ ফ্রান্সে— শ্যাম্পেন বা ব্র্যান্ডির চেয়েও ঢের ঢের বেশি; এসব কবিতা 'বোঝাবার' সময় বেনওয়া সাহেব যা 'শোল্ডার শ্রাগ্' করলেন তার থেকে আমার মনে হল যে আগামী দশ বৎসরের রেশন তিনি ওই 'হালের কবি'দের পাল্লায় পড়ে তিন মাসেই খতম করে দিচ্ছেন। এবং ওই শ্রাগ্ করার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তেলোদুটো এমনভাবে চিত করতেন যে আমরা স্পষ্ট বুঝতুম, ইংরেজিতে যাকে বলে, ঘোড়াকে জলের যথেষ্ট কাছে আনা হয়েছে, এখন সে যদি না খায়—

দ্বিতীয়ত, সনাতন লেখকদের বেলা তিনি মাঝে মাঝে আমাদের অনুবাদ করতে বলতেন। কিন্তু এই মডার্ন কবিদের হাতে নিরীহ বঙ্গসন্তানদের বে-পনাহ্ অর্থাৎ একান্ত অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে তিনি সাহস পেতেন না। নরখাদক না হলেও, যারা তাঁদের কবিতা বোঝবার চেষ্টা করে, তাদের মগজ যে কীরকম কুরে কুরে খেতে পারেন, সে তত্ত্বটি সায়েবের অজানা ছিল না। এবং ওই সময়ে শান্তিনিকেতনের একটি ছেলে পাগল হয়ে গেলে যে গুজব রটেছিল, তার বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে আমি আজ বলছি, 'সর্বৈব মিথ্যা; সে ছোকরা একদা ফরাসি ক্লাসে আসত বটে, কিন্তু ওইসব "পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই"দের প্রথম দর্শন পাওয়ামাত্রই সে "বাপ্পো বাপ্পো" রব ছেড়ে অধ্যাপক মিশ্রজির পাণিনি ক্লাসে চলে যায়— যে ক্লাসটাকে আমরা বাঘের চেয়েও বেশি ডরাতাম— এবং পরে মুক্তকণ্ঠে বলে, এসব হালের ফরাসিস 'কবি'দের বোঝার চেয়ে পাণিনির সূত্র বোঝা ও কণ্ঠস্থ করা ঢের ঢের সহজ।'

একে মডার্ন, তায় ফরাসিস, তদুপরি কোনও কোনও 'কবি' খাস প্যারিসিয়ান— উপস্থিত আবার বাঙলা দেশে একটা বিশেষ 'রস' বা ওই ধরনের 'একটা-কিছু নিয়ে' জোর আন্দোলন চলছে— কাজেই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয়, এসব কবিরা কাব্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার মধ্যে কোনও পার্থক্য স্বীকার করতেন কি না? আমার তো শেষ ভরসা ছিল ওইটেই। এত যে মেহন্নৎ করছি, তার ফলে আখেরে যদি এমন কিছু জুটে যায় যার প্রসাদাৎ সংস্কৃত-পড়নেওলাদের টিট দিতে পারি। "ধ্যত্তর তোর 'চৌরপঞ্চাশিকা' আর 'কুট্টনীমতম্'! আসল মাল এ্যাদ্দিনে, বাবা, এদেশে এসে পৌঁছেছে, নাক বরাবর প্যারিস থেকে। আয়, শুনে যা।" কারণ এদের কেউ কেউ অল্পবিস্তর মপাসাঁ পড়েছে, অবশ্য ইংরেজি অনুবাদে,[২] তাই

২. সব জিনিস মূল ভাষাতে পড়তে হবে এ উন্নাসিকতার কোনও অর্থ হয় না। আমার আপন অভিজ্ঞতা বলে, বহুক্ষেত্রে অনুবাদ মূলের চেয়ে ঢের সরেস হয়েছে। তার একাধিক কারণ আছে, কিন্তু সে-আলোচনা এস্থানে অবান্তর এবং সংক্ষেপে সারবার উপায় নেই।

www.pathagar.com

(ওই বয়সে) আমার সরস আহ্বান শুনে যে আমার সামনে করজোড়ে আসন নিত সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু হায়, অধ্যাপক বেনওয়া স্বয়ং বহু বৎসর প্যারিসে কাটিয়েছিলেন বলে এ-বিষয়ে সাবধান হতে জানতেন। ক্লাসে দুটি মেয়ে ছিল বলে তিনি প্রথমদিনই বলে দিয়েছিলেন, কোন কোন কবিতা ক্লাসে পড়ানো হবে।

আমার নিজের কেমন জানি একটা অন্ধবিশ্বাস সেসময় জন্মেছিল যে অধ্যাপক বেনওয়া স্বয়ং এই নতুন 'একোল' 'স্কুল' বা 'রীতিটা' পছন্দ করতেন না, বিশেষ রসও পেতেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে মডার্ন ফ্রান্সের নবীন কাব্য-আন্দোলনের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মাত্র— অনেকটা যেন কর্তব্য পালনের জন্য।

তবু এই সুবাদে একটি তত্ত্বকথা বলে রাখা ভালো। এসব মডার্ন কবিদের সাধনা ছিল সত্যই বিস্ময়জনক। কারও কারও ছন্দহীন, লয়বিহীন, মিলবর্জিত— বস্তুত সর্ব অলঙ্কারশূন্য— এলোপাতাড়ি আবোল-তাবোল শব্দসমষ্টি দেখে যখন আমরা উদ্‌ভ্রান্ত তখন বেনওয়া সায়েব অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কাব্য থেকে পড়ে শোনাতেন এঁদেরই আগেকার দিনের, প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত কবিতা— মডার্ন আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বে রচিত।

এবং সেগুলো শুনে, পরে পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। অনবদ্য এক-একটি কবিতা! কতখানি পরিশ্রম, কতখানি সাধনার প্রয়োজন এরকম অত্যুত্তম কবিতা রচনা করতে! অর্থাৎ, এঁরা 'ব্লাফ্-মাস্টার' নন। প্রাচীন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করার টেকনিক্, স্কিল, কৌশল সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করার পর এঁরা যে কোনও কারণেই হোক— খুব সম্ভব নিজের সৃষ্টিতে ঈপ্সিত পরিতৃপ্তি না পেয়ে— ধরেছেন অন্য টেকনিক্, বা বলা যেতে পারে, চেষ্টা করছেন নতুন এক টেকনিক্ আবিষ্কার করার। সেজানের ছবি দেখে অজ্ঞজন মনে করে, এরকম 'এলোপাতাড়ি তুলির বাড়ি ধাপ্যুস-ধুপ্যুস মারা' তো যে কোনও পাঁচ বছরের বাচ্চাও দেখিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেজান যখন প্রাচীন 'অ্যাকাডেমিক' টেকনিকে আঁকতেন তখনকার ছবি দেখলে চক্ষুস্থির হয়ে যায়। তখনকার দিনের 'অ্যাকাডেমিক' যে কোনও চিত্রকরের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারতেন, কারণ একে তো ছিল তাঁর বিধিদত্ত অসাধারণ সৌন্দর্যবোধ ও স্পর্শকাতরতা, তদুপরি তাঁর আঙুলগুলো যেন শুধু ছবি আঁকার জন্যই বিধাতা নির্মাণ করেছিলেন, এবং সর্বোপরি তাঁর বহু বৎসরব্যাপী অক্লান্ত সাধনা, ওই প্রাচীন অ্যাকাডেমিক টেকনিক্ সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার জন্য। এদেশে তাই যখন দেখি, মাত্র দুটি বছর রেওয়াজ— কবিতা, গান, নাচ যাই হোক না কেন— করেছে কি না, তার আগেই সে লেগে যায় 'কম্পোজ' করতে, এবং অন্যকে বিজ্ঞভাবে 'নবীন পন্থা' বাৎলাতে, তখন— থাক্ গে।

ইতোমধ্যে আবার জর্মন ভাষার অধ্যাপক ছুটিতে চলে যাওয়ার দরুন বেনওয়া সায়েবের ঘাড়েই পড়ল জর্মন শেখাবার ভার, এবং তিনিও ফরাসি মডার্ন কবিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়াতে আরম্ভ করলেন জর্মন মডার্ন কবিদের মডার্নতম রাইনের মারিয়া রিল্‌কে! সে আরেক নিদারুণ অভিজ্ঞতা, সুকুমার রায়ের ভাষায় 'ভুক্তভোগী জানে তাহা, অপরে বুঝিবে কিসে?'— সে-কাহিনী আরেক দিনের জন্য মুলতবি রইল। শুধু এইটুকু নিবেদন, চেষ্টা দিয়েছিলুম, স্যর, সেই সতেরো-আঠেরো বছর বয়সেই চেষ্টা দিয়েছিলুম, এই কবিতা নামক জিনিসটির রসাস্বাদন করার। আর যে দোষ দেবেন দিন, শুধু এইটুকু বলবেন না যে, বুড়ো-হাবড়া হয়ে যাবার পর মডার্ন কবিতার প্রেম কামনা করে হতাশ-প্রেমিকরূপে পরিবর্তিত হয়েছি।

www.pathagar.com

তার পর এল সেই শুভলগ্ন যেদিন মডার্ন কবিতার সঙ্গে আমাদের তালাকটি বেনওয়া সাহেব মঞ্জুর করলেন। আমরা সোল্লাসে ফিরে গেলুম দোদে, ফ্লবেরের কাছে। শুনেছি, স্পেনের লোক নাকি বছরের প্রথম দিন এক গেলাস জল নিয়ে তাতে কড়ে আঙুলের ডগাটি ডুবিয়ে সেই আঙুল জিভে লাগিয়ে অতি সন্তর্পণে সভয়ে চাটার পর আঁতকে উঠে বলে, 'ওই সেই প্রাচীন দিনের পুরনো বিস্বাদ বস্তু; চ, ভাই, ফিরে যাই আমাদের মদের গেলাসেই। কেন যে পাদ্রি সায়েব মদ কমাতে আর বেশি জল খেতে বলেন বোঝা ভার।' আমরাও স্পানিয়ার্ডদের মতো ফিরে গেলুম আমাদের ক্লাসিক্স-মদ্যে।

আমাদের মুখের ভাব দেখে বেনওয়া সায়েব হেসে বললেন, 'তবু তো আমরা আছি ভালো, কারণ আমরা চর্চা করি সাহিত্যের। সেখানে উৎকৃষ্টে-নিকৃষ্টে পার্থক্য করা তেমন কিছু অসম্ভব কঠিন নয়। সেখানে রুচিবোধের অনেকখানি স্থিরতা আছে। কিন্তু হত যদি আমাদের বিষয়বস্তু চিত্র? তা হলে খানিকটে আভাস পেতে সে-ক্ষেত্রে রুচির কী আকাশ-পাতাল পরিবর্তন হয় রাতারাতি। আজ যাঁর ছবি খোলা নিলামে বিক্রি হল লক্ষ ডলারে, বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে সেই ছবিই বিক্রি হল হাজার ডলারে। আজ যাঁকে বলা হচ্ছে 'গ্রা মেৎর্' গ্র্যান্ড মাস্টার বা মেসথরো (ওস্তাদের ওস্তাদ) তিন বছর যেতে-না-যেতে তাঁর ছবি হয়ে গেল বিল্জ্, পিফ্ল্ (রদ্দি, চোতা)!— আর এসব ছবিই কিন্তু অ্যাকাডেমিক স্টাইলে আঁকা; কোনও নতুন এক্সপেরিমেন্টের কথা উঠছে না।

তবেই ধারণা করতে পারবে 'মডার্ন পেন্টিং' নিয়ে কী অসম্ভব রুচি পরিবর্তন, রীতিমতো খুনোখুনি মারামারি। আর সে ছবিগুলোতে আছে কী? ধোঁয়াটে, তামাটে, বিৎকুটে কী যেন কী,— জানেন শুধু আর্টিস্টই, বা হয়তো তাঁর অন্তরঙ্গ সখামণ্ডলী, এতে আছে কী, আর্টিস্টের উদ্দেশ্য কী— নিচে লেখা 'বসন্ত'। আর, অ্যাজ্ ফার্ অ্যাজ্ আই্ অ্যাম্ কনসার্নড্ সেখানে 'বসন্ত' না লিখে অভিধানের ভিতরের বা বাইরের যে কোনও শব্দ লিখলেও আমার তাতে সুবিধা-অসুবিধা কিছুই হয় না। অধিকাংশ আর্টিস্টই আবার তাঁদের ছবির কোনও নামই দেন না। বলেন, তাঁরা নাকি ডিক্সনারি ইলাসট্রেট করার জন্য আঁকেন না।'

বেনওয়া সাহেব সেদিন আরও অনেক খাঁটি তত্ত্বকথা বলেছিলেন। কারণ খাস ফরাসিদের মতো তাঁর কৌতূহল ও উৎসাহ ছিল— কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি নানা রসের নানা প্রকাশে, নানা বিকাশে। সর্বশেষ তিনি ইম্প্রেশনিজ্ম, সুররিয়ালিজ্ম, ক্যুবিজ্ম, দাদাইজ্ম ইত্যাদি বহুবিধ 'ইজ্ম'-এর ইতিহাস শোনানোর পর শেষ করলেন 'বানরালে'র কীর্তিকাহিনী শুনিয়ে।

কাহিনীটি আমার চোখের সামনে আজও জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় 'নাটকে'র যিনি 'হিরো' তাঁর নামটি ভুলে গিয়েছি। বানরালে-বানরালে গোছ কী যেন এক বিজাতীয় নাম— এ নামটা অনায়াসে আমারও হতে পারত,— তবে এটুকু মনে আছে যে নামের মধ্যিখানে 'আন্' কথাটি ছিল। অবশ্য এ নাট্যের আদ্যন্ত আজও অতি সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভবে, সামান্য কয়েক মাস কলকাতা-দিল্লি-বোম্বাই (এ ব্যাপারে বোম্বাই কোন পুণ্যবলে তীর্থভূমিতে পরিণত হলেন সে রহস্য পূতভূমির পাণ্ডারাও জানেন না) মাকু মারার পর নিরাশ হয়ে, শেষটায় ভিটেমাটি বেচে, কালোবাজারে ফরেন এক্সচেঞ্জ কিনে যদি

www.pathagar.com

প্যারিস চলে যান (ভুলবেন না, ফেরার সময় মঁ পলিয়ে থেকে একটা ডিলিট নিয়ে আসবেন; এদেশে কাজে লাগবে। প্ল্যাটফর্মেই বোধহয় সনদ বিক্রি হয়, নইলে হয়তো দু-একদিন বিশ্ববিদ্যালয়-পাড়ায় বাস করে, রেডিমেড থিসিস কিনে সেটা পেশ করা মাত্রই সনদটা পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে...ডট করা লাইনের সঠিক জায়গায় নাম সই করতে কিংবা টিপসই দিতে যেন ত্রুটি না হয়...) তবে অদ্যকার বঙ্গসন্তানমাত্রই আনন্দিত হবে যে, কালোবাজার সেখানে নেই— (সব খোলাখুলি, সামনাসামনি)।

প্যারিসের লোক সে কাহিনী এখনও ভোলেনি। আপনাকে নতুন করে বলার সুযোগ পেয়ে বড্ডই উৎসাহের সঙ্গে সেটি কীর্তন করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন মডার্ন আর্ট প্যারিসের অন্যসব প্রাচীন অর্বাচীন কলাসৃষ্টিকে ঝেঁটিয়ে মহানগরী থেকে বের করে দিয়েছে, তখন হঠাৎ একদিন উদয় হলেন গট্‌গট্‌ করে, সূর্যোদয়ের গৌরব নিয়ে এই চিত্রকর— চিত্রকর বললে অত্যল্পই বলা হয়— যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। এতদিন নাকি নির্জনে চিত্রসাধনায় নিযুক্ত ছিলেন বলে কোনও প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাননি। কিন্তু এইবারে তাঁর সময় হয়েছে। কারণ মডার্ন আর্ট তার নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে, তার চরম সিদ্ধিতে পৌঁছে গেছে এঁরই চিত্রকলায়।

একইসঙ্গে প্যারিসের তিনখানা প্রখ্যাততম পত্রিকা মারফত— শুধু কলাবিভাগের নয়, অসাধারণ জ্ঞাতব্য সংবাদরূপে কাগজের উত্তমাঙ্গেও প্রকাশিত— প্যারিসবাসী এবং দু-তিন দিনের ভিতর তাবৎ ফরাসিস জাতি এই নব অরুণোদয়ের সংবাদ পেয়ে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হল। ক্রমে ক্রমে সর্ব আর্টজর্নলে, বিশেষ করে সেইসব আলট্রা-মডার্ন-আর্টজর্নলে, যেগুলো খবরটা সর্বপ্রথমে পরিবেশন করতে পারেনি বলে ঈষৎ বিব্রত বোধ করছিল, সর্বত্রই এই নবীন আর্টিস্ট সম্বন্ধে কলামের পর কলাম, পাতার পর পাতা জুড়ে নানাপ্রকারের বিশ্লেষণ তথা তাঁর প্রথম চিত্রের জন্ম থেকে শেষ চিত্র অবধি তার ক্রমবিকাশের সুনিপুণ ইতিহাস সবিস্তার বর্ণিত হল। শেষটায় কিন্তু এঁকে লুফে নিলেন আলট্রা-মডার্ন আর্টের ক্রিটিকদের চাঁইরাই। এঁরা অ্যাকাডেমিক আর্টের জন্মশত্রু, কসম্‌-খাওয়া-খুনি-দুশ্‌মন। অন্যপক্ষে প্রথমটায় কিঞ্চিৎ গাঁইগুঁই না-রাম-না-গঙ্গা ধরনের দু-একটা মন্তব্য করার পর আলট্রা মডার্নদের হাতে ঘোল খেয়ে চুপসে রঙ্গভূমি— বা জঙ্গভূমি, যাই বলুন,— পরিত্যাগ করলেন। ওদিকে সেই চিত্রকরের ছবি দেখবার জন্য যা ভিড়, সেটা সামলাতে গিয়ে প্যারিস পুলিশের মতো সহিষ্ণু প্রতিষ্ঠানও হিমশিম খেয়ে গেল। ওঁর ছবি না-দেখা থাকলে তো প্যারিসের শিক (chic) সমাজে মুখ দেখানো যায় না, ওঁর সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে কথা বলাটাই তখন দ্যর্নিয়ে ক্রি— dernier cri— শব্দে শব্দে অনুবাদ করলে 'শেষ চিৎকার' কিন্তু তার থেকে আসল অর্থ ওৎরায় না, বরঞ্চ 'আখেরি কালাম্‌' বললে ওরই গা ঘেঁষে যায়। আর্টের ব্যাপারে ফরাসি হনুকরণ (to ape)-কারী ইংরেজও ওই দ্যর্নিয়ে ক্রি-ই আপন ভাষাতে ব্যবহার করে, অর্থ uttermost refinement— ওরকম দুটো শব্দ কিছুতেই অনুবাদ করা যায় না বলে।

এমন সময় সিন্দবাদের সেই সুদর্শন, নিটোল, নিখুঁত সি-মোরগের আণ্ডাটি গেল ফেটে, কিংবা কেউ দিলে ফাটিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বেরুল উৎকট পচা দুর্গন্ধ। প্যারিসে তিষ্ঠনো কি সোজা ব্যাপার?

www.pathagar.com

সেই যে বলেছিলুম 'একইসঙ্গে প্যারিসের তিনখানা প্রখ্যাততম পত্রিকা মারফত' এই নবীন রবির প্রথম সংবাদ বেরোয়, এবং পরে সকলের অলক্ষ্যে এঁরা কেটে পড়েন— সেই তিন 'সংবাদদাতা' বা জালিয়াৎ আণ্ডাটি ফাটালেন— সর্বজনসমক্ষে ফটোগ্রাফসহ।

আসলে বানরালে নামে কোনও আর্টিস্টই নেই। এই তিন মিত্র একটা গাধাকে শক্ত করে বেঁধে নেন একটা খুঁটিতে। লম্বা ন্যাজে মাখিয়ে দেন সযত্নে, আর্টিস্টরা— বরঞ্চ বলা উচিত আলট্রামডার্ন আর্টিস্টরা— যে রঙ, অয়েল কালার ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, সেইসব রঙ। তার ন্যাজের কাছে, পিছনে, আর্টিস্টদের তেপায়া স্ট্যান্ড বা ইজ্‌লের উপর ক্যানভাস। তার পর সেই গাধাটাকে দে, বেধড়ক মার! সে বেচারি পিছনের ঠ্যাং দুটো তুলে যত লাফায়, ততই তার নানা-রঙে-রাঙা ন্যাজ থাবড়া মারে ক্যানভাসের উপর। সঙ্গে সঙ্গে আঁকা হয়ে যায় মোস্ট আলট্রামডার্ন 'ছবি'! ভিন্ন ভিন্ন সাইজের ভিন্ন ভিন্ন ক্যানভাস নিয়ে, গাধার ন্যাজ কখনও বিনুনির মতো ভাগ করে, কখনও গোচ্ছা গোচ্ছা করে বেঁধে— যার যথা অভিরুচি— রঙের ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রণ করে 'আঁকা' হল 'ছবি'র পর 'ছবি'! এবং পাছে লোকে অবিশ্বাস করে তাই 'ছবি'র প্রতি স্টেজে তার ফটো, গাধার লম্পঝম্পের ফটো, গর্দভের পুচ্ছাংশসহ চিত্রাংশের ফটো— এককথায় শব্দার্থে ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছে অপর্যাপ্ত।

তিন জালিয়াত— বলা বাহুল্য, এঁরা তৎকালীন তথাকথিত মডার্ন আর্টিস্টদের গোঠ বেঁধে, দল পাকিয়ে চিৎকার ও অ্যাকাডেমিক আর্টের উদ্দেশে তাদের অশ্রাব্য কটুবাক্য শুনতে শুনতে হন্যে হয়ে গিয়ে শেষটায় উপযুক্ত 'সৎকার'টি করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিলেন 'বানরালে' নামটার মধ্যখানে ane— ফরাসিতে যার অর্থ গর্দভ— শব্দটি গোপনে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ গাধাটিই এসব ছবির প্রকৃত আর্টিস্ট।

তস্য বিগলিতার্থ, মোস্ট-আলট্রা-মডার্ন-আর্টিস্ট তথা তাঁদের মুখপাত্র আর্টক্রিটিকরা অ্যাদ্দিন ধরে যাকে তাঁদের শিরোমণি করে, তাঁদের হিরো বানিয়ে বিনা বাদ্যে নেচেছেন ('কী কল পাতাইছ তুমি! বিনা বাইদ্যে নাচি আমি।'— লেখকের মাতৃভূমির প্রবাদ) তিনি একটি গর্দভ!

এ-জাতীয় ঘটনা আরও ঘটেছে। তার ফিরিস্তি দিতে যাবে কে? আর উপরের উল্লিখিত ঘটনাটির পিছনে রয়েছে নষ্টামি। কিন্তু যেখানে কোনওপ্রকারের কুমতলব নেই, সেখানেও যে এরকমের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে সেটা বছর পাঁচেক পূর্বে সপ্রমাণ করে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশ।

সুইডেনের অন্যতম প্রখ্যাত অতি আধুনিক চিত্রকর ফালস্ট্রোম ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসোনাইটের টুকরোয় মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেকরকম রঙ লেগে থাকার কথা। ওই সময় সুইডেনের ললিতকলা আকাদেমি এক বিরাট মহতী চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন— 'স্বতঃস্ফূর্ত কলা (Spontaneous art বা স্পন্টানিস্‌মুস্ এর নাম এবং এটাকেই তখন সর্বাধুনিক কলাপদ্ধতি বলা হত) ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ' এই নাম দিয়ে সেই চিত্রপ্রদর্শনীতে থাকবে সুইডেন তথা অন্যান্য দেশের স্পন্টানিস্‌মুস্ কলার উত্তম উত্তম নিদর্শন। তখন হয়েছে কী, চিত্রকর ফালস্ট্রোম তাঁর অন্য ছবি যাতে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে পূর্বোল্লিখিত তুলি পৌছার রঙবেরঙের ম্যাসোনাইটের টুকরোখানা তাঁর অন্য দু-খানা ছবির উপর রেখে প্যাক করে প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দেন—

www.pathagar.com

এস্থলে বলা উচিত ফাল্‌স্ট্রোম ছবি ক্যানভাসের উপর না এঁকে আঁকতেন ম্যাসোনাইটের উপর। আকাদেমির বড়কর্তারা ভাবলেন এটাও মহৎ আর্টিস্টের এক নবীন কলানিদর্শন, এবং পরম শ্রদ্ধাভরে সেই তুলি পোঁছার টুকরোটির নিচে আর্টিস্টের স্বনামধন্য নাম লিখে ঝুলিয়ে দিলেন তাঁর অন্য ছবির পাশে।

কেলেঙ্কারিটা কী করে বেরিয়ে পড়ে সে অন্য কাহিনী, কিন্তু যখন পড়ল তখন উঠল কাগজে কাগজে হইহই রব। শেষটায় খুদ আকাদেমির প্রেসিডেন্ট খুদাতাল্লার হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বলেই ফেললেন, 'কী করি মশাইরা, বলুন। কে জানত শেষটায় এরকম ধারা হবে? আজকাল নিত্যি নিত্যি এতসব নয়া নয়া এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে যে, কোনটা যে এক্সপেরিমেন্ট আর কোনটা যে অ্যাক্সিডেন্ট কী করে ঠাওরাই? আমরা ভেবেছি গুণী ফালস্ট্রোম আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং সেই ভেবে ওই ছবিটাও প্রদর্শনীর অন্যান্য ছবির সঙ্গে টাঙিয়ে দিয়েছি—'

'রাস্তার লোক' সব শুনে বলল, 'এতদিন যা শুধু সরস্বতীর বরপুত্ররাই বহু সাধনার পর, বহু তপস্যার ফলে সৃষ্টি করতে পারতেন, এখন দেখছি অ্যাক্সিডেন্টও (আকস্মিক যোগাযোগ) সেটা করতে পারে!'

এর বহুপূর্বেই সংস্কৃতেও নাকি বলা হয়ে গিয়েছে, কোটি কোটি বৎসর ধরে উইপোকা কাঠ খেয়ে খেয়ে হিজিবিজি যে নকশা কাটছে, তার ভিতর হয়তো একদিন পূর্ণ প্রণব মন্ত্রটিই খোদাই হয়ে বেরিয়ে আসবে।

পাঠক আদৌ ভাববেন না, আমি মডার্ন কবিতা বা আর্টের দুশ্‌মন্। এর চেয়ে সত্যের অপলাপ ও অন্যায় অবিচার আমার প্রতি আর কিছুই হতেই পারে না। বস্তুত আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি, প্রকৃত শিল্পী প্রতিদিন সেই চেষ্টাতেই থাকবে, কী করে নতুন ভঙ্গিতে নবীন পদ্ধতিতে তাঁর মহত্তম চিন্তা নিবিড়তম অভিজ্ঞতা মধুরতম ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। নইলে তো আমরা প্রলয় পর্যন্ত 'পাখিসবে'র সঙ্গে সেই একই 'রব' গেয়েও কূল পাব না।

কিন্তু গেল ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমি বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি। পাবলো পিকাস্‌সোর নাম শুনলে আজকের দিনে শতকরা নিরানব্বই জন— কি প্রাচীন কি অর্বাচীন সবাই— অজ্ঞান। সেই পিকাস্‌সো গেল ফেব্রুয়ারি মাসের কাছাকাছি একটি বিবৃতি দেন। বোম্বায়ের Alvi Book Bulletin-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সেটি বেরিয়েছে। উপস্থিত আমি কোনও মন্তব্য করছি না। শুধু সেটি তুলে দিচ্ছি। বাংলায় অনুবাদও করব না, কারণ যাঁরা ইংরেজি জানেন না তাঁরা অযথা সন্তাপ থেকে বেঁচে যাবেন, আর যাঁরা জানেন তাঁদের জন্য অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আসল প্রধান কারণ অবশ্য, এটির সুষ্ঠু অনুবাদ আমার শক্তির বাইরে। তবে উভয় পক্ষকে অসন্তুষ্ট করার জন্য মোটামুটি একটি ব্যাখ্যা দেব।

'Pablo Picasso, 83 years old Spanish-born father-figure of the modernist cult in art, has now made a sensational 'confession' that he was simply amusing himself at the expense of his intellectual admirers with his bizarre creations'. Says he :

'The people no longer seek consolation and inspiration in art. But the refined people, the rich, the idle, seek the new, the extraordinary, the

www.pathagar.com

original, the extravagant, the scandalous. And myself, since the epoch of Cubism, have contended these people with all the bizarre things that have come into my head. And the less they understood it the more they admired it.

By amusing myself with all these games, all this nonsense, all these picture puzzles and arabesques, I became famous, and very rapidly. And celebrity, for a painter, means sales, profits, a fortune. Today, as you know, I am famous and very rich.

But when I am alone with myself I have not the courage to consider myself as an artist in the great sense of the word, as in the days of Giotto, Titian, Rembrandt, and Goya. I am only a public entertainer who has understood his time.'

পিকাস্সো উক্তির বিগলিতার্থ— আজকের দিনের মানুষ কলাসৃষ্টির দ্বারস্থ হয় না সান্ত্বনা বা অনুপ্রেরণার জন্য; আজকের দিনের নিষ্কর্মা, তথাকথিত বিদগ্ধ ধনীরা চায়, নতুন, মৌলিক, অসাধারণ, বাড়াবাড়ির চরম, কেলেঙ্কারির কলা আর তিনি সেই ক্যুবিজেম-এর[৩] আমল থেকে তাঁর মাথায় যতসব আবোল-তাবোল হযবরল (bizarre)[৪] এসেছে, সেগুলো দিয়ে ওইসব ধনীদের সন্তুষ্ট করেছেন। এবং তাঁর ওইসব 'বিজার' ছবি তারা যত কম বুঝতে পেরেছে, সেই অনুপাতে মুগ্ধ প্রশংসা করেছে ততই উচ্চমাত্রায়। আর তিনিও ফুর্তি পেলেন

৩. এদেশে গগনেন্দ্রনাথ সত্যই ছবি এঁকেছিলেন ওই ক্যুবিজম্ পদ্ধতিতে।

৪. মডার্ন মাথামুণ্ডুহীন ছবির জন্যই যেন এই মোক্ষম bizarre শব্দটি নির্মিত হয়েছিল। ইংরেজ আভিধানিক এর প্রকৃত অর্থ বোঝাতে গিয়ে যেন দিশা না পেয়ে অনেকগুলো কাছেপিঠের শব্দ ও তাদের সমন্বয় করেছেন : eccentric, fantastic, grotesque, mixed in style, half barbaric. কিন্তু এদেশের সুকুমার রায় 'বিজার' শব্দটির প্রকৃত অর্থ একটি কবিতার মারফতে যা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সেটি বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। আমি কয়েক ছত্র তুলে দিচ্ছি :

'কেউ কি জানে সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?
পাউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?
কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগ্‌বাজি খায় লোকে?
জোছনা রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে?
ওস্তাদেরা লেপমুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে?
টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে?
সভায় কেন চেঁচায় রাজা 'হুক্কা হুয়া' ব'লে?
মন্ত্রী কেন কল্‌সি বাজায় বসে রাজার কোলে?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?
কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসি?' ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ওই ধরনের, ওদেরই প্রার্থিত খেলা খেলতে— আঁকলেন অর্থহীন যা-তা (ননসেন্স), ছবির ধাঁধা, জ্যামিতিক ডিজাইন এবং তারই ফলে হয়ে গেলেন বিখ্যাত। আর আর্টিস্টের পক্ষে বিখ্যাত হওয়ার অর্থই, প্রচুর ছবি বিক্রির ফলে প্রচুরতর অর্থলাভ। এবং সবাই এখন জানেন, পিকাস্‌সো বলছেন, তিনি এখন বিখ্যাত এবং খুবই সম্পদশালী।

কিন্তু তার পরই বলছেন, কিন্তু তিনি যখন একা বসে আত্মচিন্তা করেন, তখন আর তাঁর সাহস হয় না, নিজেকে সেই মহান অর্থে শিল্পী আখ্যা দিতে, যে অর্থে শিল্পী বোঝাত জিত্তো, তিৎসিয়ান, রেমব্রান্ট, গোইয়া-র যুগে। তিনি শুধু দিয়েছেন সবাইকে ফুর্তি (পাব্‌লিক্ এন্টারটেনার— তার রূঢ়তম অর্থ 'ভাঁড়', 'সার্কেসের ক্লাউন', 'সঙ') কারণ তিনি 'যেমন কলি, তেমন চলি' তত্ত্বটি বুঝতেন।

এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর পিকাস্‌সোর 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, সেটা আমার চোখে পড়েনি। তবে আমার কাছে পূর্বের অবোধ্য একটি সমস্যা সরল হয়ে গেল।

পিকাস্‌সো বৃদ্ধবয়সে এক তরুণীকে বিয়ে করেন। কয়েক বছর পর তরুণী তাঁকে ত্যাগ করে তালাক দেন (কিংবা হয়তো পিকাস্‌সোই এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করেন যে তালাক ভিন্ন অন্য গতি ছিল না— কারণ তিনি 'গ্রেট আর্টিস্ট' হন আর নাই হন, এ-তত্ত্বটি কিন্তু অনস্বীকার্য, 'গ্রেট আর্টিস্ট'দের যে-খামখেয়ালির বাতিক থাকে, মাথায় যে-ছিট থাকে সেটা তিনি পেয়েছেন ন-সিকে।) এবং পিকাস্‌সোর সঙ্গে তার দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। পিকাস্‌সো নাকি সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করে বিফল হন। সেই জীবনীটি যখন ধারাবাহিকভাবে কন্টিনেন্টের একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয় তখন তার প্রায় সবকটা কিস্তিই আমি পড়ি, এবং আমার মনে সবচেয়ে বেশি বিস্ময় সৃষ্টি করল— আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম বললেও অত্যুক্তি হয় না— যে, সে পুস্তিকায় পিকাস্‌সো তাঁর তরুণী স্ত্রীকে আর্ট বলতে কী বোঝায় এবং ওই বিষয় নিয়ে যেসব আলোচনা তাঁর সঙ্গে করেন সেগুলো সব প্রাচীন যুগের কথা; অর্থাৎ সেই মাইকেল এঞ্জেলোর আমল থেকে প্রায় একশো বৎসর পূর্বপর্যন্ত আলঙ্কারিক, কলারসিকরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্টের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, আর্ট-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যেসব অভিমত প্রকাশ করেছেন, পিকাস্‌সো মোটামুটি তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র!

আমি তখন চিন্তা করে বিহ্বল হয়েছি, এই যদি আর্ট সম্বন্ধে পিকাস্‌সোর ধারণা হয় তবে তাঁর আঁকা ছবির সঙ্গে এ ধারণার কোনও সামঞ্জস্যই তো খুঁজে পাচ্ছিনে! একদিকে লোকটি আর্ট সম্বন্ধে ক্ল্যাসিকাল, অ্যাকাডেমিক ধারণা পোষণ করেন, আর অন্যদিকে তিনি এঁকে যাচ্ছেন— তাঁর ভাষাতেই বলি— 'বিজার' 'গ্রোটেস্ক' যতসব মাল!

এ যেন, আপনি নামতা শিখেছেন ঠিকই, কিন্তু অঙ্ক কষার বেলা করছেন ৩ × ৪ = ৮২, ৭+৫ = ২!

পিকাস্‌সোর এই বিবৃতিটি পড়ে আমার মনের ধন্দ গেল। তাঁর আদর্শ ছিলেন জিত্তো, রেমব্রান্টই, কিন্তু তিনি জানতেন প্রথমত, ওঁদের স্তরে আদৌ পৌঁছতে পারবেন কি না; দ্বিতীয়ত, পৌঁছতে পারলেও বাজারে সেই 'প্রাচীন ঢঙে'র ছবির চাহিদা আজ আর আদপেই নেই; তৃতীয়ত, তাঁরও খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং সর্বশেষে, সেই অর্থের জন্য যখন ছবি আঁকব আপন আদর্শ বেহায়া বিসর্জন দিয়ে— তবে সেইটাই কবি

www.pathagar.com

পূর্ণমাত্রায় ইংরেজিতে যাকে বলে 'উইথ্ এ ভেন্‌জেন্‌স', উর্দুতে বলে, 'পক্‌ড়ে তলওয়ার দামন্‌কে সম্ভালে কোই?'— তলওয়ার যখন ধরেইছি তখন রক্তের ছিটে পড়বে বলে কুর্তার দামন (প্রান্ত, অঞ্চল) অন্য হাত দিয়ে সামলানোটা বিলকুল বেকার।

অবশ্য এসব তর্কবিতর্কের অর্থ হয়, যদি আমরা নিঃসন্দেহে ধরে নিই যে পিকাস্‌সো এ-বিবৃতিতে প্রাণের কথা খোলাখুলিই বলেছেন, সজ্ঞানে সত্যভাষণই করেছেন। নইলে কাল যদি আরও পয়সা কামানোর জন্য, বা বিনা-কারণেই আরেকটা নয়া ফয়তা ঝেড়ে বলেন, 'না না, ওটা আমার সত্য বিবৃতি নয়। আমি শুধু রগড় দেখবার জন্য এই মস্করাটা করেছিলাম— আমার অন্ধ স্তাবক, এবং ওইসব মূর্খ ধনীরা যারা নৃত্য করতে করতে আমার ছবি কিনেছে হুজুগে মেতে, ন্যায্যমূল্যের শতগুণ বেশি টাকা ঢেলে, তারা তখন কী বলে?— সোজা ইংরেজিতে 'আই উয়োজ পুলিং দেয়ার লেগ্!'— তখন আজ যেসব প্রাচীনপন্থীরা এই হাটের মধ্যিখানে হাঁড়ি ভাঙাটা দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠেছেন, তাঁরা লুকোবেন কোন ইঁদুরের গর্তে!

অবশ্য শেষপর্যন্ত কর্তাভজাদের কোনও দুশ্চিন্তা নেই। তাঁরা বলবেন, "আজ যদি শেক্সপিয়ারের স্বহস্তে লিখিত একখানা গোপন ডাইরি বেরোয় যাতে তিনি লিখেছেন, 'আমি হতে চেয়েছিলুম হোমার, ভার্জিলের মতো কবি, কিন্তু যখন দেখলুম এ যুগে সেসব কবিদের চাহিদা নেই তখন হয়ে গেলুম পাবলিক এন্টারটেনার— ভাঁড়' তা হলেই কি আমরা সেটা মেনে নেব, আর বলব, শেক্সপিয়ার গ্রেট পোয়েট নন!"

মুসলমানদের ভিতর একাধিক সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বাস করেন, তাঁদের সপ্তম ইমাম (পৃথিবীতে আল্লার প্রতিভূ) অদৃশ্য হয়ে যান, তিনি সত্যি সত্যি মারা যাননি— সময় হলেই তিনি অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে মাহ্‌দি (কল্কি) রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। অন্য সম্প্রদায় বলেন, 'সপ্তম ইমাম না, অদৃশ্য হন দ্বাদশ ইমাম, তিনিই মাহ্‌দিরূপে ইত্যাদি।' তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন, 'দ্বাদশ না, চতুর্বিংশতি ইত্যাদি।"

এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে স্পেনের আন্দালুশ প্রদেশের মৌলানা ইব্‌ন হাজম যেন এঁদের বাবদে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে মাথা থাবড়াতে থাবড়াতে বলছেন, 'অলৌকিক এদের অন্ধবিশ্বাসের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে থাকবার ক্ষমতা! কারও ইমাম অদৃশ্য হয়েছেন অষ্টম শতাব্দীতে, কারও নবম, কারও-বা দশমে। যে জিনিস হারিয়ে গেছে (অদৃশ্য হয়েছে) দুশো তিনশো চারশো বছর আগে, এরা এখনও সেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ-বা আবার বলে, অদৃশ্য ইমাম আছেন একটা মেঘের আড়ালে। আহা, যদি জানতুম কোন মেঘটা! চিৎকারে চিৎকারে তাঁকে অতিষ্ঠ করে বলতুম, "সশরীরে নেমে এসে কুল্লে বখেড়ার ফৈসালা করে দাও না, বাবা!" তাজ্জব তাজ্জব!'

পিকাস্‌সোর আগের বিবৃতি যদি সত্য হয় তবে আমাদের বলতে হবে, ভক্তজনের উপাস্য পিকাস্‌সো তিনি আত্মহত্যা করলেন। আর ভক্তজন বলবেন, তিনি মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন।

আর যেসব সরলজন বিশ্বাস করে ওইসব 'বিজারের' বাজার বিলকুল ঝুটা, মশকরা করে ছবির ধাঁধা বানিয়ে আর আরাবেস্ক এঁকে প্রকৃত কলাসৃষ্টি হয় না, তার জন্য প্রচুর অক্লান্ত তপস্যার প্রয়োজন তাদের জন্য নিম্নের উদ্ধৃতিটি তুলে দিলুম; কিছুতেই লোভ সামলাতে

www.pathagar.com

পারলুম না— আমার চোখে পড়েছে এই আজ : কিছুদিন আগে কোনও একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আলাউদ্দিন সাহেব এবং গোলাম আলি সাহেবকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অভিনন্দনের উত্তরে আলাউদ্দিন সাহেব বললেন— 'নব্বুই বছর ধরে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর দর্শনের আশায় সাধনা করে আসছি। একটিমাত্র আশায় দিনের পর দিন সাধনা করে আসছি— একদিন-না-একদিন তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে অমরাবতীর সংগীত-মন্দিরে ঢোকবার অনুমতি দেবেন। আজও আমার সাধনার শেষ নেই। এতদিন সাধনার ফলে দূর থেকে শুধু মন্দিরের আবছায়া ছায়াটা যেন একটু একটু নজরে আসছে।'

এর পর গোলাম আলি সাহেব অভিনন্দনের উত্তরে বললেন— 'আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব মহাভাগ্যবান ব্যক্তি। দেবী সরস্বতী তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন্দিরের ছায়া দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি হতভাগ্য এতদিন সাধনা করার পরেও সঙ্গীত-মন্দিরের ছায়া দেখতে পাওয়া দূরে থাক— উপরে ওঠবার সিঁড়িটুকুও এখনও শেষ করতে পারিনি। জানি না কত সহস্র বছর আরও কঠিন কঠোর সাধনায় দেবী প্রসন্ন হবেন।'

দর্পণ

বছর পনেরো পূর্বে সেই সোনার বাঙলা মেতে উঠেছিল রম্যরচনা মারফত রম্যসাহিত্য সৃষ্টি করতে। তার পর সে হুজুগ কেটে যায়— তার কারণ বর্ণন উপস্থিত মুলতুবি রাখলুম। বছর পাঁচ-সাত পূর্বে দেখলুম, কেষ্টবিষ্টু তো বটেনই, পাঁচু-পেঁচি তক্ ছেড়ে কথা কইছেন না— সবাই লেগে গেছেন, আত্মজীবনী প্রকাশ করতে। সে ঝোকায় আমারও মনে বাসনা যায় একখানি সরেস আত্মজীবনী ছেড়ে আর পাঁচজনকে ঘায়েল করে দিই, কিন্তু বিধি বাম। ইংরেজিতে প্রবাদ আছে 'ম্যান প্রোপোজেস, গড্ ডিস্‌পোজেস'— মানুষ প্রস্তাব পাড়ে (কোনওকিছুর কামনা করে) আর ভগবান সমাধান করেন, তাঁর ইচ্ছেমতো। এটা ইংরেজ আমাদের শিখিয়েছেন আর পাঁচটা ভুল জিনিস শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে। আপনারা সরলচিত্ত ধরেন, আর ভাবেন, ইংরেজ আমাদের ইংরেজি শিখিয়েছে। বিলকুল ভুল। ইংরেজ নিজে শেখে 'কিংস ইংলিশ', তার অর্থ, তাদের রাজা— উপস্থিত, রানি— যে ইংরেজি ব্যবহার করে। আর আমাদের শিখিয়েছে 'ব্যাবু ইংলিশ' বা 'বাবু ইংলিশ'! আসলে প্রবাদটা 'ম্যান প্রোপোজেস, উম্যান ডিসপোজেস' অর্থাৎ পুরুষ প্রস্তাব করে, স্ত্রীলোকে ফৈসালা করে। প্রবাদে ভেজাল কর্ম কিছু নতুন নয়; স্মরণ করুন বেদনিষ্ঠ সদাচারী ব্রাহ্মণসন্তান দ্রোণাচার্য তাঁর শিশুতনয়কে দুধের পরিবর্তে কী দিয়েছিলেন! কিংবা সদাশয় সরকার— থাক গে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইনে।

শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইনে! হেন বাঙাল আছে কি যে শ্বশুরবাড়ি যেতে চায় না? অসার খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্— দেবভাষায় আপ্তবাক্য। ওই তো করলেন ব্যাকরণে ভুল!

আত্মজীবনী লিখি-লিখছি লিখি-লিখছি করছি এমন সময় এক রমণীর পাল্লায় পড়ে আমাকে কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়।

www.pathagar.com

শুনেছি, জরাসন্ধ নাকি চৌদ্দ বছর আলীপুর জেলে কাটান। তার কয়েক বছর পর একদা বাসে করে ওই জেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর বালকপুত্র চিৎকার করে সোল্লাসে তাঁকে শুধোয়, 'বাবা, ওইখেনে তুমি চোদ্দ বছর ছিলে? না?'

বাস-সুদ্ধ লোক তাঁর পানে কটমটিয়ে তাকায়। যদ্যপি গাঁটকাটার চোদ্দ বছর জেল হয় না, তবু সবাই অচেতন মনে আপন আপন পকেটে হাত দিয়ে মনিব্যাগ পাকড়ে ধরে। তা ধরুক। কিন্তু বেচারি জরাসন্ধ বাস-সুদ্ধ লোককে বোঝান কী প্রকারে যে, তিনি জেলে চোদ্দ বছর সুপারিনটেন্‌ডেনটের কর্ম করেছেন। বুঝুন ঠ্যালাটা! তাই তো ঋষি বলেছেন, 'দারা পুত্র পরিবার কে তোমার তুমি কার?' পুত্র না হয়ে আর কেউ হলে শান্তস্বভাব তিতিক্ষু 'জরাসন্ধ' বসিয়ে দিতেন নাকে মোক্ষম এক ঘুষি!

না। আমি জেলে যাই, আইনত, খাস জজসাহেবের হুকুমে। সেকথা যথাসময়ে হবে।

জেলে একজন আরবের সঙ্গে আলাপ হয়— আমি পোরট্ সইদের একটা গোপন নাইটক্লাবে চাকরি করার সময় কিছুটা আরবি শিখে যাই, ওই ভাষায় কটুকাটব্য করতে ততোধিক।

আরবটি বেশ লেখাপড়ি করেছে। তবু যে কেন জেলে এল তার কারণ একটি সরেস্ ফারসি কবিতাতে আছে।

এক বৃদ্ধ বাজিকর তার ছেলেকে বলছে, 'দ্যাখ ব্যাটা, এই বয়সেই তুই আমার মতো হুনুরির কাছে সব এলেম রপ্ত করে নে। কী করে পাঁচটা বল নিয়ে লুফোলুফি করতে হয়; টুপির ভিতর থেকে জ্যান্ত খরগোশ বের করতে হয়, হাত-পা বেঁধে বাক্সে ভরে সমুদ্রে ফেলে দিলে বেরিয়ে আসতে হয়।

শুনবি না বুড়ো বাপের কথা? তা হলে আল্লার কসম, খুদার কিরে কেটে বলছি, তোকে পাঠাব পাঠশালে, তার পর ইস্কুলে, তার পর কলেজে। এম-এ, পি-এইচ-ডি করে বেরোনোর পর যখন দোরে দোরে ভিক্ষে মাগবি, লাথি-ঝাঁটা খাবি তখন বুঝবি রে, ব্যাটা, তখন বুঝবি, বুড়ো বাপ হক্ক কথা বলেছিল কি না।'

আরবের বেলাও বোধহয় তাই হয়েছিল। কলেজের বিদ্যেতে যখন পেট ভরল না তখন শিখতে গেল বড় বিদ্যে— ল্যাটে গেল, ল্যাটে গেল! বুড়ো বয়সে বিয়ে করা আর বড় বিদ্যে শিখতে যাওয়া একই আহাম্মুকী!

পিরসাহেব সেজে আরবিস্থান থেকে সোনা পাচার করতে গিয়ে শ্রীঘর।

সেকথা থাক। তার কাছে কিন্তু একখানা বই ছিল। সেটি পবিত্র কুরান শরিফ বলাতে জেল-কর্তৃপক্ষ সেটিকে তার কাছে হামেহাল রাখবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অতখানি আরবি বিদ্যে আমার নেই যে, স্বচ্ছন্দে কেতাবখানা পড়ি। তাই আরব বাবাজিই আমাকে পড়ে শোনাত। লেখকের নামটা আমার এখনও মনে আছে। এরকম দেড়-গজি নাম ইহসংসারে বিরল বলে সেইটে বহু তকলিফ বরদাস্ত করে মুখস্থ্ করে নিয়েছিলুম : আবু উস্‌মান্ আম্‌র ইব্‌ন্ বহ্‌র্ উল্ জাহিজ্— ধানাই-পানাই বাদ দিলে তার বিগলিতার্থ দাঁড়ায় 'প্রলম্বিত চক্ষুপল্লব বিশিষ্ট'। এই জাহিজ লিখেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী।

এদেশে যে আরব্যরজনী খুবই প্রচলিত সে তথ্য আরব জানত না। আমি সে আরব্যরজনীর কথা বলছিনে যেটি আপনারা কলেজ স্ট্রিটে পান— কেটেছেঁটে সেটিকে করা হয়েছে গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসী পাতাটির মতো পূতপবিত্র। আমি বটতলা সংস্করণের কথা বলছি। অশ্লীলতায়

www.pathagar.com

মূল আরব্যরজনী— ওই যে কী বলে, লেডি চ্যাটারলি না কী— তেনাকে টিড-দুয়ো দিতে পারে, হেসে-খেলে। পারলে সত্য গোপন করতুম, কিন্তু সুচতুর পাঠক বহু পূর্বেই ধরে ফেলেছেন ওই কারণেই বইখানা আমাকে ছেলেবেলায়ই আকৃষ্ট করেছিল। আহা, ওই যে নিগ্রো ছোকরা গোলাম আর সুন্দরী প্রভুকন্যার কেচ্ছা— না, থাক্ আবার আলীপুর যেতে চাইনে।

আরব বলছিল, জাহিজ্ নাকি আরব্যরজনীর খলিফা হারুন-অর্-রশিদের নাতি না কে যেন, সেই খলিফার উজিরের নেক্-নজরের আশকারা পেয়ে আপন বউকে পর্যন্ত ডরাতেন না। ব্যস্, ওই এক কথাই কাফি। কথায় বলে, বাঘের এক বাচ্চাই ব্যস্।

আত্মজীবনী আরম্ভ করার গোড়াতেই মনে পড়ল, জাহিজ্ যে অবতরণিকা দিয়ে তাঁর জীবনী আরম্ভ করেছেন সেইটে দিয়ে আমিও আরম্ভ করলে আমারও যাত্রা হবে নিরাপদ—

'যেমতি মূষিক ভ্রমে সাগরে বন্দরে
নৃপতরী আরোহিয়া—'

এমন সময় খটকা লাগল। জাহিজের কিঞ্চিৎ পরিচয় তো দিতে হয়। নিদেন তাঁর জন্মকাল লীলাভূমি তো বাৎলাতে হয়।

অধমের বাসভবনে যাঁরাই পায়ের ধূলি দিয়েছেন, তাঁরাই জানেন সেখানে আর যা থাক, না-থাক, বই সেখানে একখানাও নেই। শুনেছি এক 'বিদ্যাসাগর' নেটিভ মহারাজা ভাইসরয়ের সামনে আপন কিস্মৎ বাড়াবার জন্য একটি কলেজ খোলেন। প্রিন্সিপল নিযুক্ত হয়ে দেখেন, কলেজ লাইব্রেরি নামক কোনওকিছু সেখানে নেই। তিনি টাকা চাইতেই মহারাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'নিকালো হারামিকো অভি স্টেটসে। লেখাপড়া শিখে আসেনি; এখন বুঝি বই পড়ে কলেজে পড়াবে! আমাকে কি উল্লু পেয়েছে নাকি?'

এর থেকে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য নতমস্তকে বার বার স্বীকার করব, একখানা বইয়ের সন্ধানে আমি সংবরণের মতো পত্নীবর কামনা করে—

— তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত—

করেছি। কী সে বই? ধর্মগ্রন্থ, আয়ুর্বেদ, কামশাস্ত্র—?

এসব কিছু না। একখানা চেক্ বই। সে দুঃখের কথা আর তুলব না।

কিন্তু পুলিশের হুলিয়ার হুড়ো খেয়ে উপস্থিত যেখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছি সেই এলাকায় এক অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করেন। তদুপরি তিনি অতিশয় অমায়িক। আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলুম, 'স্যার, জাহিজ্ নামক আরবি লেখক কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?'

চট করে একখানা বই টেনে নিলেন। ঠিক ওই ঢপের আরও খান পঁচিশেক ভলুম শেলফে বিরাজ করছিল। বই থেকে পড়ে বললেন, 'মৃত্যু হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে—'

আমার কেমন যেন ধোঁকা লাগল। বললুম, '১৮৬৯? হারুন-রশিদের নাতির আমলের লোক তিনি— এই কথাই তো শুনেছি।'

'ঠিকই তো! দেখি, হারুনের নাতি'— বলে আরেক ভলুম পাড়লেন— 'হ্যাঁ, অল ওয়াসিক— ৮৪২ থেকে ৮৪৭।' একটু চিন্তা করে বললেন, 'অহ্ হো, বুঝেছি। ১৮৬৯-এর

www.pathagar.com

প্রথম ১-টা বাদ দিতে হবে! ওয়াসিকের মৃত্যুর পর আরও বাইশ বছর বেঁচেছিলেন আর কি।' তা থাকুন আর নাই থাকুন। মোদ্দা কথা, কিন্তু ইনি নবম শতাব্দীর লোক, আর এই পণ্ডিতদের বেদ বলো, কুরান বলো, পরম পূজনীয় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বেচারিকে টেনে নিয়ে এলেন উনবিংশ শতাব্দীতে! তোবা! তোবা!! নির্জলা পূর্ণ এক হাজার বছরের ডিফ্‌রেন্‌স্।

যেরকম সরলভাবে তিনি আমাকে স্ক্যান্ডালটা বুঝিয়ে বললেন যে মনে হয়, কলকাতার ডিটেকটিভ পর্যন্ত সেখানে থাকলে বুঝে যেত।

জাহিজ্ অবতরণিকায় বলেছেন, 'চতুর্দিকে আমার দুশমন আর দুশমন— দুশমনে দুশমনে আবজাব করছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমার মুরুব্বি; কেউ ডরের মারে আমার রাজহাঁসটাকে পর্যন্ত বূ করতে সাহস পায় না। কিন্তু আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, আমার দেহাস্থি গোরস্তানে প্রোথিত আমার পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষগণের জীর্ণাস্থির সঙ্গে শুভযোগে সম্মিলিত হওয়ার পূর্বেই (মেহেরবান খুদা সে শুভমিলন আসন্ন করুন!) আমার দুশমন-গুষ্টি অশেষ তৎপরতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যাবে আমি এবং আমার ঊর্ধ্বতন তথা অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের পূতিগন্ধময় নিন্দাবাদ করতে— এবং তার শতকরা ন-সিকে কপোলকল্পিত, আকাশপুরীষ-চয়িত বেহদ্দ গুলগপ্পিকার ঝুটমুট।

যেমন, আমি জানি, আর পাঁচটা নিন্দাবাদের মাঝখানে, অতি কুচতুরতাসহ তারা কীর্তন করবে— আমি নাকি অতিশয় প্রিয়দর্শন সুপুরুষ ছিলুম, সাক্ষাৎ ইউসুফ-পারা হেন দেবদুর্লভ চেহারা নাকি কামনা করেন স্বয়ং বেহস্তের ফেরেস্তারা।

ক্রোধান্ধ হয়ে জাহিজ্ এস্থলে হুঙ্কার ছাড়ছেন, 'মিথ্যা, মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। আমার প্রতি অন্যায় অবিচার! আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি, যে এ অপবাদ রটাবে তার পিতা নির্বংশ হবে। আমি আদৌ সুশ্রী নই। বস্তুত টেকো মর্কটটার চেহারা পেলে আমি বর্তে যাই। আমার মুখমণ্ডল নামক বদ্‌নাবদন চেহারার বিভীষিকা দেখে অসংখ্য শিশু ভিরমি গেছে। আমার—'

সরল পাঠক! অধম অবগত আছে তুমি জাহিজের এই আত্মকথন শুনে ধন্ধে পড়ে গ্রীবা কণ্ডুয়নে লিপ্ত হয়েছ! তোমার মনে হচ্ছে, 'এ তো বিচিত্র ব্যাপার! কেউ যদি জাহিজ্‌কে প্রিয়দর্শন বলে মন্তব্য করে তবে সেটা নিন্দা হতে যাবে কেন, আর যে মন্তব্যটা করেছে সেই-বা দুশমন হতে যাবে কেন? আর জাহিজ্ যদি কুৎসিতই হন তাতেই-বা কী? তাঁর গোর হয়ে যাওয়ার পর কে আর মিলিয়ে দেখতে পারবে তিনি সুরূপ না কদ্রূপ ছিলেন। কথায় বলে, 'মড়ার উপর এক মণও মাটি শ' মণও মাটি।' তবে কি জাহিজ্ নিরতিশয় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কেউ মিথ্যে বলুক, এটা তিনি সইতে পারতেন না?— তাও সে মিথ্যে প্রিয়ই হোক্, আর অপ্রিয়ই হোক্।

এসবের উত্তর আমি দেব কী প্রকারে? বেলা গড়িয়ে গেল, আর তুমি এখনও বুঝতে পারনি, আমার পেটে সে-এলেম নেই! বিশেষত আমার সেই মুরুব্বি পণ্ডিত— যিনি দশটি ভাষায় ত্রিশ-ভলুমি সাইক্লোপিডিয়া নিয়ে কারবার করেন এবং যাঁর বাড়তিপড়তি মাল ভাঙিয়ে আমি হাঁড়ি চড়াই, তিনি গায়েব। তবে শেষ দেখার সময় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বলেন, 'রেনেসাঁসের পূর্বেই এই লোকটা লিখল আত্মজীবনী! আশ্চর্য আশ্চর্য! রেনেসাঁসের পূর্বে তো শুধু রাজরাজড়া আর ডাঙর ডাঙর সাধুসন্ত। সাধারণ মানুষেরও যে একটা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে সেটা আবিষ্কৃত হল রেনেসাঁসের সময়। সাধারণ লোকের আত্মজীবনী তো প্রথম

www.pathagar.com

লেখেন আবেলরাড দ্বাদশ শতাব্দীতে, তার পর দান্তে 'নবজীবন' (ভিটা নুওভা) লেখেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে। আর তোমার ওই জাহিজ্ না কে লিখে ফেললে নবম শতাব্দীতে? বড়ই বিস্ময়জনক, প্রায় অবিশ্বাস্য।'

সরল পাঠক, তোমার কুটিল প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারলাম না। তবে একটা ভরসা তোমাকে দিতে পারি। ইংরেজিতে প্রবাদ আছে— এক্সট্রিম্স্ মিট— দুই অন্তিম প্রান্ত একত্র হয়ে যায়। যেমন দেখতে পাবে গ্রাম্য গাড়ল (ভিলেজ ইডিয়ট) দাওয়ায় বসে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দেয় একটা শুকনো খুঁটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে, আর যোগীশ্রেষ্ঠও তাবৎ দিবসটা কাটিয়ে দেন একাসনে বসে বসে। উভয়েই কর্মস্পৃহা জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে আমি এক প্রান্তে, জাহিজ্ অন্য প্রান্তে— উভয়ের সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী।

এতএব আমার আত্মজীবনী যদি অবহিতচিত্তে পাঠ কর তবে হয়তো তোমার প্রশ্নগুলোর কিছুটা সদুত্তর পেয়ে যাবে।

জাহিজ্ তাঁর কেতাব আরম্ভ করেছেন এই বলে যে, তাঁর দুশমনের অভাব নেই। এইখানে তাঁর সঙ্গে আমার হুবহু মিল। বাকিটা সবিস্তার নিবেদন করি।

আত্মজীবনী-লেখক মাত্রেই আপন বাল্যকাল নিয়ে রচনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথও এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। এবং সেই সুবাদে সকলেই আপন আপন বংশ-পরিচয় দেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যতটা পারেন, পরিবারের মান-ইজ্জত বাড়িয়েই বলেন। এ নিয়ে বাক্যব্যয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। স্বদেশ, স্বজাতি, মাতৃভাষা নিয়ে অযথা অহেতুক বড়াই করে না, এমন মানুষ বিরল।

আমাকে কিন্তু ক্ষমা করতে হবে। তার কারণ এ নয় যে, আমি হীন পরিবারের লোক। সত্য কারণটা পাঠক একটু ধৈর্য ধরলেই বুঝতে পারবেন।

বস্তুত, পরিবার আমাদের খানদানি। আমাদের পূর্বপুরুষ শাহ আহমদের (শাহ এস্থলে বাদশা নয়— 'সৈয়দ'কে মধ্যযুগে 'শাহ' বলা হতো) দরগা এখনও তরপ পরগনাতে আমাদের ভদ্রাসনে বিরাজিত— সেখানে প্রতি বৎসর উর্স্ হয়। তারই অল্প দূরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মাতুলালয়— মাতা শচী দেবীর জন্ম সেখানেই। আমাদের বংশ 'পিরের বংশ'— এঁরা কিন্তু যজমানগৃহে অন্ন পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। আমার পিতামহ, মাতামহ, আমার অগ্রজদ্বয় সুপণ্ডিত। আমার অগ্রজ প্রায় কুড়ি বৎসর পরিশ্রম করে সম্প্রতি 'চর্যাপদে'র একখানি নতুন টীকা রচনা করছেন। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর ফকিরি, মারিফতি গীত ঢাকা বেতারে শুনতে পাবেন।

কিন্তু থাক, আর না। এ বিষয়টাই আমার কাছে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক। কুলমর্যাদার প্রস্তাব উঠলেই আমার পিতা বলতেন, 'বাপ-ঠাকুর্দার শুকনো হাড় চিবিয়ে কি আর পেট ভরবে?' আমিও চিবোইনি। চিবোনো দূরে থাক, আমাদের পিতৃপুরুষ যে গোরস্তানে শুয়ে আছেন তার পাশ দিয়ে যেতে হলে আমি মাথা হেঁট করি।

আমি এই গোষ্ঠীর একমাত্র ব্ল্যাকশিপ— কালা ম্যাড়া!

শব্দার্থে আমার বর্ণ ঘোরতর কৃষ্ণ তো বটেই— বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা আর দেব না। তবে এইটুকুন বলতে পারি পরবর্তীকালে 'উচ্চ-শিক্ষা'র অজুহাত দেখিয়ে জন্মদাতা ও শিক্ষাদাতা দুই গুরুর কিল-কানমলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যখন শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নিই

www.pathagar.com

তখন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর শ্রীযুত রামকিঙ্কর বায়েজ আমাকে দেখামাত্রই সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠেন, 'হুর্‌রে হুর্‌রে। কেল্লা মার দিয়া। কিষ্কিন্ধ্যার মহারাজ সুগ্রীবের বংশধর শ্রীযুক্ত আহ্লাদী কুঞ্চিতপদম্ আমাকে বায়না দিয়েছেন শয়তানের একটি মূর্তি গড়ে দেবার জন্য। মানসসরোবর থেকে কন্যাকুমারী, হিংলাজ থেকে পরশুরাম কুণ্ড অবধি খুঁজে খুঁজে হয়রান— মডেল আর পাইনে। গুরুদেবের কৃপায় আজ তুই হেথায় এসে গেছিস। আয় ভাই আয়। চ' কলাভবনে।'

ইহুদিদের সদাপ্রভু য়াহভের বেহেশতে শয়তানের প্রবেশ নিষেধ। সেখান থেকে যদি শয়তানের মূর্তি গড়ার ফরমায়েশ আসত সেটাও না হয় বুঝতুম কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা থেকে! সেখানকার মেয়েমদ্দা দুই-ই বুঝি দারুণ খাবসুরত হয়!

পরবর্তীকালে কিষ্কিন্ধ্যা গিয়েছিলুম। দ্রাবিড় অঞ্চলে প্রবাদ আছে, রমণীরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে— 'কামের প্রলোভন থেকে আমাদের রক্ষা কর।' তাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করে ভগবান কিষ্কিন্ধ্যার পুরুষ সৃষ্টি করেন।

কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে দেখি, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। আসছে রবিবারে যমের পূজা উপলক্ষে অলিম্পিকের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় টাউন হলে একটি টুর্নামেন্ট হবে। যে সবচেয়ে বেশি বিকট মুখ-ভেংচি কাটতে পারবে সে পাবে হাজার টাকার পুরস্কার।

আমি কম্পিট করিনি। নিরীহ দর্শক হিসেবে ছিলুম মাত্র। অবশ্য বিকট বিকট গরিল্লাপারা নরদানবরাই ওই ভেংচি প্রদর্শনীতে হিস্যে নিয়েছিলেন— কার্তিক যতই ভেংচি কাটুন না কেন, তাঁকে তো আর মর্কটের মতো দেখাবে না!

সে কী ভেংচির বহর! এক-একটা দেখি আর আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যায়। আর সে কী দুর্দান্ত নেক্-টু-নেক্ রেস! কোথায় লাগে তার কাছে নিক্সন-হামফ্রের ঘোড়দৌড়!

পালা সাঙ্গ হল। হঠাৎ দেখি তিনজন জজই মল্লদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দর্শকদের গ্যালারি পানে এগিয়ে আসছেন। তার পর ওমা, দেখি, ঠিক আমারই সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার গলায় জবাফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যদ্যপি আপনি এই কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেননি তবু আপনাকে প্রথম স্থান না দিলে অবিচার হবে। ভেংচি না কেটেও আপনার মুখে বিধিদত্ত যে ভেংচি সদাই বিরাজ করছে সেটা অনবদ্য, দেব-না, না— যম্‌দুর্লভ। তবে আপনি এই কম্পিটিশনে পার্ট নেননি বলে আইনত টাকাটা দেওয়া যায় না— সেটা যমপূজায় ব্যয় হবে। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ— পত্রপুষ্পাদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে পৌঁছায়, বিকটের পুজো মাত্রই আপনাকে পৌঁছবে।' এ বাবদে শেষ কথা। আমি আজও কেন আইবুড়ো আছি, সেটা বুঝতে কারওরই অসুবিধা হবে না।

পাঠক ! এ লেখন প্রধানত তোমার অখণ্ড-সৌভাগ্যবান বংশধরদের জন্য। তারা যদি প্রত্যয় না যায় তবে যেন একবার কলাভবনে সন্ধান নেয়। ওই মূর্তির একটা ফটো তুলে রেখেছিলেন— আশ্চর্য, লেন্সটা কেন চৌচির হল না— ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রামকিঙ্কর। ছবিটা তিনি দেখালেও দেখাতে পারেন। তবে তারা যেন গ্যাসমাস্ক তথা ধুঁয়ো মাখানো কাচ সঙ্গে নিয়ে যায়। মূর্তিটা গায়েব হয়েছে। গুজোরব শিল্পী রদাঁর প্রেতাত্মা সেটি সরিয়েছে।

কিন্তু এহ বাহ্য।

www.pathagar.com

পাড়ার ভটচার্য মহাশয়ের কাছে শুনেছি, বিয়ের সময় কনে নাকি বরের রূপ কামনা করে (আমার রূপের বর্ণনা দিলুম), বন্ধুবান্ধব বরের উত্তম কুল কামনা করে (সেটাও হল), পিতা সুশিক্ষিত বর চায়— এইবারে আমরা এলুম ইংরেজিতে যাকে বলে 'থিক্ অব দ্য ব্যাটল্' বা রণাঙ্গনের কেন্দ্রভূমিতে।

ডাক্তার অবশ্য পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'স্লো বাট স্টেডি উইন্‌স দ্য রেস'— বিলম্বিত চালেই চলুক না, সেই চাল যদি সদা বজায় রাখে তবে সে জিতবে। অর্থাৎ হোক না গর্দভ, সে যদি গর্দভি চাল বজায় রেখে চলে তবে আখেরে ডার্বি ঘোড়ার রেস জিতবে।

জীবনের অষ্টম বর্ষাবধি আমি শুধু একটানা 'ভাত খাব, ভাত খাব' বলেছি। একদম স্টেডি সুরে। ডাক্তারের স্তোকবাক্যে আত্মজন পরিতৃপ্ত না হয়ে মেনে নিলেন যে আমি গ্লোউইটেড জড়ভরত। অষ্টম বর্ষে (চাণক্যকে টিট দিয়ে পঞ্চমে নয়) আমাকে পাঠানো হল পাঠশালে।

হাতেখড়ির প্রথম দিবসান্তে গুরুমশাই যে-শ্লোকটি আবৃত্তি করেন সেটি মমাগ্রজ লিখে নেন :

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তসময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ ॥

কাক কোকিল দুই-ই কালো, কিন্তু মাইকেল মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন 'পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে', আর আমার কণ্ঠস্বর শুনেই গুরু বুঝে গেলেন এটা এক্কেবারে জাত দাঁড়কাকের। সবিস্ময়ে দাদাকে শুধোলেন, 'এটা তোর ভাই?'

তার পর তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'কস্মিনকালেও শুনিনি, কাক কোকিলের বাসায় ডিম পাড়ল! এইবারে একটা ব্যত্যয় দেখলুম— হরি হে, তুমিই সত্য।'

এস্থলে তড়িঘড়ি আমি একটি সম্ভাব্য 'ভ্রম সংশোধন' করে রাখি। আমার দাদারা ফর্সা। আর আমি বিটকেল কৃষ্ণবর্ণ। অথচ আমরা একই বর্ণের, অর্থাৎ একই কুলের, অন্তত এই আমার বিশ্বাস ছিল বহুদিন ধরে।

কালের সঙ্গে আমার আরও একটা জবরদস্ত দোস্তি দেখা গেল অচিরাত। আমি নিরবচ্ছিন্ন সেল্‌ফ পর্ট্রেট আঁকলুম ঝাড়া তিনটি বছর ধরে। অর্থাৎ পাততাড়িতে বছরের পর বছর কাগের ছা বগের ছা লিখে গেলুম।

আমার বিস্ময় লাগে, শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেনের জন্মনগরী করিমগঞ্জ, আমারও তদ্বৎ। তাঁর আমার জন্ম একই বৎসর। আজ তিনি তাবৎ দেশের শিক্ষাদীক্ষা তরণীর কর্ণধার, আর আমি সুর করে একটানা গেয়ে যাচ্ছি— 'এক বাঁও মেলে না, দু বাঁও মেলে না—'

আমি যে শিক্ষা-দীক্ষার নিরঙ্কুশ 'ডডনং' হয়ে রইলুম তার জন্য কবিগুরু গুরুদেবও খানিকটা দায়ী। অবশ্য তাঁর প্রতি আমার ভক্তি আমৃত্যু অচলা থাকবে। কারণ—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ॥

কবিগুরু বাঙালি তথা ভারতবাসীর সম্মুখে উত্তম উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন, কিন্তু যে-আদর্শ 'এলেন আমার দ্বারে/ডাক দিলেন অন্ধকারে' এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুল্লেখার মতো আমার চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত করে দিল সেটি এই :

www.pathagar.com

'নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোসাঁই।
আমি তো, মা, চাইনে হতে
পণ্ডিতমশাই।
নাই যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,
মুর্খু হয়ে রইব তবে?
আমার তাতে কীই বা হবে,
মুর্খু যারা তাদেরি তো
সমস্তখন ছুটি।'

পুনরায় :

'যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরুমশাই দুপুরবেলায়
বসে বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান
শুনে আমি পণ করি যে
মুর্খু হব বলে।'

আমাকে অবশ্য কোনও উচাটন মন্ত্রোচ্চারণ করে কোনওপ্রকারেই পণ করতে হয়নি। সর্বেশ্বর প্রসাদাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার লগ্ন থেকেই আমি কর্মমুক্ত। গোড়ায় ভেবেছিলাম, এটা বুঝি জড়ত্বের লক্ষণ। পরে শুনি দক্ষিণ ভারতের মহর্ষি ছন্দে গেঁথে বলেছেন, 'কর্ম কিং পরং। কর্ম তজ্জড়ম্ ॥' 'কর্ম তো স্বতন্ত্র নয়, কর্ম সে তো জড়!' তবে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কর্মাতে কর্মাতে অম্বিকে গোসাঁই হয়ে গিয়ে কোন তুর্কিস্থানের বাখারার আজব মেওয়া আলু-বুখারা লাভ হবে?

অবশ্য নতমস্তকে স্বীকার করব, আমি পাঠশালা পাস করেছিলুম।

শুনেছি, নাৎসি যুগে এমনও চৌকশ স্পাই ছিল যে বিশ গজ দূরের থেকে শুধুমাত্র ঠোঁট নাড়া দেখে দুজনের ফিসফিসিনিতে কী কথাবার্তা হচ্ছে আদ্যন্ত বুঝে যেত এবং পকেটে হাত গুঁজে প্যাডের উপর সেটা আগাপাশতলা শর্টহ্যান্ডে তুলে নিতে পারত। আমি কিন্তু সে লাইনে কাজ করিনি। শ্যেনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকলে আমরা সে ব্যক্তিকে বলি 'সেয়ানা'। আমি সেই দৃষ্টিশক্তির আনুকূল্যে দশ হাত দূরের ব্রিলিয়ান্ট বয়ের খাতা থেকে টুকলি করে তর্ তর্ করে পেরিয়ে গেলুম পাঠশালার ভব-নদী।

বুদ্ধিমান জন আপন বুদ্ধির জোরে তরে যায় বলে ভাগ্যবিধাতা মূর্খকে সাহায্য করেন, নইলে তিনিও বিলকুল বেকার হয়ে পড়বেন যে! মৌলা আলীকে শিরনি চড়াবে কে, কালীঘাটে মানত মানবে কোন মূর্খ— আর বুদ্ধিমান যে করে না, সে তো জানা কথা।

www.pathagar.com

পাঠশালা পাস করার পর করলুম জীবনের চরম মূর্খমো! কলকাতার 'বেম্মো'-সমাজের বাবু-বিবিরা সে-যুগে পাড়াগাঁয়ে আসতেন আমাদের পেট্রনাইজ করার জন্যে। তাঁদের চোখে কত না ঢঙ-বেঢঙের রঙ-বেরঙের চশমা। আমারও শখ গেল অপ-টু-ডেট হওয়ার। ভান করতে লাগলুম আমি ব্ল্যাক বোর্ড দেখতে পাইনে। ডাক্তারকে পর্যন্ত ঘায়েল করলুম— কিংবা সে ছিল ঝটপট দু পয়সা কামাবার তালে।

সেই বেকার চশমা ব্যবহার করে গেল আমার শ্যেনদৃষ্টি। ফল ওৎরালো বিষময়। একই ইস্টিশানে— যেমন আগ্রা সিটি, আগ্রা ফোর্ট, আগ্রা জংশন— গাড়ি দাঁড়াতে লাগল তিন তিন বার করে। শ্যেন দৃষ্টি গেছে, টুকলি করতে পারিনি— একই ক্লাসে কাটাই তিন-তিনটি বছর করে।

ইতোমধ্যে কিন্তু আমি দিব্য অকালপক্ক 'জ্যেষ্ঠতাতত্ত্ব' লাভ করেছি— তারই একটি উদাহরণ দিই। ফেল মেরে দু কান কাটার মতো শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় এক গুরুজন, মরালিটি প্রচারে নিরেট পাদরি সাহেব, আমাকে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'ফেল মেরেছিস? লজ্জাশরম নেই? তোর দাদারা, তোদের বংশ—'

একগাল হেসে বললুম, 'কী যে বলেন, স্যার! অ্যামন ফার্স্ট ক্লাস অ্যানসার লিখেছিলুম যে এগজামিনার মুগ্ধ হয়ে খাতায় লিখলে "এনকোর এনকোর!' তাইতেই তো ফের পরীক্ষা দিচ্ছি!"

সম্পর্কে তিনি আমার জ্যাঠা। কিন্তু আমার পক্ক-নিতম্ব 'জ্যাঠামো' শুনে তিনি থ মেরে গেলেন— আমাদের স্টেট বাস যেরকম আকছারই যত্রতত্র থ মারে— বুঝে গেলেন এ পেল্লাদকে ঘায়েল করার মতো পাষাণে, সমুদ্রে নিক্ষেপ পদ্ধতি তাঁর শস্ত্রাগারে নেই। গত যুদ্ধের ফ্লেম থ্রোয়ারের মতো একবার আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'এ ছেলে বাঁচলে হয়!'

গুরুজনের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হয়! দিব্যপুরুষ্টু পাঁঠাটার মতো ঘোঁত ঘোঁত করে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেল। হঠাৎ উপলব্ধি করলুম বয়স ষোল। ওদিকে ক্লাস ফাইভের যোগাসন আর পরিবর্তিত হচ্ছে না। দুনিয়ায় যত ডানপিটেমি নষ্টামির মামদো উপযুক্ত পীঠস্থান পেয়ে আমার স্কন্ধে কায়েমি আসন গেড়েছে। আমার তথাকথিত অপকর্মের বয়ান আমি দফে দফে দেব না! তবে এইটুকু বলতে পারি, পরীক্ষার হলে বেঞ্চি-ডেসকো ভাঙা, ট্রামবাস পোড়ানোর কথা শুনলে আমার ঠা ঠা করে উচ্চহাস্য হাসতে ইচ্ছে যায়। আরেকটি কথা বলতে পারি, আজ যে শ্রীহট্ট বার-এর আসামি পক্ষের উকিলরূপে সর্ববিখ্যাত মৌলভি সইফুল আলম খান— তিনি বাল্য বয়সেই কোথায় পেলেন তাঁর প্রথম তালিম? আমার 'অপকর্ম' পদ্ধতি (মডুস অপারেনডি) অপকর্ম গোপন করার কায়দা যে নব-নব রূপে দেখা দিত সেগুলো কি তিনি আমার সহপাঠী 'কনফিডেন্ট' রূপে আগাপাশতলা নিরীক্ষণ করে তারই ফলস্বরূপ আজ উকিল সভায় স্বর্ণাসনে বসেননি!

তবু যদি পেত্যয় না যান তবে তৎকালীন আসামের আই.জি. অবসরপ্রাপ্ত শ্রীযুত— দত্তকে শুধোবেন। স্পুটনিক আর কতখানি উঁচুতে গিয়েছিল? তাঁর দফতরে মৎ-বাবৎ যে ফাইল উঁচু হয়েছিল তার সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারে? এবং সানন্দে আপনাদের জানাচ্ছি প্রত্যেকটি

www.pathagar.com

ফাইলের উপর মোটা লাল উড পেন্সিলে লেখা 'প্রমাণাভাব প্রমাণাভাব।' বেনিফিট অব্ ডিউটি নামক প্রতিষ্ঠানটি যে মহাজন আবিষ্কার করেছিলেন তাঁকে বার বার নমস্কার।

কিন্তু দুস্তর সন্তাপের বিষয়, ইহসংসারের হেডমাস্টারকুল এই প্রতিষ্ঠানটিকে যথোচিত সম্মান শ্রদ্ধা করেন না। সে সৎসাহস তাঁদের নেই। থাকলে আমার সোনার মাতৃভূমি শিক্ষাদীক্ষায় আজ এতখানি পশ্চাৎপদ কেন। আমার নাম দু-দুবার 'ব্ল্যাক বুক'-এ উঠল পর্যাপ্ত প্রমাণাভাব সত্ত্বেও। হেডমাস্টার নাকি মরালি সারটন হয়ে— যে কোনও চার-আনি বটতলার মোকতারও বলবে, এটা ঘোর 'ইলিগালি অনসারটন'— আমার নাম কালো কেতাবে তুলেছেন। আরেকটা ঘটনা নাকি তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এটা যে কীরকম সংবিধান-বিরোধী 'উল্‌টরা ভিরেস' (গাড়ল ইংরেজের উচ্চারণে 'আল্‌টরা ভাইয়ারিজ')— বেআইনি স্বেচ্ছাচারিতা, সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে না : হেডমাস্টার তো সেখানে সাক্ষী, তিনি সেখানে বিচারক হন কোন আইনে? এ স্বতঃসিদ্ধটা তো স্কুল-বয়ও জানে। জানেন না শুধু হেডমাস্টার? তাই বিবেচনা করি, যে স্কুল-বয় এ তত্ত্বটা জানে না সে-ই আখেরে হেডমাস্টার হয়।

তৃতীয়বার কোনও অপকর্ম করলে 'কালো কেতাবে' নাম ওঠে না। তাকে গলাধাক্কা দিয়ে সুর্মা নদীর কালো (চোখের সুর্মা কালো) জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সোজা বাংলায় তাকে রাস্টিকেট করে দেওয়া হয়। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। যদি সেটা শব্দার্থে নেওয়া হয়। রাস্টিকেট শব্দের প্রকৃত অর্থ, গ্রামের ছেলে শহরের স্কুলে এসে গ্রাম্য অভদ্র আচরণ করেছিল বলে তাকে ফের গ্রামে পাঠানো হল, তাকে 'রাস্টিকিট' করে দেওয়া হল, তাকে কান্ট্রিফাই করে দেওয়া হল। আমি চাঁদপানা মুখ করে সুর্মার ওপারে গ্রামে বাস করে ইস্কুলে আসতে রাজি আছি। বিস্তর ছেলে ওপার থেকে খেয়া পেরিয়ে সরকারি ইস্কুলে পড়তে আসে। আমাদের পাদ্রি সাহেবের কাছে শোনা, লাতিন 'রুস্তিকারে' ('গ্রামে বাস করা') শব্দ থেকে 'রাস্টিকেট' কথাটা এসেছে। কিন্তু এসব গুণগর্ভ সুভাষিত শুনে হেডমাস্টার যে আসন ছেড়ে আমি-সত্যকামকে গৌতম ঋষির মতো আলিঙ্গন করবেন এমত আশা তিন লিটার ভাঙ পেটে নামিয়েও করা যায় না। 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। এস্থলে ধার্মিকও শুনতে চায় না ধর্মের কাহিনী— নইলে পৃথিবীতে এত গণ্ডায় গণ্ডায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম কেন? ভট্টচায যান মসজিদে ধর্মকাহিনী শুনতে এবং বিপরীতটা? হুঁঃ!

সেসব দিনে— না, রাতের আকাশে উত্তমকুমারাদি তারকা আকাশে দীপ্যমান হয়নি। আমার পরবর্তী যুগের সখা দেবকী-পাহাড়ীও তখন অসংখ্য বিমল উজ্জ্বল রতনরাজির মতো খনির তিমির গর্ভে। নইলে গাগারিন্ বেগে চলে যেতুম মোহময়ী মুম্বই বা টলিউডে— হেসেখেলে পেয়ে যেতুম যম বা শয়তানের মেন্ রোল।

ভাঙের কথা এইমাত্র বলেছি : তখন স্থির করলুম স্কুলের দরওয়ানজি হনুমান পুজন তেওয়ারি— যিনি কি না পালপরবে ওই বস্তু সেবন করেন এবং সেই সুবাদে আমাকে তথা ফ্রেন্ড স্বদেশ চক্রবর্তীকে ওই বিদ্যায় হাতেখড়ি দেন— তেনাকে ভাঙ খাইয়ে বেহুঁস করে হেডমাস্টারের ঘরে লাগাব আগুন। গায়ে আগুন লেগে গেঞ্জিটা পুড়ে গেল আর পাঞ্জাবিটা পুড়ল না— এ কখনও হয়! ব্ল্যাক বুক তার মিথ্যা সাক্ষ্যসহ পুড়ে ছাই হবে। সেই ছাই দিয়ে পরব বিজয়-টিকা! ওয়াহ্, ওয়াহ্!

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—'

www.pathagar.com

কিচ্ছুটি করতে হল না। অতি ভৈরব হরষে ওই সময়ে এল অসহযোগ আন্দোলন।
আমারে আর পায় কেডা?

চুম্বন

ঘটনাটা সাচ্চা না গুল, হলফ করে বলতে পারব না, কিন্তু তাতে কণামাত্র যায়-আসে না। রসের বিচারে সত্য না অসত্য, ভালো না মন্দ, প্রাকৃত না অপ্রাকৃত, এসব মাপকাঠি, কষ্টিপাথর সম্পূর্ণ অবান্তর। ডানাওলা অশ্ব অর্থাৎ পক্ষিরাজ ঘোড়া কখনও হয়?... রাক্ষসীই হয় না, তার ওপর তার প্রাণ নাকি কোন এক সাত সাগরের অতল তলে কৌটোর ভিতর রয়েছে— ভোমরা রূপে। সেই ভোমরাকে চেপটে থেঁতলে না মারা পর্যন্ত ওই রাক্ষসীর উপর যতই খঞ্জর-খাণ্ডার, বন্দুক-কামান চালাও না কেন, সে মরবে না। এইসব অবাস্তব ব্যাপার নিয়ে যখন ঠাকুমা রূপকথা বলেন তখন কি সর্বাঙ্গে শিহরণ কম্পন রোমাঞ্চন হয় না? মধ্যরজনী অবধি ঠাকুমাকে জাবড়ে ধরে বিনিদ্রাবস্থায় কাটে না?

হালে জনৈক পাঠক আমায় জানিয়েছেন, আমার সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের শহ্‌র্‌-ইয়ার নামক রমণী বঙ্গদেশের মুসলিম সমাজে কখনওই থাকতে পারে না। এ চরিত্রটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য অবাস্তব হলেই যে রসের পর্যায়ে পৌঁছয় না, এ হুকুম দিয়েছেন কোন রসরাজ? তা হলে পূর্বোক্ত পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া, রাক্ষসীর কৌটোতে রাখা ভোমরা প্রাণ এসব কোনওপ্রকারেরই রসসৃষ্টি করতে পারে না। ওই অকরুণ পাঠক যদি বলতেন, 'শহ্‌র্‌-ইয়ার বাস্তব হোক, অবাস্তব হোক, এটা রসের পর্যায়ে পৌঁছয়নি,' তা হলে আমি চাঁদপানা মুখ করে সেটা সয়ে নিতুম। কারণ এটা রুচির কথা, রসবোধের কথা। আমার আরও পাঁচজন পাঠক-পাঠিকা রয়েছেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, 'না; শহ্‌র্‌-ইয়ার রসসৃষ্টি করেছে।' অতএব এ লড়াই করবেন আমার পাঠকমণ্ডলী। আমি শুক্তি বা ঝিনুক। আমার পেটে জন্মেছে শহ্‌র্‌-ইয়ার মুক্তো। জহুরিরা এর মূল্য বিচার করবেন। ওই অকরুণ পাঠকের মতো কেউ বলবেন, 'এটার মূল্য একটা কানাকড়িও নয়।' আবার কেউ কেউ হয়তো বলবেন, 'না হে না, অত হেনস্তা করো না। মুক্তোটা তো নিতান্ত হাবিজাবি বলে মনে হচ্ছে না।'

এই মতভেদের মাঝখানে দুই পক্ষের কেউই তখন বলবেন না, 'ওই ঝিনুকটাকে ডাকো না কেন? সেই-ই তো এটার জন্ম দিয়েছে। সে-ই বলুক, এটার দাম কত?'

বিচক্ষণ পাঠক, চিন্তা করো, সেই ঝিনুক, যে ইতোমধ্যে মরে দু ফাঁক হয়ে গিয়েছে, তাকে কোন মূর্খ নিয়ে আসবে নিউমার্কেটের জউরি বাজারে, কিংবা আমস্টারডামের মণিমুক্তোর মক্কা-মদীনায়? সে এসে ফাইনাল ফৈসালা করবে, মুক্তোটির মূল্য কী হবে! তাজ্জব কি বাৎ !!

সহজতর উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয়, নেপোলিয়নকে যিনি জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর সে-জননীই কি নেপোলিয়নের সর্বোত্তম জীবনী লেখবার হক ধারণ করেন?

www.pathagar.com

কিন্তু এসব কচকচানি থাক্। যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছিলুম সেইটে নিবেদন করি।

ইয়োরোপের কোনও এক বিখ্যাত নগরে মোকদ্দমা উঠেছে এক চিত্রকরের বিরুদ্ধে। তিনি একটা এক্‌জিবিশনে একাধিক ছবির মধ্যে দিয়েছেন সম্পূর্ণ নগ্না এক যুবতীর চিত্র। পুলিশ মোকদ্দমা করেছে, নগ্না রমণীর চিত্র অশ্লীল, ভালগার, অব্‌সিন, পর্নগ্রাফিক। এ-ধরনের ছবি সর্বজনসমক্ষে প্রদর্শন করা বেআইনি, ক্রিমিনাল অফেন্স।

আদালতের এজলাসে বসেছেন গণ্যমান্য বৃদ্ধ জজসাহেব, এবং জুরি হিসেবে ছ জন সম্মানিত নাগরিক।

এককোণে সেই নগ্না নারীর লাইফ সাইজ তৈলচিত্র। তাবৎ আদালত সেটি দেখতে পাচ্ছে। দুই পক্ষের উকিলদের তর্ক-বিতর্কের মাঝখানে হঠাৎ জজ-সাহেব চিত্রকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি বলছেন, এ ছবিটা অশ্লীল নয়। আচ্ছা, তা হলে অশ্লীল ছবি কাকে বলে সেটা কি এই আদালত তথা জুরি মহোদয়গণকে বুঝিয়ে বলতে পারেন?'

চিত্রকর ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই পারি, হুজুর। তবে অনুগ্রহ্ করে আমাকে মিনিট-দশেক সময় দিলে বাধিত হব।'

জজ-সাহেব বললেন, 'তথাস্তু!'

চিত্রকর তাঁর উকিলের কানে কানে ফিসফিস করে কী বললেন সেটা বাদবাকি আদালত শুনতে পেল না।

সাত-আট মিনিট যেতে-না-যেতেই উকিলের এক ছোকরা কর্মচারী চিত্রকরের হাতে ছবি আঁকার একটা রঙের বাক্স তুলে দিল। চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নগ্না রমণীর ছবির সামনে গিয়ে রঙতুলি দিয়ে এঁকে দিলেন নগ্নার একটি পায়ে সিল্কের একটি মোজা।

জজের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হুজুর, এ ছবিটা এখন হয়ে গেল অশ্লীল!'

তাবৎ আদালত থ। জজ বললেন, 'সেটা কী প্রকারে হল? আপনি তো বরঞ্চ মোজাটি পরিয়ে দিয়ে নগ্নার দেহ কথঞ্চিৎ আবৃত করলেন?'

চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এই কথঞ্চিৎ আবৃত করাতেই দেওয়া হল অশ্লীলতার ইঙ্গিত। এতক্ষণ মেয়েটি ছিল তার স্বাভাবিক, নৈসর্গিক, নেচারেল নগ্নতা নিয়ে— যে নগ্নতা দিয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক নরনারী পশুপক্ষীকে ইহ-সংসারে প্রেরণ করেন। এবারে একটি মোজা পরে মেয়েটা আবরণ দিয়ে অশ্লীল সাজেশন্ দিল তার আবরণহীনতার প্রতি। এখন যদি কেউ এ ছবিটা দেখে মনে করে, কোনও গণিকা তার গ্রাহকদের লম্পট কর্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করার জন্য একটিমাত্র মোজা পরেছে তবে আমি দর্শককে কণামাত্র দোষ দেব না।'

চিত্রকরের বিবৃতিতে সম্মানিত জজ তথা জুরি-মহোদয়গণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কি না, সেকথা আমার মনে নেই, তবে আমার উনিশ বৎসর বয়সে— যে-সময় কিশোর মাত্রেরই হৃদয়ানুভূতি নারী-রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল, কবিগুরু যা অপূর্ব ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রকাশ করেছেন :

'বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে
ছন্দের লাগালো দোল
আধো-জাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার আলোর দ্বন্দ্বে

www.pathagar.com

যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য অসত্যের মাঝে
লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।'

সে বয়সে পূর্বোক্ত চিত্রকর-কাহিনী আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। তার সাত বৎসর পর কিস্মৎ আমাকে নিয়ে গেলেন প্যারিসে। কারও দোষ নেই, আমি স্বেচ্ছায় গেলুম, এ জীবনের প্রথম 'ক্যাবারে' দেখতে।

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আমার সর্বপ্রথমই মনে হয়েছিল, এ কিশোরী যুবতীরা কী অনবদ্য সুন্দর স্বাস্থ্যই না ধরে! সুডৌল পরিপূর্ণ স্তনদ্বয়, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না-মোটা-না-সরু যুগল বাহু, নাতিক্ষীণ কটিচক্র, পুষ্টনধর উরুযুগ এবং দেহের উত্তরার্ধের কুচদ্বয়ের সঙ্গে পরিমাণ রেখে তরঙ্গিত নিতম্বদ্বয়। আমি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে স্বাস্থ্যবতী সাঁওতাল রমণী এবং অন্তত একটি মাস রাজপুতানী দেখেছি। এদের সঙ্গে আমি প্যারিসের 'ক্যাবারিনী'দের সৌন্দর্যের তুলনা করছিনে। আমি করছি স্বাস্থ্যের। সেখানে প্যারিসিনীরা বিজয়িনী।...এবং আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছিলুম। প্যারিসিনীরা যখন নাচছিল তখন তাদের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপেশি নাভিকে কেন্দ্র করে চক্রাধারে ঘুরে যাচ্ছিল। নদীতে যেরকম অতি ক্ষুদ্র দ'য়ের চতুর্দিকে স্রোতের চাপে ঘূর্ণায়মান আবর্ত সৃষ্ট হয়। ঠিক এই অদ্ভুত সৌন্দর্যটি আমি ইতোপূর্বে দেখেছিলাম একমাত্র রাজপুতানায়। সেখানকার কুমারীরা মাথার উপর দুটো-তিনটে জলে-ভর্তি ঘড়া-কলসি চাপিয়ে বাড়ি ফেরে। ওরা তো তখন হাঁটে না। যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে যায়। তাই ওদের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে প্যারিসিয়ান নর্তকীদের মতো সৃষ্ট হয় সেই দ', সেই আবর্ত। অপূর্ব সে দৃশ্য!

নমস্য চিত্রকর নন্দলাল, এই সচল ডাইনামিক চক্রাবর্তন তুলে নিয়েছেন এক অচল স্টাটিক ছবিতে। সেখানে সেই রাজপুতানীর নাভিকুণ্ডলীর দিকে খানিকক্ষণ তাকালেই চোখে ধাঁধা লাগে; মনে হয় নাভির চতুর্দিকে যেন চর্কিবাজি ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।... এই হল সার্থক শিল্পীর কলাদক্ষতা। সচলকে অচলতা দিয়ে, অচলকে সচলতা দিয়ে মূর্তমান করতে পারেন।

কিন্তু এ-বর্ণনা আর বাড়াব না। আমার বক্তব্য বোঝাবার জন্য নিতান্ত যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই নিবেদন করি।

ক্যাবারিনীদের পরনে ছিল উত্তমার্ধে অতি সূক্ষ্ম, প্রায় স্বচ্ছ, শরীরের মাংসের সঙ্গে রঙ-মিলিয়ে চীনাংশুকের গোলাপি ব্রাসিয়ের। অধমার্ধে ছিল কটিসূত্র— সোজা বাংলায় যাকে বলে ঘুনসি। সেই ঘুনসি থেকে নেবে গিয়েছে চার আঙুল চওড়া, ঠিক, আমাদের পালোয়ানদের নেঙট, অবশ্য সাইজে তিনগুণের একগুণ, আকারে ত্রিকোণ, এবং সেটি ঘুরে গিয়ে পিছনের কটিমধ্যে যেখানে ঘুনসির সঙ্গে গিঁঠ খেয়েছে সেখানে সে ঠিক ঘুনসিরই মতো একটি সূক্ষ্ম সূত্ররূপ ধারণ করেছে।

নৃত্যের সর্বশেষ দৃশ্যে ক্যাবারিনীরা তাঁদের ব্রাসিয়ের খুলে খুলে স্টেজের চতুর্দিকে ছুড়ে ছুড়ে ছড়াতে আরম্ভ করলেন।

www.pathagar.com

এস্থলে এসে পাঠক আমাকে লম্পট ভাবুন আর যাই ভাবুন, হক্ কথা বলতে গাফিলি করব না। যা থাকে কুল-কপালে!

এর পর আমি ভেবেছিলুম নর্তকীরা তাদের অধমার্ধের অঙ্গবাসও খুলে ফেলবেন। তা যখন হল না, তখন আমি আমার সঙ্গীকে শুধিয়ে জানতে পারলুম, আইনানুযায়ী স্টেজে সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য বেআইনিভাবে গোপনে সম্পূর্ণ নগ্ননৃত্যের ব্যবস্থার অভাবও প্যারিসে নেই।

এরা যখন নাভির নিচের কাপড়টুকু খুলল না তখনই আমার মনে হল— এবারে পাঠক নিশ্চয় বিস্মিত হবেন— এ নৃত্য এবারে হয়ে গেল অশ্লীল। আমার মনে হল, সেই চিত্রকরের আঁকা একটিমাত্র মোজা অশ্লীলতম ইঙ্গিত দিচ্ছিল, এখানেও হুবহু তাই, বরং বলব অশ্লীলতর, অশ্লীলতম। এরা যদি একেবারে নগ্ন হয়ে যেত তবে এরা সেই চিত্রকরের নগ্ন রমণীর মতো (একটি মোজা পরানোর পূর্বে) হয়ে যেত সরল স্বাভাবিক নৈসর্গিক নেচারেল। এদের সেই একচিলতে দক্ষিণার্ধবাস তখন দিতে লাগল অশ্লীলতম ইঙ্গিত— চিত্রকরের মোজাটির ইঙ্গিত তার তুলনায় কিছু না।

তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এক নেটিভ স্টেটের জনৈক মহারাজা ভাস্কর্যশিল্পের প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তিনি ইয়োরোপ থেকে অনেকগুলো প্রথমশ্রেণির মূর্তির প্লাস্টার-কাস্ট নিয়ে এসে তাঁর জাদুঘরটি সত্যকার দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠান করে তুলেছিলেন। কিছু কিছু মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন— পুরুষ রমণী দুই-ই। একদিন মহারানি গিয়েছেন সেই জাদুঘর দেখতে। তিনি তো শক্‌ড্। হুকুম দিলেন নগ্নমূর্তিগুলোর কোমরে গামছা বেঁধে দিতে! পাঠক ভাবুন, রোমান মূর্তির কোমরে (বাঁধিপোতার?) গামছা! সে কী বেঢপ দেখতে! কিন্তু এহ বাহ্য।... অজ পাড়াগাঁয়ে লোক, সে-শহরে এলে চিড়িয়াখানা এবং এই জাদুঘরটিও দেখতে আসত। এক ছুটির দিনে আমি জাদুঘরের এটা-সেটা দেখছি,— এমন সময় একটি গামছা-পরা মূর্তির সম্মুখে তিনজন গামড়িয়া— চাষাই হবে— আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি গুড়িগুড়ি তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং নিম্নোক্ত সরেস কথোপকথন শুনতে পেলুম।

প্রথম চাষা : 'মূর্তিটার কোমরে গামছা কেন?' (আমি বুঝলুম, ওই অঞ্চলের একাধিক মন্দিরে নগ্নমূর্তি দেখেছে বলে এ-প্রশ্নটা তুলেছে।)

দ্বিতীয় চাষা : 'শুনেছি, মহারানি নাকি ন্যাংটো মূর্তি আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁরই হুকুমে গামছা পরানো হয়েছে।'

পূর্ণ এক মিনিটের নীরবতা। তার পর—

তৃতীয় চাষা : (ফিসফিস করে) 'মহারানির পাপ মন।'

আমার এই অভিজ্ঞতা সমর্থন করেন, ওই জাদুঘরের ধুরন্ধর পণ্ডিত জর্মন উচ্চতম কর্তা! জাদুঘরে গাঁইয়াদের ভিড় লাগলেই তিনি তাঁর একাধিক কর্মচারীকে নিযুক্ত করতেন ওদের পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে ছবিমূর্তি সম্বন্ধে ওদের টীকাটিপ্পনী শুনে তাঁকে রিপোর্ট দিতে।... এ-দেশ ছাড়ার সময় তিনি আমাকে বলেন, 'শহুরেদের তুলনায় এদেশের জনপদবাসীদের সরল স্পর্শকাতরতা অনেক বেশি। এরা যেমন কালীঘাটের পট দেখে আনন্দ পায়, ঠিক তেমনি ইউরোপীয় মডার্ন ছবি দেখেও সুখ পায়। এবং বললে বিশ্বাস করবেন না, গগন ঠাকুরের কিউবিস্ট ছবিও এদেরকে হকচকিয়ে দিতে পারে না। তবে এগুলো সম্বন্ধে মতামত দেবার

www.pathagar.com

পূর্বে— এবং আকছারই লোহার উপর হাতুড়িটি মারে মোক্ষম— অনেকখানি চিন্তা করে তবে বলে। আরও একটা মোস্ট ইন্‌ট্রিসটিঙ এবং ক্যারাকটেরিস্টিক ফ্যাক্ট— এরা থ্রি-ডাইমেনশনাল, রিয়ালিস্টিক, রঙিন ফটোগ্রাফের মতো ছবি বাবদে উদাসীন (যেগুলো শহুরেরা পছন্দ করেন)। এই হল আমার কর্মচারীদের রিপোর্ট।' অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কারণ, হা-হতোস্মি, এই কর্মচারীরা অন্যান্য শহুরেদের মতো পছন্দ করে রঙিন ফটোগ্রাফের মতো ছবি।

আমি শুধালুম 'নিউড?'

হ্যার ডিরেক্টর তাজ্জব মেনে বললেন, 'নিউড? এসব গ্রাম্য লোক সুস্থ স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন করে। উত্তম বলদের সঙ্গে জাতগাভীর সম্বন্ধ করায়। পথেঘাটে কুকুর-বেড়ালের সম্পর্ক দেখে ছেলেবেলা থেকেই। এদের ভিতরে তো কোনও ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। এরা তো শহুরেদের মতো সেক্সস্টার্ভড্ বা পার্ভার্স নয়। এরা ন্যুড দেখে সরলচিত্তে, রস পায় অনাবিল হৃদয়ে।

কী বলতে গিয়ে কী বলে বলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে এলুম! কিন্তু বিচক্ষণ গ্রাম্য পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারবেন আমার এসব আশকথা-পাশকথা আমার মূল বক্তব্যের সখ্‌ৎ বুনিয়াদ নির্মাণ করছে।

তা হলে ফিরে যাই ফের সেই ক্যাবারেতে; বরঞ্চ বলি, ততক্ষণে আমি সখাসহ নৃত্যশালা ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে পড়েছি। আমি প্যুরিটান নই, নটবরও নই। তাই এসব অশ্লীল ইঙ্গিত আমার ভালো লাগে না। ওই জর্মন পণ্ডিতের ভাষায় বলতে গেলে আমি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ স্বাভাবিক জনপদপ্রাণী। তদুপরি আমি বুদ্ধু। আমি চট্ করে উত্তেজিত হইনে, ঝপ্ করে মাটির সঙ্গে মিলিয়েও যাইনে।

রাস্তায় নামার পর সখা বলল, 'তা হলে চলো, পুরোপাক্কা উলঙ্গ নৃত্যে।'

আমি আঁতকে উঠে বললুম, 'সর্বনাশ! সে জায়গার টিকিটের মূল্য তো বিলেতের পঞ্চম জর্জের মুকুটের কূহ্-ই-নূরের চেয়ে খুব কিছু একটা কম হবে না। আমার পকেটে সে-রেস্ত নেই।'

সখা জানতেন আমি বুদ্ধু। তাই শান্তকণ্ঠে বললেন, 'একদম নগ্ননৃত্যের আসরে টিকিটের দাম ঢের ঢের কম। ওগুলো বিলকুল পপুলার নয়।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলুম, যেটি এ-লেখনে আমার একমাত্র বক্তব্য।

সম্পূর্ণ নগ্ননৃত্য তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, নৈসর্গিক নেচারেল জিনিস। সেটা দেখতে যাবে কে? প্যারিসে বেড়াতে আসে সাধারণত বিদেশিরা। তাদের অনেকেই মরবিড্, নপুংসক পার্ভার্স্। তারা, এবং অল্পাধিক ফরাসিরা যায় ওইসব অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ নৃত্যে। তারা তো নেচারেল নগ্ননৃত্য দেখতে চায় না। এইটেই আমার মূল বক্তব্য।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খোস্‌লা অতিষ্ঠ হয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সে-বিবৃতিতে তিনি একটা অশ্লীল ফিল্মের সাতিশয় ভর্ৎসনাপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। যুবক নায়ক যুবতী নায়িকা একটা টিলার সানুদেশে একে অন্যের অতিশয় পাশাপাশি লম্ববান হয়ে গড়গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন এবং একে অন্যের প্রতি কুৎসিততম জঘন্যতম যৌনইঙ্গিত দিচ্ছেন। এটা কেন হল, তার বিশ্লেষণ শ্রীযুত খোস্‌লা করেননি। বোধহয় প্রয়োজন বোধ করেননি।

www.pathagar.com

পাঠকদের সহৃদয় অনুমতি নিয়ে আমি তার বিশ্লেষণ করি।

যেহেতু এ-দেশের ফিল্মে চুম্বন, আলিঙ্গন, নগ্নতা দেখানো বেআইনি তাই ফিল্ম-নির্মাতা রগরগে ছবি বানিয়েছেন যৌন-সম্পর্কের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়ে—হুবহু যেরকম নগ্নাকে মোজা পরিয়ে, কাব্যের নৃত্যের শেষ কটিবস্ত্র উন্মোচন না করে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, চুম্বন নগ্নতার বাধা-নিষেধ যদি আজ তুলে দেওয়া হয় আর্টের খাতিরে (অবশ্যই সেটা কঠিন প্রশ্ন, ফিল্মে আর্ট বলতে আমরা কী বুঝি, এ নিয়ে সুযোগ পেলে পরবর্তীকালে আলোচনা করব), তবে কি আমাদের ফিল্ম-নির্মাতারা সঙ্গে সঙ্গে উদোম নৃত্য আরম্ভ করে তাঁদের ফিল্ম চুম্বনে নগ্নতায় ভরপুর, টইটম্বুর করে দেবেন?

হয়তো গোড়ার দিকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁরা শিগগিরই বুঝে যাবেন যে, সাধারণ দর্শক তিন মিনিটব্যাপী চুম্বন, পাঁচ মিনিটব্যাপী নগ্নতা প্রদর্শন দেখবার জন্য অত্যধিক ব্যাকুল নয়। ঠিক যেরকম পূর্বেই নিবেদন করেছি, প্যারিসের পরিপূর্ণ নগ্ননৃত্য দেখবার জন্য মানুষ হই-হুল্লোড় লাগায় না।

আইন দরকার, ব্যান্-এরও আয়োজন আছে।

কিন্তু মনে রাখা উচিত, কোনও কোনও দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার পরও সেসব দেশে খুনের সংখ্যা বেড়ে যায়নি।

হালে ডেনমার্কে সর্বপ্রকার অশ্লীল 'সাহিত্যের' উপরকার ব্যান্ তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে কোথায় না অশ্লীল সাহিত্যের বিক্রি হুশ হুশ করে বেড়ে যাবে, রাম— ব্যাপারটা উল্টো বুঝেছেন। অশ্লীল মালের পাবলিশাররা মাথায় হাত দিয়ে ফুটপাতে বসে গেছেন। তাঁদের বিক্রি শতকরা ৭০ ভাগ কমে গেছে। কারণ মানুষের লোভ নিষিদ্ধ ফলের প্রতি। ইংরেজিতে প্রবাদ : A stolen kiss is sweeter than any other.

এ বাবদে শেষ আপ্তবাক্য বলেছেন একটি সুরসিকা ফরাসি মহিলা। আমেরিকায় তখন লরেন্স মহাশয়ের লেডি চ্যাটারলি পুস্তক অশ্লীল কি না, সেই নিয়ে মোকদ্দমা চলছে। লেডি চ্যাটারলি পক্ষের উকিল ('লেডি চ্যাটারলির লাভার' না, 'লেডি চ্যাটারলির লয়ার') হুতাশনসদৃশ প্রজ্বলিত ভাষায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করে অনুপ্রেরণিত কণ্ঠে বললেন, 'লেখকরাজ লরেন্স এই পুস্তক দ্বারা যৌন-সম্পর্ককে অকল্পনীয় স্বর্গীয় স্তরে (স্পিরিচুয়াল লেভেলে) তুলে ধরেছেন।'

এই বিবৃতিটি পড়ে সেই ফরাসি মহিলাটি একটু দুষ্টুহাসি হেসে বললেন, 'সর্বনাশ। এখন তা হলে যৌন-সম্পর্কের অর্ধেক আনন্দই মাঠে মারা গেল। আমি তো অ্যাদ্দিন জানতুম, এটা পাপাচার!'

মরহুম অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হাই
(আল্লার পদপ্রান্তে)

এ লেখাটি আমাকে লিখতে হবে, এবং আজই লিখতে হবে। অথচ অন্তর্যামী জানেন, এটি লিখতে গিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে আমার অক্ষম লেখনী কতখানি পর্যুদস্ত হচ্ছে। ভাবাবেগে

www.pathagar.com

আমি এমনই মতিচ্ছন্ন যে অনেক কিছু একসঙ্গে বলতে চাই, এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারি না।

সরল পাঠক ভাবে, সাহিত্যিকের ভাবনা কী? ভাষা তার আয়ত্তে, বেদনা হোক, আনন্দ হোক, সে সবকিছুই সহজ সরলতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে। কথাটা ভুল নয়। কিন্তু এ বিষয়ে মাত্র একটি ব্যত্যয় আছে।

উপস্থিত আমার কথা ভুলে যান। সার্থক সাহিত্যিকদের কথাই বলব।

তাঁরা কল্পনারাজ্যে বিচরণ করে যুবক-যুবতীর মধ্যে বিরহ ঘটান, বিধবার একমাত্র শিশুপুত্রের মৃত্যু ঘটান এবং এগুলোর চেয়েও নিদারুণতর ট্র্যাজেডি নির্মাণ করেন। তার পর অতিশয় সহানুভূতিপূর্ণ স্পর্শকাতর হৃদয় দিয়ে বিরহকাতরা যুবতীকে, পুত্রহীনা বিধবাকে কখনও যুক্তি, কখনও অনুভূতির মারফতে সান্ত্বনা জানান।

এসব কল্পনারাজ্যের কথা।

কিন্তু যখন সার্থক সাহিত্যিকের আপন জীবনে নিদারুণ শোক আসে তখন তিনি কী করেন? তখন তাঁর অবস্থা হয় সত্যই শোচনীয়। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিই। আমার চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের বড় জনৈক যশস্বী লেখক একদিন ঢুকলেন আমার ঘরে কাঁদতে কাঁদতে। আমি কোনওকিছু বলার পূর্বেই তিনি বললেন, 'ভাই আমার ছোট মেয়ে মাধবী কাল বিধবা হয়েছে। লক্ষ্ণৌ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। তুমি ভাই, আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দাও। আমি কী লিখব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি নে।'

সেইদিনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, ব্যক্তিগত বেদনায় সাহিত্যিক কী নিদারুণ অসহায়। অপরের বেদনা সে দূর থেকে দেখে কিছুদিন ধরে সেটাকে মনের ভিতর থিতোয় এবং বেশ কিছুদিন পর সেটাকে সাহিত্যরূপে প্রকাশ করে। কিন্তু নিজের বেলায়? হায়, সে অসহায়। এবং সাধারণ 'অসাহিত্যিক' জনের চেয়েও সে নিরুপায়। সাধারণ 'অসাহিত্যিক'-জন তখন বিধবা কন্যাকে সাদামাটা চিঠি লিখে সান্ত্বনা জানায়। মেয়েও সে চিঠি বুকে চেপে কাঁদে, সান্ত্বনা পায়।

কিন্তু সার্থক সাহিত্যিক? সে তো অনেক বেশি স্পর্শকাতর। এরকম সাদামাটা চিঠি সে তো লিখতে পারে না। তার তো সে অভ্যাস নেই।

সার্থক যশস্বী সাহিত্য-নির্মাতার যদি এই বিপাক হয়, তবে আমার মতো অতিশয় সাধারণ লেখকের কথা চিন্তা করুন।

আমি যে কী মতিচ্ছন্ন সেটি রচনারম্ভেই নিবেদন করেছি।

ভোরবেলা আমার এক চেলা ঘরে ঢুকল, 'আনন্দবাজার' হাতে নিয়ে প্রায়ই আসে। আপন মনে খবরের কাগজ পড়ে।

আজ শুধোল, 'আপনি তো বাঙাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের জোর লড়নেওলা অধ্যাপক আব্দুল হাইকে আপনি চিনতেন?'

আমি বললুম, 'চিনতুম মানে? এখনও চিনি। আমার চেয়ে বছর পনরো ছোট। তা হলে কী হয়! লোকটা অসাধারণ পণ্ডিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সাহিত্যরসে কী সুন্দর স্পর্শকাতরতা। তদুপরি, তুমি যা বললে, ভাষা আন্দোলনে জোর লড়নেওলা, আমার বন্ধু—'

www.pathagar.com

চেলা আমাকে আনন্দবাজার এগিয়ে দিল। তাতে দেখি আব্দুল হাইয়ের ছবি এবং নিচে লেখা :

'ঢাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে ডক্টর হাই-এর মৃত্যু।'

ভাষা ও ধ্বনিবিদ্ বলতে শেষ পর্যন্ত বিধাতার কৃপায় বেঁচে রইলেন পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মৌলানা মহম্মদ শহীদুল্লাহ। এঁরা উভয়েই পশ্চিম বাংলার কৃতী সন্তান।

দেশবিভাগের ফলে একজন রইলেন কলকাতায়, অন্যজন ঢাকায়। যেন গঙ্গার একভাগ জল এল ভাগীরথী দিয়ে, অন্য হিস্যার পানি চলে গেল পদ্মা দিয়ে পাকিস্তান। তার পর এই বাইশ বৎসর ধরে বিস্তর পানি জল[১] দুধারা দিয়ে বয়ে গেল।

ইতোমধ্যে শ্রীযুত চাটুয্যের ওপর নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কাজের চাপ পড়ল। বয়সও হয়েছে। কাজেই তাঁর প্রাণে যে কামনা— ভাষাতত্ত্বের চর্চা— তার জন্য হাতে সময় থাকে অল্পই। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, শব্দতত্ত্বে জ্ঞানার্থীজনকে তিনি সদাসর্বদা পথনির্দেশ করে দেন। ভরতনাট্যেও বলে, একটা বিশেষ বয়সের পর তুমি আর নৃত্যগীত করবে না, তোমার শিষ্যশিষ্যাদের দেহ দিয়ে তোমার নৃত্যকলা দেখাবে।

ওদিকে, ওপারে ঘটল আরও মর্মন্তুদ ঘটনা। মৌলানা শহীদুল্লাহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বৎসর দুই পূর্বে আচম্বিতে শয্যা নিলেন[২]— বহু কাজ অসম্পূর্ণ রেখে। গত বৎসর যখন তাঁকে ঢাকা হাসপাতালে সেলাম দিতে যাই তখন তিনি আমাকে চিনতে পারলেন, অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে— যদ্যপি আমাদের পরিচয় গত অর্ধ শতাব্দী ধরে।

উভয় বাংলাতে আমরা সকলেই আশা করেছিলুম, আব্দুল হাই একদিন শহীদুল্লাহর আসন গ্রহণ করবেন। আমি কোনও সরকারি, বেসরকারি উচ্চপদের কথা ভাবছি না। আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল একদিন তাঁর গবেষণা আরও বিস্তৃত সুপরিচিত হবে, তাঁর পথনির্দেশ গৌড়জনকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

কিস্মৎ, কিস্মৎ— সবই কিস্মৎ! একটি সামান্য উদাহরণ দি :

'হাই' শব্দের অর্থ জীবন্ত প্রাণবন্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জাগ্রত ভগবান'। আব্দুল হাই শব্দদ্বয়ের অর্থ তাই 'জাগ্রত (জীবন্ত) ভগবানের (অনুগত) দাস।'

যিনি তার নামকরণ করেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই আশা পোষণ করেছিলেন এ শিশু যেন অতি, অতিশয় দীর্ঘজীবী হয়।

---

১. জলপানি বললুম না, তার অর্থ ভিন্ন। বস্তুত আমি 'পানি' শব্দের দুশমন নই। অতি অবশ্যই আমি 'জল-পাঁড়ে' নামক কাল্পনিক সমাস ব্যবহার করব না। পক্ষান্তরে জমজমের জল না বলে জমজমের পানি বলাই ভালো। 'গঙ্গা পানি' কানে খারাপ শোনায়। কিন্তু সেও না হয় সয়ে নিলুম। মুশকিল হবে 'জলপানি' নিয়ে। কেউ 'জলপানি' পেলে সে কি 'পানি-পানি' পায়? যদিও সে খুশিতে পানি পানি হতে পারে, তার জান ত-র্-র্-র্ হতে পারে।

২. তবে ইনি এখনও সম্পূর্ণ অচল নন। এবং তাঁর গুণগ্রাহী তথা শিষ্যজনকে সানন্দে জানাই তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন একটি তরুণ ডাক্তার— চট্টগ্রামের চিরঞ্জীব বড়ুয়া। মানুষ বুঝি পিতাকেও অতখানি সেবা করে না।

www.pathagar.com

সে চলে গেল পঞ্চাশে। যাঁরা তাঁকে চিনতেন না, তাঁরা হয়তো ভাবলেন, পঞ্চাশ তো খুব অল্প বয়স নয়। কিন্তু আমার মতো তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ-পরিচয়ে সোনার সৌভাগ্য যাঁদেরই হয়েছিল তাঁরাই শুধু জানেন পঞ্চাশেও এই লোকটি ছিলেন কী অসাধারণ প্রাণবন্ত ('হাই',) বিদ্যাচর্চা রসগ্রহণে সদাজাগ্রত এমনকি মূর্তমান 'চাঞ্চল্য' বললেও অত্যুক্তি হয় না— অবশ্য সদর্থে। এঁরা সকলেই একবাক্যে বলবেন, আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুর মতো অকালমৃত্যু— এ শোক বিধাতা যেন দয়া করে আমাদের অত্যধিক না দেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনে যখন এক নবীন ভুবনে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর মৃত্যু হয়। আব্দুল হাই যখন জ্ঞানান্বেষণে এক নতুন জগতের সম্মুখীন তখন তাঁর মৃত্যু হল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের গুরু। আজ শুধু আব্দুল হাইয়ের গুরুই তাঁর সম্বন্ধে সার্থক সর্বাঙ্গসুন্দর প্রশস্তি রচনা করতে পারবেন।

তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়, আমি, আমরা শুধু আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারি।

আব্দুল হাইয়ের চরিত্রের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য আমি এস্থলে নিবেদন করি। তার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই বলে হয়তো আব্দুল হাইয়ের চরিত্রের এ মহান্ দিকটা অধিকাংশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। অতি সংক্ষেপে নিবেদন করি।

এ বঙ্গে আমাদের চেয়েও বেশি যদি আজ কেউ প্রিয়বিয়োগ-কাতর হয়ে থাকেন তবে তিনি— যদিও আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, তবু তাঁর অবস্থার কিছুটা অনুমান করতে পারি— ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ (ট্রিপল) ডি-লিট (ক্যাল), রিপন, হুগলি মহসিন, কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, কিন্তু বহুকাল ধরে এদেশবাসী।

অধুনা তাঁর একখানি অভিধান— 'বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দ'— ডক্টর আব্দুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন। পূর্বতন 'পঞ্চতন্ত্র'-এ আমি এ-গ্রন্থের উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমার কথা থাক। এ অভিধান প্রকাশ করার সময় আব্দুল হাই একটি ক্ষুদ্র 'ভূমিকা' লেখেন। তার থেকে আমি কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি।

হাই সাহেব ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে লিখছেন : 'কয়েক বছর পূর্বে ডক্টর সুকুমার সেন *সাহিত্য পত্রিকায়* (এ পত্রিকাটি অধ্যক্ষ আব্দুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমৃত্যু সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন) প্রকাশের জন্য ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পালের 'বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দ সঙ্কলন' নামে একটি প্রবন্ধ আমাকে পাঠিয়ে দেন। ডক্টর পালের এ প্রবন্ধটি আমি ১৯৬৮ সালের শীত সংখ্যা *সাহিত্য পত্রিকায়* সানন্দে প্রকাশ করি এবং যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে অভিধান আকারে এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাই।

ডক্টর পাল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা পূর্ব পাকিস্তানে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত ছিল কিন্তু অদৃষ্টচক্রে তিনি সীমান্তপারে বসবাস করছেন।[৩] তা হলেও তিনি মুসলিম জীবন ও সংস্কৃতিমূলক সাধনাতেই নিজেকে নিয়োজিত

৩. আব্দুল হাই মুর্শিদাবাদের লোক। 'অদৃষ্টচক্রে' তাঁকেও 'সীমান্তপারে' বসবাস করতে হল। তাই সমদুখীজনব্যথিতবেদন অনুভব করার মতো অভিজ্ঞতা ও স্পর্শকাতরতা ছিল। তাঁর আপন দুঃখ তিনি ডক্টর পালের মারফত প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

রেখেছেন। মধ্যযুগ থেকে এ কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার দেখিয়ে এ বিরাট সংকলন গ্রন্থটি প্রণয়ন করে ডক্টর পাল বাংলা-ভাষী সকলকে এবং বিশেষভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথমে 'সাহিত্য পত্রিকায়' ও পরে পুস্তকাকারে তাঁর এ মূল্যবান গবেষণামূলক সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করে বাঙালি সুধী সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আজ সত্যিই আনন্দিত।

মুহম্মদ আব্দুল হাই
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ

আমি শুধু এইটুকুই নিবেদন করতে পেরেছিলুম, পণ্ডিত আব্দুল হাই নিজে, তো জ্ঞানচর্চা করেছেনই, কিন্তু তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি উৎসাহ দিয়েছেন অন্যজনকে— শুধু পূর্ববঙ্গে নয়, এ বঙ্গেও।

আর, আজ যেসব যুবক জ্ঞানচর্চা গবেষণা করতে গিয়ে নানাবিধ অন্যায় অসত্য, মনুষ্যকৃত স্বার্থপ্রণোদিত নীচ-হীন প্রতিবন্ধকের সম্মুখে পদে পদে বিড়ম্বিত হচ্ছে তারা অন্তত এই ব্যত্যয়টি, উৎসাহদাতা আব্দুল হাইয়ের এই চরিত্রমূল্যটি মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করবে। আমেন।

সিংহ-মূষিক কাহিনী

চল্লিশ বৎসর বয়সের ঘাটের থেকে যৌবনতরী বিদায় দেওয়ার পরও কখনও আশা করতে পারিনি, স্বপ্নেও সে আকাশ-কুসুম চয়ন করতে পারিনি যে এ অধমের জীবদ্দশাতেই স্বরাজ আসবে, স্বাধীন জীবন কাকে বলে তা এই চর্মচোখেই দেখে যেতে পারব।

কিন্তু প্রভু যখন দেন, তিনি তখন চাল-ছাত চৌচির করে ঐশ্বর্য-বৈভব (নিয়ামৎ গণীমৎ) ঢেলে দেন। হঠাৎ একদিন হুড়মুড়িয়ে স্বরাজ এসে উপস্থিত— বন্যার প্লাবনের মতো। ফলে আমরা সবাই যে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে ভেসে গেলুম এবং এখনও এমনই যাচ্ছি যে তার দিক্‌চক্রবালও দেখতে পাচ্ছিনে। আমি ইচ্ছে করেই এই অতিশয় প্রাচীন, সাদামাটা তুলনাটি পেশ করলুম, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুলনা তিন ঠ্যাঙের উপর ভর করে দাঁড়ায়, কিন্তু এস্থলে তুল্য ও তুলনীয় এমনই টায়-টায় মিলে গেছে— স্বরাজ এবং বন্যা, যে এটি সত্যি চার ঠ্যাঙের উপর দাঁড়িয়েছে। তুলনাটি যে কীরকম মোক্ষম ড্রেনপাইপ পাতলুনের মতো টাইটফিট তার আরেকটি নিদর্শন দিই। এই প্রলয়জলধিতে যেসব কর্তাব্যক্তিরা নৌকো ভেলা পেয়ে গেলেন তাঁরা বানে ভেসে-যাওয়া বেওয়ারিশ মাল (দেশের সম্পদ, 'কোম্পানি কা মাল', যদি বেওয়ারিশ না হয় তবে বেওয়ারিশ আর কারে কয়!) আঁকশি দিয়ে ধরে ধরে আপনআপন ভল্টে বোঝাই করলেন। এখানে আরও একটা মিল রয়েছে— অবশ্যই স্বীকার

www.pathagar.com

করতে হবে, গুটিকয়েক অ্যাড্ভরি ইয়ং টার্ক-এর 'অবিমৃষ্যকারিতা'র ফলে ব্যাঙ্ক ভল্ট বাবদে এমনসব ব্যবস্থা নেওয়া হল যে সেগুলো সেই বানের জলে উৎক্ষিপ্ত-প্রক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে ভেসে চলেছে। কোন কূলে ভিড়বে— আমরা তো অনুমান করতে পারছিনে। তবে মাভৈঃ! এসব ঘড়েল কুমিরগুষ্টি যখন জলের অতল থেকে নির্বিচারে অবলা কুমারী থেকে গোবর-গামার ঠ্যাং কামড়ে ধরে বহ্বান্ন ভক্ষণ করতে পারেন, তখন এইসব বেওয়ারিশ প্রাণহীন ভল্ট কামড়ে ধরে সেগুলোকে নদীর অর্ধনিমজ্জিত গহ্বরে নিয়ে যাওয়া তো এঁদের কাছে শনির অপরাহ্নের পিকনিকের মতো নির্দোষ সহজ সরল, কিংবা বলতে পারেন অত্যাবশ্যকীয় 'রাজকার্যে'র অনুরোধ হাওয়াই দ্বীপে বসন্তযাপন অথবা শীতে মন্তে কার্লো ভ্রমণ।

সন্দেহপিচেশ পাঠক হয়তো ভাবছ, আমি নিজে সেই হালুয়ার কোনও হিস্যে পাইনি বলে বন্ধ্যা রমণীর ন্যায় শতপুত্রবতীদের অভিসম্পাত দিচ্ছি। মোটেই না। আমার কপালেও ছিটেফোঁটা জুটেছে! ইরানের প্রখ্যাত কবি মৌলানা শেখ সাদি বলেছেন, 'ইহ-সংসারে মহাজন ব্যক্তি মাত্রই (সাদি গুণীজ্ঞানী অর্থে বলেছেন এস্থলে কিন্তু আপনাকে যখ সম্প্রদায়ের বেনেদের কথা ভাবতে হবে) যেন আতরের ব্যবসা করেন। তোমাকে মিন-পয়সায় আতর না দিলেও তাবৎ আতরের বাক্সে ডবল তালা মেরে বন্ধ রাখলেও বাড়িময় যে আতরের খুশবাই ম-ম করছে এবং তোমার নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করছে, সেটা ঠেকাবেন কী প্রকারে?' এস্থলেও তাই। এ মহাজনরা যদ্যপি বাইশ বৎসর ধনদৌলত ভরা গোটা আষ্টেক লোহার সিন্দুকের উপর ডবল ডানলোপিলোতে বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছেন তথাপি এগুলো বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে এঁদের খুলতে হয় তখন পাকা বেল ফেটে গিয়ে যে কাককুল প্রবাদানুযায়ী এ রস থেকে বঞ্চিত তারাও তার হিস্যে পেয়ে যায়।

এই ধরুন কিছুদিন আগেকার কথা। এক টাকার-কুমিরের উচ্চাশা হয়েছে তিনি সমাজেও যেন গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে উচ্চাসন লাভ করেন। হঠাৎ একদিন আমার কুটিরের সম্মুখে এসে দাঁড়াল এক বিরাট মোটরগাড়ি। তার দৈর্ঘ্য এমনই যে সেটার ন্যাজামুড়ো করতে হলে হঠাৎ পিছনের লাগেজ কেরিয়ার থেকে সম্মুখের বনেটের নাক অবধি— সেখানে পদাধিকারলব্ধ পতাকা পৎ পৎ করে, এঁর গাড়িতে অবশ্য পতাকা ছিল না— যেতে হলে আরেকটা মোটরগাড়ি ভাড়া করতে হয়! তা সে যাই হোক, যাই থাক, যেই যক্ষ (অবশ্য ইনি কালিদাসের একদারনিষ্ঠ বিরহী যক্ষ নন— এঁর নাকি ভূমিতে আনন্দ; থাক 'শঙ্করে'র চৌরঙ্গী পশ্য) এসে এই অধমকে আলিঙ্গন করে একখানা চেয়ারে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন।

নিম্নলিখিত রসালাপ হল :

যক্ষ ॥ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়াতে বড় আনন্দিত হলুম। আমি বহুকাল ধরে আপনার একনিষ্ঠ পাঠক। আপনার 'অগ্নিবীণা' আপনার 'বিদ্রোহী' উপন্যাস আমি পড়েছি, কতবার পড়েছি বলে শেষ করতে পরব না। ওহ্। কী করুণ, কী মধুর!

হরি হে, তুমিই সত্য।

আমি ॥ (মনে মনে) সর্বনাশ! ইনি আমাকে কবিবর নজরুল ইসলামের সঙ্গে গোবলেট করে ফেলেছেন! যে ভুল পাঠশালার ছোকরাও যদি করে তবে সে খাবে ইস্কুলের বাদবাকি পড়ুয়াদের কাছে বেধড়ক প্যাঁদানি। তদুপরি যক্ষবর বলছেন, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নাকি উপন্যাস এবং সেটি নাকি বড়ই করুণ আর মধুর! এস্থলে আমি করি কী! যে ব্যক্তি গাধাকে

www.pathagar.com

(এস্থলে আমি) দেখে বলে এটা রেসের ঘোড়া (এস্থলে কাজী কবি— কবি-পরিবার যেন অপরাধ না নেন, আমি নিছক রূপকার্থে নিবেদন করছি) সে ব্যক্তি গাধাকে তো চেনেই না, ঘোড়াকেও চেনে না। ইতোমধ্যে পুনরপি,

যক্ষ ॥ (স্মিতহাস্য করে) আপনার বড় ভাই সৈয়দ মুস্তাফা শিরাজ— ওই যিনি তালতলার খ্যাতনামা পুস্তক প্রকাশক— তিনিও আমার ছোট ভাইয়ের কাছে প্রায়ই আসেন। বড় অমায়িক বৃদ্ধ। শুনেছি আমাদের বাড়ির পাশেই তাঁর বিরাট তেতলা বাড়ি।

হরি হে, তুমিই সত্য! তুমিই সত্য!

আমি ॥ (মনে মনে) এই আমার জীবন সর্বপ্রথম আমার পিরামিড-দৃঢ় হরিভক্তিতে চিড় ধরল। হরি যদি সত্যই হবেন তবে তাঁকে সাক্ষী রেখে এই লোকটা মিথ্যার জাহাজ বোঝাই করে যাচ্ছে আর তিনি টুঁ ফুঁ করছেন না, এটা কী প্রকারে হয়? ওদিকে শিরাজ মিঞা খাঁটি বিদগ্ধ রাঢ়ের ঘটি, আর আমি সিলট্যা খাজা বাঙাল। ওঁর সঙ্গে আমার কোনও আত্মীয়তা নেই— থাকলে নিশ্চয়ই শ্লাঘা অনুভব করতুম। অবশ্য আমরা সবাই আদমের সন্তান; সে হিসেবে তিনি আমার আত্মীয়। তদুপরি বেচারি পুস্তক প্রকাশক নয়, ঢাউস বাড়িও তাঁর নেই, যদ্দুর জানি আমারই মতো দিন-আনি-দিন-খাই চাকরিতে পুরো-পাক্কা-পার্মানেন্ট। এবং বাচ্চা শিরাজ— যে আমার পুত্রের বয়সী— সে নাকি আমার অগ্রজ এবং বৃদ্ধ! বৃদ্ধ! বুঝুন ঠ্যালা। আশা করি এ লেখন বাবাজির গোচর হলে তিনিও সব্যসাচীর ন্যায় আমাকে মাফ করে দেবেন। ইতোমধ্যে পুনরপি,

যক্ষ ॥ (তাঁর দেওয়া 'বিবিধ-ভারতী'র মতো বিবিধ সংবাদ যে আমাকে একদম হতবাক করে দিয়েছে সেইটে উপলব্ধি করে, পরম পরিতোষ সহকারে) আচ্ছা, আপনি কি শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করেছিলেন?

আমি ॥ (মনে মনে, যাক্ মিথ্যের জাহাজ সত্যের চড়াতে এসে কিছুটা ঠেকেছে) আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে বিশেষ ফলোদয় হয়নি সে তো দেখতেই পাচ্ছেন।

— আহা কী যে বলেন! আচ্ছা, আপনার হাতের লেখা নাকি রবিঠাকুরের মতো?

— অনুকরণ করেছিলুম। সে সুন্দর লেখার কাছে আমার লেখা কি কস্মিনকালেও পৌঁছতে পারে?

— আচ্ছা, কিন্তু আপনি নাকি হুবহু তাঁর নাম সই করতে পারেন? একবার নাকি তাঁর নাম সই করে ভুয়ো নোটিশ মারফত আশ্রমকে একদিনের ছুটি দেন! পরে নাকি আপনি নিজেই সেটা ফাঁস করে দেন?

আমি 'কীর্তিটি' অস্বীকার করলুম না। কিন্তু যক্ষরাজ কোনদিকে নল চালাচ্ছেন সেঁটে বসে, তখনও বুঝিনি। জানালা-দরজার দিকে ঘুরে এবারে চেয়ার ছেড়ে তক্তপোশে আমার গা সেঁটে বসে, জানালা দরজার দিকে ঘোর সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ফিসফিস করে আমার কানে কানে বললেন, বাবু, তোমার হাল তো দেখতে পাচ্ছি। তোমার দু-পয়সা হবে : আমারও ফায়দা হবে। কিন্তু কাককোকিল পোকাপরিন্দায়ও যেন জানতে না পায়।

আমার প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের একখানা সার্টিফিকেট। আমি যে তাঁর জীবিতাবস্থায় গোপনে গোপনে দেশসেবা, পলিটিক্যাল কাজ এবং বিশ্বভারতীকে সাহায্য করছিলুম সেই

www.pathagar.com

মর্মে একখানা চিঠি। শেষ বয়েসে তাঁর প্রায় সব চিঠিই ইংরেজিতে টাইপ হতো, তিনি শুধুমাত্র সই করে দিতেন।

আপনাকে কিচ্ছুটি করতে হবে না। আমি সেই জরাজীর্ণ টাইপরাইটার মেলা জাঙ্কের সঙ্গে নিলামে কিনেছি, অবশ্যই দালাল মারফত। আমার কপাল ভালো। ওইসব হাবিজাবির ভিতর তাঁর প্রাচীন দিনের একগুচ্ছা লেটারহেড সমেত হলদে ফ্যাকাসে নোটপেপারও পেয়ে গিয়েছি। টাইপরাইটারটা সযত্নে মেরামত করেছি। এখন এটা ঠিক ১৯৩৮/৩৯/৪১-এর মতোই ছাপা ফোটায়। আমি পাকা লোককে দিয়ে সার্টিফিকেটের মুশাবিদা করাব, টাইপ করাব। তার পর কবির দস্তখতটি হয়ে গেলে দলিলটি রেখে দেব আঁকাড়া চালের বস্তার ভিতর। ব্যস! আর দেখতে হবে না। টাইপের কালি, দস্তখতের কালি সব ম্যাটমেটে মেরে গিয়ে ১৯৪১ সালের চেহারা নিয়ে বেরুবে সেই খানদানি চেহারা নিয়ে।

এই চূড়ান্তে পৌঁছে যক্ষ হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন।

সাংসারিক বুদ্ধি আমার ঘটে আছে, এহেন অপবাদ যেসব পাওনাদারদের আমি নিত্যি নিত্যি ফাঁকি দিয়ে অদ্যাবধি বেঁচেবর্তে আছি তাঁরাও বলবেন না। তৎসত্ত্বে এ নাটকের শেষাঙ্কে আমি যেন অকস্মাৎ অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি প্রসাদাৎ কৃষ্ণাবতারের বিশ্বরূপ দেখতে পেলুম।

'সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট!' অর্থাৎ পূর্বোক্ত দলিলে আমাকে জাল করতে হবে কবির সিগনেচর, স্বাক্ষর, দস্তখত। দস্ত্ কথা শব্দটির অর্থ হাত (যার থেকে দস্তানা এসেছে); আমাকে দস্তখত করতে হবে না, করতে হবে দস্তক্ষত— অর্থাৎ জাল করে হাতে ক্ষত আনতে হবে।

আমার মুখে কোনও কথা যোগাল না।

যক্ষ বললেন, আপনার দক্ষিণা কী পরিমাণ হবে?

আমার মাথায় তখন নলরাজদেহনির্গত কলি ঢুকেছে, অর্থাৎ দুষ্টবুদ্ধি চেপেছে। দেখিই না, শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।

ব্রীড়াময়ী কুমারীর মতো— কিংবা ধোওয়া তুলসীপাতাটির মতোও বলতে পারেন— ক্ষিতিতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিবেদন করলুম, আপনি বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে না তাকিয়েই অনুভব করলুম যক্ষের সর্বাঙ্গে শিহরণ রোমাঞ্চন উত্তাল তরঙ্গ তুলেছে। এত সহজে যে নিরীহ একটা লেখক এহেন ফেরেব্বাজিতে রাজি হবে, এ দুরাশা তিনি আদপেই করেননি। ভেবেছিলেন আমাকে বহুৎ ডলাইমলাই করতে হবে। সোল্লাসে বললেন, পাঁচশো।

আমি তুলসীপাতার কোমল রূপটি সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করে সুতীক্ষ্ণ তালপাতার আকার ধারণ করে বললুম, আপনি কি ছাগীর দরে হাতি কিনতে চান? তার চাইতে যান না যে কোনও আদালতের সামনে বটতলায়। পাক্কা জালিয়াত পাঁচটি টাকায় ওই কর্মটি করে দেবে!

আমার চাই পাঁচ হাজার।

আমি বেশ বুঝে গিয়েছিলুম, যক্ষ প্রফেশনাল জালিয়াতের কাছে যেতে চান না। সেটা মোস্ট ডেনজরস্।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে এই প্রথম তাঁর পরিপূর্ণ সপ্রতিভ ভাব কেটে গিয়ে তিনি হয়ে গেছেন স্তম্ভিত হতভম্ব। কিছুক্ষণ পরে রাম ইডিয়টের মতো বিড়বিড় করে বললেন, পাঁচ হাজার?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, বড়বাজারের নাপিতকে দিয়ে আপনার কান সাফ করাতে হবে না। ঠিকই শুনেছেন।

অতঃপর গৃহমধ্যে সূচিভেদ্য নৈস্তব্ধ্য।

খানিকক্ষণ পর আমিই বললুম, আপনি বাড়ি গিয়ে চিন্তা করুন, স্লিপ ওভার ইট। আমিও তাই করব।

আমি জানতুম, এসব ঘড়েলদের সবচেয়ে বড় গুণ এদের ধৈর্য। তাই এই ধৈর্য কাজে লাগাবার ফুরসত-মোকা পেলেই এরা সোল্লাসে রাজি হয়। ধৈর্য দ্বারা ঘষতে ঘষতে এরা অন্যপক্ষের প্রস্তরও ক্ষয় করতে পারে।

আর আমারও তো কোনও স্টক নেই। এদের ধৈর্য যদি অফুরন্ত হয়, তবে আমার ধৈর্য অনন্ত। দেখাই যাক না, শ্রাদ্ধ কদ্দুর গড়ায়!

তাই গোড়াতেই বলছিলুম আমাদের মতো নগণ্যগণও এসব ছিটেফোঁটার সুযোগ পায়, কিন্তু হায়, যার অদৃষ্টে অর্থ নেই তার কপালে স্বয়ং মা-লক্ষ্মী ঠাকুরানিও ফোঁটা আঁকতে এলে সে মূর্খ তখন যায় নদীতীরে, কপাল ধুতে! ফিরে এসে দেখে, লক্ষ্মী অন্তর্ধান করেছেন। তাই তাঁর নাম চপলা!

রাবাৎ— ইনসল্ট

প্রখ্যাত লেখক রেমার্ক-এর উপন্যাস 'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ (অল কোআএট্)'-এর এক জায়গায় আলোচনা হচ্ছে কয়েকজন নিতান্ত সাধারণ সেপাইয়ের মধ্যে। ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে প্রতিবেদন নিবেদন করছি। একজন সেপাই শুধোলে, 'লড়াই লাগে কেন?' আরেকজন বলল, 'দূর বোকা! এক দেশ আরেক দেশকে অপমান করে। তখন লাগে লড়াই।' প্রথম সেপাই তখন বলল, 'কিন্তু আমি তো মোটেই অপমানিত বোধ করছিনে। যারা করছে তারা প্রাণভরে লড়ুক। আমাকে আমার বাড়ি, ক্ষেতখামারে ফিরে যেতে দেয় না কেন?'

রাবাৎ সম্মেলনে নাকি ভারতবর্ষ ইন্‌সল্টেড হয়েছেন। কই, আমি তো মোটেই অপমানিত বোধ করছিনে। তদুপরি আরেকটি তত্ত্ব এস্থলে আমার স্মরণে আসে। আমার বাল্যবয়সে আমার এক গুরুজনের সামনে বাইরের এক ব্যক্তি আমাকে অযথা কড়া কড়া কথা শোনায়। আমি তখন চটে গিয়ে বলি, 'আমাকে অপমান করছেন কেন?' সে ব্যক্তি কোনও উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমার সেই মুরুব্বি তখন বলেন, 'ওই তো করলে ব্যাকরণে— প্রোতোকলে— ভুল। তুমি স্বীকার করে নিলে তুমি অপমানিত হয়েছ। তার পর যে অপমান করেছে সে মাফ না চেয়ে চলে গেল। তুমি রয়ে গেলে অপমানিত। সুতরাং কক্খনও নিজের মুখে মেনে নিতে নেই, 'আমি অপমানিত হয়েছি।' নিতান্তই যদি তখন তোমাকে কিছু বলতে

www.pathagar.com

হয়, তবে বলবে, 'আপনি এরকম অভদ্র আচরণ করছেন কেন?' দোষটা চাপাবে তার ঘাড়ে। এবং আরও নিতান্তই যদি অপমান বোধ করে থাক তবে সেটা জোর গলায় স্বীকার না করে, চুপসে সেটা হজম করে নেবে এবং তক্কে তক্কে থাকবে কখন ব্যাটার ওপর মোক্ষম দাদ তুলতে পারবে— যদ্যপি আল্লাতালার আদেশ সব্‌র্‌ (সহিষ্ণুতাসহ ক্ষমা— যার থেকে বাংলার 'সবুর' কথাটা এসেছে।) রাবাতের ব্যাপারটা আগাপাশতলা 'মুসলমানি' ছিল বলে মুসলমানি শাস্ত্রের নজির দিলুম।

এর ওপর আরেকটা কথা আছে। অপমান করতে পারে কে, কাকে? আমি গেলুম আপনার বাড়িতে। আপনার চাকর আমাকে খামোখা কতকগুলি কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল— বৈঠকখানায় ঢুকতেই দিল না। এস্থলে সে আমাকে অপমান করেনি, করেছে রূঢ় ব্যবহার— আমাকে অপমান করার মতো সামাজিক আসন তার কোথায়? আবার দেখুন, অন্য আরেকদিন আপনার ঠাকুরদা বসেছিলেন বারান্দায়। আমাকে দেখেই খাপ্পা হয়ে আমাকে নাহক বকতে শুরু করলেন। সেস্থলেও আমি অপমানিত নই। কারণ আমি আপনার বন্ধু। আমার পিতামহের বিলক্ষণ হক আছে আমাকে কড়া কথা বলার।... অপমান হয় সমপর্যায়ে। যেমন মনে করুন, সন্তোষ ঘোষ। তিনি লেখক, আমিও লেখক। তিনি আমাকে অপমান করতে পারেন, আমিও তাঁকে অপমান করতে পারি। আরেকটি নজির দিই। যদ্যপি আইনে বারণ তথাপি ইতালি প্রভৃতি কোনও কোনও দেশে ডুয়েল লড়ার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সেখানেও যদি আপনার ভৃত্য ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে ডুয়েলে চ্যালেন্‌জ্‌ করে, সে খবর জানিয়ে দুজন প্রতিভূ চাকরের প্রতিভূদের সঙ্গে দু-মিনিট আলোচনা করেই, একবাক্যে চারজনাই রায় দেবেন, এ ডুয়েল হতে পারে না। দুজনার পদমর্যাদা এক নয়। চাকরটা শুধু তার পদমর্যাদা বাড়াবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেন্‌জ্‌ করেছে।'

মরক্কো দেশ কোথায়, মশাই? শুনেছি সেখান থেকে মরক্কো লেদার নামক পুরু চামড়া রপ্তানি হয়। পুরু চামড়া নিশ্চয়ই। নইলে সেখানকার লোক এই সুদূর ভারতবর্ষের লোককে নিমন্ত্রণ করে— তাদের অর্বাচীন ইতিহাসে (প্রাচীন ইতিহাস এদের নেই) এই বোধহয় তারা কাউকে কখনও নিমন্ত্রণ করল— এরকম পুরু চামড়ার আচরণ করবে কেন? তদুপরি শুনেছি, মরক্কো দেশকে নাকি এখনও বহু বাবতে ফ্রান্স এবং স্পেনের কথামতো চলতে হয়, এবং সর্বশেষে শুনেছি, স্পেন ও ফ্রান্সের ঝগড়ার সুযোগ দিয়েই এদেশের যেটুকু 'স্বাধীনতা' আছে সেটুকু বেঁচেবর্তে আছে। আমার কেমন যেন সন্দেহ জাগে, মুসলিম রাষ্ট্রদের নিমন্ত্রণ করে এরা যেন সেই ইতালির ডুয়েলকামীর মতো পদমর্যাদা বাড়াতে চেয়েছিল। আমার তো মনে হয় না, আক্‌সা মসজিদের আগুন মরক্কোর বুকে কোনও আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

কোথায় মরক্কো, কোথায় ভারত? পদমর্যাদায় কোথায় ভারত আর কোথায় সেই ধেড়ধেড়ে গোবিন্দপুর টা-পেনি হে-পেনি মরক্কো! সে আমাদের ইনসল্ট করবে কী করে!

ফখরুদ্দীন সাহেব, দীনেশবাবু, আমাদের ফরেন আপিস যা করলেন সেটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমার দুঃখ, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে চিঠিপত্র ছাপিয়ে এদেশের মুসলমানরা এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন না কেন? বলেন না কেন যে, এঁদেরই হয়ে একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সরকার ওই একটা থার্ড ক্লাস দেশে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

যদ্যপি-বা স্বীকার করি— আমি করি না— যে ভারত রাবাতে ইনসল্টেড হয়েছে— তথাপি বলব, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অপমানিত হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই। ক্ষুদ্র স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়ে জয়ী হলেও উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করার কিছু নেই।

অল-মসজিদ্-উল-আক্‌সা

আজকের দিনে বিশ্ব মুসলিম প্রধানত তিনটি তীর্থ দর্শনে যান। মক্কায় আল্লার ঘর কা'বাতে, মদিনায় পয়গম্বরের কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং তৃতীয় জেরুজালেমে— যেখানে ইহুদি, খ্রিস্ট ও ইসলাম তিন ধর্মের সমন্বয় হয়।

প্রকৃত শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী কিন্তু বিশ্ব মুসলিমকে যে তিনটি পুণ্যভূমি স্বীকার করতে হয় তার একটি মক্কার কা'বা এবং তার পর যে পুণ্যস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে তার দুইটিই জেরুজালেমে। এর প্রথমটি একাধিক নামে পরিচিত। ইংরেজিতে একে ডোম্ অব দি রক্ (রক্ = প্রস্তরের উপর নির্মিত ডোম্ = গুম্বুজ), ঐতিহাসিক ভ্রান্তিবশত ওমর মস্ক্‌ও বলা হয়; আরবিতে এটিকে কুব্বতুস্— সখরা (কুব্বৎ=ডোম; সখ্‌রা = প্রস্তর বলা হয়)। এটিকে ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে। কারণ এই তিন ধর্মেরই সম্মানিত রাজা সুলেমানের প্রসিদ্ধ মন্দির একদা এস্থলেই দণ্ডায়মান ছিল। এই সলমনের টেম্পল্ একাধিকবার বিনষ্ট হয় এবং সর্বশেষে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের দ্বারা। ভগ্নস্তূপের উপর তাবৎ শহরের ময়লা স্তূপীকৃত হতে থাকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বৎসর ধরে। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর খ্রিস্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম অধিকার করে জঞ্জাল সরিয়ে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এর পঞ্চাশ বৎসর পর আমাদের শাহ্‌জাহানের মতো বিত্তশালী ও স্থাপত্যে সুরুচিসম্পন্ন খলিফা আব্দুল মালিক যেখানে যে পৃথিবীর অন্যতম অনবদ্য ইমারত নির্মাণ করেন সেইটিই ১২০০ বৎসর ধরে সেখানে অটুট অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিশ্বজনের সৌন্দর্যস্তুতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছে। আমি যতদিন জেরুজালেমে ছিলুম তার প্রায় প্রতিদিন একবার না একবার একা একা ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর বিরাট আরকিটেক্টনিকাল বৈভব থেকে ক্ষুদ্রতম অলঙ্করণ দেখে মুগ্ধ হতুম।

১. কা'বা, ২. উপরে উল্লিখিত এই মসজিদ— তার পরেই আসে ৩. মস্‌জিদ-উল্- আক্‌সা, সংক্ষেপে আক্‌সা মসজিদ। এই আক্‌সার উল্লেখ কুরান শরিফে আছে (সূরা ১৭ : ১)।

এস্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাসের প্রয়োজন।

আরব ও ইহুদি একই সেমিতি বংশ (রেস) জাত, একই রক্ত ধারণ করে। আরবি ও হিব্রু (ইহুদিদের এই ভাষাতেই তাদের বাইবেল রচিত) ভাষা দুই ভগ্নী, অর্থাৎ কগ্‌নেট্। এবং সবচেয়ে বড় কথা বাইবেলে বর্ণিত ইহুদি প্রফেটগণ যথা, আব্রাহম, দায়ুদ, সুলেমান ইত্যাদি কুরান শরীফেও স্বীকৃতিলাভ করেছেন। হজরত নবী তাই যখন ইসলাম প্রচার করেন তখন তিনি ইহুদি আরবের কেন্দ্রভূমি জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে

www.pathagar.com

আরম্ভ করেন। কিন্তু হজরতের মদিনা শহরে বসতি স্থাপন করার দুই বৎসর পর আল্লার আদেশে মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন— এবং আজও সে রীতি প্রচলিত আছে। এরই ফলে জেরুজালেমের সলমন-মন্দিরভূমি মুসলিম জগতে দ্বিতীয় স্থান পেল বটে তবু কোনও কোনও জাত্যাভিমানী আরব সেটিকে বহু শতাব্দী ধরে প্রথম স্থানেই রেখেছিলেন— বিশেষত উম্মই (ওমাইয়াড্) খলিফারা। অদ্যকার দিনে কিন্তু মুসলিম জাহান প্রথম স্থান দেয় মক্কার কা'বা শরিফকে এবং দ্বিতীয় স্থান জেরুজালেমের সলমন মন্দিরকে— যার উপর প্রতিষ্ঠিত আব্দুল মালিক নির্মিত এমারতের বয়ান এইমাত্র দিয়েছি এবং এর পরই বলেছি, তৃতীয় পুণ্যক্ষেত্র— মসজিদ্-উল্-আক্সা।

কিন্তু তৃতীয় হলে কী হয়, এই আক্সার সঙ্গে বিজড়িত আছে বিশ্ব মুসলিমের রোমহর্ষক উত্তেজনাদায়ী ঐতিহ্য, পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্মিলিত হবার অবিস্মরণীয় অভিযান এবং তার চরম ফলপ্রাপ্তি— নজাৎ, মোক্ষ, মহা পরিনির্বাণ, যা-খুশি বলতে পারেন।

কুরান শরিফে এ অভিযানের যে বয়ান লেখা আছে, হদিসে তার যে টীকা-টিপ্পনী আছে (কুরান হিন্দুদের বেদস্থানীয় শ্রুতি; হদিসকে স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্গে সচরাচর তুলনা করা হয়, আশাকরি কোনও মুসলমান এ তুলনার জন্য অপরাধ নেবেন না)। বস্তুত ইয়োরোপীয় কাব্যের ইতিহাসে ইসলামের এই অনুচ্ছেদটি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। দান্তের মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি' এর কাছে ঋণী— অপর্যাপ্ত ইয়োরোপীয় আরবি তথা ইতালিয়ান ভাষা-সাহিত্যের গুণীজ্ঞানী আলঙ্কারিক পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন।

কুরানে আছে, পয়গম্বর সাহেব মক্কাতে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করার কিছুকালের মধ্যেই স্বয়ং আল্লাতালা তাঁকে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং পরম সত্যধর্মের নিগূঢ়তম তত্ত্বে দীক্ষিত করার জন্য তাঁর প্রধান ফেরেশতা ('দেবদূত' ইংরেজিতে 'আর্কেঞ্জেল' জিব্রাইল = গেব্রিয়েলকে) পাঠান মুহম্মদকে (দ.) তাঁর সমীপে নিয়ে আসতে।[১] কুরান শরিফে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে,

'সেই (ব্যক্তিই) ধন্য যিনি এক রাত্রেই তাঁর অনুচরসহ মসজিদ্-উল্-হারাম্ (অর্থাৎ মক্কার কা'বা) থেকে একই রাত্রে মসজিদ্-উল্-আক্সা (জেরুজালেম) পর্যন্ত ভ্রমণ করেন, যার চতুর্দিক আমরা পূত করেছি। এবং যাতে করে আমরা তাঁকে আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি।' (কুরান শরিফ; সূরা ১৭ : ১)

অন্বয় এবং টীকা : 'সেই ব্যক্তি' হজরত। 'একই রাত্রে'— তখনকার দিনে যানবাহন যা ছিল তাতে করে মক্কা থেকে জেরুজালেম পৌঁছতে অন্তত (উটে চড়েও) পনেরো দিন লাগার কথা। এটা আমার অনুমান মাত্র। কম তো হতে পারে না; বেশিই হবে।

'আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি'— অর্থাৎ আল্লাতালা স্বয়ং তাঁকে সত্যধর্মের গভীর তত্ত্বে দীক্ষিত করবেন— পূর্বোক্ত নজাৎ মোক্ষ ইত্যাদি।

এস্থলে প্রশ্ন, মসজিদ-উল্-আক্সা কোন স্থলে অধিষ্ঠিত? মুসলিম-অমুসলিম (অমুসলিম এই কারণে বলছি, প্রচলিতার্থে অহিন্দু মাক্সমুলার যেরকম বেদ নিয়ে গবেষণা করেছেন, ঠিক সেই জিনিসই করেছেন একাধিক ইয়োরোপীয় অমুসলিম পণ্ডিত কুরান-হদিস নিয়ে) সকলেই

১. কুরান শরিফে জিব্রাইলের উল্লেখ নেই। একাধিক হদিসে সবিস্তর আছে।

www.pathagar.com

তার অধিষ্ঠান জেরুজালেমে ছিল বলে স্থিরনিশ্চয়— তাই আমি অনুবাদ এবং টীকাতে একই রাত্রে মক্কা থেকে জেরুজালেম ভ্রমণের কথা বলছি।

পণ্ডিতদের বক্তব্য, মক্কা শরিফের বাইরে এমন এক জায়গা যেটি আল্লা স্বয়ং পূতপবিত্র করেছেন, সে শুধু জেরুজালেমেই হতে পারে। কারণ ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ই হজরত ওইদিকে মুখ করে নামাজ পড়েছিলেন। অতএব সেই জেরুজালেমের সলমনের মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত ভূমিতেই আছে মস্‌জিদ-উল্‌-আক্‌সা।

পূর্বেই বলেছি খলিফা ওমর সলমন মন্দিরের সেই ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করে নির্মাণ করেন একটি মসজিদ এবং পরবর্তীকালে আব্দুল মালিক নির্মাণ করেন ডোম অব দি রক্‌ এবং তারই অতি কাছে আরেকটি বৃহত্তম বিরাট মসজিদ্‌-উল্‌-আক্‌সা।

ডোম অব দি রক্‌ একটা পাথরের চতুর্দিকে গড়া হয়েছিল বলে স্থপতি সেটাকে হাজার হাজার নমাজার্থী মুসলমানের জন্য বিরাট কলেবর দিতে পারেননি। তাই তিনি সেটিকে করেছিলেন সুন্দর, মধুর। অবশ্য মসজিদের চতুর্দিকে দিয়েছিলেন প্রশস্ততম অঙ্গন (এদেশের মন্দিরে সঙ্কীর্ণ গর্ভ-গৃহের চতুর্দিকে যেরকম বিস্তীর্ণ অঙ্গন রাখা হয়), কিন্তু গ্রীষ্মকালে, জেরুজালেমের দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সেখানকার অনাচ্ছাদিত মুক্তাঙ্গনে— যেখানে মস্তকোপরি সূর্যের প্রতাপের চেয়ে পদতলের পাষাণ ঢের বেশি পীড়াদায়ক— সেখানে জুম্মা নামাজ পড়া অহেতুক পীড়াদায়ক হবে বলে তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর প্রাণ যা চায় সেই পরিমাণে বিস্তৃত, মসজিদ্‌-উল্‌-আক্‌সা।

কিন্তু এহ বাহ্য।

আসলে বিশ্ব মুসলিমের কাছে মসজিদ্‌-উল্‌-আক্‌সা তাবৎ পুণ্যভূমির মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর।

কুরান হদিসের সঙ্গে যে মুসলিমের সামান্যতম পরিচয় আছে, সে-ই আপন মনে কল্পনা করে, সেই সুদূর মক্কা থেকে আল্লা তাঁর প্রিয় নবীকে রাতারাতি নিয়ে এলেন মসজিদ্‌-উল্‌-আক্‌সাতে (শব্দার্থে মক্কা থেকে 'সবচেয়ে দূরে পুণ্যক্ষেত্রে'), সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, 'বুর‍্যক্‌' নামক পক্ষিরাজ অশ্ব এবং তার মুখ মানবীর ন্যায়— সেই অশ্বে সোয়ার হয়ে নবীজি পৌঁছলেন বেহেশ্‌তের দ্বারপ্রান্তে।

এই নিয়ে সে মনে মনে কত না কল্পনার জাল বোনে! স্বয়ং আল্লার সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ!

অবশ্য একথাও সত্য যে, বহু মুসলিম দার্শনিক সুফি (রহস্যবাদী ভক্ত = মিস্টিক) এ প্রশ্ন বার বার শুধিয়েছেন, এই যে হজরতের স্বর্গারোহণ এটা বাস্তব না স্বপ্ন; তিনি কি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন, না তাঁর আত্মা মাত্রই আল্লার সম্মুখীন হয়েছিলেন? কিন্তু মোলাকাত যে হয়েছিল সে সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ।

যাই হোক, যা-ই থাক্‌,— এই মসজিদ্‌-উল্‌-আক্‌সা থেকেই, আল্লাতালা হজরতকে দিয়ে স্থাপন করলেন মর্তভূমি ও স্বর্গভূমিতে যোগ-সেতু।

সেই সেতুর পার্থিব প্রান্ত পুড়িয়ে দিয়ে সে সেতু বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা অজ্ঞ-বিজ্ঞ যে কোনও মুসলমানকেই বিচলিত করার কথা।

www.pathagar.com

ন্যাকামো

প্রতি বৎসর আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ম্বর প্রাথমিক শিক্ষা, পাঠশালার মাস্টারমশাইদের 'দুরবস্থা', দেশ থেকে কেন নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে না এই নিয়ে বিরাট বিরাট মিটিং হয়, বিস্তর চেল্লাচেল্লি হয়, ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলা হয়। তার পর সারা বৎসর নিশ্চুপ।

এ যেন কঞ্জুস শ্বশুরের জামাইষষ্ঠী করার মতো। নিতান্ত না করলেই নয় বলে। তার পর পরিপূর্ণ একটি বৎসর কিপ্টে শ্বশুর নিশ্চিন্দি।

উঁহু! তুলনাটা টায়-টায় মিলল না। শ্বশুর যতই হাড়ে টক শাইলক হোক না কেন, এবং জামাই যতই হতভাগ্য দুঃখী হোক না কেন, সে বেচারি অন্তত একবেলার মতো পেট ভরে খেতে পায় এবং শুনেছি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে একখানা কাপড়ও পায়। আমি সঠিক বলতে পারব না কারণ আমি মুসলমানি বিয়ে করেছি। যদ্যপি সম্পর্কে তার এক বারেন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই কলকাতা শহরেই পুরুষ্টু পাঁঠাটার মতো ঘোঁত ঘোঁত করে ঝাঁ-চকচকে একাধিক মোটর দাবড়ে বেড়ায় তবু শালা... আমি অশ্রাব্য অছাপা গালিগালাজ করছিনে[১]— স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটা সম্পর্কে আমার বড়কুটুম (শ্যালক)— আমাকে জামাইষষ্ঠীর দিনে স্মরণ করে না। কারণ তার পিতা— আমার ঈশ্বর শ্বশুর মহাশয় তাঁর সাধনোচিত ধামে চলে যাওয়ার পর এই শ্যালকটি তার পিতার তাবৎ সব গ্রহণ করেছেন নৃত্য করতে করতে। (সত্যের খাতিরে অনিচ্ছায় বলছি দাতাকর্ণ শ্বশুরমশাই বিশেষ কিছু রেখে যাননি, এবং সামান্য যেটুকু ভদ্রাসন রঙপুরে রেখে গিয়েছিলেন সেটুকুও পার্টিশনের ফলে শ্যালকের হস্তচ্যুত হয়। (বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে!!) কিন্তু পিতৃদেবের দায়দায়িত্ব বেবাক এড়িয়ে গেছে। তাই সে জামাইষষ্ঠীর একমাস আগের থেকে এড়িয়ে চলে। হিন্দু কায়দাকানুন আমি জানিনে, কিন্তু

---

১. আমার প্রতি অকারণ সহৃদয় পাঠক, যাঁরা আশকথা-পাশকথা শুনতে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে অবান্তর একটি ঘটনার উল্লেখ। আমার বৃদ্ধ পিতা তখন ছোট একটি মহকুমার অনারারি হাকিম। একদিন আদালত থেকে ফিরে আমায় বললেন, 'সিতু, আজ আদালতে কী হয়েছিল, জানিস? এক মূর্খ আরেক গাধার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এনেছে ওই দোসরাটা নাকি তাকে সদর রাস্তায় 'শালা' বলে গালাগালি দিয়েছে (এতদিন পরে আমার মনে নেই সেটা এবুজিভ ল্যানগুইজ না ডিফেমেশন ছিল— লেখক)।' তার পর বাবা বললেন, 'আসামি পক্ষে মোক্তারের বক্তব্য, যাকে সে 'শালা' বলেছে সে সম্পর্কে সত্যিই তার শালা; অতএব কোনও অপরাধ হয়নি। বিপক্ষ কিন্তু বলছে, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আসামি যখন শালা বলেছে তখন মধুভরা সোহাগ-পোরা সে শালা বলেনি; বলেছে অপমান করার জন্য।' ইতোমধ্যে বাবার মগরিবের (সন্ধ্যার নামাজের) জন্য অজুর জল এসে গিয়েছে। আমি তাই তাড়াতাড়ি শুধোলুম, 'আপনি কী রায় দিলেন?' বাবা বললেন, 'দুই পক্ষকে আদালত থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলুম। বললুম, "মশকরা করার জায়গা পাওনি!"... আমার মনে এখন সন্দেহ জাগে, বাবার এই হুকুম ঠিক আইনসম্মত হয়েছিল কি না। তবে একথা জানি, দুই পক্ষই কোনও প্রতিবাদ না জানিয়ে স্যুস্সুড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল। কারণ বাবা ছিলেন রাশভারী, আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ। আসামি ফরিয়াদি মোক্তার সবাইকে দেখেছেন উলঙ্গাবস্থায় আমাদের বাড়ির আঙিনায় খেলাধুলো করতে।

www.pathagar.com

আমি যে অঞ্চলের মুসলমান সেখানে রীতি, শ্বশুর গত হওয়ার পরেই তাঁর পুত্র জামাইয়ের শ্বশুর হয়ে যান। হয়তো হিন্দুদের ভিতর এ রেওয়াজ নেই। আমি জানব কী করে? কিন্তু আমাদের এই হিন্দু-মুসলমান, ভারতীয় ঐক্যবিধান নিয়ে যখন সব্বাই মাথা ঘামাচ্ছেন তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ লেনদেন গিভ্-অ্যান্ড-টেক করা উচিত নয়?

এই দেখুন না, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় আমার দু-তিনটি হিন্দু বোন আমাকে নেমন্তন্ন জানায়— নেমন্তন্ন কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। আমাকে তখন তারা ডাক দেয়— হক্কা হিসেবে, অ্যাজ এ ম্যাটার অব্ রাইট। আমি তখন বিশ-পঁচিশ টাকার শাড়ি নিয়ে যাই।

কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্, ফিরোজ মিঞা বড্ডই ঘোর আত্মাভিমানী। সে নিমন্ত্রণ পায় তার তিন-চার হিন্দু বোনদের কাছ থেকে। আমি বিলক্ষণ বুঝি সেই সরলা হিন্দু কুমারীরা মনে মনে ভাবে, সব হিন্দু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরব করছে আর এই ছোট ভাইটি একা একা দিন গোঁয়াবে? তদুপরি একথাও তো সত্য, এই কুমারীদের কোনও কোনও হিন্দু ভাই মুসলমান ফিরোজের চেয়ে কোনও গুণে শ্রেষ্ঠতর নয়। আমার মনে পড়ল, ওই ফিরোজই তার কোনও এক দিদির জন্মদিনে তার প্রিয় ফুল কেয়া আনতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকে গোয়ালপাড়ার কেয়াবনের মধ্যিখানে গোখরো সাপের ছোবল খেতে খেতে বেঁচে যায়।

অতএব বাবু ফিরোজ আমাকে বললেন, 'আব্বু, আমি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যাচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে দিদিদের জন্য কিছু শাড়ি কিনতে হবে। আমি দালাল কোম্পানিতে যাচ্ছি।'

সর্বনাশ! দালাল কোম্পানি অকাতরে সব দেবে। অবশ্য, বাচ্চা ফিরোজ কেন, ওরা কাউকেই ঠকায় না। তবে কি না আমি ওদের একবার ঠকিয়েছি।

কত টাকার বিল এনেছিল জানেন? ১৮০ টাকা!

পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমি কী নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, আর কোথায় এসে পৌঁছলুম। বুঝিয়ে বলি। এ লেখাটি যখন আরম্ভ করি তখন ভীষণ রৌদ্র, দারুণ গরম। তারই সঙ্গে তাল রেখে আমি রুদ্র তথা ব্যঙ্গরসের অবতারণা করি। কিন্তু দু লহমা লেখার পূর্বেই হঠাৎ অন্ধকার করে নামল ঝমাঝম বৃষ্টি। তার পর মোলায়েম রিমঝিম। তার পর ইলশেগুঁড়ি। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ররসের অন্তর্ধান। বাসনা হল আপনাদের সঙ্গে দু-দণ্ড রসালাপ করি, একটুখানি জমজমাট আড্ডা জমাই।

ইতোমধ্যে আবার চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। ফিরে যাই রুদ্ররসে।

আমাকে যদি কেউ শুধোয়, আমি কোন জিনিসে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করি, তবে নির্ভয়ে বলব, শিক্ষা।

কোন শিক্ষা?

প্রাইমারি স্কুল, অর্থাৎ পাঠশালা।

তার পর?

হাইস্কুল। তার পর? কলেজ, বি.এ. এম.এ.। তার পর? পি.এইচ.ডি.। আমার মনে সবচেয়ে বিরক্তির সঞ্চার হয়, যখন ডক্টরেট করার জন্য কেউ আমার কাছে এসে সাহায্য চায়।

www.pathagar.com

পাঠক অপরাধ নেবেন না যদি এস্থলে আমি কিঞ্চিৎ আত্মজীবন প্রকাশ করি।

বঙ্গসাহিত্যে আমার যেটুকু সামান্য লাস্ট বেঞ্চের আসন জুটেছে (অর্থাৎ আমার প্রথম পুস্তক 'দেশে বিদেশে' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে) আমি একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি, মরহুম হুমায়ুন কবীর সাহেবের 'চতুরঙ্গে' ১৯৪৮ সালে। প্রবন্ধটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলুম, যে-যাই বলুক না কেন, আখেরে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হবে। কিন্তু এহ বাহ্য। আমি তখন প্রাইমারি এডুকেশনের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে বলি :

'আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইদের কিছু কিছু জমিজমা মাঝে-মধ্যে থাকে, কিন্তু সে অতি সামান্য, নগণ্য। কেউ কেউ হালও ধরে থাকেন। এবং তৎসত্ত্বেও তাঁরা যে কী নিদারুণ দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে জীবনযাপন করেন সে নির্মম কাহিনী বর্ণনা করার মতো ভাষা ও শৈলী আমার নেই। লেখাপড়া শিখেছেন বলে এবং অনেক স্থলেই উত্তম বিদ্যার্জন করেছেন, যেটা আমরা শহরে বসে সঠিক বুঝিনে— গ্রামের আর পাঁচজনের তুলনায় এঁদের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা এবং আত্মসম্মানজ্ঞান হয় অনেক বেশি। মহাজনের রূঢ় বাক্য, জমিদার জোতদারের রক্তচক্ষু এঁদের হৃদয়-মনে আঘাত দেয় ঢের ঢের বেশি। এবং উচ্চশিক্ষা কী বস্তু তার সন্ধান তাঁরা কিছুটা রাখেন বলে মেধাবী পুত্রকে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা না দিতে পারাটা এঁদের জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ট্র্যাজেডি। 'ইত্তিহাদ' 'আজাদ' (পশ্চিমবঙ্গের বেলায় বলব, 'আনন্দবাজার' 'দেশ'— এটা এখানে জুড়ে দিচ্ছি— লেখক) মাঝে মাঝে এঁদের হস্তগত হয় বলে এঁরা জানেন যে যক্ষ্মারোগী স্বাস্থ্যনিবাসে বহুক্ষেত্রে নিরাময় হয়, হয়তো তার সবিস্তর আশাবাদী বর্ণনাও কোনও রবিবাসরীয়তে তাঁরা পড়েছেন এবং তার পর অন্নাভাবে চিকিৎসাভাবে পুত্র অথবা কন্যা যখন যক্ষ্মারোগে চোখের সামনে তিলে তিলে মরে তখন তাঁরা কী করেন, কী ভাবেন, আমার জানা নেই। বাইবেলি ভাষায় বলতে ইচ্ছা যায়, 'ধন্য যাহারা অজ্ঞ, কারণ তাহাদের দুঃখ কম'। পাঠশালার গুরুমশাইয়ের তুলনায় গাঁয়ের আর পাঁচজন যখন জানে না, স্বাস্থ্যনিবাস (সেনেটরিয়াম) সাপ না ব্যাঙ না কী, তখন তারা যক্ষ্মারোগকে কিস্মতের গর্দিশ বলে মেনে নিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে। হতভাগা পণ্ডিত পারে না।'

কিন্তু প্রশ্ন, প্রবন্ধের গোড়াতেই জামাইষষ্ঠীর কথা তুলেছিলুম কেন?

শুনেছি, সঠিক বলতে পারব না, গাঁয়ের পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে বছরে একদিন শহরে এনে ওই যে বিরাট বিরাট সভা করা হয়, ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলা হয় তখন জামাইষষ্ঠীর দিনের মতো তাদেরকে একপেট খেতেও দেওয়া হয় না।

এবং তৎপর ৩৬৪ দিনের গোরস্তানের নীরবতা।

এই শেষ নয়। দাঁড়ান না। সুযোগ পেলে আরেকদিন আরেক হাত আমি নেবই নেব।

স্বামী বিবেকানন্দকে গুরু মেনে, সাক্ষী মেনে।

www.pathagar.com

বিশ্বভারতী প্রাগ্

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীর জন্য এদেশে বিশ্ববিখ্যাত একাধিক পণ্ডিত আনিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ছিলেন অধ্যাপক মরিৎস্ ভিন্‌টার্‌নিৎস। এঁকে এদের অনেক সংস্কৃতপণ্ডিত চিনতে পারবেন। ১৯০৯ থেকে ১৯২২ জুড়ে জর্মন ভাষায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'। এরই ইংরেজি অনুবাদ বেরোয় এদেশে ১৯২৭ থেকে ১৯৩২। এছাড়া আছে, 'গৃহ্যসূত্র' 'প্রাচীন ভারতে বিবাহ অনুষ্ঠান' 'ভারতীয় ধর্মে রমণী' ইত্যাদি তাঁর প্রচুর গ্রন্থরাজি।

এ সবকটি বই-ই পণ্ডিতদের জন্য।

কিন্তু তিনি আমাদের মতো সাধারণজনদের একখানি পুস্তিকা লিখে গিয়েছেন— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। এ-পুস্তিকা সম্বন্ধে ইতোপূর্বে, অন্য অবকাশে, আমি দু-একটি কথা বলেছি। এস্থলে পুনরায় বলি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত লেখা বেরিয়েছে তার ভিতরে আমি এটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। তার প্রধান কারণ অধ্যাপকের সমস্ত জীবন কাটে বেদ, উপনিষদ, সংস্কৃত কাব্য নিয়ে। এদেরই ভেতর দিয়ে যে ঐতিহ্য ভারতবর্ষে চলে আসছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সংযুক্ত, কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁর ধর্মমত কীভাবে গড়ে উঠেছিল এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি বলার অধিকার ছিল অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎসেরই। তিনি বাংলা ভাষা জানতেন।

বইখানি অতিশয় সরল জর্মন ভাষায় রচিত। ইংরেজি বা বাংলায় এর অনুবাদ হয়েছে বলে শুনিনি। হওয়া উচিত। বইখানি একখণ্ড শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ ভবনে আছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার জনসাধারণ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীয় জর্মন এবং পরবর্তী যুগে খাস জর্মনির জর্মনগণ দ্বারা নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কৃষ্টি-সভ্যতার অনেকখানি জর্মন সভ্যতার কাছে ঋণী। তাছাড়া অনেক জর্মনও চেকোস্লোভাকিয়ায় বাস করত।

অধ্যাপক ভিনটার্‌নিৎস চেক নন। তিনি জন্মেছিলেন দক্ষিণ অস্ট্রিয়ায় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যখন টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন তাঁর জন্মভূমি পড়ে নবনির্মিত রাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে, অবশ্য অস্ট্রিয়াই (হিটলারেরও জন্ম এই অঞ্চলে এবং তাঁর ধমনীতে নাকি কিঞ্চিৎ চেক রক্তও ছিল; মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, চেকদের যে তিনি সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন তার কারণ, ওই করে তিনি তাঁর চেক রক্ত অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন) কিন্তু, সেইটে আসল কথা নয়। তিনি ভালোবাসতেন প্রাগ শহরকে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে সেখানে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৮/১৯ খ্রিস্টাব্দে চেকোস্লোভাকিয়া জন্মগ্রহণ করে মাতৃ-উদর থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন তিনি ইচ্ছে করলেই ভিয়েনা (এইমাত্র বলেছি, তাঁর মাতৃভূমি পড়েছিল অস্ট্রিয়ায় এবং অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা তখন প্রাগ ইত্যাদি শহর থেকে তার আপনজনকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে) বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি যাননি।

www.pathagar.com

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎস ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বরাবর ১৯৩৭— তাঁর পরলোকগমন অবধি প্রাগেই থেকে যান।

তিনি ছিলেন জাতে, ধর্মে ইহুদি।[১] ইহুদিরা কোনও জায়গায় পত্তন জমালে সেখানে যেসব ইহুদি পরিবার আছে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে এমনই এক হয়ে যায় যে পরে ভিন্ন জায়গায় উৎকৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা পেলেও এদের ত্যাগ করাটা নিমকহারামি বলে মনে করে। এই একই কারণে ইজরায়েলের শত ক্রন্দনরোদন সত্ত্বেও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ ইহুদি পরিবার-সমাজ-দেশ ছেড়ে ওই দেশে যেতে চায় না।[২]

প্রাগ শহর বড় বিচিত্র শহর। সেখানে চেক আছে, জর্মন আছে, ইহুদি আছে, আরও কত জাত-বেজাতের লোক আছে— এবং বড় মিলেমিশে থাকে।

আর, পূর্বেই বলেছি, শহরটি বাস্তবিকই বড় সুন্দর।

মধ্যিখান দিয়ে মলডাও নদী চলে গিয়েছে। ঠিক যেরকম ভিয়েনার মাঝখান দিয়ে ড্যানুয়ুব, প্যারিসের মধ্যিখান দিয়ে শেন, বুডাপেস্ট-এর মাঝখান দিয়ে ড্যানুয়ুব।

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎসকে নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাব।

হোটেলওলাকে শুধোলুম, হোথায় কোন ট্রামে বা বাসে যেতে হয়।

সেদিন কী-একটা পরব ছিল। ভিড়ে ভিড়ে হুজ্জুম।

অতএব বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয় বন্ধ। কিন্তু একটা স্কেলিটেন স্টাফ থাকবে তো! তারা নিশ্চয়ই অধ্যাপকের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারবে।

ইতোমধ্যে এই হুজ্জুম না কাটা পর্যন্ত ট্রাম-বাস তো চলবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে ঘাড়ের বাঁ দিকটা চুলকোচ্ছি, এমন সময়ে এক অপরূপ সুন্দরী এসে আমাকে শুধোল, 'আপনার কি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন?'

এ শুধু প্রাগেই সম্ভবে!

অন্য দেশের মেয়েরা পুরুষকে মদত দেবার জন্য এরকম এগিয়ে আসে না।

ত্রিমূর্তি

প্রখ্যাত রুশ ঐতিহাসিক মিখাইল গুস্ একটি বড় খাঁটি তত্ত্বকথা বলেছেন : 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলির কথা আজ আমরা স্মরণ করি এজন্য যে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আমরা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি। এরকম একটা শিক্ষা হল যে, আমাদের যুগে বিশ্ব আধিপত্য

১. আমি শুনেছি তিনি যখন শান্তিনিকেতনে ভিজিটিং প্রফেসাররূপে ছিলেন তখন কলকাতার ইহুদি সম্প্রদায়ের নিমন্ত্রণে সেখানকার ইহুদি ধর্মমন্দিরে তাঁদের বাৎসরিক পূজায় উপস্থিত থাকেন।

২. অন্য কারণও হয়তো আছে। ১৯৩৪ সালে যখন আমি প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের কেন্দ্রভূমি তেল আভিভ শহরে যাই তখন এক ইহুদি আমাকে বলেন— মশকরা করে, না কি, বলা কঠিন— 'কাকে কাকের মাংস খায় না। সব ইহুদি, সব কাক, এক জায়গায় জড় হলে তো উপবাসে মরতে হবে। দুনিয়ার কুল্লে জাত স্বজাতের সঙ্গে থাকতে চায়। আমরা ব্যত্যয়।'

www.pathagar.com

বিস্তারের যে কোনও রকম দাবি এক সামগ্রিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। হিটলারের পদানুসরণ যারা করতে চায়, তাদের সকলের প্রতি এ হল এক গুরুতর হুশিয়ারি।[১]

কমরেড পণ্ডিত গুসের কথার পিঠ-পিঠ আমি কোনও মন্তব্য করার দম্ভ ধরিনে। আমি অন্য এক মনস্তত্ত্ববিদের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ন্যুরনবের্গ শহরে যখন গ্যোরিঙ, হেস্, কাইটেল প্রভৃতি জনা বিশেকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলছিল তখন প্রখ্যাত মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার কেলি দিনের পর দিন হাজতে ওদের মনঃসমীক্ষণ করার পর দেশে ফিরে গিয়ে বলেন, 'হিটলারের মতো ডিক্টেটর এবং নাৎসি পার্টির মতো পার্টি পৃথিবীর যে কোনও দেশে যে কোনও সময়ে পুনরায় দেখা দিতে পারে।' তাই আমার মনে ভয় লাগে, কমরেড গুসের 'গুরুতর হুশিয়ারি' সত্ত্বেও এ গর্দিশ পুনরায় যে কোনও দিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তবু যদি রুশ তভারিশ্ গুস্-এর এ হুশিয়ারি (অস্‌তরজ্‌নো!) মেনে নেন তবে ক্রমে ক্রমে চীন এমনকি মার্কিনও হয়তো রুশের সৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন— এরকম একটা আশা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপের পঞ্চপ্রধান ছিলেন, হিটলার স্তালিন মুস্‌সোলিনি রোজোভেল্ট এবং চার্চিল। এদের প্রথম তিনজন ছিলেন কট্টর ডিক্টেটর; বাকি দুজন গণতন্ত্রের প্রতিভূ। প্রথম তিনজন রণাঙ্গনে নামেননি বটে, কিন্তু তাবৎ যুদ্ধের নীতি পদ্ধতি ইত্যাদি (স্ট্র্যাটেজি; মাঝে-মধ্যে ট্যাক্‌টিক পর্যন্ত)[২] সম্বন্ধে তাঁরা পরিষ্কার, কঠিন নির্দেশ দিতেন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ জঙ্গিলাটদের। রোজোভেল্ট চার্চিল সেরকম করেননি। এঁরা তাঁদের জঙ্গিলাটদের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য এবং নীতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বাদবাকি সবকিছু ওদেরই হাতে ছেড়ে দিতেন। তবে

---

১. ভারতে অবস্থিত বিদেশি একাধিক দূতাবাস একাধিক ভাষায় বিস্তর প্রোপাগান্ডা লেখেন প্রকাশ করেন, আমার মতো স্বল্পজ্ঞাত লোকও খান-দশেক পায়। এগুলো পড়তে হলে অনেকখানি ধৈর্যের প্রয়োজন কারণ এদের অধিকাংশই বড় একঘেয়ে।...এরই মধ্যে হঠাৎ একখানি উত্তম চটি পুস্তিকা আমাদের হৃদয়মনকে বড়ই আলোড়িত করেছে। 'সোভিয়েত সমীক্ষা' ৯.৯.৬৯ সংখ্যা, সম্পাদক কোলোকোলো, যুগ্ম সম্পাদক প্রদ্যোৎ গুহ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কলিকাতাস্থিত দূতস্থানে প্রকাশিত।
   এই সংখ্যায় আছে দুটি সুলিখিত রচনা : ১. মিখাইল গুস কর্তৃক 'ইতিহাসের শিক্ষা' এবং ২. সোভিয়েট ইউনিয়নের জনৈক মার্শাল কর্তৃক 'সোভিয়েত সৈন্যের উদ্দেশে' (মার্শাল জুকভের গ্রন্থ 'স্মৃতিচারণ ও প্রতিচিন্তার' সমালোচনা)। বলা বাহুল্য, আমি যে সব সময় এঁদের সঙ্গে একমত হতে পেরেছি তা নয়। সান্ত্বনা নিই এই ভেবে যে দেশে-বিদেশের একাধিক কমরেডও হয়তো কোনও কোনও স্থলে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। বাংলা অনুবাদ কে বা কারা করেছেন তাঁদের নাম নেই। অনুবাদ স্থলে স্থলে ঈষৎ আড়ষ্ট হলেও অতিশয় বিদগ্ধ উচ্চাঙ্গের।
২. মাত্র কয়েকদিন পূর্বে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড (৩ অক্টোবর '৬৯)-এ জেনারেল শ্রীযুক্ত চৌধুরীর 'ডিফেন্‌স স্ট্র্যাটেজি' শিরোনামায় লিখিত একটি অতুলনীয় অনবদ্য রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, এটির বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। অনেকে হয়তো বলবেন, সাধারণজন, (সিভিলিয়ানরা) যতই সংগ্রামশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে ততই সে মারমুখো হয়ে পদে পদে লড়াই করতে চাইবে— জিঙ্গোইস্ট বনে যাবে। আমি ভিন্নমত পোষণ করি। আমার বিশ্বাস

www.pathagar.com

বলা হয়, রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত জঙ্গিলাটদের রুটিন কর্মে নাক গলাতেন (ইনটারফিয়ার করতেন) ডিক্টেটরদের ভিতর হিটলার প্রচুরতম ও গণতন্ত্রের প্রতিভূ চার্চিল অনেকখানি।

এই পঞ্চপ্রধানের যে তিন জঙ্গিলাট খ্যাতি অর্জন করলেন তাঁরা মার্কিন আইজেনহাওয়ার, ইংরেজ মন্টগামেরি। ডিক্টেটররা সর্বদাই সর্বকৃতিত্ব সম্পূর্ণ পেতে চান বলে তাঁদের সৈন্যবাহিনীর কোনও সর্বময় কর্তা নিযুক্ত করতে চাইতেন না। তৎসত্ত্বেও ডিক্টেটরের অধীনে থেকেও যিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন তিনি রুশের জঙ্গিলাট মার্শাল গ্রিগরি জুকফ্।

এই তিন জঙ্গিলাট সম্মুখসংগ্রামে নেমেছিলেন। এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিয়ৎকাল পরেই মার্কিন আইজেনহাওয়ার ও ইংরেজ মন্টগামেরি যুদ্ধক্ষেত্রে আপন আপন অভিজ্ঞতা সবিস্তর বর্ণনা করে গ্রন্থ লেখেন। তৃতীয় বীর জুকফ্ এ-তাবৎ কিছু লেখেননি।[৩] (হয়তো স্তালিন চাননি যে জুকফ্ কোনওকিছু লেখেন যাতে করে তাঁর কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। আমার মনে হয় সেখানে তিনি করেছিলেন ভুল। সেকথা পরে হবে।)

এই তিনজনেই হিটলারের সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখসংগ্রামে পরাজিত করেন। এবং একাধিক মার্কিন, ইংরেজ (ফরাসিও) যদ্যপি স্বীকার করতে রাজি হন না, আমার নিজের বিশ্বাস, হিটলারকে পরাজিত করার প্রধান কৃতিত্ব রুশ জনগণ, স্তালিন ও মার্শাল জুকফের। সুতরাং গত বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন-ইতিহাস— জুকফের বিবরণীহীন ইতিহাস— যেন হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক! স্তালিনের মৃত্যুর পর জুকফ অবশ্যই তাঁর গ্রন্থ লিখতে পারতেন। কিন্তু তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে স্তালিনের চরিত্রের ওপর কলঙ্ক-লেপন। রুশের বড় কর্তারা তখন যে-প্রোপাগান্ডা আরম্ভ করলেন তার মূল বক্তব্য, 'স্তালিন ছিল সংগ্রামনীতিতে একটা আস্ত বুদ্ধু। তার ভ্রান্ত নির্দেশের ফলেই লক্ষ লক্ষ রুশ সে যুদ্ধে মারা যায়। নইলে যুদ্ধ অনেক পূর্বেই খতম হয়ে যেত।'

যুদ্ধের পর স্তালিন যদিও জুকফকে নানাপ্রকার নিপীড়ন করেন তবু তিনি এই প্রোপাগান্ডাতে সায় দিতে পারেননি। স্তালিনকে তিনি তাঁর ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চাননি। তাই সে সময়েও তিনি কোনওকিছু লিখলেন না।

এর পর স্তালিন-স্মৃতিবিরোধীরাও গদিচ্যুত হলেন।

ধীরে ধীরে স্তালিন সম্বন্ধে রাশার জনসাধারণেরও ধারণা বদলাতে লাগল।

তাই যুদ্ধের চব্বিশ বৎসর পর জুকফ তাঁর 'স্মৃতিচারণ ও প্রতিচিন্তা' প্রকাশ করেছেন ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। (এক নম্বর ফুটনোট দ্রষ্টব্য)

রাজনীতি কোথায় সমরনীতিতে পরিণত হয়, এ জ্ঞান সাধারণজনের যতই বাড়বে ততই যুদ্ধ সম্বন্ধে তার দায়িত্ববোধও বাড়বে। ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন, এ দুনিয়ায় কত-শত বার সিভিলিয়ান পলিটিশিয়ানরা লড়াই করার জন্য যখন হন্যে হয়ে উঠেছে, তখন সেনাবাহিনীর জঙ্গিলাট জাঁদরেলরা (প্রফেশনাল সোলজাররা) তাদেরকে ঠেকিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করতে দেয়নি এবং পরে দেখা গেল ওই করে জঙ্গিলাট জাঁদরেল দেশকে সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছেন। অথচ সাধারণজন ভাবে, এরা কথায় কথায় লড়াই শুরু করে দিয়ে পদোন্নতি, মেডেলের জন্য মুখিয়ে আছেন।

৩. কয়েকজন জর্মন জেনারেল লিখেছেন বটে, কিন্তু এঁদের কেউই সব রণাঙ্গনের পূর্ণাধিকার কখনও পাননি। আর ইতালিয়ান 'জাঁদরেল'দের সম্বন্ধে 'নীরবতা হিরণ্ময়'।

www.pathagar.com

যুদ্ধশেষের এই সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর পর আইজেনহাওয়ার, মন্টগামেরি ও জুকফ এই ত্রিমূর্তির কল্যাণে এখন যুদ্ধক্ষেত্রে হাতেকলমে এঁরা কোন কোন রণনীতি রণকৌশল অবলম্বন করে অবশেষে জয়লাভ করলেন তার পূর্ণতর ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হবে— কোনও যুদ্ধেরই পূর্ণতম ইতিহাস এ পর্যন্ত লেখা হয়নি, এ বেলাও হবে না।

জুকফের মূল গ্রন্থ বা তার পূর্ণ অনুবাদ আমার হাতে কখনও পৌঁছবে না। ইতোমধ্যে রুশ মার্শাল ভাসিলেফস্কি ওই গ্রন্থের যে পরিচিতি অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সারাংশ দিয়েছেন একমাত্র তারই ওপর নির্ভর করে— কথায় বলে অভাবে পড়লে স্বয়ং শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়— ঘরমুখো বাঙালিকে রণমুখো সেপাইয়ের অভিজ্ঞতা শোনাবার চেষ্টা দেব। একেবারে নিষ্ফল হব না। কারণ 'রণমুখো' না হলেও বাঙালি যে ইতোমধ্যে বেশ 'মারমুখো' হয়ে উঠেছে সে তত্ত্ব কি কলকাতা কি মফঃস্বল সর্বত্রই স্বপ্রকাশ। শুনতে পাই এর পর তারা নাকি 'রণমুখো' হয়ে লড়াই লড়ে এদেশে 'প্রলেতারিয়া রাষ্ট্র' প্রবর্তন করবে। কিন্তু সেটা আ লা রুস্ (রুশ পদ্ধতিতে রান্না স্যালাড) না, আ লা শিন (চীন পদ্ধতিতে রান্না ফ্রাইড রাইস) হবে সেটি নিয়ে মতভেদ আছে।

রুশ রাজনীতি তথা চীন রাজনীতি সম্বন্ধে আমার কোনওই জ্ঞানগম্যি নেই।

কিন্তু বিস্তর রসানুভূতি আছে উভয়ের সরেস খাদ্যাদি সম্বন্ধে।

তাই ভালোবাসি রাশান স্যালাড, রাশান কাভিয়ার, রাশান বর্শসুপ, রাশান পানীয় (আমি কড়া ভোদকা সইতে পারিনে; পছন্দ করি— এবং স্তালিনও ওই খেতেন— উত্তম ওয়াইন, তা সে স্তালিনের জন্মভূমি জর্জিয়ারই হোক বা ককেশাসেরই হোক)।

সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করি চীনা ফ্রাইড রাইস (চীনা হোটেল-বয় বলে 'ফ্রাইড লাইস' অর্থাৎ ভাজা উকুন), স্প্রিং চিকিন, ব্যাঙের ছাতার অমলেট ইত্যাদি।

কলকাতার রুশপন্থী কম্যুনিস্টরা একটা মারাত্মক ভুল করছেন। ওঁদের উচিত এ শহরে অন্তত দু গণ্ডা রাশান রেস্তোরাঁ বসানো।

কারণ 'Love does not go through heart, but through stomach'— 'প্রেম হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় না, সঞ্চারিত হয় উদরে'— আপ্তবাক্যটি বলেছেন একটি ফরাসিনী সুরসিকা নাগরিক।

রহস্য লহরি

২২ সেপ্টেম্বরের 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' কাগজের 'ক্যালকাটা নোটবুক'-এ দীনেন্দ্র কুমার রায় সম্বন্ধে ওই 'নোটবুকে'র বিদগ্ধ লেখকের করুণ-মধুর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অনুচ্ছেদটি পড়ে আমি সত্যই ঈষৎ লজ্জায় মাথা নিচু করলুম। 'ঈষৎ' বললুম এই কারণে যে, আমিও স্থির করেছিলাম যে আগস্ট-সেপ্টেম্বর (দীনেন্দ্রকুমারের জন্ম ২০ আগস্ট ১৮৬৯) তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমিও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমার নগণ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব। তার পর বার্ধক্যে যা হয়, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের জন্মদিন যখন সে ভুলে যায় তখন তরুণ

www.pathagar.com

অকরুণ পাঠক তার ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির দিকে কটাক্ষ করে তাকে বিড়ম্বিত করবেন না এই তার ক্ষীণতর আশা।

তরুণ পাঠক যদি ২২ সেপ্টেম্বরের ওই হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডটি জোগাড় করতে পারেন তবে তিনি যেন সেই অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করে তাঁর ঠাকুর-দিদিমাকে শোনান। আমি কথা দিচ্ছি, তাঁদের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠবে, ক্ষণতরে তাঁরা আবার কিশোর হয়ে যাবেন, দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে পারেন। কারণ পুনরায় বলছি, অনুচ্ছেদটি— এ লেখকের চৌদ্দ আনা লেখাতে যা হয় তাই হয়েছে— বড়ই সুন্দর হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগ করছি, আমি লেখক হিসেবে ওঁকে দম্ভপূর্ণ সার্টিফিকেট দিচ্ছিনে— সামান্য পাঠক হিসেবে আমার দিলভরা তারিফ জানাচ্ছি। সে হক সকল পাঠকেরই আছে। আর লেখক হিসেবে বললেই-বা কী! কাগে কাগের মাংস খায় না, এ প্রবাদ জানি। কিন্তু কাগে কাগের মাংস প্রশংসা করে না একথা কখনও শুনিনি।

গুরুজনদের মুখে যা শুনেছি। (বিশেষত মমাগ্রজের বাচনিক— কারণ তিনি কুষ্টিয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) সেসব তত্ত্ব ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে বলেছি। ভুল হয়ে যেতে পারে।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের জন্ম কুষ্টিয়ার কাছেই। সেই জায়গাতেই বা তার অতিশয় কাছে জন্ম নেন বা বিরাজ করেন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র, সাহিত্যিক জলধর সেন (যাঁকে শরৎচন্দ্র বড়দা বলে সম্বোধন করে সম্মান দেখাতেন) এবং এ যুগের প্রথম মুসলমান লেখক মুশর্‌রফ হোসেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'বিষাদসিন্ধু' এখনও মুসলমানদের — এবং অনেক হিন্দুদের কাছে সুপরিচিত।

তদুপরি ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। এঁর শ্যামাসঙ্গীত আমি শুনি বাল্যবয়সে, পদকীর্তন শোনার সময়ে— প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার বহু পূর্বে। হায়, সে গানের কথাগুলো আমার ঠিক ঠিক মনে নেই। তার বক্তব্য ছিল, 'কাঙাল (অর্থাৎ হরিনাথ) যদি ছেলের মতো ছেলে হত তবে তুমি জানতে। কাঙাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, তুমি পারতে না মা ছাড়তে।' গ্রামোফোন কোম্পানির সে রেকর্ড বোধহয় এখন আর নেই।

এবং এই অঞ্চলেরই মহাত্মা— লালন ফকির। তাঁর পরিচয় দেবার মতো প্রগল্‌ভতা আমার নেই।

ওই সময়ে গোপনে গোপনে কেমন যেন একটা দ্বন্দ্ব ছিল নদীয়া জেলায় এবং কলকাতাতে। নদীয়ার লোক তো বলতই, এখনও বলে, তাদের বাংলাভাষা সবচেয়ে শুদ্ধ ও মধুর। ওদিকে রাঢ়ের ঈশ্বরচন্দ্র-বঙ্কিম প্রভৃতি তখন কলকাতাকে কেন্দ্র করে, তাঁরা যে ভাষা জানেন, বলেন, সেই ভাষাকেই বাংলা সাহিত্যের বাহনরূপে প্রবর্তিত করেছেন। তাই এখনও নদীয়া তথা পূর্ববঙ্গের বহু গুণী খেদ করেন যে, মীর মুশর্‌রফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' যখন প্রকাশিত হল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনে পুস্তকটির পরিপূর্ণ সম্মান দেখাননি।

ওই সময়ে, অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষের দিকে, এ শতাব্দীর গোড়াতে দীনেন্দ্র কুমার তাঁর সামান্য কয়েকটি পল্লিচিত্র ('নোটবুকে'র ভাষায় he wrote sketches of village life in

www.pathagar.com

a reminicent mood...' Generally he starts with a festival and goes on to describe its impact on the different sections of the village population. His pleasant vignettes— পল্লিচিত্রের 'জন্যে এই 'ভিনেৎ' শব্দটি একদম mot juste—born out of acute personal observation, present a microscopic picture of life.) 'ভারতী' পত্রিকাকে পাঠান। তখন সম্পাদিকা ছিলেন খুব সম্ভব সরলা দেবী কিংবা তাঁর মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী। এই ভিনেৎগুলো সম্পাদিকা সানন্দে লুফে নেন এবং বহু বহু গুণী এগুলোর সর্বোত্তম প্রশংসা করেন। এ যেন হঠাৎ একঝলক গাঁয়ের মিঠে মেঠো হাওয়া নগরে ঢুকে শহরের নিরুদ্ধ-নিশ্বাস বাতাসকে মোলায়েম করে দিল। এই চিত্রগুলো ওই সময়ে পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

এর পরের ইতিহাস আমি সঠিক কালানুক্রমিক বলতে পারব না। যতদূর মনে আছে তাই নিবেদন করি।

ওই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার চাকরি নিয়ে বাঙলা দেশে লিখে পাঠান, তাঁকে বাংলা শেখাবার জন্য যেন একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত যে দীনেন্দ্রকুমারকেই পাঠানো হয় এর থেকেই আজকের দিনের পাঠক বুঝে যাবেন, সেদিন বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন কতখানি উচ্চ ছিল। এবং হয়তো যাঁরা তাঁকে মনোনীত করেন তাঁরা চেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের উচ্চারণটিও যেন খাঁটি ন'দের মিষ্টি উচ্চারণ হয়।[১]

কিন্তু দীনেন্দ্রকুমার বরোদায় খুব বেশিকাল থাকেননি।

কারণ ইতোমধ্যে বরোদার মহারাজা, শ্রীঅরবিন্দ, অন্যতম বরোদাপ্রধান খাসে রাও যাদব এবং (বোধহয়) দেশপাণ্ডের মধ্যে কী-সব গুপ্ত মন্ত্রণা হয়, সে সম্বন্ধে আমি সঠিক জানিনে। ফলে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বিপ্লবী আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু এ ভিন্ন কাহিনী।

দীনেন্দ্রকুমার বাঙলায় ফিরে এলেন।

এর পর তাঁর জীবন-কাহিনী আমার কাছে আরও অস্পষ্ট।

---

১. 'বরোদাতে বাঙালি' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ লেখা যায়। ঔপন্যাসিক বেদজ্ঞ সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের নাতি সুপ্রকাশ গাঙ্গুলী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এবং আরও উত্তম উত্তম বাঙালিকে বরোদার মহারাজা সয়াজি রাও কর্ম দেন।... এস্থলে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন আমার আছে। আমার প্রতি দরদী পাঠক ভিন্ন অন্যেরা যেন বাকিটুকু না পড়েন। ১৯৩৪-এ আমি যখন কাইরোতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি তখন ওই সয়াজি রাও আমাকে 'পাকড়ুকে' বরোদায় নিয়ে এসে একটি অত্যুত্তম কর্ম দেন। মহারাজা একদিন আমাকে রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দের অনেক কাহিনী বলার পর আমি দুঃখ করে বলেছিলুম— 'Your Highness! I am your latest and worst choice.' মহারাজ তখন গুন গুন করে সেকালের একটি song-hit গান 'you are not my fist love, but you could be my last love!...এর কিছুদিন পরেই মহারাজ গত হন। এ বাবদে শেষ কথা, ওই সর্বগুণে গুণী মহারাজ ভারতের নানা জাতের ভিতর সবচেয়ে ভালোবাসতেন বাঙালিকে।

www.pathagar.com

তবে আমার মনে সন্দেহ হয়, একালেও যখন বাঙালি সাহিত্যস্রষ্টা শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে দগ্ধ-উদর-জ্বালা শান্ত করতে পারে না[২], তা হলে ভদ্রলোক বোধহয় খুবই অর্থকষ্টে ছিলেন। তখন ১৯১৫, এরকম সময় দীনেন্দ্রকুমার গত্যন্তর না দেখে ডিটেক্টিভ স্টোরি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। তারই নাম 'রহস্য লহরি'। সঠিক অনুবাদ বললে বোধহয় একটু ভুল হয়। যেখানেই সুযোগ পেতেন, সেখানেই কিঞ্চিৎ বঙ্গোপযোগী বাঙালি ধরনধারণ ঢুকিয়ে দিতেন।

এই 'রহস্য লহরি' এদেশে তখন যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, তার বয়ান আজ দেবে কে? সাধুবাদসহ বলি, 'নোটবুক' তার যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়েছেন।

কিন্তু এই উন্মাদনার প্রধান কারণ কী?

আমি দৃঢ়প্রত্যয়, সত্যনিশ্চয় যে-ভাষাতে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর 'রহস্য লহরি' লিখলেন, ওরকম ঝরঝরে, ছিমছাম সরল স্বচ্ছ শীতের নদীস্রোতের মতো শান্ত প্রবহমান বাংলা ভাষা এই দেড়শো বছরের ভিতর অতি অল্প লোকই লিখেছেন।

তা না হলে বলুন তো, বারো বছরের বাঙাল বালক তার সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা বিলাতের গল্প পড়ে অর্ধযামিনী অবধি বিনিদ্র অবস্থায় শিহরিত, কম্পিত, রোমাঞ্চিত হয়ে রইল কেন?

ভাষা, ভাষা, ভাষা! ভাষা বহু তিলিসমাৎ, বহু মিরাক্‌ল, বহু অলৌকিক কর্ম করতে পারে।

দ্বন্দ্ব-পুরাণ

মহাপুরুষদের জীবনধারণ প্রণালি, তাঁদের কর্মকীর্তি এমনকি দৈবেসৈবে তাঁদের খামখেয়ালির আচরণ দেখে তাঁদের শিষ্য-সহচর তথা সমকালীন সাধারণ জন আপন আপন গতানুগতিক ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, কী করে একটা মানুষের পক্ষে এরকম কীর্তিকলাপ আদৌ সম্ভবে। এ-প্রহেলিকার সমাধান না করতে পেরে শেষটায় বলে, 'ওহ্! বুঝেছি। এঁরা অলৌকিক ঐশী শক্তি ধারণ করেন।' তখন আরম্ভ হয় এঁদের সম্বন্ধে কিংবদন্তি

---

২. নবীনরা হয়তো জানেন না এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কী কী মনোবেদনা বাংলা এবং সংস্কৃতে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থকষ্টে যখন মাইকেল মারা যান তখন হেমচন্দ্র লেখেন :

'হায় মা ভারতী,
চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে জন সেবিবে ও-রাঙা চরণ সেই সে দরিদ্র হবে।'

এবং বিদ্যাসাগর মশাই সংস্কৃতে বলেছেন,

'অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে।'

অধমের তার অক্ষম অনুবাদ :

'ওরে পোড়া পেট, কত না কিছুই করি আমি তোর তরে।
বাঁদরীর মতো সরস্বতীরে নাচাচ্ছি ঘরে ঘরে।'

www.pathagar.com

বা লেজেন্ড নির্মাণ। কোন পির ধূলিমুষ্টি স্বর্ণমুষ্টিতে পরিবর্তিত করতে পারতেন, কোন গুরু চেলাদের আবদার-খাঁইয়ে অতিষ্ঠ হয়ে রাগের বশে এক কুষ্ঠরোগীকে পদাঘাত করা মাত্রই তন্মুহূর্তেই, সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়— হরি হে তুমিই সত্য।

ফারসি ভাষাতে তাই প্রবাদ আছে, 'পিরেরা ওড়েন না, তাদের চেলারা ওঁদের ওড়ান'— 'পিরহা নমিপরন্দ, শাগির্দান উন্‌হারি মি পরানন্দ্'— অর্থাৎ 'আমাদের পির উড়তে পারেন। তবে কি না সে অলৌকিক দৃশ্য সবাই দেখতে পায় না।'

অর্থাৎ,

অদ্যাপিও সেই লীলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়—

এস্থলে লক্ষণীয় আপনার-আমার মতো পাঁচু-ভূতোকে নিয়ে কেউ ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র লেজেন্ডও নির্মাণ করে না। করবার কোনও প্রয়োজন বোধ করে না।

তাই আশ্চর্য হলুম একটা ব্যাপার দেখে। কিছুদিন পূর্বে এই গৌড়ভূমির এক মহাপুরুষকে নিয়ে জনৈক সুপণ্ডিত গভীর গবেষণামূলক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য— থিসিস— ওই মহাপুরুষকে নিয়ে যেসব অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে সেগুলো নিছক রূপকথা, সোজা বাংলায় গাঁজা-গুল; আসলে উনি ছিলেন অত্যন্ত সাদামাটা সাধারণ জনের একজন।

এ থিসিস ধোপে কতখানি টেঁকে কি না-টেঁকে সেটা আমি বলতে পারব না— আমার পশ্চাদ্দেশে লোহার শিকলি দিয়ে টাইম বম বেঁধে দিলেও প্রাণ বাঁচাবার জন্যও (যদ্যপি পয়গম্বর সাহেব বলেছেন, 'জান্ বাঁচানো ফর্জ।' নামাজ রোজার মতোই ফর্জ— অর্থাৎ অবশ্য-কর্তব্য কর্ম, না করলে সখ্‌ৎ গুনাহ্ বা কঠিন পাপ হয়)!

তাই আমি ওই লেখককে (তিনি যে সত্যই সুপণ্ডিত সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও দ্বিধা নেই, কারণ আমি তাঁর একাধিক গভীর গবেষণাময় সুচিন্তিত পুস্তক পড়েছি) মাত্র একটি প্রশ্ন শুধোতে চাই। সেই আলোচ্য মহাপুরুষ যদি আসলে অতই সাদামাটা সাধারণজন হন তবে তাঁর সম্বন্ধে অত লেজেন্ড, অত অলৌকিক কাহিনী নির্মাণ করবার দায় পড়েছিল কোন গণ্ডমূর্খ-মণ্ডলীর ওপর! লেজেন্ডগুলো সত্য না মিথ্যা সে বিচারের গুরুভার বিধাতা এ হীনপ্রাণের স্কন্ধে রাখেননি। আমি শুধু জানি, সাধারণজনকে দিয়ে মানুষ অলৌকিক কর্ম করায় না; যদি বা অতি, অতিশয় দৈবেসৈবে, দু-একজনকে নিয়ে লেজেন্ড তৈরি করে, তবে প্রথম পরশুরামের 'বিরিঞ্চি' স্মরণে এনে তার পর কাশীরামদাসের শরণ নিতে হয় :

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে —

তাবৎ লেজেন্ডই যে নৈসর্গিক নিয়মভঙ্গকারী অলৌকিক কর্ম, মিরাক্‌ল হবে, এমন কোনও খুদার কসম বা কালীর কিরে নেই। সাদামাটা, হার্মলেস লেজেন্ড আজকের দিনেও নির্মিত হয়। পাঠক হয়তো প্রত্যয় যাবেন না, কিন্তু হয়, হয় এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ সপ্তম দশকে— অন্তত নব লেজেন্ডের ফাউন্ডেশন স্টোন পোঁতা হয়।

ওই তো সেদিন পত্রান্তরে পড়লুম, জনৈক লেখক লিখেছেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চা পান করতেন না।' আমি তো বিস্ময়ে স্তম্ভিত। আমি তাঁকে বহু-বহুবার চা খেতে দেখেছি, এ-দেশি চা, যাকে সচরাচর ব্ল্যাক টি বলা হয়, উত্তম গোত্রবর্ণের অর্থাৎ, উজ্জ্বল সোনালি রঙের চা হলে

www.pathagar.com

তারিফ করতে শুনেছি। একবার চীন দেশ থেকে গ্রিন টি (যদিও গরম জলে ঢালার পর রঙ এর হয়ে যায় ফিকে লেমন ইয়োলো) আসে গুরুদেবের কাছে। সে চায়ের শেষ পাতাটুকু পর্যন্ত তাঁকে সদ্ব্যবহার করতে দেখেছি।

তা হলে এ লেজেন্ডের মূল উৎস কোথায়? এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চা-বাগানের কুলিদের উপর বর্বর ইংরেজ ম্যানেজার (আই.সি.এস.-দের তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক ভাষায় বক্স-ওয়ালা— কারণ তারা চায়ের বাক্স নিয়ে কারবার করে) কী পৈশাচিক অত্যাচার করত সে-সংবাদ বাঙালি জনসাধারণের কানে এসে পৌঁছয়। তখন চায়ের নামকরণ হয় 'কুলির রক্ত' এবং অনেকেই এই 'কুলির রক্ত' চায়ের পাতা বাড়ি থেকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠান, কাউকে চা পান করতে দেখলে ঘৃণামিশ্রিত উচ্চকণ্ঠে সর্বজনসমক্ষে বলতেন, 'লজ্জা করে না মশাই, কুলির রক্ত পান করতে।' রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলনের খবর রাখতেন; বিশেষ করে যখন স্মরণে আনি, যে-স্বর্গত শশীন্দ্র সিংহ তাঁর সাপ্তাহিক ইংরেজি খবরের কাগজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অকুতোভয়ে চা-বাগানের 'টমকাকার কুটির' লিখে লিখে বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত ছিলেন। অতএব আজ যিনি এক লেজেন্ডের প্রথম চিড়িয়া ওড়ালেন যে রবীন্দ্রনাথ চা খেতেন না, তিনি হয়তো ধরে নিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় তখন আর পাঁচজন সহানুভূতিশীল বাঙালির মতো চা বয়কট করেছিলেন এবং জীবনে আর কখনও চা খাননি। বয়কট হয়তো তিনি করেছিলেন— কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা কিয়ৎকাল (এবং স্মরণে রাখা উচিত সে-যুগে চায়ের এত ছড়াছড়ি ছিল না— বোধহয় মোটামুটি গত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ স্টিমার প্যাসেনজারদের মুফতে চা পান করানো হত), কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত আমি তাঁকে বহুবার চা পান করতে দেখেছি'।[১] তবে চায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনও আসক্তি ছিল না।

প্রায়ই চা ছেড়ে দিয়ে কিছুকালের জন্য অন্য কোনও পানীয়তে চলে যেতেন। গরমের দিন বিকালে চা বড় খেতেন না— বদলে খেতেন বেলের, তরমুজের শরবত (নিমপাতার "শরবতের' কথা সকলেই জানেন)। সকাল-বিকেল ছাড়া অবেলায় টিপিকাল বাঙালির মতো তাঁকে আমি কখনও বেমক্কা চা খেতে দেখিনি। এবং

> বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
> আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনও তার সাজ বাকি।[২]

---

১. ১৯২১-২২ রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন দেহলী বাড়ির উপরের তলায়, নিচের তলায় সস্ত্রীক দিনেন্দ্রনাথ। তার সঙ্গে একেবারে লাগোয়া নতুন বাড়ি হসটেল ঘর। সেখানে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, বিনোদবিহারী ইত্যাদিরা বাস করতেন। শেষ কামরায় স্বর্গত অনাথনাথ বসু এবং আপনাদের স্নেহধন্য এ অধম। সর্বশেষ কামরা রবীন্দ্রনাথের পেন্‌ট্রিরূপে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, কমলাদি (দিনুবাবুর স্ত্রী) রবীন্দ্রনাথের যে দৈনন্দিন আহার্য পানীয় পাঠাতেন সেগুলো প্রথম এ পেন্‌ট্রিতে জড়ো করে (চাকরের নাম ছিল সাধু; বনমালী পরে আসে) রবীন্দ্রনাথকে সার্ভ করা হত। ওই ঘর পেরুবার সময় সবসময়ই চোখে পড়ত আহারাদি কী কী। আমার জানার কথা।

২. এই কবিতাটি নিয়ে আমার মনে ধন্দ আছে। এ দু লাইন থেকে বোঝা যায় কবি ব্যস্ত, চায়ের নেমন্তন্নের জন্য এখনও সাজ করা হয়নি; অথচ তার ঠিক ষোল লাইন পরেই বলেছেন,

www.pathagar.com

স্মরণে আনুন। অবশ্য চায়ের নেমন্তন্নে চা খেতেই হবে এমন আইন হিটলারও করেননি— যদ্যপি তিনি দিনে-রাতে এন্ডলেস (অসংখ্য, অন্তহীন) কাপ্‌স্ অব টি পান করতেন— অতিশয় হালকা, মিন-দুধ।

বস্তুত কি চা, কি মাছ-মাংস কোনও জিনিসেই রবীন্দ্রনাথের আসক্তি ছিল না— যা সামান্য ছিল সেটা মিষ্ট-মিষ্টান্নের প্রতি। টোস্টের উপর প্রায় কোয়ার্টার ইঞ্চি মধুর পলেস্তরা পেতে জীবনের প্রায় শেষ বৎসর অবধি তিনি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ওই বস্তু খেয়েছেন।[৩] মিষ্টান্ন তো বটেই— বিশেষ করে নলেন গুড়ের সন্দেশ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো ভোজনবিলাসী আমি কমই দেখেছি। এবং প্রকৃত ভোজনবিলাসীর মতো পদের আধিক্য ও বৈচিত্র্য থাকলেও পরিমাণে খেতেন কম— তাঁর সেই পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও তার সঙ্গে মানানসই দোহারা দেহ নিয়ে— প্রয়োজনের চেয়ে ঢের কম। ফরাসিতে বলতে গেলে তিনি ছিলেন গুর্‌মে (ভোজনবিলাসী, খুশখানেওলা); গুরমাঁ (পেটুক) বদনাম তাঁকে পওহারী বাবা (এই সাধুজি নাকি শুধুমাত্র পও = বাতাস খেয়ে প্রাণধারণ করতেন) পর্যন্ত দেবেন না।

লেজেন্ড সম্বন্ধে এইবারে শেষকথাটি বলে মূল বক্তব্যে যাব।

লেজেন্ডের একটা বিশেষ সুস্পষ্ট লক্ষণ এই; দার্শনিক বৈজ্ঞানিক গুণীজ্ঞানীরা যতই কট্টর কট্টর অকাট্য যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করুন না কেন যে, বিশেষ কোনও একটা লেজেন্ড সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তবুও তারা সে লেজেন্ড আঁকড়ে ধরে থাকে। এখনও বিস্তর লোক বিশ্বাস করে পৃথিবীটা চেপ্টা; শ্মশানে ভূতপ্রেত, গোরস্তানে মামদো আছে; ইংরেজ বিশ্বাস করে সে পৃথিবীর— সরি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বোৎকৃষ্ট নেশন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এস্থলে আরও বলে নিই; মহাপুরুষদের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে তারাও তাদের সম্বন্ধে বিপরীত লেজেন্ড তৈরি করে। যেমন খ্রিস্টবৈরী ইহুদিরা বলেছে প্রভু খ্রিস্ট ছিলেন মাতাল,

---

বিশেষ কারণে তিনি যে বৃদ্ধ নন সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। (তখন তাঁর বয়েস ৬২) এবং বলেছেন,

> 'এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
> ডাকছে ভোলা "খাবার এল" আমার কী তার হুঁশ আছে?'

এখন প্রশ্ন, কবি এই বললেন তিনি চায়ের নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন এবং তার পরই নাকি ভোলা খাবার নিয়ে এসেছে! তবে কি লখনৌওলাদের মতো বাড়ি থেকে উত্তমরূপে খেয়ে নিয়ে দাওয়াতে যেতেন যাতে করে সেখানে খানদানি কায়দায় কম-সে-কম খাবেন। কিংবা ফরেসডাঙার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মতো— যেখানে নিমন্ত্রিত মাত্র ভোজ্যবস্তুর প্রতি নজর বুলিয়ে জলস্পর্শ না করে বাড়ি ফিরে যান। বিশ্বাস না হয়, অবধূত রচিত 'নীলকণ্ঠ হিমালয়ে' মল্লিখিত মুখবন্ধে এ বাবদে সবিস্তর বর্ণনা পড়ুন।

৩. সিলেট ও খাসিয়া সীমান্তে একরকম অতুলনীয় মধু পাওয়া যায়। এ মধু মৌমাছিরা শুদ্ধমাত্র কমলালেবুর ফুল থেকে সংগ্রহ করে (সিলেটি কমলালেবুও পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্ট এবং সবচেয়ে সুগন্ধি, যদিও জাফার নেবুর চেয়ে সাইজে ছোট)। ছুটিতে দেশে যাবার সময় গুরুদেব আমাকে বললেন, 'পারিস যদি আমার জন্য কিছু কমলামধু নিয়ে আসিস।' আমি খুশি হয়ে বললুম, 'নিশ্চয়ই আনব কিন্তু কাশ্মিরের পদ্মমধু কি এর চেয়ে আরও ভালো নয়?' গুরুদেব স্মিত হাস্য করলেন। ভাবখানা 'কিসে আর কিসে।'

www.pathagar.com

তিনি শুঁড়িদের (পাব্‌লিকান্‌স) ইতরজনের সাহচর্যে উল্লাস বোধ করতেন, এবং নর্তকী বেশ্যাদের সেবা গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না (মেরি ম্যাগডলিন)।

বাঙলা দেশে একটা দল আছে। সেটা কভু-বা বর্ষার প্লাবনে দুর্বার গতিতে বন্যা জাগিয়ে জনপদভূমির সর্বনাশ করে যায় আর কভু বা বৎসরের পর বৎসর ফল্গুধারা পারা অন্তঃসলিলা থাকে। এ দল পরপর রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করে উপস্থিত ফল্গু-পন্থানুযায়ী অন্তঃসলিলা। মোকা পেলে বুজ্‌বুজ্‌ করে বেরুতে চায়। এদের জন্ম নেবার কারণ সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা করব না।

রবীন্দ্রনাথ চা খেতেন না— এটা নিরীহ, হার্মলেস লেজেন্ড। কিন্তু এই দল প্রচার করে যে, রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক অক্ষরও জানতেন না, তিনি ছিলেন সুরকানা, মামুলি রাগরাগিণী তিনি ঘুলিয়ে ফেলতেন এবং বিলিতি গাওন-বাজনার প্রতি তাঁর ছিল অন্ধ ভক্তি। তাই গোড়ার দিকে তাঁর গানের কথাতে সুর দিতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে তাবৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর দিয়েছেন দিনেন্দ্রনাথ!!! এস্থলে পুনরায় বলতে হয় : হরি হে তুমিই সত্য।

দ্বিতীয় লেজেন্ড : আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' রবিঠাকুর রচনা করেন রাজা পঞ্চম জর্জের উদ্দেশে। এদের 'যুক্তি' এই প্রকার :

(১) জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা একজন রাজা (কারণ রাজাই তো জনগণের ভাগ্যনির্ণয় করেন)।

(২) পঞ্চম জর্জ রাজা।

অতএব জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা স্বয়ং পঞ্চম জর্জ।

কুয়োট এরাট ডেমনস্ট্রান্ডুম (Q. E. D.)। আমেন আমেন। সুশীল পাঠক, অবধারিত হোন, যে দল এ-লেজেন্ডের বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল তারা সেটা সত্য জানা সত্ত্বেও সজ্ঞানেই করেছিল। এরা জ্ঞানপাপী। এবং এরা বিলক্ষণ অবগত ছিল, সমসাময়িক বিশ্বাসভাজন শ্রদ্ধেয় গুণীজ্ঞানীরা এই কিম্ভূতকিমাকার থিয়োরিকে দলিলদস্তাবেজ, প্রমাণপত্র, সাক্ষীসাবুদ, যুক্তিতর্ক দ্বারা নস্যাৎ ধূলিসাৎ তো করবেনই, তদুপরি করলারি বা ফাউ হিসেবে আরও প্রমাণ করে দেবেন, এই বিষবৃক্ষ-রোপণকারীরা হস্তীমূর্খ রামপন্টক (কন্টক থেকে কাঁটা, পন্টক থেকে পাঁঠা— জ্ঞানবৃদ্ধ রসসিদ্ধ সুনীতি উবাচ)। কিন্তু এ-দলের চর্ম কাজিরাঙার গণ্ডারবিনিন্দিত বর্মসম স্থূল। তাই আমার যখন একদা চর্মরোগ হয় তখন আমার সখা ও শিষ্য চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ড.— লি আমাকে সলা দেন, 'আপনি পরনিন্দা আরম্ভ করুন। চামড়াটি গণ্ডারের মতো হয়ে যাবে। গণ্ডারের চর্মরোগ হয় না।'

তাই যখন অধুনা খবরের কাগজে দেখতে পাই শ্রীযুক্তা ইন্দিরাকে 'জনগণমন অধিনায়িকা'রূপে উল্লেখ করা হয়েছে তখন আমি রীতিমতো শঙ্কিত হই। আজ ইন্দিরা, কাল জ্যোতিবাবু, পরশু আপনার মতো নিরীহ পাঠককে হয়তো 'জনগণমন-অধিনায়ক' বলে বসবে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের পর্যায়ে তুলে দেবে। কিন্তু এ পয়েন্টটি থাক।

কিন্তু প্রশ্ন এই, জাতীয় সঙ্গীতটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে পঞ্চম জর্জকে শোনালে কি হিজ ম্যাজেস্টি আপ্যায়িত হতেন? মোটেই না।

আইস পাঠক! গানটি বিশ্লেষণ করহ।

www.pathagar.com

'ভারতভাগ্যবিধাতা' যে তিনি, সেকথা শুনে রাজা নিশ্চয়ই মনে মনে শুকনো হাসি হাসতেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন, তিনি তাঁর মাতৃভূমি ইংলন্ডেরও ভাগ্যবিধাতা নন। তাঁর আপন ভাগ্যই নির্ণয় করেন তাঁর (হ্যাঁ 'তাঁরই'— মশকরা আর কারে কয়?) প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের চুড়োয় বসে। তিনি অবশ্য তখন জানতেন না যে তাঁর যুবরাজ রাজা হবার পর যখন এক এড়িকে (লগ্নচ্ছিন্ন = ডিভোর্সড় = তালাকপ্রাপ্তা) বিয়ে করতে চাইবেন তখন তাঁর (!) প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কানটি ধরে দেশ থেকে বের করে দেবেন। এবং তাঁর নাতনি যখন রানি হবেন তখন তাঁর স্বামী রানা ('রাজা'র স্ত্রীলিঙ্গ 'রানি' কিন্তু রানির স্বামী যদি রাজা না হন তবে 'রানি' শব্দ থেকে পুংলিঙ্গ নির্মাণ করে 'রানা' শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাই রানি এলিজাবেথের স্বামী রাজা নন, তিনি রানা) ডুক অব্ এড়ন্‌বরা ভিখিরির টোল-খাওয়া মাখনের টিন হাতে করে পার্লামেন্ট বাড়ির সামনে এসে হাঁকবেন 'দুটো চাল পাই না', আর গেরস্ত-গিন্নি প্রধানমন্ত্রী বাড়ির দরজা এক বুড়ো আঙুল ফাঁক করে (অবশ্য অষ্টরম্ভা দেখিয়ে) বিরক্তকণ্ঠে বলবেন 'ঘরে চাল বাড়ন্ত'। প্রধানমন্ত্রী মুসলমান হলে বলবেন, 'ফিরি মাঙো'— অর্থাৎ 'অন্য বাড়ি যাও'।

এর পর যখন অনুবাদক চারণ বলবে, 'হুজুরকে "জনগণ ঐক্যবিধায়ক" বলা হয়েছে' তখন তিনি বহুযুগসঞ্চিত রাজগৌরব প্রসাদাৎ তাঁর ঠা ঠা করে অট্টহাস্য করার অদমনীয় উচ্ছৃঙ্খলাচরণ দমন করে মনে মনে মৃদু হাস্য করে বলবেন, 'বটেƒ! আমাদের নীতি আমাদের ধর্ম "ডিভাইড অ্যান্ড রুল" "দ্বিধা করে সিধা রাখো"। আর এ প্রাইজ ইডিয়ট বলে কী? আমি নাকি "ঐক্যবিধায়ক"। হোলি জিজস!'

এর পর চারণ কাঁচুমাচু হয়ে বলবে, 'হুজুর মধ্যিখানের প্যারা খুঁজে পাচ্ছিনে। দুসরা কপি এখ্খনি এল বলে। ইতোমধ্যে শেষ প্যারাটি অনুবাদ করি।' রাজা আন্‌মনে শুনতে শুনতে হঠাৎ খাড়া হয়ে বসবেন। 'কী বললে? "পূর্ব গিরিতে রবি উদিল"? রবি তো রবীনডর ন্যাট ট্যাগোর— দ্যাট নেটিভ?'

চারণ সভয়ে বলবে, 'এজ্ঞে হ্যাঁ।' কারণ একথা তো বিলকুল খাঁটি যে রবি কবি পূর্বদেশে, প্রাচ্যে জন্মেছেন, "পূর্ব উদয়গিরিভালে' তিনি রাজটীকা।

রাজা জর্জ তো রেগে টঙ। 'কী, কী-আস্পদ্দা। কাউকে যদি পূর্বদেশে, ভারতে উদয় হইতেই হয় তবে সে হব আমি।' তার পর গরগর করে বলবেন, 'ভাইসরয়টাকে বলো গে, পুবের মণিপুর পাহাড়ের উপর সিংহাসন যেন পাতা হয়। আমি যেখানে উদিত হব। আশ্চর্য, এত বড় একটা ফন্‌ক্‌শন ডংকিগুলো বেবাক ভুলে গেছে। চিফ অব্ প্রটোকল মাস্টার অব্ সেরিমনিজকে এক্ষুনি ডিসমিস কর।'

ইতোমধ্যে মিসিং দুই প্যারা এসে গেছে। অনুবাদক তো ভয়ে কাঁপছে। অনুবাদ করে কী প্রকারে? শেষটায় 'ভয়ে না নির্ভয়ে' ইত্যাদি ফরমুলা কেতাদুরস্ত করে বলল, 'হুজুর, কবি বলছে, আপনি 'চিরসারথি', আপনি শাঁখ বাজাচ্ছেন (হে চিরসারথি তব...শঙ্খধ্বনি বাজে)।'

রাজা তো রেগে টঙ। ক্রোধে জিঘাংসায় বেপথুমান হয়ে হুঙ্কারিলেন, 'কী! এত বড় বেআদবি, বেইজ্জতি বেত্তমিজি! এ তো 'লায়েসা মাজেস্টাস' (laesa majestas)। হিজ ম্যাজেস্টিকে অপমান। অবশ্য নেটিভটা লাতিন লায়েসা মাজেস্টাস জানে না। কিন্তু এটাও কি জানে না, এর চেয়ে শতাংশের একাংশ অপরাধ করেও, কোনও কোনও স্থলে না করেও ব্রিটিশ রাজে লক্ষ লক্ষ লোক ফাঁসি গেছে।

www.pathagar.com

অসহ্য অসহ্য। আমাকে বলছে সারথি। মোটর ড্রাইভার। আমার বাবা এডওয়ার্ড যখন ইহজগতের স্বপ্নাতীত অকল্পনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বপ্রথম ডেমলার গাড়ি নিয়ে তাঁর কাজিন কাইজারকে বার্লিনে দেখতে যান তখন কাইজার বিস্ময়ে অভিভূত ছোট বাচ্চাটার মতো নাগাড়ে সাড়ে-তেরো ঘণ্টা গাড়িটার পালিশের উপর হাত বুলিয়েছিলেন। বাবা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা গাড়ির জন্য বারোটা ড্রাইভার। আর আজ আমাকে— রাজাকে— বলছে আমি মোটরড্রাইভার, শোফার। আমার আস্তাবলে ক-শো ড্রাইভার আছে তার খবর আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি পর্যন্ত জানে না। আর আমি নাকি— ওহ্!'

তার পর বিড়বিড় করে যেন আপন মনে বললেন, 'আর বলছে কী, আমি নাকি 'চিরসারথি'। আমি চিরকাল ড্রাইভার থাকব। পার্মেনেন্ট পোস্ট। আমার প্রমোশন তক হবে না। আমি এমনই নিষ্কর্মা চোতা রদ্দী ড্রাইভার! হোলি মৈরি— হ্যাঁ, নেটিভরা মাইরি বলে বটে— আমি যদি এ লোকটাকে আমার রোলসের চাকায় বেঁধে— না, আগে তো বলডুইনের এজাজৎ চাই। ড্যাম বলডুইন! আর আমি শাঁখ বাজাই। পল্টনের বিউগলে ফুঁ দি। ছি ছি।'

চারণ আবার 'সভয় নির্ভয়' করে নিয়ে বলল, 'হুজুরকে বলেছে স্নেহময়ী মাতা।'

এবারে রাজা লম্ফ দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। অবশ্য অন্য কারণও ছিল।

সিংহাসনে কোচের মতো স্প্রিং থাকে না। থাকে পাতলা একখানি কুশন। কংগ্রেসের সম্মানিত সিডিশাস মেম্বার ভারতীয় ছারপোকার পাল সেখানে বাসা বেঁধে হুজুরের কোমলাঙ্গে তখন ব্যাংকুয়েট পরবের মাঝখানে।

কম্পিত কণ্ঠে রাজা বললেন, 'আমি এখ্খুনি ফিরে যাচ্ছি দেশে। সব সইতে পারি। কিন্তু আমি মা, আমি স্ত্রীলোক! বুঝেছি লোকটার ইনসলেন্স। বলতে চায়, কূটনৈতিক কারণে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য— rasion d' tat— আমি মাগী হওয়া সত্ত্বেও মেকডনাল্ড বলডুইন আমাকে মদ্দার বেশে সাজিয়েছে। আমি আসলে মেনি, ওরা আমাকে পরিয়েছে হুলোর ছদ্মবেশ।'

কাঁপতে কাঁপতে রাজা কার্পেটে বসে পড়লেন। প্রায় কান্নার সুরে বললেন, 'সেদিন শিকারের সময় এক নেটিভ শিকারি বলেছিল, এক আসামি নাকি দারোগাকে বলেছিল, 'হুজুর, আমার মা বাপ।' দারোগা নাকি বলেছিল, 'বাপ হতে পারি, কিন্তু আমাকে মা বলছিস কেন? আমি কী স্যারি (শাড়ি) পরি।' শিকারি আমাকে বলেছিল, 'হুজুর, আসামি যদি শুধু বাপ বলত তবে দারোগা ছেড়ে দিত। মা বলেছিল বলে সেশনে সোপর্দ করল। ফাঁসি হল।' ... দারোগাকে মেনি বলাতে সামান্য দারোগা ফাঁসিকাষ্ঠে চড়াল। আর আমি ইংলন্ডেশ্বর, অ্যান্ড অব্ দি ডমিনিয়নস বিওন্ড দি সিজ, ডিফেন্ডার অব ফেথ, এম্পারার অব্ ইন্ডিয়া। আর এই শেষেরটা কী কাষ্ঠরসিকতা! আমি কি বকিংহম পেলেসে নিভৃতে পেটিকোট পরি, ঠোঁটে নখে আলতা মাখি! ওহ্! অসহ্য অসহ্য!'

তার পর রাজা কোর্ট-গেজেট প্রকাশ করলেন, ওই নেটিভ টেগোরের গান আমার উদ্দেশে লেখা নয়।

তথাপি এ-লেজেন্ড মরে না।

কিন্তু এ কাহিনী এখানে বন্ধ করি। হালে বঙ্কিমচন্দ্রের রামায়ণ-সম্বন্ধে একটি রচনা হিন্দিতে অনুবাদিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লির আদালতে ডবল ফৌজদারি মোকদ্দমা রুজু হয়েছে। বঙ্কিমবাবু নাকি বিস্তর ছুটোছুটি করেও একটা বটতলার চার-আনি মোক্তারও

www.pathagar.com

পাচ্ছেন না— অথচ একদা তিনি স্বয়ং দুঁদে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাবৎ ছাতুখোর খোট্টা চুরনবেচনে-ওলাকে বংশধর লালাজি ব্যারিস্টার দারুণ চটিতং।... পাঠক, তিষ্ঠ ক্ষণকাল— টেলিফোন বাজছে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলুম তাই। এক হিন্দিপ্রেমী সোল্লাসে জানালেন, আজ সকালে বঙ্কিমবাবুর ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।

আমার এ লেখন হিন্দিতে অনূদিত হলে আমার নির্ঘাত ছ মাসের ফাঁসি।

মে মাসের ২৯ তারিখ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গাঁধী শান্তিনিকেতন আশ্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বলা বাহুল্য এই তাঁদের প্রথম পরিচয় নয়। গাঁধীজি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে ভারতে আসেন তখন তিনি প্রায় চার মাস শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ওই সময়ে ৬ মার্চ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।[৪] এর পর ১৯২১-এর পূর্বে উভয়ের আর কোনও মোলাকাত হয়েছিল কি না জানি নে। তবে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ গাঁধীজি জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা করেন। গাঁধীজির উদ্দেশ্য ছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছিলেন সেটা বন্ধ করা এবং কবি যেন সত্যাগ্রহকে অন্তত তাঁর আশীর্বাদটুকু জানান।[৫] বলাবাহুল্য গাঁধীজি অকৃতকার্য হন। এই আলোচনা হয়েছিল রুদ্ধদ্বারে। কবি ও গাঁধীজি ছাড়া এ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র আর একজন— দীনবন্ধু এনড্রুজ। বস্তুত তিনিই এ-দুজনকে একত্র করেছিলেন; তাঁর আশা ছিল, সামনাসামনি আলাপচারি হলে হয়তো দুজনের মতের মিল হয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য তিনি এই দুই প্রখ্যাত ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।[৬]

৪. শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে (পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৫৫) লিখছেন : 'দুই মহাপুরুষের প্রথম সাক্ষাৎকার হইল (৬ মার্চ ১৯১৮)।' পৃ. ৩৭৭। এটা বোধহয় ছাপার ভুল। হবে ১৯১৫।

৫. রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ (একুশ বছরের বড়) কিন্তু গোড়ার থেকেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থন করে গাঁধীকে পত্র লেখেন। গান্ধীজির ভক্তেরা, আশা করি অপরাধ নেবেন না, যদি বলি, হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থরাজির সঙ্গে গান্ধীজির খুব নিবিড় পরিচয় ছিল না। ওদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বশাস্ত্র তথা সর্বদর্শন বিশারদ। তাই গান্ধীজি খুব একটা বল পেয়েছিলেন যে তাঁর আন্দোলন শাস্ত্রসম্মত এবং হিন্দু-ঐতিহ্যপন্থী। দ্বিজেন্দ্রনাথকে গাঁধী ডাকতেন 'বড়দাদা' বলে। ১৬ জুলাই (অর্থাৎ গাঁধী ভেটের প্রায় মাস দেড়েক পূর্বে ১৯২১-এ) রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোমেরিকা ভ্রমণের পর আশ্রমে ঢুকেই দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে যান। কুশলাদি জিগ্যেস করার পর তিনি একাধিকবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা দেন— কারণ তিনি জানতেন, রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলনের বিরোধী কিন্তু অতিশয় নম্রতার সঙ্গে এবং দৃঢ়ভাবে রবীন্দ্রনাথ সে আলোচনার গোড়াপত্তন করতে দিলেন না। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

৬. এ আলোচনার বিবরণী কখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে এনড্রুজ সাহেব আশ্রমে ফিরে ঘরোয়া বৈঠকে আমাদের একটা প্রতিবেদন দেন কিন্তু আমাদের নোট নিতে মানা করেন। আমি ঘরে

www.pathagar.com

এ মোলাকাত সম্বন্ধে একটি হাফ-লেজেন্ড আছে। তবে সেটা অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে। তিনি বললেন, 'এত বড় জব্বর একটা পেল্লাই ব্যাপার এলাহি কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে আর আমরা দেখতে পাব না, শুনতে পাব না? আচ্ছা দেখি।' অর্থাৎ শব্দার্থেই তিনি দেখে নিলেন কি-হোল দিয়ে, কীভাবে দুই জাঁদরেল ও তাঁদের মধ্যিখানের সেতুবন্ধ এনড্রুজ আসন গ্রহণ করেছেন। বিচিত্রা বাড়িতে বিলিতি কেতায় কি-হোল আছে কি না জানিনে; তবে হয়তো তিনজনের আসন নেওয়ার পর বাইরের থেকে দরজায় খিল দেওয়ার পূর্বে তিনি একঝলক দেখে নিয়েছিলেন। আপন বাড়িতে ফিরেই তিনি এঁকে ফেললেন একখানা বেশ বড় সাইজের গ্রুপ ছবি। মুখোমুখি হয়ে বসেছেন দুজনা দু প্রান্তে। তাঁদের বসার ধরন টিপিকাল— ঠিক এই ধরনেই তাঁরা আকছারই বসতেন। আর গাঁধীর পিছনে একপাশে বসেছেন এনড্রুজ। এর তিন মাস পরে বাৎসরিক কলাপ্রদর্শনীতে অবনবাবু ছবিখানি এক্সিবিট করলেন। দাম দেখে তো বিশ্বজনের চক্ষুস্থির। সেই আমলে— আবার বলছি সেই আমলে— পনেরো হাজার টাকা! কে একজন বলল, 'দামটা বড্ড বেশি হয়ে গেল না?' অবনবাবু শেয়ানা বেনের মতো হেসে বললেন, 'বা রে! আমি তো সস্তায় ছাড়ছি। এদের প্রত্যেকের দাম পাঁচ-পাঁচ হাজারের চেয়ে ঢের ঢের বেশি নয় কি?' এ ছবি যখন কেউ কিনল না, তখন অবনবাবু বললেন, 'এটা কাকে দেওয়া যায়? রবিকাকা হেথায়, গাঁধী হোথায়। তবে কি না এনড্রুজের নিবাস বলতে যদি কিছু থাকে তবে সেটা তো রবিকাকার ছায়াতেই। দুজন যখন শান্তিনিকেতনে তখন এটা যাক ওখানকার কলাভবনে।' এ ছবি অনেকেই নিশ্চয় কলাভবনে দেখেছেন— তবে দীর্ঘ ৪৮ বৎসর পর রঙ বড্ড ফিকে হয়ে গিয়েছে।

১৯২৫-এর ২৯ মে গাঁধীজি আবার রবীন্দ্রনাথকে স্বপক্ষে টানবার জন্য শান্তিনিকেতন আসেন এবং দু দিন সেখানে থাকেন। ইতোমধ্যে 'শান্তিনিকেতনেই ৯০ খানা চরকা ও তকলি চলিতেছে— বিধুশেখর, নন্দলাল প্রভৃতি সকলেই চরকা কাটিতেছেন।' আবহাওয়া তা হলে অনুকূল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন : 'তিনি (গাঁধী) শান্তিনিকেতনে আসিতেছেন, রবীন্দ্রনাথের সহিত চরকা সম্বন্ধে আলোচনাই প্রধান উদ্দেশ্য। গাঁধীজি জানিতেন কবি তাঁহার সহিত চরকা সম্বন্ধে একমত নহেন, তবুও বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে, নিজের ঐকান্তিকতার বলে তিনি কবিকে তাঁহার পথে আনিতে পারিবেন। দুই দিন তাঁহাদের দীর্ঘ আলোচনা চলে, বলা বাহুল্য কেহ কাহাকেও নিজ মতে আনিতে পারেন নাই। তৎসত্ত্বেও এখানে বলিয়া রাখি, উভয়ের প্রীতি পূর্ববৎই অক্ষুণ্ন রহিল।'*

২৯-এ গ্রীষ্মাবকাশের মাঝখানে পড়ে। আমি তখন দেশে, সিলেটে।

ফিরে এসে কী আলোচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা কীর্তন শুনলুম। কিন্তু সেসব রসকষহীন আলোচনা নিয়ে লেজেন্ডের গোড়াপত্তন হয় না। আমি বলতে চাই অন্য জিনিস।

ফিরে এসেই গেলুম আমার মুরুব্বি গাঙ্গুলীমশাইকে আদাব-তসলিমাত জানাতে। শুনেছি, ইনি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় বউদির (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী) আত্মীয় ছিলেন। গাঙ্গুলীমশাই

ফিরে যতখানি মনে ছিল গরমাগরম লিখে ফেলি। সে পাণ্ডুলিপি কাবুলে বিদ্রোহের সময় হারিয়ে যায়। তাতে করে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এ আলোচনার সারাংশ না হোক, বিষয়বস্তু পাঠক প্রাগুক্ত পুস্তকের ৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় পাবেন।

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, ৩য় খণ্ড : পৃ. ১৬৪।

www.pathagar.com

ছিলেন শান্তিনিকেতন গেস্ট হাউসের ম্যানেজার। সে আমলে শান্তিনিকেতন মন্দিরের কাছে যে পাকা দোতলা বাড়ি (এইটেই আশ্রমে মহর্ষি-নির্মিত প্রথম বাড়ি এবং বর্তমান বোধহয় বিশ্বভারতীর দর্শন বিভাগের আস্তানা) সেইটেই ছিল গেস্ট হাউস। তারই নিচের তলায় একটি ছোট্ট কামরায় মিলিটারি বুট তথা হাফ মিলিটারি ইউনিফর্ম পরিহিত, হীতলাল প্রভৃতি 'দাসবংশ' কর্তৃক সমাদৃত হয়ে সাতিশয় ফিটফাট রূপে বিরাজ করতেন মহাপ্রতাপান্বিত মহারাজ প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় বা 'গাঙ্গুলীমশাই'। বিরাজ করতেন বললে বড্ডই অল্পোক্তি করা হয়— রামায়ণী ভাষায় বলতে গেলে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় গাঙ্গুলিমশাই ম্যানেজার পদে 'প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে' অতিথিশালায় পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ তথা অষ্টকূলাচল সপ্তসমুদ্র থেকে রবিমন্দ্রিত 'দেশ দেশ নন্দিত করি' ভেরীর আহ্বানে সমাগত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রিস্টানি অতিথি সজ্জনকে যেন 'প্রজাপালন করিতেন'। তাঁর দাপট তাঁর রওয়াবের সামনে দাঁড়াতে পারেন এমন লোক আশ্রমে সে আমলে ছিলেন কমই। লোকে বলে, তিনি যখন গেস্ট হাউসে বসে 'হীতলাল!' বলে হুঙ্কার ছাড়তেন তখন এক ফার্লং দূরে রতন কুটিতে প্রফেসর মার্ক কলিন্সের ছোকরা চাকর পঞ্চা আঁতকে উঠত— তার পিলে চমকে উঠে এপেনডিক্সের সঙ্গে স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হয়ে যেত।

গাঙ্গুলীমশাই ম্যাট্রিক অবধি উঠতে পেরেছিলেন কি না সেকথা বলতে পারি না। তাই পাঠক পেত্যয় যাবেন না যে এঁর আবাল্য অতিশয় অন্তরঙ্গ সখা ছিলেন বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর পুত্র ব্যঙ্গসুনিপুণ অভূতপূর্ব সাহিত্য-সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সম্পাদকমণ্ডলীর মুকুটমণি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক ইনটেলেকচুয়েল বা বুদ্ধিজীবী।

গাঙ্গুলীমশাইয়ের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর, নিটোল পারফেক্‌ট 'রাকোঁতর' স্টোরিটেলার মজলিসতোড় কেচ্ছাবলনেওলা এ পৃথিবীতে আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। রাকোঁতর হিসেবে ওসকার ওয়াইল্ড ছিলেন এ কলার সম্রাট। সে বাবদে যা কিছু লেখা হয়েছে, বিশেষ করে গীতাঞ্জলির ফরাসি অনুবাদক, ১৯৪৮-এ নোবেল প্রাইজ বিভূষিত আঁদ্রে জিদ (এই হালে, ২২ নভেম্বর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী মহাড়ম্বরে ইয়োরোপে উদ্‌যাপিত হল, কিন্তু হায়, কৌলিক রচনার যে প্রখ্যাত লেখক আপন সৃজনকর্ম স্থগিত রেখে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করলেন— তিনি অন্য কোনও মহান লেখকের রচনা অনুবাদ করে তাঁকে এভাবে সম্মানিত করেছেন বলে শুনিনি— যে আঁদ্রে জিদ ইয়োরোপে অজ্ঞাত বাঙালি নামক জাতের শ্রেষ্ঠ ধন ইয়োরোপের বিদগ্ধতম জাতের প্যারিস সমাজে প্রচার করলেন, তাঁকে এই উপলক্ষে কোনও বাঙালি স্মরণ করেছে বলে কানে আসেনি) তাঁর অন্তরঙ্গ সখা ওয়াইল্ড সম্বন্ধে যা লিখেছেন সেসব পড়ার পর রাকোঁতর হিসেবে গাঙ্গুলীমশাইয়ের প্রতি আমার ভক্তি বেড়েছে বই কমেনি। বস্তুত আ লা রিডারস্ ডাইজেস্‌ট্ বলতে হলে ইনিই আমার মোস্‌ট্ অনফরগেটবল্ ক্যারেকটার। এঁর কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি বাংলা ভাষায় চালু ইডিয়ম, প্রবাদ এবং কলকাতার কক্‌নি শব্দ শিখেছি। আমার মতো তাঁর অন্য এক সমঝদার— সাপুড়ে সম্মোহিত সর্পের মতো মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা— ছিলেন 'আনন্দবাজার' গ্রুপের শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার। আমার কথা পেত্যয় না পেলে ওঁয়াকে শুধোবেন।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, বিলকুল বেফায়দা বেকার, আমি গাঙ্গুলীমশাইয়ের সে বয়ানের বন্যা, টৈটম্বুর রসের ছিটেফোঁটাও এই হিম-শীতল, রসকষহীন সিসের ছাপা হরফে প্রকাশ করতে পারব না। একমাত্র লোক যিনি পারতেন তিনি আমার রসের দুনিয়া-আখেরের পিরমুর্‌শিদ 'পরশুরাম' রাজশেখর বসু।

আমি তাঁকে মায়ের দেওয়া এক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট সিলেটি আনারসের মোরব্বা দিলে পর তিনি আমার ললাটে চুম্বন দিলেন, মস্তকাঘ্রাণ করলেন। বেলা তখন একটা। তিনি আহারাদি সমাপন করে খাটে শুয়ে আলবোলায় ফুরুৎ ফুরুৎ মন্দমধুর টান দিচ্ছিলেন। আমাকে আদর করার পর ফের লম্বা হয়ে শুয়ে নলটি তুলে নিলেন। চোখ দুটি বন্ধ করে, কবির ভাষায় 'আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু' বললেন, 'গেরো হে গেরো। এমন গেরো আমার পঞ্চাশ বছরের আয়ুতে কখনও আসেনি। পুলিশের সঙ্গে মারপিট করে অসহ্য মশার কামড়ের মধ্যিখানে তেরাত্তির হাজতে কাটিয়েছি, চন্ননগর মাহেশের ফেস্তাতে যাবার পথে মাঝগঙ্গায় নৌকোডুবিতে হাবুডুবু খেয়েছি— জলে পড়লে আমি আবার নিরেট পাথরবাটি— থিয়েডারের এক হাফ-গেরস্ত মাগী আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল' ইত্যাকার বহুবিধ যাবতীয় ফাঁড়া-মুশকিল গেরো-গর্দিশ বয়ান করার পর বললেন, 'ওসব লস্যি হে লস্যি। ওহ্! এ গেরো যা গেল।'

আমি বললুম, 'এ আশ্রম তো শান্তির নিকেতন। এখানে আবার গেরো?'

গাঙ্গুলীমশাই নল ফেলে দিয়ে যুক্তকরে, মহর্ষির উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন, 'তিনি পিরিলি[৭] বংশের প্রদীপ, আর সেই পিরিলি বংশের এ অধম পিলসুজ দেলকোর ছায়া। পাপ মুখে কী করে বলি, এখানেও মাঝে মাঝে অশান্তির উপদ্রব দেখা দেয়। কিন্তু বাবা, আমা হেন সামান্য প্রাণীকে বলির পাঁঠার মতো বেছে নেওয়া কেন?'

আমি হুঁকোর নলটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললুম, 'হুঁকোটা ল্যান, খুলে কন।'

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'গাঁধী হে, গাঁধী! তোমরা যাকে মহাৎমা ঠহাৎমা বল।' তার পর ফের যুক্তকরে বললেন, 'তারা ব্রহ্মময়ী মা, বজ্রযোগিনী মা, রক্ষে দাও মা এসব মহাৎমাদের লেক লজর থাকে।'

আমি তাজ্জব মেনে বললুম, 'গান্ধীজি তো অতিশয় নিরীহ, নিরুপদ্রবী, ভালো মানুষ। তিনি আপনার গেরো হতে যাবেন কেন?'

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'ওই বুঝলেই তো পাগল সারে। তোমাকে তা হলে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

জানো তো বাপু, দেশ-বিদেশের হোমরা-চোমরা এখানে এলে আকছারই ওঠেন উত্তরায়ণে; বাস করেন হয় গুর্দেবের (প্রাচীন-পন্থীরা 'গুরুদেব' না বলে বলতেন 'গুর্দেব') পাশে, নয় রথীবাবুর ওখানে। আমি তো নিশ্চিন্দি মনে দিব্য গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর উত্তরায়ণের নায়েব গোমস্তা চাকরবাকরদের দেখলেই মনে মনে ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ভাবি,

---

৭. পিরিলি খেতাবটি নাকি মুসলমান বাদশা ঠাকুর গোষ্ঠী এবং তাঁদের আত্মীয়দের দেন। কথাটা 'পির' এবং 'আলী' শব্দের অশুদ্ধ সন্ধি। আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলুম তখন গুরুদেবের এক পিরিলি আত্মীয় ছোকরা আমাকে বলে, 'ভাই তোর নাম মুজতবা আলী, আর আমার বংশের নাম পির আলী। দুজনারই পদবি আলী। আর ওই সিলেটি রাকেশ বলছিল তুই নাকি পির বংশের ছেলেও বটিস। তবেই দ্যাখ, তুই আমার কাছের কুটুম।'

www.pathagar.com

সব ব্যাটা বলির পাঁঠা। গাঁধী মাছ মাংস খান না বটে, কিন্তু মা কালীকেই কী তাঁর উদ্দেশে বলি দেওয়া পাঁঠা কেউ কখনও খেতে দেখেছ? গাঁধী খাবেন না, সত্যি কথা, কিন্তু তাই বলে চাকর নফরের বলি নির্ঘাত। তখন কেমন জানি, কিংবা জানিনে, একটা অহেতুক অজানা শঙ্কা আমার ব্রেন-বক্সের-ব্রহ্মতালুতে ঢুকে সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে পায়ের চেটো দিয়ে বেরিয়ে গেল তোমারই মুখে শোনা,

পাঁঠার বলি দেখে পাঁঠী নাচে।

(পাঁঠা বলে) 'ও পাঁঠী তোমার লাগি বিবির শিরনি আছে ॥'

আমি তখন পাঁঠীর মতো আপন মনে ফিক্‌ফিক্ হাসছি, বিলকুল খেয়াল নেই যে পির বিবির দর্গাতে পাঁঠা বলি হয় না, বলি হয় পাঁঠী, শিরনি চড়াবার জন্যে। সাদামাটা রাঢ়ীতে বলে, 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, সবার একদিন আছে শেষে।'[৮] উত্তমরূপে প্রবাদটি হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বেই দ্যাখ-তো-না-দ্যাখ সঙ্গে সঙ্গে এত্তেলাফরমান উপস্থিত। আমি কি তখন আর জানতুম যে এই ফরমান-পুষ্পগুচ্ছের ভিতর লুকিয়ে আছে গোখরোর বাচ্চা। আমি তো নাপাতে নাপাতে উত্তরায়ণ পৌঁছলুম। পকেট থেকে ডাস্টার বের করে বুটজোড়া পরিষ্কার করে খোলা দরজায় হাফ মিলিটারি মোলায়েম টোকা দিয়ে গুর্দেবের ঘরে ঢুকলুম।

গুর্দেব লেখা বন্ধ করে আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, 'বসো গাঙ্গুলী।' আমি সিভিলিয়ান কায়দায় তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মিলিটারি কেতায় দাঁড়িয়েই রইলুম।

গুর্দেব অত্যন্ত প্রসন্ন বদনে আমাকে বললেন, 'যবে থেকে তুমি এখানে এসেছ, বুঝলে গাঙ্গুলী, আমার ঘাড় থেকে অন্তত একটা বোঝা নেমে গেছে, ভিজিটারদের আরাম-আয়েসের জন্যে আমাকে আর মাথা ঘামাতে হয় না। তুমি একাই একশো; সব সামলাতে পার। আমি তো মনস্থির করে বসেছিলুম গান্ধীজিকে এই উত্তরায়ণেই গেস্ট-রুমে তুলব। কিন্তু আজ এইমাত্র তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেলুম, তিনি দুটি দিন এখানে নির্জনে শান্তিতে বাস করতে চান। তুমি তো জানো, আমার এখানে উদয়াস্ত ভিজিটারের ভিড় লেগেই আছে। তাদের আনাগোনা, বারান্দায় চলাফেরা, আঙিনায় হাঁকডাক গাঁধীর শান্তিভঙ্গ করবে। তাই স্থির করেছি, তোমার গেস্ট হাউসের দোতলাই তাঁর জন্য সবচেয়ে ভালো আবাস হবে; আর তুমি যা-তা ভিজিটারকে ঠেকাতে যে কতখানি ওস্তাদ সে আমি ভালো করেই জানি। তোমার হাতে গাঁধীকে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।'

গাঙ্গুলীমশাই সেই ফাঁসির হুকুমের স্মরণে একটুখানি কেঁপে উঠে কাঁপা গলায় বললেন, 'বাব্বা! আমি আমার ওই গেস্ট হাউস আস্তাবলে গাঁধীকে রাখব কী করে? একটা শোবার ঘরে আছে দুখানা স্প্রিঙের খাট। সে এমনই স্প্রিং যে তার উপর রামমূর্তি সার্কাসের ফেদার-ওয়েট বামনাবতার শুলেও সে-স্প্রিং ক্যাঁচর-ম্যাঁচর করে মেঝের সঙ্গে মিশে যায়। আমাদের পাড়াতে এক পাদ্রি সাহেব লেকচার দিতে গিয়ে বলেন, 'প্রফেট নোআর আমলে সর্ববিশ্বব্যাপী এক বিরাট বন্যা হয়। ঈশ্বরসৃষ্ট তাবৎ প্রাণী, বৃক্ষ, তৈজস-পত্রাদি যাতে সেই বন্যায় লোপ না পায়

৮. শ্রদ্ধেয় সুশীলকুমার দে'র অত্যুত্তম 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে আছে (নং ৪৯৯৯) 'পাঁঠায় কাটে, পাঁঠী নাচে, পাঁঠা বলে মগধেশ্বরী আছে।' সুশীলবাবু এর টীকা লিখতে গিয়ে জে. ডি. এনডারসেন-এর ওপর বরাত দিয়ে বলেছেন, মগধেশ্বরী পুজোতে চট্টগ্রামে পাঁঠী বলি দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

তাই তিনি নোআকে আদেশ দেন, তিনি যেন একটা বিরাট নৌকা গড়ে তার উপর প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক জীব, এমনকি প্রত্যেক আসবাবপত্র জোড়ায় জোড়ায় হেপাজতির সঙ্গে তুলে রাখেন।' গুরুগম্ভীর হয়ে এতখানি শাস্ত্রালোচনা করার পর গাঙ্গুলীমশাই ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জিরিয়ে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আমার মনে রত্তিভর সন্দ নেই যে আমার গেস্ট হাউসের উপরের তলায় যে দুটি খাট আছে সেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বময় ঘোরাঘুরি করে শেষটায় আশ্রয় পেল দেবেন্দ্রনাথের চরণপ্রান্তে। আফটার অল্ তিনি তো প্রফেট— নোআরই মতন গত শতাব্দীর প্রফেট।'

এস্থলে বলে রাখা প্রয়োজন, গাঙ্গুলীমশাই ছেলেবেলা থেকেই সে যুগের বিলিতি— এদেশে একদম বেখাপ্পা— ডবল খাট, ড্রেসিং টেবিল, এস্ক্রিতোয়ার, বিদে, চায়না ইত্যাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনিই আমাকে একদিন বলেছিলেন যে তাঁর ধনী ঠাকুদ্দা তাঁর ভিলাটি সাজিয়েছিলেন ন'সিকে বিলিতি কায়দায়— একমাত্র ডাব্‌ল সি টা ছিল ব্যত্যয়, নেটিভ স্টাইলে গোড়ালির উপর বসে কর্মটি সমাধান করতে হত। তা সে যাই হোক, গাঁধীজির অভ্যর্থনার জন্য যেটুকু মিনিমামেস্ট দরকার সে তিনি পাবেন কোথায়, গাঙ্গুলীমশায়ের ভাষায় 'আফটার অল লোকটা তো বিলেতে ব্যারিস্টারি পাস করেছে।'

গাঙ্গুলীমশাই বলে যেতে লাগলেন, 'গুর্দেব বোধহয় আমার হতভম্ব ভাব দেখে ভরসা দেবার জন্য বললেন, "তোমার যা যা দরকার আমার এখান থেকে, রথী আর বউমার বাড়ি থেকে নিয়ে যেও।" আহ্! কথাটি শুনে পেরানটি জুড়িয়ে গেল। ওঁয়ার আছেটা কী? এরকম কম আসবাবপত্র নিয়ে তাঁর ক্রিচারস কম্ফর্ট পোষায় কী করে জানেন ব্রহ্মময়ী।[৯] অবশ্য রথীবাবুর বাড়িতে এটা-সেটা আছে, কিন্তু একটা ভদ্রলোকের বাড়ি তো আর লাজারসের গুদাম নয় যে প্রত্যেক আইটেম্ দু-তিন দফে করে থাকবে। ও বাড়ি থেকে আমার যা দরকার— খাট সোফা কোচ, নতুন পর্দা, লেখা-পড়ার জন্য উত্তম টেবিল-চেয়ার, একটা পেনট্রির আসবাবপত্র যেখানে খাবার জড় করা হবে, ডাইনিংরুমের জন্য একটা সাইডবর্ড যেখানে পেনট্রি থেকে আসা খাবারের ডিস ডিনার টেবিলে সার্ভ করার পূর্বে রাখা হয়, হল-মার্কওলা উত্তম রুপোর ছুরি-কাঁটা—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'অবাক করলেন, গাঙ্গুলীমশাই! আপনি আমাকে সেই বুদ্ধু স্নব ইংরেজের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ফরাসি ভাষা জানে না; প্যারিসের রেস্তোরাঁয় তাই আঙুল দিয়ে মেনুতে দেখিয়ে দিল প্রথম পদ। এল সুপ। এবার স্নব আঙুল দিল মেনুর মধ্যিখানে। ভাবল, মাছ-মাংস ওই ধরনের কিছু একটা সলিড় সাব্‌স্টেনশাল আসবে— ফরাসিতে যাকে বলে 'পিয়েস দ্য রেজিস্‌তাঁস' অর্থাৎ যে বস্তু (পিস) আপনার ক্ষুধাকে মোক্ষম রেজিসটেন্স

৯. কথাটা খুবই সত্য। প্রাগুক্ত দেহলী বাড়িতে যখন কবি থাকতেন তখন দেখেছি তাঁর ছিল (১) দু-খানা তক্তপোশ জুড়ে একটি ফরাস— তার গদি কোয়ার্টার ইঞ্চি পুরু হয় কি না হয় (২) মেঝে পড়াশোনার জন্য যেরকম মিনিয়েচার টেবিল দেয় তারই এক প্রস্থ ও একখানা চেয়ার (৩) সামনে ন্যাড়া ছাতের উপর দু-একখানা বেতের কুশনহীন চেয়ার এবং (৪) বোধহয় উপাসনা করার জন্য একখানা হেলানো-হাতাহীন জলচৌকির মতো কাষ্ঠাসন। গোসলখানায় কী কী মহামূল্যবান জিনিস ছিল দেখিনি, তবে এমনই একটা সঙ্কীর্ণ করিডরের মতো ফালি জায়গায় সেটা ছিল যে সেখানে নূরজাহানের হাম্মাম থাকার কথা নয়।

www.pathagar.com

দেবে। ও হরি! ফের এল সুপ। খানাপিনা বাবদে হটেনটট গোত্রের ইংরেজ জানবে কী করে বিদগ্ধ ফরাসি জাত মেনুতে নিদেন ত্রিশ রকমের সুপ রাখে (হটেনটট গোরা বলে, উই ইট টু লিভ, আর বিদগ্ধ ফরাসি বলে, উই লিভ টু ইট)। এদিকে ইংরেজের রেস্ত ফুরিয়ে এসেছে। পুডিং মুডিং-এর আশায় দেখাল সর্বশেষ আইটেম। এল টুথ পেক— খড়কে। বুঝুন ঠ্যালা। তরলতম দু-কিস্তি সুপ খেয়ে, 'পান করে' বললে সঠিকতর হয়, খড়কে দিয়ে দাঁড়ি খোঁটা! আপনি যে ইংরেজটাকেও হার মানাতে চললেন। করমচান্দের সুযোগ্য সন্তান মোহনদাস গাঁধী তো শুনি খান— বা পান করেন— প্যাঁজের শুরুয়া বা সুপ, সে-ও অতি হালকা আর বকরির দুধ। ওই দুই তরল দ্রব্য মুখে পৌঁছে দেবার জন্য আপনি ওঁকে হাতে তুলে দেবেন হ্যামিলটন কোম্পানির হল মার্কওলা রুপোর ছুরি আর কাঁটা! ভাগ্যিস আপনি চীনের ইম্পিরিয়াল পেলেস থেকে হীরে পান্না বসানো চপ স্টিক রেকুইজেশন করেননি।'

গাঙ্গুলীমশাই ঠোঁটের এককোণ দিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে ধুঁয়ো ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'তোমার যেমন আক্কেল। যে ভিখিরি কুকুরের সঙ্গে মারামারি করতে করতে ডাস্টবিন থেকে খুঁজে খুঁজে খুঁটে খুঁটে অখাদ্য খায়, তাকে খেতে ডাকলে কী রাস্তা থেকে বাড়িতে একটা ডাস্টবিন তুলে এনে সেই ময়লার ভিতর সেই অখাদ্যই রাখ নাকি, যেটা সে নিত্যি নিত্যি খায়? আর দু-তিনটে ঘেয়ো কুকুর লড়াই করার জন্য?

আরে বাপু, যার যা বেস্ট, মেহমানকে সেইটে দিতে হয়। আমি তাই দিন তিনেক উদয়াস্ত খেটে উপরের তলার তিনখানা ঘর সাজালুম। খুব যে মন্দ হল তা বলব না। অবশ্য দুর্গা নাম জপ এক সেকেন্ডের তরেও কামাই দিইনি।

মহারাজ আসবার আগের দিন বেলা প্রায় দশটার সময়— গর্মি তখন নিদেন ১১২ ডিগ্রি— দেখি, কে যেন মিন-ছাতায় রোদ্দুর ভেঙে ভেঙে আসছে। কে? চোখ কচলে দেখি— সর্বনাশ— জাব্বাজোব্বা পরা গুর্দেব। প্রথমটায় ভেবেছিলুম মহর্ষিদেবের ছায়া-শরীর। জানো, বোধহয়, অনেকেই জ্যোৎস্নারাতে দেখেছে, সাদা আলখাল্লা পরা তাঁর ছায়াকায়া মন্দির থেকে বেরিয়ে তাঁর মর্তের বাসভবনে এই গেস্ট হাউসের দিকে আসছেন। এবার বুঝি ঠা ঠা রোদ্দুরে। তবে ভরসা এই, কাছে গেলেই উপে যাবেন।'

আমি বললুম, 'যত সব গাঁজা। মহর্ষিদেব এ মন্দির কখনও দেখেননি। শুনেছি, মহর্ষির আদেশে হাভেল সাহেব না কে যেন আর অবন ঠাকুরে মিলে এটার প্ল্যান করেন। এটার প্রতি পরলোকে গিয়েও তাঁর মোহ থাকবে কেন?'

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'আমি তো পড়িমরি হয়ে ছুটলাম গুর্দেবের দিকে, রঙচটা বাঁশের ছাতাখানা নিয়ে। তিনি ছাতাখানা উপেক্ষা করে মৃদু হেসে বললেন, "দেখি গাঙ্গুলী, অতিথি সৎকারের কী ব্যবস্থা করেছ"।'

গাঙ্গুলী মহাশয়ের সর্বাঙ্গে সভয় কম্পনের শিহরণ খেলে গেল— গুরুদেবের ওই অত্যন্ত হার্মলেস ইচ্ছা প্রকাশের স্মরণে। বললেন, 'সবাই আমাকে ভরসা দিয়েছিল, গাঁধী কিছুতেই গুর্দেবকে এ বাড়িতে তকলিফ বরদাস্ত করে আসতে দেবেন না। তিনি যাবেন স্বয়ং— যতবার প্রয়োজন হয়— উত্তরায়ণে, যাত্রী যেরকম ভক্তিভরে তীর্থস্থলে যায়। কাজেই গুর্দেব আমার জোড়াতালির ঘর-সাজানো দেখতে পাবেন না। এখন উপায়?— এক ঝটকায় মা কালীর ঘুষ ডবল করে দিলুম— দুটোর বদলে চারটে মোষ।

www.pathagar.com

হায়, হায়, হায়। গেরো, গেরো, গেরো। গুর্দেব ঘরে ঢুকেই বললেন, "এসব করেছ কী হে! সব যে বিলিতি মাল। ব্রাস রডওলা স্প্রিং খাট! সর্বনাশ। বের কর, বের কর টেনে। এখ্‌খুনি। আর লোক পাঠাও, দেরি কর না— অমুকের বাড়িতে বিয়ের সময়ে সে পেয়েছিল চীনে মিস্ত্রির হাতে খোদাই করা করা একখানা জবরদস্ত কাঠের পালঙ্ক। আনাও সেটা। আর এসব যে এক্কেবারে বিলিতি বেড্‌ শিট, বালিশের ওয়াড়। তুমিই যাও, গাঙ্গুলী, হ্যাঁ তুমিই যাও, বউমার কাছে। তাঁর গুদামঘরে আমার একটা মস্ত বড় সিন্দুক আছে। তার ভিতর খদ্দরের সব জিনিস পাবে। আমি যখন গেলবার আহমদাবাদ গিয়েছিলুম তখন সবাই আমাকে চেপে ধরল খদ্দর পরার জন্য। আমি বললুম অত মোটা কাপড় আমার সয় না। তারা যেন চ্যালেন্‌জ্‌টা তুলে নিল। ধুতি, পাঞ্জাবির অতি মিহিন কাপড় থেকে আরম্ভ করে বিছানার চাদর, ওয়াড়— এমনকি খদ্দরের মশারি। না হে না, তুমি ভাবছ ওর ভিতর মানুষ দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। মোটেই না। এমনই মিহিন যেন মসলিন। ভিতরে যে শুয়ে আছে তার দিকে বাইরের থেকে তাকালে মনে হয় মাঝখানে কোনও মশারি নেই।"

হঠাৎ কার্পেটের দিকে নজর যেতে ফের হুকুম, "ফেলে দাও এটাও।" তার পর কী যেন ভাবতে গিয়ে উপরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল বিজলিবাতির বাল্‌ব। চিন্তিতভাবে যেন আপন মনে বললেন, "এটাকে নিয়ে কী করা যায়?" আমাকে বললেন, "হ্যাঁ, বউমার ওখানে যাবার সময় নন্দলাল আর ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দিও।" আমি সব আদেশ তামিল করার সময় ভাবলুম, হনুমানজিকে কে বলে সরল? তিনি তাঁর মুনিবটিকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। এখন বলছেন, "লে আও বিশল্যকরণী"। আনা মাত্রই হয়তো ফের হুকুম— "ওই য্‌-যা। বিবস্ত্রতারিণীর কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। যাও তো বৎস পবননন্দন হনুমান পবনগতিতে। নিয়ে এস ওই বস্তুটি।" তখন ঘণ্টাতে ঘণ্টাতে যাও ফের ওই মোকামে। ক-বার যেতে আসতে হবে সে কি স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্রই জানেন? অতএব নিয়ে চল সমূচা গন্ধমাদনটাকে। আর এস্থলে স্মরণ কর, আমাদের গুর্দেবের বাবামশাই কী করতেন? ঘড়ি ঘড়ি মত বদলাতেন বলে তাঁর খাস সহচর দুদিন অন্তর অন্তর বিদেশ থেকে টেলি পাঠাতেন, 'বাবু চেন্‌জেস হিজ় মাইন্ড।' পুত্রের যে সেটা অর্সায়নি কী করে জানব? আমি নিয়ে চললুম গন্ধমাদন প্রমাণ সেই বিরাট সিন্দুকটাকে। আমার অবশ্য সুবিধে, আমাকে তো ওটা বইতে হবে না। বইবে ব্যাটা হীতলাল, কালো, ভোলা, বঙ্কা গয়রহ্‌।

গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেখি, চীনা পালঙ্ক তখনও আসেনি। খবর পেলুম সক্কলের পয়লা এসে পৌঁছেছেন ঠানদি (ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী)। সেটা অতিশয় স্বাভাবিক। তাঁর নাম কিরণ। তাঁর টাট্টু ঘোড়ার মতো চলন দেখে ক্ষিতিবাবুই একদিন বলেছিলেন, 'সার্থক নাম কিরণ! কী run দেখেছ?"

উপরে গিয়ে দেখি তুলকালাম কাণ্ড। ঠানদি এবং জনা তিন-চার এক্সপার্ট মহিলা লেগে গেছেন ঠিক সেন্ট্রাল বাতিটার নিচে দুনিয়ার যত কঠিন কারুকার্য ভরা বিরাট গোল একটা আল্পনা আঁকতে। গুর্দেব এককোণে চুপ করে বসে বসে সব দেখছেন। এমন সময় নন্দলাল এলেন। গুর্দেব তাঁকে বললেন, "এক কাজ কর তো নন্দলাল। ওই বাল্‌বটাকে আড়াল করতে হবে। তুমি এটার নিচে একটা পেতলের চেপ্টা ফ্লাওয়ার ভাজ্‌ ছাত থেকে সরু সরু চেন দিয়ে ঝুলিয়ে দাও তো। ঠিক মানানসই সাইজ ও শেপের ও-রকম একটা ভাজ্‌ বউমার আছে।

www.pathagar.com

আর ভাজ্ ভর্তি করে দাও পদ্মফুল দিয়ে, কুঁড়িগুলো যেন গোল হয়ে বাইরের দিকে মাথা ঝুলিয়ে দেয়। বিজলির আলো আসবে পদ্ম পাপড়ির ফাঁকে ফাঁকে। কী বললে? পদ্ম না-ও পাওয়া যেতে পারে! নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। একটু দূরে লোক পাঠালেই হবে। নইলে মানানসই অন্য ফুল?" নন্দলাল মাথা নেড়ে জানালেন হয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে সেই মানওয়ারি জাহাজ সাইজের পালঙ্ক এল।

আমি এ কাপড়, ও শিট দেখাই। তিনি নামঞ্জুর করেন। শেষটায় না পেরে বললুম, "সিন্দুকটা নিচে রয়েছে। উপরে নিয়ে আসব কি?" এক ঝলক হেসে বললেন, "না, আমি নিচে যাচ্ছি।" সেখানে চেয়ারে বসে শেষ রুমাল অবধি নেড়ে-চেড়ে পরখ করলেন, বাছাই করলেন। তার পর ফের উপরে এসে চেয়ারে বসে বিছানা তৈরি করা বাবদে পই পই করে বাত্লালেন, কোন শিটটা উপরে যাবে, কোনটা নিচে ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও মেলা মেলা বায়নাক্কা ঝামেলা। জলের কুঁজোটা কোথায় থাকবে, নাইট-টেবিলের পাশে ছোট্ট শেলফে কী কী বই থাকবে— সেসব কথা বলতে গেলে বাকি দিনটা, চাই কি রাতটাও কাবার হয়ে যেতে পারে। সংক্ষেপে সারি। হঠাৎ বললেন, "চল গাঙ্গুলী, স্নানের ঘর দেখে আসি।" ঢুকেই বললেন, "এ কী কাণ্ড! সরাও এখ্খুনি ওই জিনক্ টাব্টা। নিয়ে এস আমার স্নানের ঘর থেকে পেতলের বড় গামলাটা। আর ওখানেই একটা বোয়ামে আছে বেসন। নিয়ে এস একটা রুপোর কৌটোতে করে। সাবানটা সরাও।" আমি বললুম, "ওটা গডরেজের ভেজিটেবল সোপ।" "তা হোক। ফেলে দাও ওটা। আর ওই টার্কিশ টাওয়েলটাও সরাও। সিন্দুক থেকে নিয়ে এস খদ্দরের তোয়ালে, আর একখানা সবচেয়ে সরেস গামছা। নিমের দাঁতন কই?" আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, "ওঁর তো দাঁত নেই, আর্টিফিসিয়াল আছে কি না জানিনে।" "তা হোক, নিয়ে এস দাঁতন। আর ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে বল, আজই যেন সুপরি পুড়িয়ে— বাকি সব তিনি জানেন— টুথ পাউডার বানিয়ে পাঠিয়ে দিতে।" বুঝলুম, কোনও নবীন দশনসংস্কারচূর্ণ— ক্ষিতিমোহনের স্ত্রী বদ্যি-গিন্নি তো।

করে করে সবকটা তৈরি হল। সেই ১১৪ গরমে আর ক্লান্তিতে আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। বৃদ্ধ প্রভু কিন্তু খুট খুট করে দিব্য এ-ঘর ও-ঘর করছেন।'

দম নিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বিরাট এক তাওয়া সাজাতে সাজাতে বললেন, 'তোমার প্রাণ যা চায় সেই দিব্যি, কসম, কিরে আমাকে কাটতে বললে আমি এখ্খুনি সেইটে কেটে বলব আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস কোনও বধূ তার বরের জন্য, কোনও প্রেমিক তার প্রিয়ার জন্য কস্মিনকালেও এরকম বাসরঘর মিলনশয্যা তৈরি করেনি। আর গুর্দেবও এ কর্ম পূর্বে কখনও করেননি সে বিষয়ে আমি আদালতে তিন সত্যির দোহাই দিয়ে কসম খেতে রাজি আছি।

আরেকটা কথা শোন, সৈয়দ। গুর্দেবের মতো স্পর্শকাতর, সুন্দরের পূজারি যখন সব হৃদয় ঢেলে দিয়ে কোনও কিছু সুন্দর করে গড়ে তুলতে চান— এই যেমন এ বাড়িটাকে তার চরম সুন্দর রূপ দেওয়া— তখন তাঁর হাজার মাইল কাছেও আসতে পারে কোন প্রফেশনাল ডেকোরেটরের গোঁসাই!

আর সমস্ত জিনিসটা ছিল অত্যন্ত সিমপল অথচ প্রত্যেকটি জিনিস থেকে উথলে উঠছিল সৌন্দর্য।'

আমি শুধালুম, 'তার পর?'

www.pathagar.com

গাঙ্গুলীমশাই শান্তকণ্ঠে বললেন, 'এখানেই কাহিনীটি শেষ করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তুমি যখন আদ্যন্ত শুনতে চাও তবে কী আর করি? বলি।

গাঁধীজিকে উপরের তলায় নিয়ে গেলেন স্বয়ং গুর্দেব। আমি তাঁর ধরা-ছোঁওয়ার ভিতরে— যদি-বা কোনও কিছুর দরকার হয়। তাই সব দেখেছিলুম, সব শুনেছিলুম। দুই হিমালয়ের সাক্ষাৎ, উভয়ের মধ্যে গভীরতম প্রীতি— এমনকি সংঘাত। সেই মোকা ছাড়ব আমি! হেঃ!

বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট লক্ষ করলুম, গাঁধী যেন দু-চারটে জিনিস দেখলেন, কিন্তু কোনও কিছুই লক্ষ করলেন না। আল্পনা, মাথার উপরে ফুলের ডালি, তাজমহলের মতো খাটবিছানা, বেডকভারের ঠিক মাঝখানে বাটিকে কাজ করা নিটোল গোল মেডালিয়নের ভিতর সেই অজন্তার ছবি, যেখানে একটি তরুণী দু-ভাঁজ হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রভু বুদ্ধের পদতলে পদ্মফুলের অঞ্জলি দিচ্ছে।

কোনও-কিছুই যেন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না।

তার পর তিনি আস্তে আস্তে উত্তরের খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি যেন মন্দির পেরিয়ে টাটা বিলডিং ছাড়িয়ে কোন সুদূরে চলে গেছে। হঠাৎ গুর্দেবের দিকে ফিরে বললেন, 'এরই কাছে ছাতে যাবার সিঁড়ি আছে না? চলুন।' ছাতে গিয়ে দুজনাতে অল্প একটু পাইচারি করার পর গাঁধী একগাল হেসে বললেন, 'আমি এই ছাতেই বাসা বাঁধব। ভারি চমৎকার!'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'তার মানে?'

'মানে আর কী? পড়ে রইল সব নিচে। আমি তাঁকে কক্‌খনও ওই বেডরুমের একটিমাত্র জিনিসও ব্যবহার করতে দেখিনি। অবশ্য একথা ঠিক, যে দুটি দিন এখানে ছিলেন তার অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন উত্তরায়ণে, গুর্দেবের সঙ্গে আর বড়বাবুর (দ্বিজেন্দ্রনাথের) সান্নিধ্যে। বড়বাবুর কাছ থেকে বুড়ো ফিরছিলেন হাসিখুশি ভরা ডগমগ মুখে, আর গুর্দেবের কাছ থেকে চিন্তাকুল বদনে। রাত্রি কাটাতেন ছাতে।' গাঙ্গুলীমশাই থামলেন।

অনেকক্ষণ গভীর চিন্তা করার পর বললেন, 'আমি পলিটিক্স একবর্ণও বুঝিনে। গাঁধীর লেখা এক ছত্রও পড়িনি আর গুর্দেবের সামান্য যেটুকু পড়েছি সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমার মতামতের কোনও মূল্য নেই। তবু বলি, এবারও গাঁধী-গুর্দেবে মনের মিল হল না। কিন্তু আমার মনে হয় এবারেই ছিল বেস্ট চান্‌স্। আমার মনে হয়, গাঁধী যদি ওই আল্পনা, পদ্মফুলের আলো এবং গুর্দেবের আরও পাঁচটা সযত্নে সাজানো নেড়েচেড়ে দেখতেন, একটুখানি কদর দেখাতেন তা হলে গুর্দেবের দিলটা একটু মোলায়েম হত। লোকে বলে গাঁধী সত্যের পূজারি আর গুর্দেব নাকি সুন্দরের পূজারি! কিন্তু গুর্দেব যে সত্যেরও পূজারী সে-ও তো জানা কথা। গাঁধীও নিশ্চয়ই সুন্দর জিনিস ভালোবাসেন— কে বাসে না, কও! কিন্তু তার কোনও লক্ষণ আমার পাপ চোখে পড়েনি। তাই আমার মনে হয় গাঁধী যদি তাঁর জন্য সাজানো ঘরটাকে একটু পুজো করতেন— মানে একটু আদর করতেন— তা হলে গুর্দেব ভাবতেন, 'এ লোকটা ভিতরে ভিতরে সুন্দরেরও পূজা করে। আমার বংশের না হোক, আমার গোত্রেরই লোক।' তাই হয়তো একটা সমঝাওতা হয়ে যেত।

আবার দেখ, গাঁধীজি তাঁর সত্য-উপলব্ধির প্রতীক চরকা সবাইকে বিলোচ্ছেন। আমরা হাত পেতে নিচ্ছি কিন্তু আমরা কোনও প্রতিদান দিচ্ছিনে— কারণ আমাদের মতো সাধারণ

www.pathagar.com

লোকের কীই-বা আছে যে তাঁকে দেব? কিন্তু গুর্দেবের বেলা তো সেকথা নয়। তিনি সুন্দরের পূজা করে অনেককিছু পেয়েছেন। কই, গাঁধী তো তাঁর কাছ থেকে নিলেন না! এমনকি এই যে সামান্য সাজানো কামরা কটি— তার ফুল, কিছু আল্পনা কোনওকিছুই লক্ষ করলেন না— গ্রহণ করলেন না।

তাই বলি, সৈয়দ, সংসারটা চলে গিভ অ্যান্‌ড্ টেকের ওপর।'

উপসংহারে নিবেদন, বলা বাহুল্য, গুরুদেবকে নিয়ে যে আমি উত্তম পুরুষে কথা বলিয়েছি তার অধিকাংশই আমার কল্পনাপ্রসূত। কারণ যদিও গাঙ্গুলীমশাই গুরুদেবের কথাবার্তার চোদ্দ আনা আমাকে সে সময়ে ঠিক ঠিকই বলেছিলেন তবু ভুললে চলবে না, পূর্বেই নিবেদন করেছি, গাঙ্গুলীমশাই ছিলেন পয়লা নম্বরি কীর্তনিয়া— রাকোঁতর। নিশ্চয়ই তাঁর বর্ণনায় বেশ খানিকটে রঙচঙ চড়িয়ে ছিলেন— ইচ্ছা-অনিচ্ছায়।

তদুপরি তিনি আমাকে কাহিনীটি বলেন, ১৯২৫-এ। আর আমি এ কাহিনী লিখছি ১৯৬৯-এ!! কিন্তু মূল ঘটনাগুলো যে সত্য তার গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি (কারণ এ ঘটনা পরে আরেকবার ঘটে— তবে সেখানে পাত্র গাঁধী ও মুসসোলিনির প্রতিভূ এক জাহাজ-কাপ্তান)।

অবশ্য আমি দুই লাইনেই এ কাহিনী শেষ করতে পারতুম। যথা :

'গুরুদেব অতিশয় সযত্নে ঘর সাজালেন। তার সৌন্দর্য গাঁধীজির চোখে পড়ল না।' কিন্তু তা হলে তো লেজেন্ডের গোড়াপত্তন হয় না— 'রবিপুরাণ' দ্বন্দ্বকাহিনী নির্মিত হয় না।

আরেকটি কথা বলার খুব যে একটা প্রয়োজন আছে তা নয়। তবু বলি। সুচতুর পাঠক অতি অবশ্যই বুঝে গিয়েছেন, গুরুদেবের মুখে আমি যে ভাষা বসিয়েছি, অতি অবশ্যই গুরুদেব ওরকম কাঁচা বাংলা বলতেন না। এবং সহৃদয় পাঠক বুঝে গিয়েছেন বলেই আমাকে মাফও করে দিয়েছেন। প্রবাদ আছে— 'টু আন্‌ডারস্টেন্ড ইজ টু ফরগিভ্'।

এবং গাঙ্গুলীমশাইয়ের ভাষারও জেল্লাই জ্রৌলুস জ্যান্ত জিন্দা করতে পারিনি আমি— দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর পর।

সর্বশেষে বক্তব্য এটা লেজেন্ড, রূপকথা, পুরাণ। ইতিহাস নয়।

'দ্বন্দ্বপুরাণ' উপরেই শেষ হল। কিন্তু গাঁধী-পুরাণের অন্য এক কাহিনীর ইঙ্গিত আমি এইমাত্র দিয়েছি। সেটি বলিনি। সে-ও মজাদার।

দ্বন্দ্বপুরাণের ছ বছর পরের ঘটনা। ১৯৩১ রাউন্ড-টেবিল সেরে গাঁধীজি দেশে ফেরার জন্য বেছে নিলেন একখানা ইতালির জাহাজ। ইল দুচে বেনিতো মুসসোলিনি তো ড্যাম গ্ল্যাড্। (ওদিকে জর্মন জাত বড় নিরাশ হয়েছিল। গাঁধী বলেছিলেন, রাউন্ড-টেবিলে তিনি যদি সফলতা লাভ করেন তবে ইয়োরোপে যে একটিমাত্র জায়গা দেখার তাঁর ঐকান্তিক কামনা আছে সেটিকে তিনি তীর্থযাত্রীরূপে শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশে ফিরবেন— ভাইমার, কবি গ্যোটের লীলাভূমি ও সমাধিস্থল। কিন্তু গোলটেবিলে নিষ্ফল হলেন বলে সোজা দেশে ফেরেন।) মুসসোলিনি খবর পাওয়া মাত্র বললেন, 'যে জাহাজে গাঁধী যাবেন সেটা অত্যুত্তম, কিন্তু তার সেরার সেরা 'কাবিনা লুস্‌সোরিয়োজা' (সাধু সাবধান!— ইতালীয় ভাষার সঙ্গে আমার অতি সামান্য নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পরিচয়— ভুল হতে পারে। অর্থ হচ্ছে কাবিন দ্য ল্যুক্‌স্,

www.pathagar.com

লাকসারি কেবিন, সবচেয়ে আক্রা ভাড়ার বিলাস কেবিন) নিশ্চয়ই রাজা মহারাজা ফিল্মস্টারের পক্ষে যথেষ্টরও বেশি, কিন্তু গাঁধী?' এখানে এসে তিনি যে অলঙ্কার ব্যবহার করলেন তার ইংরেজি আছে— 'গাঁধী? হি ইস নট এভরিবডিজ কাপ অব্ টি'— বাংলাতে মেরেকেটে বলা যেতে পারে, 'ভিন্ন গোয়ালের একক গোমাতা, মা ভগবতী' কিংবা আমরা যেরকম বলি 'কানু ছাড়া গীত নেই', তার সঙ্গে মিলিয়ে 'গাঁধী ছাড়া নর নেই।' আরবরা বলে, 'গাঁধী মহারাজের কাহিনী সব কাহিনীর মহারাজা।' তার পর হুকুম দিলেন, 'গাঁধীকে সবসে বঢ়িয়া কেবিন দাও— একটা না, সুইট অব কেবিন্‌স্। বেডরুম, ড্রয়িংরুম, এন্টিরুম (ভিজিটরদের জন্য প্রতীক্ষা-গৃহ), আপন খাস ডাইনিংরুম ইত্যাদি ইত্যাদি। লক্ষপতিদের বুকিং কেনসেল করে। আর তোমাদের দ্য ল্যুক্‌স্ কেবিনের সোফা কোচ বিছানা বাথরুম লক্ষপতিদের জন্য গুড ইনাফ, মলটো বুয়োনো (ভেরি গুড্) কিন্তু গাঁধীর জন্য নয়। পালাদসো ভেনেদসিয়া (ভেনিস পেলেস— ইটালির প্রায় সর্বোত্তম প্রাসাদ) থেকে তাবৎ ফার্নিচার পাঠাও।' সর্বশেষে বললেন, 'ওই অচ্ছি অচ্ছি তাগড়ি বকরি, দুধকে লিয়ে।' এই ফার্নিচার পাঠানোর পিছনে হয়তো-বা কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। এখানে আবার গুরুদেব প্রধান পাত্র।

যাঁরা কবিগুরুর মৃত্যুর পর তাঁর বধূমাতা স্বর্গীয় প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ' পুস্তিকা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, অসুস্থাবস্থায় তিনি কিছুদিন কাটান তাঁর এক প্রিয়া শিষ্যার বাড়িতে, দক্ষিণ আমেরিকার আরজেনটিনায়। এঁর নাম ভিকতরিয়া (অর্থাৎ 'বিজয়া' এবং কবি দেশে ফিরে এঁকেই তাঁর পরের গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। কবির সঙ্গে তোলা এঁর ছবি পাঠক পাবেন 'পূরবী' কাব্যে, বিশ্বভারতী সংস্করণ 'রবীন্দ্ররচনাবলী' চতুর্দশ খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠার মুখোমুখি। এঁকে উদ্দেশ করে কবি একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন 'পূরবী'তে 'বিদেশি ফুল' 'অতিথি' ও অন্যান্য কবিতা দ্রষ্টব্য) ও কাম্পো। কবি দেশে ফেরেন ইটালিয়ান 'জুলিয়ো চেজারে' (জুলিয়াস সিজারের ইতালির উচ্চারণ) জাহাজে করে। জাহাজে বিদায় দিতে এসে ভিকতরিয়া দেখেন (পূরবীর 'বদল' ও গীতবিতানের 'তার হাতে ছিল' গান দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য) যে, যদিও কবিকে সর্বোত্তম দ্য ল্যুক্‌স্ কেবিন দেওয়া হয়েছে তবু সদ্য রোগমুক্ত জনের জন্য হেলান দিয়ে বসার আরাম-কেদারা সেখানে নেই। তিনি তদ্দণ্ডেই লোক পাঠালেন বাড়িতে; যে আরাম কেদারায় অসুস্থ কবি বসতে ভালোবাসতেন সেইটে নিয়ে আসতে। বিরাট সে কেদারা, তাই কেবিনের ছোট দরজা দিয়ে ঢোকে না। ভিকতরিয়া ডেকে পাঠালেন জাহাজের কাপ্তানকে। বিরাট জাহাজের কাপতেন হেজিপেজি লোক নয়— তাকে 'ডেকে পাঠানো' যে সে লোকের কর্ম নয়। তাই এস্থলে বলে রাখা ভালো, তাঁর অর্থসম্পত্তি ছিল প্রচুরতম এবং তাবৎ আর্জেনটাইনের রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারিত। তিনি সুসাহিত্যিকা, প্রভাবশালী মাসিকের সম্পাদিকা এবং পরবর্তীকালে তিনি ইউনাইটেড নেশনসের একাধিক বিভাগে তাঁর দেশের প্রতিভূ হয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। 'টাইম' সাপ্তাহিকে আমি সে বিবরণী পড়েছি ও তাঁর ছবি সেখানে দেখতে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে আরজেনটাইন ডাকবিভাগ কবির ছবিসহ বিশেষ স্ট্যাম্প প্রকাশ করে ভিকতরিয়ারই জোরদার প্রস্তাবে। এবং তিনি নির্দেশ দেন, ডাকবিভাগ যেন কবির কোন ছবি ছাপা হবে তাই নিয়ে মাথা না ঘামায়। ভারত যে ছবি ছাপাবে সেটা তিনি কবিপুত্রের কাছ থেকে আনিয়ে ডাকবিভাগকে দেবেন। ডাকবিভাগ মাতার সুপুত্রের মতো তাবৎ নির্দেশ মেনে

www.pathagar.com

নেয়। ওই স্ট্যাম্প খামে সেঁটে ভিকতরিয়া কবিপুত্রকে একখানা চিঠি লেখেন; আমি সেটি দেখেছি। যা বলছিলুম : কাপতানকে ভিকতরিয়া হুকুম দিল কেবিনের দরজা কেটে কেদারা ঢোকাও।* বলে কী? দ্য ল্যুক্স কেবিনের দেয়াল করাত দিয়ে কেটে তার অঙ্গহানি করা! কাপতান গাঁইগুঁই করছে দেখে জাতে দজ্জাল সেই স্পেনিশ রমণী আরম্ভ করলেন ভর্ৎসনা, অভিসম্পাত, কাপতানের আসন্ন পতনের ভবিষ্যদ্বাণী— মুষলধারার বাক্যবাণে তাকে জর্জরিত করতে। এ ঘটনা স্বয়ং কবি কনফার্ম করেছেন। তিনি পুরো ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে এস্থলে, বলেন, 'আমি স্পেনিশ ভাষা জানিনে। কিন্তু ভিকতরিয়ার সেই জ্বালাময়ী ভাষার কটুবাক্যের রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধা হয়নি।'

কাপতান পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বংশরক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দেয়।

হয়তো এ ঘটনা মুসসোলিনির কানে পৌঁছয়। হয়তো তাই এ ঘটনার ছ বছর পর গাঁধীজি যখন তাঁর জাহাজে চড়লেন তখন তিনি পালাদসো ভেনেদসিয়া থেকে সেরা সেরা আসবাবপত্র পাঠান।

যে জাহাজে করে গাঁধী দেশে ফেরেন তার এক ইতালীয় স্টুয়ার্ড আমাকে এ কাহিনীটি বলে। আমি তার সবিস্তর বর্ণনা আমার 'বড়বাবু' গ্রন্থে 'গান্ধীজির দেশে ফেরা' নাম দিয়ে লিখেছি। এস্থলে সংক্ষেপে সারি।

গাঁধীজি জাহাজে উঠলেন। ভয়ে আধমরা (কারণ নির্মম ডিক্‌টেটর মুসসোলিনির কানে যদি খবর পৌঁছয়— গুজব হোক আর না-হোক, লেজেন্ড হোক আর সত্য ইতিহাসই হোক যে— গাঁধীর পরিচর্যায় ত্রুটি-জখম ছিল তা হলে বারোটা রাইফেলের গুলি খেয়ে তাঁকে যে ওপারে যেতে হবে সে বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চয়) তথাপি সগর্বে সদম্ভে গাঁধীজিকে দেখালেন তাঁর জন্য স্পেশালি রিজার্ভড্ প্রাসাদসজ্জায় গৌরবদীপ্ত আরাম-আয়েসের ইন্দ্রপুরী সদৃশ্য কেবিনগুলো। গাঁধীজির অনুরোধে তার পর তিনি তাঁকে দেখালেন বাদবাকি তাবৎ জাহাজ।

সর্বশেষে গাঁধী শুধোলেন, সবচেয়ে উপরে খোলা ডেক-এ (ছাতে) যাওয়া যায় কি না?

কাপ্তান সানন্দে তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন। উন্মুক্ত আকাশের নিচে বিরাট বিস্তীর্ণ ডেক।

গাঁধী বললেন, 'আমি এখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করব।'

কাপ্তান বদ্ধ পাগলের মতো হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে গোঙরাতে গোঙরাতে বলল, 'অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই ভূমধ্যসাগরে রাত্রে তাপমাত্রা নামবে শূন্যে। সুয়েজ খাল আর লোহিত সাগরে দুপুরের গরমি উঠবে ১১৪ তক্। এমন কর্ম থেকে আপনাকে ঈশ্বর রক্ষতু।'

গাঁধী ঝাড়া তেরোটি দিনরাত্রি কাটিয়েছিলেন উপরে। প্রতি সকালে মাত্র একবার নেমে আসতেন নিচে। প্রার্থনা করতে। সর্বশ্রেণির প্যাসেনজার নিমন্ত্রিত হতেন। শুনেছি খালাসিরাও বাদ যায়নি।

---

* এ কেদারার শেষ ইতিহাস পাঠক পাবেন, কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'শেষলেখা'তে। এ ঘটনার দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে, কবি তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পূর্বে রোগশয্যায় সেই কেদারাখানা খুঁজে নিয়ে (ছাপাতে আছে 'খুঁজে দেব'— হবে 'খুঁজে নেব') তার উদ্দেশে একটি মধুর কবিতা লেখেন। 'শেষলেখা' কাব্যের ৫ নং কবিতা পশ্য।

www.pathagar.com

কিন্তু গাঁধীজির এই দুই প্রত্যাখ্যানের ভিতর অতলস্পর্শী পাতাল এবং গগনচুম্বী আকাশের পার্থক্য রয়েছে।

মুসসোলিনির ভেট ছিল আরাম-আয়েস বিশাল-ঐশ্বর্য। গাঁধী যে সেগুলো সবিনয় প্রত্যাখ্যান করবেন সেটা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু রবি কবি গাঁধীর সামনে ধরেছিলেন সরল, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য। কবিরই ভাষায় বলি,

'দুয়ারে এঁকেছি
রক্তরেখায়
পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে?'

হায়, বলেনি ॥

মাভৈঃ

বাঙালি সবদিক দিয়েই পিছিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কথাটা ঠিক কি না, হলপ খেয়ে বলা কঠিন, কারণ দেশ-বিভাগের ফলে তার যে খানিকটে শক্তিক্ষয় হয়েছে সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। পার্লামেন্টে যদি আপনার সদস্যসংখ্যা কমে যায় তবে সবকিছুই কাটতে হয় ধার দিয়ে— ভার দিয়ে কাটার সুযোগ আর মোটেই জোটে না।

দিল্লিতে থাকাকালীন আমি একটি বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছিলুম। কেন্দ্রে অর্থাৎ ইউপিএসসি-তে বাঙালি যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে কি না? ওই অনুষ্ঠানের সদস্য না হয়েও যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের বিশ্বাস, বাঙালির এতে যতখানি কৃতকার্য হওয়া উচিত ততখানি সে হচ্ছে না। একদা বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকেও সেখানে ডাকা হয়েছিল; আমি তখন চোখকান খোলা এবং খাড়া রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলুম।

দিল্লিতে এখন যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা বিলিতি কিংবা বিলিতি-ঘেঁষা পোশাক পরেন, ছুরিকাঁটা দিয়ে খাওয়া প্রচুর বাড়িতে চালু হয়েছে, ইংরেজি আদব-কায়দা, বিশেষ করে ইংরেজি এটিকেট এঁদের কাছে আর সম্পূর্ণ অজানা নয়।

ইউপিএসসি-র তাবৎ মেম্বারই সায়েবিয়ানা পছন্দ করেন, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যেখানে যে আবহাওয়া বিদ্যমান, মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার থেকেই প্রাণবায়ু গ্রহণ করে। তাই যদি বাঙালি ছেলের পোশাক ছিমছাম না হয়, চেয়ার টেনে বসার সময় সে যদি শব্দ করে, মোকামাফিক পার্ডন, থ্যাঙ্ক্যু না বলতে পারে এবং সর্বক্ষণ ঘন ঘন পা দোলায় তবে সদস্যরা আপন অজানতেই যে তার প্রতি কিঞ্চিৎ বিমুখ হয়ে ওঠেন সেটা কিছু আশ্চর্যজনক বস্তু নয়।

কিন্তু আসল বিপদ অন্যত্র। বাঙালি উমেদার ইংরেজিতে ভাব প্রকাশ করতে পারে না। পাঞ্জাবি, হিন্দিভাষী কিংবা মারাঠি যে ইংরেজি বলে সেটা কিছু 'আ-মরি' 'আ-মরি' করবার মতো নয়— বিশেষত পাঞ্জাবি, হিন্দিভাষী ও সিন্ধিদের ইংরেজিজ্ঞান 'শিলিং-শকার' ও

www.pathagar.com

'পেনি-হরার' থেকেই আহরিত। তা হোক, কিন্তু ওইসব বুঝে না-বুঝেই যারা বেশি পড়ে তাদের কথা বলার অভ্যাস হয়ে যায় বেশি, অন্তত 'থ্যাঙ্ক্যু', 'পার্ডন', 'আই এম এফ্রেড' তারা তাগমাফিক লাগিয়ে দিতে কসুর করে না।

এস্থলে ইতিহাসের দিকে একনজর তাকাতে হয়।

মুসলমান আগমনের পর থেকে ১৮৪০-৪২ পর্যন্ত বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণ তথা বৈদ্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন এবং মুসলমান ও কায়স্থরা ফারসি (এবং কিঞ্চিৎ আরবির) চর্চা করেন। এদেশের বড় বড় সরকারি চাকরি, যেমন সরকার (চিফ সেক্রেটারি), কানুনগো (লিগেল রিমেম্‌ব্রেন্‌সার), বখ্‌শি (একাউন্টেন্ট জেনারেল— পে মাস্টার) অর্থাৎ এডমিনস্ট্রেটিভ তাবৎ ডাঙর ডাঙর নোকরিই করেন কায়স্থরা। ইংরেজের আদেশে এঁরাই কলকাতাতে প্রথম ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেন। বস্তুত ফারসি তাঁদের মাতৃভাষা ছিল না বলে তাঁরা সেটা অনায়াসে ত্যাগ করে ইংরেজি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন— এবং ফলে হাইকোর্টটি তাঁদের হাতে চলে যায়। ব্রাহ্মণরা আসেন পরে; তাই তাঁরা পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমান আসেন সর্বশেষে, তাঁদের কপালে কিছুই জোটেনি।

তা সে যাই হোক, আমরা বাঙালি প্রথমেই সাততাড়াতাড়ি ইংরেজি শিখেছিলুম বলে বেহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এস্তক সিন্ধুদেশ পর্যন্ত আমরা ছড়িয়ে পড়ি।

এর পর অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তর লোক ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের চাহিদা ও কদর কমতে লাগল, এসব কথা সকলেই জানেন, কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব বিশেষভাবে বিজড়িত এবং সেই তত্ত্বটির প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

যে দুটি জাতীয় সঙ্গীত ভারতের সর্বত্র সম্মানিত সে দুটিই বাঙলা দেশেই রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় বাঙলা দেশেই। এটা কিছু আকস্মিক যোগাযোগ নয়। এর কারণ বাঙালি আপন দেশ ভালোবাসে এবং সে বিদ্রোহী।[১] দেশকে ভালোবাসলে মানুষ তার ভাষাকেও ভালোবাসতে শেখে।

আশ্চর্য, ইংরেজি ভালো করে আসন জমাবার পূর্বেই বাঙলা দেশে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। (ঠিক সেইরকমই ফারসি যখন একদা আসন জমাতে যায় তখন কবি সৈয়দ সুলতান আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,

আল্লায় বলিছে 'মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে-দেশে সে-ভাষে করলুম রসুল প্রকাশ।'
'যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার অমূল্য সেই ধন ॥')

এবং আরও আশ্চর্যের বিষয়, সে বিদ্রোহের কাণ্ডারি ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে বড় ইংরেজি (ফরাসি, লাতিন, গ্রিক) ভাষার সুপণ্ডিত মাইকেল। কাজেই যদিও সে উইলসেন, কেশবসেন

১. 'বিদ্রোহী' আমি কথার কথারূপে বলছি না। বস্তুত বাঙালি যে বিদ্রোহী তার ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। (ক) দোয়াবের ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাকে অভিভূত করতে পারেনি, ফলে সে সংস্কৃত উচ্চারণ গ্রহণ করেনি, (খ) বৌদ্ধ-জৈনের নিরামিষ সে গ্রহণ করেনি, (গ) মুসলমান আমলে বাঙলা দেশেই সবচেয়ে বেশি লড়াই দিয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইত্যাদি বিস্তর বিষয়বস্তু নিয়ে সে ইতিহাস লিখতে হবে।

www.pathagar.com

ও ইস্টিসেন এই তিন সেনের কাছে জাত দিয়ে ছুরি কাঁটা ধরতে শিখল (আজ যা দিল্লিতে বড়ই কদর পাচ্ছে) তবু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিনাশের চারাকে জল দিয়ে বাঁচাতে আরম্ভ করল। এটাকে বাঙালির স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এসময় সে গাছেরও খেয়েছে, তলারও কুড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই চোখে পড়ল, বাঙালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজি বইয়ের আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যেরকম কাতর হয়ে পড়েছিল এবার সে সেরকম হাঁসফাঁস করল না। স্বরাজ লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালি ইংরেজি ভাষা, আচার-ব্যবহার, কায়দা-কেতা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে এবং ফলে দিল্লিতে আর কল্কে, সরি, সের্ভিয়েট— পায় না।

তর্ক করে, দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে সপ্রমাণ করতে হলে ভূরি ভূরি লিখতে হবে।

তা না হয় লিখলুম, কিন্তু পড়বে কে? তাই সংক্ষেপে বলি।

পৃথিবীর সভ্যাসভ্য কোনও দেশই বিদেশি ভাষা দিয়ে বেশিদিন কারবার চালায় না। আজকের দিনে তো নয়ই। ফারসি এদেশে ছ-শো বছর ধরে রাষ্ট্রভাষা ছিল— আমরা একে চিরন্তনী ভাষা বলে গ্রহণ করিনি।

তাই হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠিওয়ালারাও একদিন ইংরেজি বর্জন করে আপন আপন মাতৃভাষায় কাজ-কারবার করতে গিয়ে দেখবেন, আমরা বাঙালিরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে— কারণ আমরা অনেক পূর্বে আরম্ভ করেছিলুম। তখন যখন কেন্দ্রে আপন আপন মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে তখন আবার আমরা সেই যুগে ফিরে যাব, যখন একমাত্র বাঙালিই ইংরেজি জানত। হিন্দি কখনও ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক হবে না, আর হলেও বাঙালিকে যেমন মাতৃভাষার ওপর হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে, হিন্দিওলাকে হিন্দি ভিন্ন অন্য একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। অমাতৃভাষা অমাতৃভাষায় কাটাকুটি গিয়ে রইবে বাঙলা বনাম হিন্দি। তাই অবস্থা একই দাঁড়াবে— আমরা এগিয়ে যাব।

তাই মাভৈঃ!

হিটলারের শেষ প্রেম

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১ মে রাত দশটার সময় হামবুর্গ বেতার কেন্দ্র তার উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রোগ্রাম হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে ঘোষণা করল—

'আমাদের ফ্যুরার আডলফ হিটলার বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন।'

যে সময়ে এ নিদারুণ ঘোষণাটি করা হয়, তখন প্রোগ্রামমাফিক কথা ছিল, 'ইঁদুর ধ্বংস করার উপায়।' এই নিয়ে হিটলার-বৈরীরা এখনও ঠাট্টা-মশকরা করেন।

যেসব জর্মন বেতার-ঘোষণাটি শুনেছিল, তাদের অনেকেই যে বিরাট শক্ পেয়েছিল, সে নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এদের অনেকেই সরলচিত্তে বিশ্বাস করত, আশা রাখত— যে হিটলার ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর বহু উৎকৃষ্ট সংকটে যেন ভাগ্যবিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলি

www.pathagar.com

সংকেতে, অবলীলাক্রমে বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করে সেসব সংকট উত্তীর্ণ হয়েছেন, এবারেও তিনি আবার শেষ মোক্ষম ভেল্কিবাজি দেখিয়ে তাবৎ মুশকিল আসান করে দেবেন। তার অর্থ; যেসব রুশ-সৈন্য বার্লিন অবরোধ করেছে তারা স্বয়ং হিটলারচালিত আক্রমণে খাবে প্রচণ্ডতম মার, ছুটবে মুক্তকচ্ছ হয়ে মস্কো বাগে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন-ইংরেজ সৈন্যও পড়ি-মরি হয়ে ফিরে যাবে আপন আপন দেশে। রাহুমুক্ত ফ্যুরার— পথপ্রদর্শক সর্বোচ্চ নেতা পুনরায় ইয়োরোপময় দাবড়ে বেড়াবেন।

এরা যে মোক্ষম শক্ পেয়েছিল সে তো বোঝা গেল। কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষমতর শক্ পেল কয়েকদিন পর, যখন বেতার ঘোষণা করল, হিটলার আত্মহত্যা করার পনেরো ঘণ্টা পূর্বে এফা ব্রাউন নামক একটি কুমারীকে বিয়ে করেন। কারণ, জর্মনির দশ লক্ষের ভিতর মাত্র একজন হয়তো জানত যে, হিটলারের একটি প্রণয়িনী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে তিনি স্বামী-স্ত্রীরূপে বছর বারো-তেরো ধরে জীবনযাপন করছেন। নিতান্ত অন্তরঙ্গ যে কয়েকজন এই 'গুপ্তি প্রেমে'র খবর জানতেন, তাঁরা এ বাবদে ঠোঁট সেলাই করে কানে ক্লরফর্ম ঢেলে পুরো পাক্কা নিশ্চুপ থাকতেন। কারণ হিটলারের কড়া আদেশ ছিল, তাঁর এই গুপ্তিপ্রেম সম্বন্ধে যে-কেউ খবর দেবে বা গুজব রটাবে, তিনি তার সর্বনাশ করবেন। তার কারণও সরল। তাঁর প্রপাগান্ডা মিনিস্টার গ্যোবেল্স্ দিনে দিনে বেতারে খবরের কাগজের মারফতে হিটলারের যে মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন (আজকের দিনের ইংরেজিতে 'তাঁর যে "ইমেজ" নির্মাণ করেছিলেন' (সেটি সংক্ষেপে এই : হিটলার আজীবন ব্রহ্মচারী, তাঁর ধ্যানধারণাসাধনা সর্বশক্তি তিনি নিয়োগ করেন, একমাত্র জর্মনির মঙ্গলসাধনে, হিটলার স্বয়ং অন্তরঙ্গ জনকে একাধিকবার বলেছেন, 'জর্মনিই আমার বঁধু (বাগদত্তা দয়িতা')। এমনকি তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরও তত্ত্বতাবাশ করেন না। এটা সত্য, এ নিয়ে কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না। গোড়ার দিকে তিনি তাঁর বিধবা একমাত্র সৎদিদিকে মিউনিকের নিকটবর্তী তাঁর বের্খ্‌টেশগার্ডেনের বাড়ি বের্গহফে গৃহকর্ত্রীরূপে রাখেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে সে বাড়িতে এসে পৌঁছলেন এফা ব্রাউন। যা আকছারই হয়— ননদিনী-ঠাকুরঝির সঙ্গে লাগল কোঁদল। হিটলারের অন্যতম বন্ধু বলেন, এস্থলে আরও আকছারই যা হয় তাই হল। পুরুষমানুষ, তায় হিটলারের মতো কর্মব্যস্ত পুরুষ, এসব মেয়েলি কোঁদলে কিছুতেই প্রবেশ করে একটা ফৈসালা করে দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তিনি চুপ করে বসে 'যাত্রাগান দেখলেন'— অবশ্য অতিশয় বিরক্তিভরে। শেষটায় দিদিই হার মানলেন। হিটলার-ভবন ত্যাগ করে মিউনিকে আপন একটি ছোট্ট বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। হিটলার এর পর তাঁকে আর কখনও তাঁর নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেননি। তার কিছুদিন পর সৎদিদি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। হিটলার এটাতে ভয়ঙ্কর চটে যান। কেন, তা জানা যায়নি। বিবাহ-উৎসবে উপস্থিত তো হলেনই না, সামান্য একটি প্রেজেন্টও পাঠালেন না। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র চিরতরে সম্পূর্ণ ছিন্ন হল।

হিটলারের আপন মায়ের পেটের একটি সুন্দরী বোনও ছিল। তাঁকেও তিনি একবার তার বাড়ি বের্গহফে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি ওই বাড়ির আরাম-আয়েসে এতই সুখ পেলেন যে, কাটালেন মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘকাল। হিটলার বিরক্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত বোনের বিদায় নেওয়ার পর তাঁকে আর কখনও নিমন্ত্রণ জানাননি। এ ননদীর সঙ্গে এফা ব্রাউনের কলহ

www.pathagar.com

হয়েছিল কি না সে বিষয়ে ঐতিহাসিকরা নীরব। ভাইবোন বলতে ইনিই হিটলারের একমাত্র মায়ের পেটের বোন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রাতা আডলফ হিটলারের মৃত্যুর পরও অবহেলিত এই বোন কয়েক বৎসর বেঁচে ছিলেন।

এই আপন বোন ও পূর্বে বর্ণিত সেই সৎদিদি ছাড়া হিটলারের ছিলেন একটি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ওই সৎদিদির বড় ভাই। নানা দেশে বহু কর্মকীর্তি করার পর ইনি এলেন বার্লিনে— তাঁর সৎভাই জর্মনির কর্ণধার হয়েছেন খবর শুনে। নাৎসি পার্টির দু-একজনকে চিনতেন বলে তাঁদের কৃপায় পারমিট জোগাড় করে খুললেন বার্লিনের উপকণ্ঠে একটা মদের দোকান— বার্। পার্টি-মেম্বাররা সেখানে যেতেন তো বটেই, তদুপরি বিশেষ করে সেখানে হুল্লোড় লাগাতেন দুনিয়ার যত খবরের কাগজের রিপোর্টার। ওনাদের মতলব, হিটলারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে তস্য অগ্রজ ভ্রাতার কাছ থেকে গোপন তথ্য, রসালো চুট্‌কিলা সংগ্রহ করে আপন আপন কাগজে টকঝাল পরিবেশন করা।

কিন্তু ব্রাদার আলওয়া হিটলার ছিলেন ঝাণ্ডু শুঁড়ি। পাছে তাঁর কোনও বেফাঁস কথা কনিষ্ঠ ফ্যুরার আডলফের কানে পৌঁছে যায় এবং তিনি চটেমটে তাঁর মদের দোকানের পারমিটটি নাকচ করে দেন সেই ভয়ে তিনি ফ্যুরার সম্বন্ধে একটিমাত্র কথা বলতে রাজি হতেন না। অনুজ যে কারণে-অকারণে ফায়ার হয়ে যান সেটা বড় বেরাদার বিলক্ষণ জানতেন।...হিটলারও তাঁর সম্বন্ধে কখনও কোনও কৌতূহল দেখাননি।

পূর্বেই বলেছি, হিটলারের দাদা-দিদি-বোনের সঙ্গে তাঁর যে কোনওপ্রকারের সম্পর্ক ছিল না, সেটা দিদি-বোনের পাড়াপ্রতিবেশী সখাসখী সবাই জানতেন। তাঁরাও সেটা আর পাঁচজনকে বলতেন। 'আহা! ফ্যুরার জর্মনির ভবিষ্যৎ নিয়ে এমনই আকণ্ঠ নিমগ্ন যে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধেও অচেতন।' ক্রমে ক্রমে, গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে 'মৈত্র মহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে', এ স্থলে জর্মনির নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সংবাদটি রটে গেল, আবাল্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় প্রভু হিটলার তাঁর সব আত্মজনকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র জর্মনির জন্য আত্ম-বিসর্জন দিচ্ছেন।

প্রপাগান্ডা মন্ত্রী গ্যোবেল্‌স্ ঠিক এইটেই চাইছিলেন। তিনি সেই গুজবের দাবাগ্নিতে দিলেন ঘন ঘন কুলোর বাতাস। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক এ 'সত্য তত্ত্ব'। বিশ্বজন আগের থেকেই জানত, হিটলারের জীবনধারণ পদ্ধতি ছিল চার্চিল এবং স্তালিন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চার্চিলের মুখে জাগ্রতাবস্থায় সর্বক্ষণ অ্যাম্মোটা সিগার এবং বেলা-অবেলায় এক পেট খাঁটি স্কচ হুইস্কি। স্তালিনের ঠোঁটেও তদ্বৎ— তবে সিগারের বদলে খাঁটি রাশান পাপিরসি (সিগারেট) এবং স্কচের বদলে তিনি অষ্টপ্রহর পান করতেন, হুইস্কির চেয়েও কড়া মাল ভোদকা শরাব। দুজনই সর্ববিধ গোশত গব গব করে গিলতেন। পক্ষান্তরে হিটলার ধূম্র এবং মদ্যপান করতেন না এবং তিনি ছিলেন ভেজিটারিয়ান। কাজেই তাঁকে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীরূপে বিশ্বজনের সম্মুখে তুলে ধরতে ড. গ্যোবেল্‌সের কল্পনার আশ্রয় অত্যধিক নিতে হয়নি।

হিটলারের মৃত্যুসংবাদ জর্মন জনগণকে যে শক্ দিয়েছিল, তার পর তারা যে মোক্ষমতর শক্ পেল তার সঙ্গে এটার কোনও তুলনাই হয় না।

www.pathagar.com

যুদ্ধ-শেষে কয়েকদিন পর (মে ১৯৪৫) যে রুশ সেনাপতি জুকফ বার্লিন অধিকার করে তিনি প্রচার করলেন, আত্মহত্যা করবার পূর্বে হিটলার তাঁর এক রক্ষিতাকে বিয়ে করেন।

সর্বনাশ ! বলে কী! সেই জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী যিনি—

'দারাপুত্র পরিবার
কে তোমার তুমি কার?'

কিংবা 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' ধ্যানমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ বৎসর জর্মনির জন্য বিনিদ্র ত্রিযামা যামিনী যাপন করলেন তিনি কি না শেষ মুহূর্তে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যবশত 'ধর্মচ্যুত' হয়ে বিবাহ করলেন একটা 'রক্ষিতাকে'! এ যে মস্তকে সর্পদংশন।

আজ যদি শুনতে পাই (এবং এটা অসম্ভব তথ্য আমি মাপ চেয়ে নিয়ে বলছি) যে ডিউক অব উইনজার তাঁর দয়িতার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনার্থে অবহেলে ইংলন্ডের সিংহাসন ত্যাগ করেন, তিনি তাঁর সেই বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করে প্যারিসের কোনও গণিকালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তবে কি সেটা পয়লা ধাক্কাতেই বিশ্বাস করব?

জর্মনির জনসাধারণ প্রথমটা এ সংবাদ বিশ্বাস করতে চায়নি।

কিন্তু ব্যাপারটা তখন দাঁড়িয়েছে এই : যতক্ষণ ম্যাজিশিয়ান তার ভানুমতি খেল দেখায় ততক্ষণ দর্শক বেবাক নির্বাক হয়ে তাই দেখে, কিন্তু যে মুহূর্তে বাজিকর 'গুড নাইট' বলে অন্তর্ধান করে তন্মুহূর্তেই আরম্ভ হয় বিপুল কলরব। কী করে এটা সম্ভব হল, কী করে ওটা সম্ভব হল?— তাই নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা! এবং দু-একটি লোক যারা ম্যাজিকের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিত তারা অল্পবিস্তর পাকা সমাধানও তখন দেয়।

এ স্থলেও তাই হল। হিটলার ম্যাজিশিয়ান যখন তাঁর শেষ খেল দেখিয়ে ইহলোক থেকে অন্তর্ধান করলেন তখন আরম্ভ হল তুমুলতর অট্টরোল। এবং এ স্থলেও যাঁরা হিটলারের অন্তরঙ্গজন— হিটলারি ম্যাজিকের অর্থাৎ এফা ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানতেন— তাঁরা এ বাবদে ঈষৎ ছিটেফোঁটা ছাড়তে আরম্ভ করলেন। এঁদের কাহিনী অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না।

ইতোমধ্যে হিটলারের খাস চিকিৎসক ডাক্তার মরেল ধরা পড়েছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেন সেটা আমাদের ভাষায় বলতে গেলে, 'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ— এফা ব্রাউন আর হিটলার একসঙ্গে বাস করতেন বইকি— হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ— এবং কিছু একটা হতো হয়তো— হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।'

এ সময়ে হিটলারের উইল দলিলটি আবিষ্কৃত হয়। এটি তিনি তাঁর বিবাহের পরমুহূর্তেই ডিকটেট করে টাইপ করান এবং আপন স্বাক্ষর দেন। তাতে অন্যান্য বক্তব্যের ভিতর আছে :

'যদ্যপি আমার সংগ্রামের সময় বিবাহ এবং তজ্জনিত দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো আস্থা আমার ছিল না, তথাপি এখন, আমার মৃত্যুর পূর্বে আমি মনস্থির করে একটি রমণীকে বিবাহ করছি। আমাদের ভিতর ছিল বহু বৎসরের বন্ধুত্ব (ফ্রেন্ডশিপ = জর্মনে ফ্রয়েন্টশফট) এবং বার্লিন যখন চতুর্দিক থেকে শত্রুসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত তখন তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার অদৃষ্টের অংশীদার হবার জন্য এখানে এসেছেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার স্ত্রীরূপে আমার

www.pathagar.com

সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবেন। আমি জনসেবায় নিয়োজিত ছিলুম বলে যে ক্ষতি হয়েছিল (অর্থাৎ একে অন্যের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলুম'— অনুবাদ) তার ক্ষতিপূরণ এর দ্বারা হবে।'[১]

এই এফা ব্রাউন রমণীটি কে?

আমি ইতোপূর্বে 'হিটলারের শেষ দশ দিবস' তথা 'হিটলারের প্রেম' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার সময় উল্লেখ করি যে আমার জানামতে হিটলার তাঁর জীবনে সবসুদ্ধ $\frac{১}{২}$ + ১ + $\frac{১}{২}$ = দুইবার ভালোবেসেছিলেন। প্রথম হাফ প্রেমকে ইংরেজিতে 'কাফ্ লভ্' বলে। বাছুরের মতো ড্যাবডেবে চোখে দয়িতার দিকে তাকানো আর 'উদ্ভ্রান্ত প্রেমে'র মতো গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলা— বাঙাল দেশে যাকে বলে ঝুলে মরা। কারণ হিটলার তাঁর হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে কখনও সাহসভরে আলাপচারী তো করেনইনি, এমনকি চিঠিপত্রও লেখেননি। হিটলার তখন ইংরেজিতে যাকে বলে 'টিনএজার'। এ প্রেমটাকে সত্যকার রোমান্টিক প্লাতনিক প্রেম বলা যেতে পারে।

এর প্রায় বাইশ বৎসর পরে, যৌবনে, হিটলার পুরো-পাকা ভালোবেসেছিলেন গেলি রাউবাল নামক এক কিশোরীকে। এটিকে আমি পুরো এক নম্বর দিয়ে পূর্বোল্লিখিত 'হিটলারের প্রেম' প্রবন্ধ রচনা করি। এটি স্থান পেয়েছে মল্লিখিত 'রাজা উজির' পুস্তকে। এ অধম পারতপক্ষে কাউকে কখনও আমার নিজের লেখা পড়ার সলা-উপদেশ দেয় না, তবে যাঁরা রগরগে রোমান্টিক প্রেমের গল্প ছাড়া অন্য রচনা পড়তে পারেন না, তাঁরা এটি পড়ে দেখতে পারেন।

এই কিশোরী আত্মহত্যা করেন। হিটলারও হয়তো সেই শোকে আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু— তাঁর ফটোগ্রাফার বন্ধু, হফ্‌মান প্রধানত— যদি তাঁকে শব্দার্থে তিন দিন তিন রাত্রি চোখে চোখে রাখতেন।

এই দুটি— $\frac{১}{২}$ + ১ প্রেম হয়ে যাওয়ার পর হিটলার আরেক $\frac{১}{২}$ প্রেমে পড়েন— জীবনে শেষবারের মতো। এফা ব্রাউনের সঙ্গে। এটাকে আমি হাফ প্রেম বলছি এই কারণে যে, আজ পর্যন্ত উভয়ের কোনও অন্তরঙ্গজনই এঁদের ভিতর সঠিক কী সম্পর্ক ছিল সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেননি। এফা ছিলেন অতিশয় নীতিনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের কুমারী। হিটলার ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষের প্রতি তিনি কদাচ আকৃষ্ট হননি। যে রমণী তার দয়িতের সঙ্গে সহমরণ বরণ করার জন্য স্বেচ্ছায় শত্রুবেষ্টিত পুরীতে প্রবেশ করে, তাকে 'রক্ষিতা' আখ্যা দিলে নিশ্চয়ই তার প্রতি অবিচার করা হয়।

পক্ষান্তরে এ তত্ত্বটিও নিষ্ঠুর সত্য যে, হিটলার সুদীর্ঘ বারো বৎসর ধরে এফাকে বিয়ে করতে রাজি হননি। তিনি অবশ্য তার জন্য একাধিক যুক্তি দেখিয়েছিলেন। সেগুলো বিশ্বাস করা-না-করা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও রুচির ওপর নির্ভর করে। আমার মনে হয় তার সবকটা ভুয়ো নয়। এবং হিটলার সর্বদাই এ জাতীয় আলোচনার সর্বশেষে মধুরেণ সমাপয়েত করে বলতেন, 'জর্মনি ইজ মাই ব্রাইড' = জর্মনি আমার (জীবনমরণের) বধূ। এরই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তাঁর শেষ উইল-এ।

---

১. বৈদিক যুগে আমাদের ভিতর সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, তার সমাধান এখনও হয়নি। এস্থলে লক্ষণীয়, হিটলার নিজেকে আর্য বলে শ্লাঘা অনুভব করতেন। তাই হয়তো প্রথমে কিছুটা আপত্তি জানানোর পর এই সতীদাহে সম্মত হন। পাঠক এ নিয়ে চিন্তা করতে পারেন।

www.pathagar.com

অতএব এফা না ছিলেন হিটলারের রক্ষিতা, না ছিলেন তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। সর্ব ঐতিহাসিক তাই বলেছেন, 'এ মোস্ট আনডিফাইন্ড স্টেট'— অর্থাৎ এঁদের ভিতর ছিল এমন এক সম্বন্ধ যেটা কোনও সংজ্ঞার চৌহদ্দিতে পড়ে না।

হিটলারের সঙ্গে এফার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। বাঘা ঐতিহাসিক (যদ্যপি আমার বিচারে তিনি ট্রেভার রোপার, বুলক, নামিরের ইত্যাদির কাছেই আসতে পারেন না) শয়রার— যাঁর নাৎসিদের সম্বন্ধে বিরাট ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে নির্মিত একটা অতিশয় রসকষহীন ফিল্ম ১৯৬৯-এর গোড়ার দিকে কলকাতা তক পৌঁছেছিল— ইনি বলছেন, যে গেলি রাউবালের সঙ্গে হিটলারের প্রণয় হয় তাঁর আত্মহত্যার এক বা দুই বৎসর পর হিটলারের সঙ্গে এফা ব্রাউনের পরিচয় হয়। এ তথ্যটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য নয়। কারণ একাধিক ঐতিহাসিক বলেন, আত্মহত্যা করার কয়েকদিন পূর্বে গেলি তার মামা (সম্পর্কে) হিটলারের স্যুট সাফসুৎরো করার সময় পকেটে হিটলারকে লিখিত এফা ব্রাউনের একখানা 'প্রেমপত্র' পেয়ে যায়। গেলি আত্মহত্যা করার পর তার মা বলেন, এই চিঠিই গেলিকে আত্মহত্যার দিকে শেষ ঠেলা দেয়— অবশ্য একথা কারুর কাছেই অবিদিত ছিল না, গেলির মা এফাকে এমনই উৎকট ঘৃণা করতেন যে পারলে তার চোখদুটো ছোবল মেরে তুলে নিয়ে, রোস্ট করে তার প্যারা কুকুরকে খেতে দিতেন।

গেলি হয়তো চিঠিখানা পেয়েছিল কিন্তু সে-চিঠি যে তার হৃদয়ে কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সে বিশ্বাস আমার হয় না। কারণ গেলিকে যিনি সবচেয়ে বেশি চিনতেন সেই হফ্‌মান বলেছেন, গেলি ভালোবাসত ভিয়েনাবাসী এক কলেজের ছোকরাকে, সে প্রকৃতপক্ষে কখনও তার মামার প্রেম নিবেদনের প্রতিদান দেয়নি। তদুপরি আরেকটি কথা আছে, হিটলার তখন গেলির প্রেমে অর্ধোন্মাদ। এফার সঙ্গে এমনি গতানুগতিক আলাপ হয়েছে। সে মজে গিয়ে হিটলারকে প্রেমপত্র লিখেছে— তরুণীরা আকছারই এরকম করে থাকে— এবং হিটলার এ ধরনের চিঠি পেতেন গণ্ডায় গণ্ডায় এবং নিশ্চয়ই এফার এ চিঠি সিরিয়াসলি নেননি।

হিটলারের সঙ্গে এফার প্রথম পরিচয় হল হিটলার-সখা ফটোগ্রাফার হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে। মধ্যবিত্ত সমাজের কুমারী কন্যা যতখানি লেখাপড়া করে সেইটে সেরে তিনি হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে অ্যাসিসটেন্টের কর্ম নেন। তাঁর কাজ ছিল, খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং ডার্করুমে কিছুটা সাহায্য করা। সেই সূত্রে হফ্‌মান নিতান্ত প্রফেশনালি হিটলারের সঙ্গে এফার আলাপ করিয়ে দেন।

হিটলারের কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটে ভিয়েনা নগরে। সে নগরের নাগরিকরা ডানসিং, ফ্লার্টিং, প্রণয়-মিলন, পরকীয়া শিভালরিতে অনায়াসে প্যারিসের সঙ্গে পাল্লা দেয়। হিটলারও রমণীসঙ্গ খুবই পছন্দ করতেন। জর্মনির সর্বময় কর্তা হওয়ার পর তিনি তাঁর অন্তরঙ্গজনকে একাধিকবার গল্পচ্ছলে বলেছেন, 'এসব বড় বড় হোটেলের গাড়োলরা যে পুরুষ ওয়েটার রাখে, তার মতো ইডিয়টিক আর কী হতে পারে! এটা তো জলের মতো স্বচ্ছ যে, সুন্দরী যুবতী ওয়েট্রেস রাখলে ঢের ঢের বেশি খদ্দের জুটবে। আমার জীবনে ট্র্যাজেডি যে, রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে যখন আমি কোনও স্টেট-ব্যাঙ্কুয়েটে বসি, আমাকে বাধ্য হয়ে ডাইনে এবং বাঁয়ে বসাতে হয় দুই বুড়ি-হাবড়িকে। কারণ তাঁদের স্বামীরা দুই বুড়ো-হাবড়া রাষ্ট্রমন্ত্রী বা ভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।... ওহ্, সে কী গব্বযন্ত্রণা। খুশ-এখতেয়ার থাকলে তার

www.pathagar.com

বদলে আমি যে কোনও অবস্থায় ছোট্ট একটি নাম-নাজানা রেস্তোরাঁয় একটি ডবকি ওয়েট্রেসের সঙ্গে (মেয়েদের বেতন কম বলে কন্টিনেন্টে ছোট রেস্তোরাঁই শুধু ওয়েট্রেস রাখে) দু-দণ্ড রসালাপ করতে করতে না হয় সামান্য ডাল-ভাতই (ওদের ভাষায় দুই পদী খানা) খাব— জাহান্নামে যাক স্টেট ব্যাঙ্কুয়েটের বাহান্ন পদি কোর্মা-কালিয়া, বিরয়ানি-তন্দুরি (ওদের ভাষায় শ্যাম্পেন কাভিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি)।'

তাই হিটলারের অ্যারোপ্লেনে রাখা হতো খাবসুরৎ হুরি, স্টুয়ার্ডেস। কিন্তু একথা সবাই বলেছেন, হিটলার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন না।

এস্থলে নাগর পাঠককে সবিনয় নিবেদন করি, এফা ব্রাউন ছিলেন সত্য সত্যই চিত্তহারিণী অসাধারণ সুন্দরী। কিশোরী-যুবতীর সেই মধুর সঙ্গমস্থলে। কিন্তু এ-বেরসিক লেখক নারী-সৌন্দর্য বর্ণনে এযাবৎ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি বলে নাগর রসিক পাঠককে এস্থলে সে রস থেকে সে বঞ্চিত করতে বাধ্য হল।

এফা সুন্দরী তো ছিলেনই তদুপরি স্টুডিয়োতে যেসব খানদানি বিত্তশালিণী তরুনী যুবতী ছবি তোলাতে আসতেন, এফা তাদের আচার-আচরণ থেকে অনেক কিছু শিখে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাদের বেশভূষা এবং অলঙ্কারাদি।... পরবর্তীকালে যখন তাঁর অর্থের কোনওই অভাব ছিল না তখনও তাঁর বেশভূষাতে রুচিহীন আড়ম্বরাতিশয্য প্রকাশ পায়নি। তাঁর অর্থবৈভব শুধু একটি অলঙ্কারে প্রকাশ পেত। তাঁর বাঁ হাতে বাঁধা থাকত মহার্ঘ্য বিরল হীরেতে বসানো একটি ছোট্ট রিস্টওয়াচ। জর্মনির মতো দেশের ফ্যুরার যদি প্রিয়াকে তাঁর জন্মদিনে একটি হাতঘড়ি উপহার দেন, তবে সেটি কী প্রকারের হবে, সেটা কল্পনা করার ভার আমি বিত্তশালী পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

গোড়ার দিকে হিটলার এফাকে খুব বেশি একটা লক্ষ করেননি।

এদিকে গেলির মৃত্যুর পর হিটলারের জীবন বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

সখা হফ্‌মান তখন তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য সুযোগ পেলে হিটলারের প্রিয় অবসর যাপন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। হিটলারকে নিয়ে যেতেন মিউনিকের আশপাশের হ্রদবনানীতে পিকনিকে। সঙ্গে থাকতেন হফ্‌মানের স্ত্রী, ফটো স্টুডিয়োর দু-একজন কর্মচারী এবং এফা ব্রাউন।

ক্রমে ক্রমে হিটলার শ্রীমতী এফা ব্রাউনের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

এর পর দেখা গেল, হফ্‌মান যদি পক্ষাধিককাল কোনও পিকনিকের ব্যবস্থা না করতেন তবে স্বয়ং হিটলার তাঁর ফ্ল্যাটে উপস্থিত হয়ে বলতেন, 'হেঁ হেঁ, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, তাই আপনার এখানে ঢুঁ মারলুম।' তার পর কিঞ্চিৎ ইতিউতি করে বলতেন, 'যা ভাবছিলুম... একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করলে হয়, আপনারা তো আছেনই, আর হেঁ হেঁ, ওই ফ্রলাইন ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে এলেও মন্দ হয় না— কী বলেন?'

তখনও হিটলার এফার প্রেমে নিমজ্জিত হননি— এবং কখনও হয়েছিলেন কি না, সে-বাবদে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে। পরবর্তী কাহিনী পড়ে সুচতুর— অন্তত আমার চেয়ে চতুর— পাঠক-পাঠিকা প্রেম বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতাপ্রসূত কূটবুদ্ধি দ্বারা আপন আপন সুচিন্তিত এবং/কিংবা সহৃদয় অভিমত নির্মাণ করে নিতে পারবেন।

ইতোমধ্যে কিন্তু শ্রীমতী এফা হিটলার প্রেমের অতলান্ত সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতরে বিলীন হচ্ছেন। আর হবেনই-না কেন? যদ্যপি হিটলার তখনও রাষ্ট্রনেতা হননি, তথাপি তাবৎ

www.pathagar.com

জর্মনির সবাই তখন জানত, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ যে কোনও দিন তাঁকে ডেকে বলবেন প্রধানমন্ত্রীরূপে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে। তদুপরি, পূর্বেই বলেছি, হিটলার ছিলেন রমণীচিত্তহরণের যাবতীয় কলাকৌশলে রপ্ত।... এবং সর্বোপরি তিনি প্রায়ই অবরেসবরে এফাকে দিতেন ছোটখাটো প্রেজেন্ট। বিত্তশালীজন তার দয়িতাকে যেরকম দামি দামি ফার কোট, মোটরগাড়ি দেয়, সেরকম আদৌ ছিল না— তিনি দিতেন চকলেট, ফুল বা ভ্যানিটি কেস (আমাগো রাষ্ট্রভাষায় যারে কয় 'ফুটানি কি ডিবিয়া)'।

সব ঐতিহাসিক বলেছেন, এফা ছিলেন 'রাদার এম্‌টি-হেডেড' অর্থাৎ সরলা বুদ্ধিহীনা। কিন্তু তাতে কী এসে-যায়? অস্মদ্দেশীয় এক বৃদ্ধ চাটুয্যে 'মহারাজ'কে জনৈক অর্বাচীন শুধিয়েছিল প্রেমের খবর তিনি রাখেন কি, তিনি বৃদ্ধ, তাঁর কটা দাঁত এখনও বাকি আছে? গোস্‌সাভরে তিনি যা বলেন তার মোদ্দা— 'ওরে মূর্খ, প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিস যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস? প্রেম হয় হৃদয়ে।' বিলকুল হক কথা। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে পারতেন, প্রেম নামক আদিরসটি মস্তিষ্ক থেকে সঞ্চারিত হয় না।

তাই এফা ওইসব চকলেটাদি সওগাত বান্ধবী, সহকর্মীদের ফলাও করে দেখাত, পিকনিকের বর্ণনা ফলাওতর করে সবিস্তর বাখানিত এবং ভাবখানা এমন করত যে, হিটলার তার প্রেমে রীতিমতো ডগোমগোজরোজরোমরোমরো।

এস্থলে ইয়োরোপীয় সরল কুমারীরা যা সর্বত্রই করে থাকে (এবং অধুনা কলকাতা-ঢাকাতে তাই হচ্ছে) এফা তাই করলেন। নির্জনে একে অন্যে যখন দুঁহুঁ দুঁহুঁ, কুঁহুঁ কুঁহুঁ তখন আশকথা-পাশকথার মাঝখান দিয়ে— যেমন টেবিলের ফুলদানির দেখা-না-দেখার ফুলের মাঝখান দিয়ে জর্মনে একে বলে 'থ্রু দ্য ফ্লাওয়ারস'— বিবাহ নামক সেই প্রাচীন সনাতন প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা দিলেন। নিশ্চয়ই একাধিকবার।

পূর্বেই বলেছি, হিটলার কিন্তু পৈতে ছুঁয়ে কসম খেয়ে বসে আছেন, বিবাহবন্ধন নামক উদ্বন্ধনে তিনি— কাট্যা ফালাইলেও— দোদুল্যমান হতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। এবং ঝাণ্ড ডিপ্লোমেট এই অস্বস্তিকর বাক্যালাপ কী করে এড়াতে হয়, সেটা খুব ভালো করেই জানতেন।

এটা বুঝতে সরলা, নীতিশীল পরিবারে পালিতা এফার একটু সময় লেগেছিল। ইতোমধ্যে তাঁর রক্ষণশীল পিতামাতা এফার সঙ্গে হিটলারের 'ঢলাঢলি'র খবর পেয়ে গিয়েছে। তাঁরা মেয়েকে বুঝিয়ে দিলেন হয় হিটলার তোমাকে বিয়ে করুক, নয় তুমি তার সঙ্গ ত্যাগ কর।

পিতামাতার প্রতি বিনম্রা এই কুমারী তখন কী করে?

হঠাৎ ওই সময়ে একদিন হফ্‌মান সখা হিটলারকে টেলিফোন করলেন 'যদ্দুর সম্ভব তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি চলে আসুন।'

হিটলার : 'কেন, কী হয়েছে?'

হফ্‌মান : 'আসুন না, সবকথা এখানে হবে।' হফ্‌মান এবং হিটলার দুজনেই জানতেন তাঁদের টেলিফোনের কথাবার্তা পুলিশ ট্যাপ্ করে।

হিটলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হফ্‌মানের ফ্ল্যাটে পৌঁছলেন। শুধোলেন, 'কী হয়েছে? ব্যাপার কী?'

হফ্‌মান : 'বড় সিরিয়াস। এফা পিস্তল দিয়ে বুকে গুলি মেরে আত্মহত্যা করার চেষ্টা নেয়। তাকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়—'

www.pathagar.com

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় হিটলার বাধা দিয়ে বললেন, 'কিন্তু জানাজানি হয়নি তো— তা হলেই তো সর্বনাশ!'

এস্থলে লক্ষণীয় যে, হিটলার দুঃসংবাদ পাওয়ামাত্রই সর্বপ্রথম নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছেন। তাঁর পার্টি এবং বিশেষ করে গ্যোবেল্‌স্‌ সাধারণ্যে তাঁর যে 'ইমেজ' গড়ে তুলছিলেন, সেটা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীর। এখন যদি তাঁর দুশমন কম্যুনিস্টরা জেনে যায় যে, তিনি গোপনে একটা মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করতেন এবং সেই সরলা কুমারী যখন যুক্তিসঙ্গত নীতিসম্মত পদ্ধতিতে হিটলারকে সেই ভাব-ভালোবাসার অন্তে যে প্রতিষ্ঠান থাকে, অর্থাৎ বিবাহ, সেটা প্রস্তাব করে তখন তিনি ধড়িবাজ, কাপুরুষ, বেইমানের মতো মেয়েটাকে ধাপ্পা মারেন, এবং ফলে ভগ্নহৃদয়া কুমারী আত্মহত্যার চেষ্টা করে, তবেই তো চিত্তির! যে নাৎসি পার্টির নেতা এরকম একটা পিশেচ সে পার্টির কী মূল্য? এই বেইমান পার্টিতে আস্থা রাখবে কোন ভদ্র ইমানদার জর্মন? এবং ভুললে চলবে না, মাত্র বছর দুই পূর্বে গেলি রাউবালও আত্মহত্যা করে— যদিও সে সময় কম্যুনিস্টরা সেই সুবর্ণ-সুযোগের সিকি পরিমাণ ফায়দাও ওঠাতে পারেনি, অর্থাৎ একসপ্লয়েট করতে পারেনি।

কিন্তু মাভৈঃ! কন্দর্প নির্মিত এসব সংকটে প্রায়শ তিনি বিধাতার ন্যায়নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রেমিক-প্রেমিকার তাবৎ মুশকিল আসান করে দেন।

হফ্‌মান সঙ্গে সঙ্গে হিটলার তথা নাৎসি পার্টির জীবনমরণ সমস্যা সমাধান করে বললেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন। জানাজানি হয়নি। কারণ এফাকে অচৈতন্য অবস্থায় যে সার্জনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি আমার নিকট-আত্মীয়। তাকে এমনভাবে কড়া পাহারায় রেখেছেন যে, পুলিশ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারেনি। তিনি স্বয়ং আমাকে খবরটা জানিয়েছেন।'

তখন, এই প্রথম হিটলার প্রেয়সীর অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। না— ফাঁড়া কেটে গিয়েছে, তবে এফা রক্তক্ষরণহেতু বড্ডই দুর্বল।

শুধু এফার ফাঁড়া কেটে গেল তাই নয়, স্বয়ং হিটলার এবং নাৎসি পার্টিরও ফাঁড়া কেটে গেল। অবশ্য কিছুটা কানাঘুষো হয়েছিল, কিন্তু জানাজানি হয়নি।

ব্যক্তিগত সম্পর্কে হিটলার যে খুবএকটা নেমকহারাম ছিলেন তা নয়। এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টা থেকে হিটলার বুঝে গেলেন এফার প্রেম কতখানি গভীর— বল্লভার ব্রেন-বাক্সে কিছু থাক আর না-ই থাক, তার গলা থেকে নাভিকুণ্ডলী অবধি জুড়ে বসে আছে একটা বিরাট হৃদয়— সেখানে না আছে ফুসফুস, না আছে লিভার স্প্লিন কিডনি না আছে অন্য কোনও যন্ত্রপাতি।

এ হেন হৃদয়কে তো অবহেলা করা যায় না।

এতদিন হিটলার যে প্রেম করতেন এফার সঙ্গে সেটার পদ্ধতি ছিল মোটামুটি জর্মন কলেজ-স্টুডেন্টরা তাদের বান্ধবীর (ফ্রয়েন্ডিন— গার্ল ফ্রেন্ডের) সঙ্গে যেভাবে করে থাকে। অর্থাৎ সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর এফা তাঁর নাইটগাউন ইত্যাদি রাত্রের পোশাক একটি অতি ছোট্ট স্যুটকেসে পুরে চুপিসাড়ে ঢুকতেন হিটলারের ফ্ল্যাট বাড়িতে। বাড়ির পাঁচজন জেগে ওঠার পূর্বেই, ভোরবেলা, ফের চুপিসাড়ে চলে যেতেন আপন ফ্ল্যাটে।

এবার হিটলার করলেন ভিন্ন ব্যবস্থা। ততদিনে তিনি রীতিমতো বিত্তশালী হয়ে গিয়েছেন। হিটলারের আপন কর্মস্থল ম্যুনিক শহরে তিনি এফার জন্য ছোট্ট একটি ভিলা, মোটর কিনে দিলেন এবং মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

www.pathagar.com

অর্থাৎ তিনি হিটলারের একমাত্র রক্ষিতা হিসেবে হিটলারমণ্ডলীতে আসন পেলেন। এস্থলে 'রক্ষিতা' বলাটা হয়তো ঠিক হল না। কারণ ইয়োরোপের প্রায়ই অনেকে কয়েক বৎসর পরে এই রক্ষিতাকে বিয়ে করে তাকে সমাজে তুলে নেন। এবং সমাজপতিরাও বধূর অতীত সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন তোলেন না। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিই : এদেশে যদি বিয়ের তিন-চার মাস পর কোনও রমণী বাচ্চা প্রসব করে, তবে হইচই পড়ে যায়। ইয়োরোপে আদৌ না। আমার যতদূর জানা গির্জা পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন না তুলে বাচ্চাটাকে ব্যাপ্টিস্ট করে তাকে ধর্মত সমাজে তুলে নেয়।

অবশ্য হিটলার সমস্ত ব্যবস্থাটা করলেন অতিশয় গোপনে। পূর্বেই বলেছি, তাঁর এবং এফার চাকর মেড্ তথা অতিশয় অন্তরঙ্গজন হাড়ে-মাসে জানতেন তাঁরা যদি এই প্রণয়লীলা নিয়ে সামান্যতম আলোচনা করেন— বাইরের লোককে খবরটা জানাবার তো কথাই ওঠে না— তা হলে তিনি পার্টির জব্বর পাণ্ডাই হন আর জমাদারণীই হোক, তাঁরা যে তদ্দণ্ডেই পদচ্যুত বহিষ্কৃত হবেন তাই নয়, কপালে গুম-খুনও অনিবার্য। কারণ হিটলার বহু বিষয়ে নির্মম। এদেশের কর্ণধার হওয়ার পূর্বে এবং পরেও হিটলার-হিমলার বিস্তর গুম-খুন করিয়েছেন।

ওদিকে এফার যে ধার্মিক চরিত্রশীল জনক-জননী হিটলারের সঙ্গে তাঁদের কুমারী কন্যার অন্তরঙ্গতার কঠোর কঠিনতম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁরাও এ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিলেন। এটাকে প্রতিরোধ করলে একগুঁয়ে মেয়ে যদি আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে, এবং যদি সফল হয়ে যায়!

আমার দুঃখ শুদ্ধ-পাঠটি আমাদের মনে নেই : মোটামুটি যে মেয়ে—

'মরণেরে করিয়াছে জীবনের প্রিয়।
কারও কোনও উপদেশ কান দিবে কি ও?'

এফার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গজন ছাড়া আর সবাই বিশ্বাস করত, এফা ফটোগ্রাফ দোকানে কাজ করেন। তিনি হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে প্রতিদিন হাজিরা দিতেন।

এর কিছুদিন পরে ১৯৩৩-এর ৩০ জানুয়ারি হিটলার হয়ে গেলেন জর্মনির কর্ণধার— প্রধানমন্ত্রী চ্যানসেলার। তাকে তখন স্থায়ীভাবে বাস করতে হল বার্লিনে— ম্যুনিক পরিত্যাগ করে। এখন তিনি এফাকে নিয়ে পড়লেন বিপদে। এতদিন শুধু কম্যুনিস্টরাই তাদের আধা-পাকা গোয়েন্দাগিরি করেছে হিটলারের। এবারে জুটলো তাবৎ মার্কিন খবরের কাগজের দুঁদে দুঁদে রিপোর্টার— পূর্বোক্ত 'ঐতিহাসিক' শায়রারও তাদেরই একজন। এদের চোখ দু-নলা বন্দুকের মতো গভীর অন্ধকারেও এক্স-রে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে জানে শিকারের দিকে। এবং কারও যে কোনও ব্যক্তিগত জীবনের প্রাইভেসি থাকতে পারে সেটা তাদের শাস্ত্রে— আদৌ যদি তাদের কোনও শাস্ত্র থাকে— লেখে না। পাঠক শুধু স্মরণে আনুন ইংল্যান্ডের রাজা যখন মিসেস সিমনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে তখন সে 'কেচ্ছা'কে তারা কী কেলেঙ্কারির রূপ দিয়ে দিনে দিনে রসিয়ে রসিয়ে মার্কিন কাগজে প্রকাশ করেছে! তার তুলনায় হিটলার কোন ছার! ব্যাটা আপস্টার্ট যুদ্ধের সময় ছিল নগণ্য করপোরেল— তার আবার প্রাইভেট লাইফ! সেটাকেও আবার রেহাই দিতে হবে! ছোঃ!

কাজেই এফাকে বার্লিনে আনা অসম্ভব।

www.pathagar.com

ফলস্বরূপ ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫-এ হিটলারের আত্মহত্যা করা পর্যন্ত সুদীর্ঘ বারোটি বৎসর— কবির ভাষায় নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর— এফা পেলেন আগের তুলনায় অল্পই, এবং ক্রমশ হ্রাসমান। তাই সহমরণের বহু আগের থেকেই এফা একাধিক বন্ধুবান্ধবীকে বিষণ্ণকণ্ঠে বলেছেন, '১৯৩৩-এর জানুয়ারি (অর্থাৎ হিটলার যেদিন চ্যানসেলর হন) আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা নির্মম দিবস (ট্র্যাজিক ডে, "ট্রাগিশা টাখ"।'

যেদিন মিত্রপক্ষ ফ্রান্সে অবতরণ করে কালক্রমে জর্মনি জয় করে সেটাকে বলা হয় ডি-ডে (D-Day)। সেটা ৬ জুন ১৯৪৪। ১৯৩৩-এর ৩০ জানুয়ারিতেই কিন্তু আরম্ভ হয় অভাগিনী এফার ডি-ডে। কিন্তু এসব কথা পরে হবে।

বার্লিনে কর্মব্যস্ত হিটলার ম্যুনিকে আসার সুযোগ পেতেন কমই। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ম্যুনিকে ট্রাঙ্ককল করে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ করে নিতেন। এবং টেলিফোন লাইনটি এমনভাবে নির্মিত ছিল যে, এফা-হিটলার কনেকশান হয়ে যাওয়া মাত্রই দুই প্রান্তের টেলিফোন অপারেটররা কিছুই শুনতে পেত না।... এবং যে স্থলে ট্রাঙ্ককলের অষ্টপ্রহরব্যাপী এহেন সুবিধা সেখানে চিঠিচাপাটির বিশেষ প্রশ্ন ওঠে না— ওদিকে আবার চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে হিটলার ছিলেন হাড় আলসে। (জর্মনে 'স্টিঙ্কেতের শ্রাইবফাউল' দুর্গন্ধময় লেখন-আলসে)। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন আক্ষরিক অর্থে হিটলারের দম ফেলার ফুরসত নেই, ক্রমাগত একটার পর আরেকটা মিলিটারি কনফারেন্স হচ্ছে— তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গতম ভ্যালে লিঙেকে বলতেন, 'হে লিঙে, তুমি ঝপ করে এফাকে দুটি লাইন লিখে দাও না।' তখন প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় হিটলারের কোনও-না-কোনও কর্মচারী প্লেনে করে ম্যুনিক যাচ্ছে। ঘণ্টা তিনেকের ভিতর চিঠি এফার হস্তগত হত।

ভ্যালে বলতে ভৃত্যও বোঝায়। কাজেই পাঠক নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়ে শুধাবেন, "কী! চাকরদের দিয়ে প্রিয়ার উদ্দেশে চিঠি লেখানো! সখৎ বেআদবি তো বটেই— তার চেয়ে বটতলার 'সচিত্র প্রেমপত্র' থেকে দু-পাতা কেটে নিয়ে খামে পাঠিয়ে দেওয়া ঢের ঢের বেশি শৃঙ্গাররসসম্মত!" কিন্তু পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই— হিটলার, এফা ও ভ্যালে লিঙে তিনজনই ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক। এমনকি লিঙের সামাজিক (রাজনীতির কথা হচ্ছে না) প্রতিষ্ঠা ছিল হিটলারের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের। তদুপরি, হিটলারের হাজার হাজার খাস সেনানীর (এস-এ) মাঝখান থেকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লিঙেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন প্রায় কর্নেলের কাছাকাছি। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, হিটলার ম্যুনিকে এলেও তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত রাষ্ট্রকার্যে। সে সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এফাতে-লিঙেতে সময় কাটাতেন গালগল্প করে। এফা জানতেন, পুরুষদের ভিতর লিঙেই দশ-বারো বছর ধরে হিটলারের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং হিটলারও তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতেন। এফা মেয়েদের ভিতর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তিনী। অতএব দুজনার ভিতর একটা অন্তরঙ্গতা জমে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, এফা এই লিঙেকে তাঁর হৃদয়বেদনা যতখানি খুলে বলেছেন, অন্য আর কাউকে অতখানি বলেননি।[২]

২. এফার সঙ্গে লিঙের আরেকটা মিল আছে। বার্লিন যখন প্রায় চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত, শেষ পরাজয় সুনিশ্চিত, কিন্তু পালাবার পথ তখনও ছিল, সে সময় হিটলার লিঙেকে ডেকে বলেন, 'তুমি আপন বাড়ি চলে যাও।' লিঙে অসম্মতি জানান এবং সংক্ষেপে যা বলেন তার মোদ্দা :

www.pathagar.com

অন্যত্র সবিস্তর লিখেছি, হিটলারের মৃত্যুর পর লিঙে রুশহস্তে বন্দি হন এবং দীর্ঘ বৎসর রুশ-কারাগারের দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করার পর জর্মনিতে ফিরে এসে হিটলার সম্বন্ধে একখানি চটিবই লেখেন। এফা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক এই পুস্তিকায়ই তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে বিশ্বাস্য খবর পাবেন। হিটলার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে, কিন্তু এফা সম্বন্ধে লিখেছেন বড়ই দরদ-ভরা ভাষায়। তিনি ইচ্ছে করলেই হিটলার-এফার সম্পর্ক সম্বন্ধে রগরগে মার্কিনি ভাষায় 'কেলেঙ্কারি কেচ্ছা' লিখতে পারতেন— কোনও সন্দেহ নেই তিনি রুশ দেশ থেকে পশ্চিম জর্মনিতে ফেরা মাত্রই মার্কিন রিপোর্টাররা তাঁকে চেপে ধরে, অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে হিটলার-এফার নব 'বিদ্যাসুন্দরে'র জন্য আপ্রাণ পাম্প করেছিল কিন্তু সেসময় বিশেষ কিছু তো বলেনইনি, পরেও পুস্তিকা রচনাকালে লিখেছেন যেটুকু নিতান্তই না লিখলে সত্য গোপন করে এফার প্রতি অবিচার করা হয়। এই অন্তর্নিহিত শালীনতাবোধ ছিল বলেই হিটলার ও এফা উভয়েই তাঁকে বন্ধুর চোখে দেখতেন। এটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া আজগুবি ব্যাপার নয়। এ দেশের পাঠান দাসবংশের ইতিহাস যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরাই এর সত্যতার নজির সে ইতিহাসে পাবেন এবং লিঙে তো কিছু ক্রীতদাস নন!!

তাই এফাতে-লিঙেতে এমনিতেই চিঠিপত্র চলত। হিটলার সেটা জানতেন। তাই তিনি যে কাজকর্মে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তিনি যে ফোন করার জন্য মন্ত্রণাকক্ষ ত্যাগ করে পাঁচ মিনিটের তরেও আপন খাস কামরায় যেতে পারছেন না, এটা তাঁর গাফিলতি নয়, বস্তুত তাঁর এই অপারগতা সম্বন্ধে তিনি নিজেকে দোষী মনে করেন— এসব কথা লিঙেকে গুছিয়ে লিখতে বলতেন।

হিটলার যে এফাকে কখনও বার্লিনে আসতে দিতেন না, তা নয়। অবশ্য অতিশয় কালেকস্মিনে। জব্বর পার্টি-পরবের স্টেট ব্যাঙ্কুয়েট না থাকলে অন্তরঙ্গজন তথা এফার সঙ্গে তিনি ডিনার-লাঞ্চে বসতেন। এফাকে তাঁর বাঁ দিকের চেয়ারে বসাতেন। এফা ঠিকমতো খাচ্ছেন কি না, তাঁর পছন্দসই খানা তৈরি হয়েছে কি না তাই নিয়ে পুতুপুতু করতেন এবং সবাই বুঝতে পারত তিনি এফাকে সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মান দেখাচ্ছেন। কিন্তু যেদিন স্টেট ব্যাঙ্কুয়েট বা বাইরের লোক খানা খেতে আসত, সেদিন এফাকে উপরের তলায় হিটলারের চারজন মহিলা সেক্রেটারি ও তাঁর খাদ্যরন্ধনের অধিকর্ত্রীর[৩] সঙ্গে খানা খেতে হত। অবশ্য এ ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হল, যখন হিটলারের দফতরের এক উচ্চ অফিসার, ফেগেলাইন বিয়ে করলেন এফার এক

যাঁকে আমি এত বৎসর ধরে সেবা করেছি তাঁকে তাঁর শেষ মুহূর্তে আমি ত্যাগ করতে পারব না।' এবং সবাই জানেন, এফাও হিটলারের কড়া আদেশ সত্ত্বেও তাঁকে ত্যাগ করেননি।

৩. ইংরেজের স্নবারির 'বামনাই'য়ের দুটি চূড়ান্ত বেশরম, বেহায়া উদাহরণ পাঠক এস্থলে পাবেন। হিটলার নিরামিষাশী ছিলেন ও তদুপরি তাঁকে বিশেষ বিশেষ খাদ্য খেতে হত; অর্থাৎ তিনি ডায়েট খেতেন। সেসব বিষয়ে রান্না বড় বড় হোটেলের 'শেফ'-রাও রাঁধতে জানে না। তাই ডাক্তারদের আদেশে তাঁকে নিযুক্ত করতে হয় একটি অতিশয় উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে। ইনি সর্বোচ্চ সম্মানসহ এম.ডি. পাস করার পর বিশেষভাবে স্পেশালাইজ করেন কীভাবে বিশেষ বিশেষ খাদ্য দিয়ে রুগীকে সারানো যায়। (আমাদের কবিরাজ ঠাকুমা-দিদিমারা যা করে থাকেন) এবং যারা শীতের দেশে নিরামিষাশী তাদের খাদ্য কীভাবে তৈরি করতে হয়— যাতে করে মাছ-মাংসের অভাব পরিপূরণ করা যায়। ইংরেজ এই সম্ভ্রান্ত

www.pathagar.com

বোনকে। তখন হিটলার-সমাজের একটুখানি বৃহত্তর চক্রে এফাকে পরিচয় দেওয়া হত, সম্মানিত অফিসার ফেগেলাইনের শ্যালিকারূপে! মায়ের ছেলে নয়, শাশুড়ির মেয়ের বর!

বিরাট বিরাট লক্ষজন পরিপূর্ণ সভাতে, যেখানে হিটলার ওজস্বিনী বজ্রভাষিণী খাণ্ডারি লেকচার ঝাড়বেন, সেখানে তাঁকে বিশেষ আসন দেওয়া হত না। তাঁর এবং হিটলারের আর পাঁচজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি সবার সঙ্গে মিশে গিয়ে দয়িতের জনগণমনচিত্তহারিণী বক্তৃতা শুনতেন।

হায়! একে কী বলব— 'বড় দুঃখে সুখ' বা 'বড় সুখে দুঃখ'? আমি এ বাবদে মূর্খ— আবার বিদগ্ধ, সম্মানিত সখা 'শিব্রাম' এরকম একটা মোকা পেলে ঝপ্ করে একটা অকল্পনীয় পান করে খপ্ করে একটা আরও অচিন্তনীয় সুমধুর সুভাষিত ম্যাক্সিম বানিয়ে ফেলতেন পুরো দেড় গণ্ডা শব্দ ব্যবহার না করেই। এই একটা ব্যাপারে লোকটা মক্খি-চোস্ কঞ্জুস। অভিধানের শব্দভাণ্ডার যেন ব্যাঙ্কের ভল্টে লুকানো চিত্রতারকাদের— সক্কলের না কারও-কারওর— ইনকাম-ট্যাক্স অফিসারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শক সম্পদ।

আমি কিন্তু দেখছি, এর ট্র্যাজিক দিকটা। পিতামহ ভীষ্মের পরই যে বীরকে এ ভারত সর্বসম্মত স্বীকৃতি দিয়েছে তিনি একচক্রা ভদ্রোত্তম কমান্ডার-ইন-চিফ্ ফিল্ড-মার্শাল কর্ণ। তিনি যখন কুরুপ্রাঙ্গণে শৌর্যবীর্য দেখাচ্ছেন, তখন মাতা কুন্তী তাঁর প্রতি-সাফল্যে কি তাঁর মাতৃগর্ব, মাতৃশ্লাঘা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন? শাস্ত্রোদ্ধৃতি দিতে পারব না, তবে বাল্যবয়সে আমার সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম গুরু আমাকে সঙ্গোপনে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন, মাতা কুন্তীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়সন্তান ছিলেন কর্ণ।

এফা ব্রাউনের ওই একই ট্র্যাজেডি। সর্বজনসমক্ষে তিনিও গাইতে পারেন না— 'বঁধু তুহাঁরি গরবে গরবিণী হম, রূপসী তুহাঁরি রূপে।'

অভিমানিনী পাঠিকা, তুমি হয়তো শুধোবে, এ হেন ভণ্ডামির অপমানজনক পরিস্থিতি এফা মেনে নিলেন কেন? এর উত্তরে আমার নিজের কোনও মন্তব্য না দিয়ে শুধু নিবেদন :

'চন্দ্রাবলি কুঞ্জে গিয়ে
সারা নিশি কাটাইয়ে
প্রভাতে এসেছ, শ্যাম,
দিতে মনোবেদনা ॥'

মহিলাকে বার বার 'কুক', 'পাচিকা', 'রাঁধুনী বাম্নী', 'বাবুর্চি' বলে তাচ্ছিল্যভরে উল্লেখ করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে। তিনি প্রায়ই এঁর সঙ্গে ডিনার খেতেন। ভাবটা এই, ছোট জাতের হিটলার— আর 'রাঁধুনী', 'বাবুর্চি' ছাড়া কার সঙ্গে হৃদ্যতা করবে! এবং সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ ইংরেজের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং মহিলার পাণ্ডিত্যের কথা বলতে বেবাক ভুলে যায়। এবং ভুলে যায় বলতে, মহিলাতে-হিটলারেতে খেতে খেতে 'মোচার ঘণ্টে কতখানি গুড় দিতে হয়' সে নিয়ে আলোচনা হত না। আলোচনা হত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নিয়ে। ... এবং পূর্বেই বলেছি, লিঙের শিক্ষাদীক্ষা পদমর্যাদা 'ভুলে গিয়ে' ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়ে 'ভ্যালে চাকর' নামে তাকে হীন করার চেষ্টা করেছে। ...হিটলারের আদেশ সত্ত্বেও তিনি লিঙেরই মতো হিটলারকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি। আমার যতদূর জানা, তিনি বার্লিনে নিহত হন। প্রভুভক্তির ফলস্বরূপ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হিটলার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রহর শেষে আলোয় রাঙা
সেদিন মধুমাস,
পূরবী গেয়ে ভোলালি তোরা,
চাইনে তো বিভাস!

বাণীর একনিষ্ঠ সাধিকা
অখণ্ডসৌভাগ্যবতী বধূ
কল্যাণীয়া
শ্রীমতী অর্চনা
তথা
পুত্রপ্রতিম অপিচ দিলের দোস্ত
নূর-ই-চশ্ম্
শ্রীমান দ্বারিক মিত্রের
চতুর্ভদ্র করকমলে

আনকল্
সৈয়দ মুজতবা আলী

রথযাত্রা, ১৩৭৭
কলকাতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হিটলারের শেষ দশ দিবস

ঠিক কুড়ি বৎসর আগে, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বেলা সাড়ে তিনটের অল্প পূর্বে হিটলার তাঁর অ্যার-রেড্ শেল্‌টার (বুঙ্কার— মাটির গভীরে কন্‌ক্রিটের পঞ্চাশ ফুট ছাতের নিচের আশ্রয়স্থল— কামানের বা প্লেন থেকে ফেলা গোলা বুঙ্কারের গর্ভ পর্যন্ত কিছুতেই পৌঁছতে পারে না) থেকে বেরিয়ে করিডোরে এলেন। সঙ্গে তাঁর নব-পরিণীতা বধূ এফা, প্রায় পনের বৎসরের 'বন্ধুত্বে'র (হিটলারের শেষ উইলে তিনি এই শব্দটিই ব্যবহার করেছেন— বস্তুত নিতান্ত অন্তরঙ্গ কয়েকজন অনুচর ভিন্ন দেশের-দশের লোক জানত না যে হিটলার ও এফার মধ্যে সম্পর্ক ছিল স্বামী-স্ত্রীর) পর তিনি প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে এঁকে বিয়ে করেছেন। করিডরে গ্যোবেল্‌স্, বরমান প্রভৃতি প্রায় পনেরোজন তাঁর নিকটতম মন্ত্রী, সেক্রেটারি, সেনাপতি, স্টেনো, খাস অনুচর-চাকর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হিটলার ও এফা নীরবে একে একে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তার পর নিতান্ত যে কজনের প্রয়োজন তাঁরা করিডরে রইলেন— বাদ-বাকিদের বিদায় দেওয়া হল। হিটলার ও এফা খাস কামরায় ঢুকলেন। অনুচররা বাইরে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে একটিমাত্র পিস্তল ছোড়ার শব্দ শোনা গেল। অনুচররা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন— তাঁরা ভেবেছিলেন দুটো শব্দ হবে। সেটা যখন শোনা গেল না তখন তাঁরা কামরার ভিতরে ঢুকলেন। সেখানে দেখতে পেলেন, তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন, কিংবা পড়ে আছেনও বলা যেতে পারে। তাঁর খুলি, মুখ এবং যে সোফাটিতে তিনি বসেছিলেন সব রক্তাক্ত। কেউ কেউ বলেন, তিনি মুখের ভিতরে পিস্তল পুরে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ বলেন, কপালের ভিতর দিয়ে গুলি চালিয়ে। তাঁর কাঁধে এফার মাথা হেলে পড়েছে। এফার কাছেও মাটিতে একটি ছোট পিস্তল। কিন্তু তিনি সেটা ব্যবহার করেননি। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

তার পর কুড়িটি বৎসর কেটে গেলে পর ইয়োরোপের অনেক ভাষাতেই সেদিনের স্মরণে ও তার সপ্তাহখানেক পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার উপলক্ষে বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

আমার কাছে আসে প্রধানত জর্মনি, অস্ট্রিয়া ও সুইটজারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত জর্মন ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক। এগুলোর আসতে প্রায় দু মাস সময় লাগে। অ্যার-মেল হওয়ার ফলে বুকপোস্ট, ছাপা-মাল যে কী জঘন্য শম্বুক গতিতে আসে সেকথা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

হিটলারের মৃত্যুর পর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ অন্তর্ধান করেন। কেউ কেউ ধরা পড়েন রাশানদের হাতে। তার মধ্যে হিটলারের খাস চাকর (ভ্যালে) লিঙেও ছিলেন। কেউ কেউ লুকিয়ে

www.pathagar.com

থাকেন মার্কিন-ইংরেজ-ফরাসি অধিকৃত এলাকায়। এঁরাও ধরা পড়েন, প্রধানত মার্কিনদের দ্বারা। আর কারও কারও কোনও সন্ধানই পাওয়া যায়নি। যেমন বরমান ইত্যাদি কয়েকজন। এঁদের কে কে পালাবার সময় হত হন বা পালাতে সক্ষম হন জানা যায়নি।

গোড়ায়, অর্থাৎ হিটলারের মৃত্যুর কয়েকদিন পর রুশ জঙ্গিলাট জুকফ প্রচার করেন যে, হিটলার এফা ব্রাউনকে বিয়ে করার পর আত্মহত্যা করেন। ওদিকে মস্কোতে বসে স্তালিন বলেন, হিটলার মরেননি, তিনি ডিক্‌টেটর ফ্রাঙ্কোর আশ্রয়ে স্পেনে আছেন (স্তালিনের মতলব ছিল এই অছিলায় ইয়োরোপের শেষ ফ্যাশি ডিক্‌টেটর ফ্রাঙ্কোকে খতম করা)। এমনকি কোনও কোনও উচ্চস্থলে একথাও বলা হল যে, ইংরেজ(!) তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। ইংরেজকে তখন বাধ্য হয়ে পাকাপাকি তদন্ত করতে হয় যে হিটলার সত্যই বুঙ্কার থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কি না, কিংবা তিনি মারা গিয়েছেন কি না। এ কাজের ভার দেওয়া হয় ইতিহাসের অধ্যাপক, যুদ্ধকালীন গুপ্তচর বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ট্রেভার রোপারকে।

তিনি তাঁদেরই সন্ধানে বেরুলেন যাঁরা হিটলারের সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন। এঁদের কয়েকজন হিটলারের মৃত্যু, দাহ, অস্থি-সমাধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু বুঙ্কার ও তৎসংলগ্ন ভূমি তখন রাশানদের অধিকারে (পূর্ব বার্লিনে); তারা সেখানে অধ্যাপককে কোনও অনুসন্ধান করতে দিল না। হিটলারের যেসব সাঙ্গোপাঙ্গ রাশানদের হাতে ধরা পড়েন তাঁরা যেসব জবানবন্দি দেন সেগুলোও অধ্যাপককে জানানো হল না।

হিটলারের মৃত্যুর সাত মাস পরে ট্রেভার রোপার তাঁর রিপোর্ট সরকারের হাতে দেন ও সেটি প্রকাশিত হয়। এর পর আরও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু অধ্যাপক তাঁর ময়না-তদন্তে যে বর্ণনাটি দেন তার বিশেষ কোনও রদ্‌-বদল করার প্রয়োজন হয়নি। এসব মিলিয়ে ট্রেভার রোপার সর্বসাধারণের জন্য একখানি পুস্তিকা রচনা করে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত করেন। তার নাম 'লাস্ট্‌ ডেজ্‌ অব হিটলার'।

এ পুস্তিকা ইয়োরোপের প্রায় সর্ব ভাষাতেই অনূদিত হয়, এবং তার যুক্তিতর্ক এমনই অকাট্য যে, জনসাধারণ হিটলারের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়। ওদিকে সরকারি রাশান মত— হিটলার মারা যাননি।— তাই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে বইখানি নিষিদ্ধ বলে আইনজারি করা হল।

কিন্তু শেষটায় রাশানদের স্বীকার করতে হল যে, হিটলার জীবিত নেই।

কাশীরাম দাস পূর্বেই বলে গেছেন :

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে স্তালিনকে প্রায় সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সৃষ্টিকর্তার আসনে তুলে 'দি ফল্‌ অব বার্লিন' ফিল্‌ম্‌ রাশাতে তৈরি হল। এ ছবি এদেশেও এসেছিল। এতে হিটলারের মৃত্যু যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেটা মোটামুটি ট্রেভার রোপারের বর্ণনাই। মাত্র একটি বিষয়ে তফাত। ছবিতে দেখানো হয়েছে হিটলার বিষ খেয়ে মরলেন— অথচ হিটলার যে পিস্তল ব্যবহার করেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই পরিবর্তনের কারণ কী তাই নিয়ে অধ্যাপক তাঁর পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে সবিস্তর আলোচনা করেছেন— এ স্থলে সেটা নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ পণ্ডিতের বিশ্বাস to make assurance doubly sure হিটলার বিষের পিলে কামড় ও পিস্তলের গুলি ছোড়েন একইসঙ্গে।

www.pathagar.com

রুশদেশে দশ বছর জেল খাটার পর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে হিটলারের কয়েকজন পার্শ্বচর মুক্তি পান। তার ভিতর একজন হিটলারের ভ্যালে লিঙে। ইনি বেরিয়ে এসেই দীর্ঘ একটি বিবৃতি দেন। এদেশের *অমৃতবাজার* পত্রিকায়ও সেটি ধারাবাহিক বেরোয়। অন্যজন হিটলারের অ্যাড্‌জুটান্ট গ্যুন্‌শে। ইনি ও লিঙে যেসব বিবৃতি দিলেন, সেগুলোর সঙ্গে অধ্যাপকের বইয়ে গরমিল অতি কম, এবং তা-ও খুঁটিনাটি নিয়ে।

* * *

আমি প্রথম জর্মনি যাই ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। হিটলার তখনও গোটা জর্মনিতে সুপরিচিত হননি। তাঁর কর্মস্থল ও খ্যাতি প্রধানত ছিল ম্যুনিক অঞ্চলে। তার পর আমার চোখের সামনেই তিনি রাইশ্‌টাগে (জর্মন পার্লিমেন্টে) তাঁর দলের ক্ষমতা অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ালেন। ১৯৩২-এ আমি দেশে ফিরে এলুম। ৩৩-এ হিটলার জর্মনির চ্যান্‌সেলর— প্রধানমন্ত্রী, প্রধান কর্মকর্তা হলেন। ১৯৩৪-এ আমি আবার প্রায় এক বছর জর্মনিতে ছিলুম। তখন হিটলার কীভাবে রাজ্যশাসন করেন সেটি পুরোপুরি দেখলুম। ১৯৩৮-এ আমি আবার জর্মনিতে চার মাস কাটালুম। চেম্বারলেন তখন হিটলারের কাছে যাবার জন্য তোড়জোড় করছেন। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে হিটলার পোলান্ড আক্রমণ করলেন— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগল। বিশ্বযুদ্ধের পর আমি হিটলার ও তাঁর রাজ্যশাসন (থার্ড রাইষ একেই বলা হয়, এবং হিটলার সদম্ভে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তৃতীয় রাইষ, এক হাজার বছর স্থায়ী হবে— কিন্তু তার আয়ুষ্কাল হল মাত্র বারো বছর তিন মাস!) সম্বন্ধে শত শত বই কিনি। জর্মন, মার্কিন, ফরাসি, ইংরেজ ইত্যাদির লেখা। এদের সকলেই হয় হিটলারের পক্ষে না হয় বিপক্ষে ছিলেন। আমাকে নিরপেক্ষ বলা যেতে পারে। যুদ্ধের পরও আমি দু-বার জর্মনি ঘুরে আসি।

এস্থলে হিটলারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার দম্ভ আমার নেই। উপরের কয়েক ছত্র থেকে পাঠক শুধু যেন বুঝতে পারেন আমার মিত্রেরা কেন আমাকে হিটলার সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক লিখতে বলেন। আমারও সেই বাসনা ছিল, কিন্তু এখন দেখছি সেটা আর হয়ে উঠবে না। তাই যেটুকু পারি সেইটুকু এইবেলা লিখে নিই।

অনেক সময় পাঠকের ধৈর্য কম থাকে বলে তিনি উপন্যাসের শেষ অধ্যায়টি পড়ে নেন। আমি শেষ অধ্যায়ই সর্বপ্রথম লিখব। পটভূমি— অর্থাৎ প্রথম বাইশ বা বত্রিশ অধ্যায় নির্মাণ করব কয়েকটি ছত্রে।

১৯৩৩-এ হিটলার চ্যান্‌সেলর হলেন। ১৯৩৪-এ জর্মনির প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ মারা গেলে তিনি সে আসনটিও দখল করে দেশের 'ফ্যুরার' বা একচ্ছত্রাধিপতি 'নেতা' হন। পার্লিমেন্টের আর কোনও স্বাধীনতা রইল না। ১৯৩৮-এ হিটলার স্বাধীন অস্ট্রিয়া রাজ্য (তাঁর আপন জন্মভূমি ওই দেশেই) দখল করে 'বৃহত্তর রাইষে'র অংশ করে নিলেন। ওই বছরের সেপ্টেম্বরেই তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার জর্মন-ভাষাভাষী অঞ্চল গ্রাস করতে চাইলে, শান্তিভঙ্গের ভয়ে ভীত ইংলন্ডের চেম্বারলেন ও ফ্রান্সের দালাদিয়ে সে অঞ্চলটুকু তাঁকে লিখিত-পঠিতভাবে দান করলেন। কয়েক মাস পরে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার যে অঞ্চল তিনি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সেইটুকুও কাউকে কিছু না বলে-কয়ে গ্রাস করলেন। তখন চেম্বারলেনের কানে জল গেল— সে-ও পূর্ণমাত্রায় নয়। ১৯৩৯-এ

www.pathagar.com

হিটলার পোলান্ডের ভেতর দিয়ে জর্মন পূর্ব প্রাশা সংযুক্ত করার মানসে পোলান্ড রাজ্যের কাছে করিডর এবং অন্যান্য এটা-সেটা দাবি করলেন। ইংলন্ড আবার মধ্যস্থ হতে চাইল, কিন্তু হিটলার পোলান্ড আক্রমণ করলেন। ইতঃপূর্বেই জর্মন তথা বিশ্ববাসীকে সচকিত শঙ্কিত করে তিনি তাঁর জাতশত্রু স্তালিনের সঙ্গে চুক্তি করে পোলান্ড ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। ইংলন্ড ও ফ্রান্স তখন উত্তেজিত জনমতের চাপে পড়ে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল কিন্তু পোলান্ডকে কোনও সাহায্য পাঠাতে পারার পূর্বেই পোলান্ড হেরে গেল।

তার এক বৎসর পর ১৯৪০-এর গ্রীষ্মকালে হিটলার ফ্রান্স আক্রমণ করে অত্যল্প সময়েই তাকে পরাজিত করলেন। ফ্রান্সে আগত ইংরেজ বাহিনী প্রাণ নিয়ে কোনও গতিতে স্বদেশে ফিরে গেল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম সবকিছু ডানকার্ক বন্দরে ফেলে যেতে হল।

হিটলার ইংরেজকে বললেন, 'আর কেন? সন্ধি করো!' ইংরেজ বলল, 'না, তোমাকে খতম করব।'

হিটলার তখন বিরাট নৌবহর নিয়ে ইংলন্ড আক্রমণের তোড়জোড় করলেন, কিন্তু শেষটায় দেখা গেল অভিযান নিষ্ফল হলেও হতে পারে। হিটলার সে চিন্তা বর্জন করলেন।

তাঁর চিরকালের বাসনা ছিল রুশ জয় করে বিজিত অংশে জর্মন চাষি-মজুর বসিয়ে কলোনি নির্মাণ করা।[১] ১৯৪১-এর গ্রীষ্মে তিনি রাশা আক্রমণ করলেন ও রুশ সৈন্য পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করে পিছু হটতে লাগল। হিটলারবাহিনী মস্কোর দোরের গোড়ায় পৌঁছল। কিন্তু হিটলারের কপাল মন্দ। অসময়ে নেমে এল প্রচণ্ড শীত, বরফ আর বৃষ্টি। পরের বৎসর হিটলার-সৈন্য অভিযান করল ককেশাসের তেল দখল করতে। সেখানে স্তালিনগ্রাদে জর্মনরা খেল তাদের প্রথম মোক্ষম মার। ওদিকে হিটলারের মিত্র জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার ফলে আমেরিকাও যুদ্ধে নামল। মার্কিনদের একদল গেল জাপানদের হারাতে; অন্য দল ইংরেজসহ উত্তর আফ্রিকায়। সেখানে রমেল প্রায় মিশর আক্রমণ করে সুয়েজ দখল করতে যাচ্ছিলেন। মার্কিন-ইংরেজ সম্পূর্ণ উত্তর আফ্রিকা দখল করে নামল জর্মনমিত্র মুস্সোলিনির মুলুক ইতালিতে।

ওদিকে ১৯৪৪-এ রুশ বিপুল বিক্রমে জর্মনদের আক্রমণ করে বিজিত রাশা থেকে তাদের খেদিয়ে দিয়ে পৌঁছে গেল পোলান্ডে— তার পর জর্মন সীমান্তে। এদিকে ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালে হাজার হাজার জাহাজ নিয়ে মার্কিন-ইংরেজ নামল পশ্চিম ফ্রান্সের নরমান্ডি উপকূলে (হিটলার যে নৌ-অভিযান করতে সাহস পাননি এরা সেটাই উল্টোদিক থেকে করল)। হিটলার সমুদ্র উপকূলে প্রচুর রক্ষণ ব্যবস্থা করেছিলেন— সেনাপতিদের মধ্যে রমেলও ছিলেন— কিন্তু দুশমনকে ঠেকাতে পারলেন না। তারা ফ্রান্স জয় করে ১৯৪৫-এর শীতকালে জর্মনি ঢুকে, রাইন নদ অতিক্রম করে বার্লিনের কিছু দূরে এসে দাঁড়িয়ে রইল। কারণ স্তালিনের সঙ্গে মার্কিন-ইংরেজের চুক্তি ছিল, রুশরা প্রথম বার্লিন প্রবেশ করবে। রুশরা বার্লিনের পূর্ব সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে। এবার তারা বার্লিন আক্রমণ

---

১. জর্মন রাষ্ট্রের নেতা (ফ্যুরার) হওয়ার বহু পূর্বে তাঁর একমাত্র বই হিটলার লেখেন 'মাইন কাম্‌পৃফ্' নাম দিয়ে। এ পুস্তকের অন্যতম মূল বক্তব্য : সমুদ্রপারে কলোনি নির্মাণের যুগ গেছে। (এটা সত্য, এতদিনে সপ্রমাণ হয়েছে); জর্মনিকে রুশদেশ জয় করে সেখানে কলোনি স্থাপনা করতে হবে।

www.pathagar.com

করবে। এটা এপ্রিলের মাঝামাঝি— ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। আর কয়েক দিন পরেই হিটলারের জন্মদিন— ২০ এপ্রিল।

২০ এপ্রিল। আজ ফ্যুরারের জন্মদিন। তিনি কি জানতেন, দশ দিন পর তাঁকে নিজের হাতে নিজের জীবন নিতে হবে? না; কারণ ২৯ এপ্রিল রাত্রেও তিনি জেনারেল ভেংকের খবর নিচ্ছেন; তিনি কবে পর্যন্ত চতুর্দিকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ বার্লিন থেকে তাঁকে উদ্ধার করবেন। আবার ২০ এপ্রিলে ফিরে যাই।

হিটলারের আমির-ওমরাহ্, সেনাপতি-জাঁদরেল, সাঙ্গোপাঙ্গ সেদিন সবাই জন্মদিন উপলক্ষে বুঙ্কারে উপস্থিত হয়েছেন। এদের প্রায় সকলেই মনে মনে জানতেন, ফ্যুরারের সঙ্গে এই তাঁদের শেষ দেখা, কারণ রাশানরা তখন বার্লিনের প্রায় চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ব্যূহ নির্মাণ করে ফেলেছে। যে প্রভুকে তাঁরা কেউ ১২ বছর, কেউ ২০ বছর ধরে সেবা করেছেন এবং হিটলার চ্যান্সেলর হওয়ার পর ধনজন-খ্যাতি-খেতাব সবকিছুই তাঁর অকৃপণ হস্ত থেকে পেয়েছেন— তাঁকে তখন ত্যাগ করতে তাঁদের আর তর সইছে না। কারণ রাশান-ব্যূহ পরিপূর্ণ চক্রাকার ধারণ করার পর তাঁরা আর বেরুতে পারবেন না। তদুপরি বার্লিনের আরও দক্ষিণে রুশ-সেনাবাহিনীর আরেক বৃহৎ অংশ রাষ্ট্রের প্রায় মাঝখানে এসেছে; মার্কিন-ইংরেজ পশ্চিম থেকে পূর্ব পানে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দুই সৈন্যদল হাত মেলালে পর রাইষ দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। ২০ এপ্রিলে তারা তখনও হাত মেলায়নি— দক্ষিণ জর্মনি পৌঁছবার জন্য তখনও একটি করিডর খোলা। বেশিরভাগই দক্ষিণ জর্মনি যেতে চান। সেখানেই নাৎসি আন্দোলনের জন্মভূমি ম্যুনিক শহর; তার কাছেই হিটলারের আবাসভূমি বের্গহর্ফ— বের্ষ্‌টেশগাডেন্ অঞ্চলে, আল্‌পসের উপরে। সকলেরই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত হিটলার ওই পর্বতসঙ্কুল গিরি-উপত্যকার গোলকধাঁধাতে এসে তারই সাহায্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য দুশমনের সঙ্গে লড়ে যাবেন—

কারণ হিটলার একাদিক্রমে বার বার তাঁর সহচরদের বলেছেন : 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এই যে রুশ, মার্কিন, ইংরেজ মৈত্রী এটা কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এদের আদর্শ স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। দুই সৈন্যদল মুখোমুখি হতেই এই কোয়ালিশন (মৈত্রী) ভেঙে পড়বে। ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের বিরুদ্ধে ঠিক এইরকমই কোয়ালিশন হয়েছিল। তিনিও নিরুপায় হয়ে যখন আত্মহত্যার চিন্তা করছেন, ঠিক সেই সময় কোয়ালিশনের অন্যতম প্রধান নেত্রী রাশার মহারানি মারা গেলেন। রাশানরা বাড়ি ফিরে গেল; সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালিশন খানখান হয়ে গেল। জর্মনি লুপ্তগৌরব ফিরে পেল এবং উচ্চতর শিখরে আরোহণ করল।'

বুঙ্কারের খাস কামরায় নৌসেনাপতি ড্যোনিৎস, জেনারেল কাইটেল, জেনারেল ইয়োডলের কাছ থেকে হিটলার একজন একজন করে জন্মদিনের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। বাদবাকিরা— গ্যোরিঙ, রিবেন্‌ট্রপ্, হিমলার (হিটলার এঁরই মারফত আইষমানকে ইহুদি-হননে নিযুক্ত করেন), গ্যোবেল্‌স্, বরমান ইত্যাদির সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস। তিনি দৃঢ়নিশ্চয়, বার্লিন মহানগরের সামনে রাশানরা পাবে তাদের চূড়ান্ত পরাজয়। ভাগ্যবিধাতাই শুধু জানেন, এইসব অপদার্থ চাটুকারদের কজন হিটলারের এই অন্ধবিশ্বাসে অংশীদার ছিলেন। কারণ এঁরা সবাই জানতেন, প্রায়

www.pathagar.com

সপ্তাহখানেক পূর্বে রাশার জারিনার (মহারানির) মতো প্রেসিডেন্ট রোজভেল্ট মারা গিয়েছেন, কিন্তু মার্কিন সৈন্যদল স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেনি।

হিটলার আগের থেকেই জর্মনিকে উত্তর দক্ষিণ দু ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিলেন। এখন আদেশ দিলেন, বার্লিনে যাদের নিতান্তই কোনও প্রয়োজন নেই তারা হয় উত্তর, নয় দক্ষিণ পানে চলে যাবেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমির-ওমরাহ্ দক্ষিণ ভাগে চললেন— বিরাট বিরাট লরিতে করে দফতরের কাগজপত্র বোঝাই করে, এবং তার চেয়েও বড় কথা— আপন আপন ধন-দৌলত বোঝাই করে। পড়ে রইল বার্লিনের অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারী। আর রইলেন খাঁটি প্রভুভক্ত গ্যোবেল্‌স্, ক্ষমতালোভী সেক্রেটারি বরমান— হিটলারের 'গরবে তিনি গরবিনী'; দূরে চলে গেলে সে শক্তি পাবেন কোথা থেকে? বাদবাকিদের অধিকাংশের সঙ্গে হিটলারের আর দেখা হয়নি। তাঁর দুই প্রধান সেনাপতি কাইটেল আর ইয়োডল গেলেন বার্লিনের উপকণ্ঠে, সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্সে; নৌসেনাপতি চলে গেলেন উত্তর-পশ্চিম সমুদ্র-পারে, তাঁর হেডকোয়ার্টার্সে।

সবাই করজোড়ে হিটলারকে নিবেদন করলেন, আর কয়েকদিনের মধ্যেই রুশ সৈন্য বার্লিনের চতুর্দিকে ব্যূহ স্থাপন করে ফেলবে। ফ্যুরার তা হলে আর দক্ষিণে যেতে পারবেন না। যুদ্ধচালনার হুকুম-নির্দেশ তা হলে দেবে কে? হিটলার কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না। অবশ্য একথা সবাই জানতেন, একবার মনস্থির করার পর হিটলার অচল অটল হয়ে রইতেন।

তার পর হিটলার হুকুম দিলেন, বার্লিনে ও বার্লিনের চতুর্দিকে যেসব সৈন্য রয়েছে তারা যেন সবাই একত্র হয়ে একজোটে সব ট্যাংক, সব জঙ্গিবিমান নিয়ে বার্লিনের দক্ষিণভাগে রুশসৈন্যদের আক্রমণ করে। হিটলার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'কোনও সেনাধ্যক্ষ যদি তার সৈন্যকে সম্মুখযুদ্ধে না পাঠায় তবে পাঁচ ঘণ্টার বেশি সে বাঁচবে না।' জঙ্গিবিমানের সেনাপতি কলারকে বললেন, 'তোমার মাথার দিব্যি, কোনও সৈন্য যদি রণাঙ্গনে না যায়...।' এস্থলে 'মাথার দিব্যি' অর্থ হিটলার তার মুণ্ডুটির ভেতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালাবার হুকুম দেবেন।

কিন্তু হায়, বাস্তব জগতের সঙ্গে হিটলারের হুকুমের কোনও সাদৃশ্য তখন আর ছিল না। মাসের পর মাস ধরে তাঁর আমির-ওমরাহ্ তাঁর কাছে সত্য গোপন করে চলেছেন। যাঁরা সত্য গোপন করেননি, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অশেষ ভাগ্যবান, তাঁরা সুদ্ধ অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে বরখাস্ত হয়েছেন, অন্যরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, কারাগারে ফাঁসি যাচ্ছেন বা হিটলারের খাসসেনানীর চাবুকে চাবুকে জর্জরিত হচ্ছেন। সত্য গোপন করে হিটলারকে বলা হয়নি, ব্যাটালিয়ানের পর ব্যাটালিয়ান যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে— যেখানে হিটলার ভেবেছেন পুরো ডিভিশন রয়েছে, সেখানে তার এক-দশমাংশ আছে কি না সন্দেহ, তিনজন সেপাইয়ে মিলে রয়েছে একটা বন্দুক, টোটার সংখ্যা এতই সীমাবদ্ধ যে শত্রু দশবার গুলি ছুড়লে এরা একবার;— হিটলার জানতেন যে জঙ্গিবিমানের পেট্রল কমে আসছে, কিন্তু তারই অভাবে যে শত শত অ্যারোপ্লেন মাটিতেই শত্রুর বোমারু দ্বারা বিনষ্ট হচ্ছে তার পুরো খবর তাঁকে দেওয়া হয়নি।

বুঙ্কারের কনফারেন্স রুমে টেবিলের উপর বিরাট জঙ্গি ম্যাপ খুলে হিটলার তাঁর কাল্পনিক সৈন্যবাহিনী, ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ি লাল-নীল রঙিন বোতামের প্রতীক দিয়ে সাজাচ্ছেন আর

www.pathagar.com

কোন জায়গা থেকে কোন সৈন্যদল কোথায় কার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কোন জায়গায় আক্রমণ করবে তার হুকুম দিচ্ছেন। এসব সেনাপতিদের এমনকি কোনও কোনও স্থলে কর্নেলদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার কথা— এ সমস্ত তিনি তুলে নিয়েছেন আপন স্কন্ধে। হুকুম দিচ্ছেন মাটির নিচের বুঙ্কারে বসে। যুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন ইংরেজ বোমারু, জঙ্গিবিমান জর্মনির আকাশে একচ্ছত্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দিন নেই, রাত্রি নেই বেধড়ক বোমা ফেলে ফেলে বার্লিন শহরটাকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। হিটলার একদিনের তরে, একঘণ্টারও তরে সরেজমিন অবস্থা তদন্ত করতে বেরোননি। পাছে 'বাস্তবতা' তাঁর অনুপ্রেরণাকে ব্যাহত করে! পক্ষান্তরে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জর্মন বোমারু যখন লন্ডন লণ্ডভণ্ড করছিল তখন প্রায়ই দেখা যেত, বিরাট সিগার মুখে চার্চিল সেসব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর জনসাধারণকে দুঃখের দিনে উৎসাহ দিচ্ছেন— আর তারাও বলছে, 'আসুক না তারা, আমরাও আছি— গুড্ ওল্ড উইনি'।[২]

বুঙ্কারে হিটলারের জীবনের শেষ কদিন সম্বন্ধে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে সময় ও তারিখে ভুল করেছেন। কারণটি অতিশয় সরল। দিনের পর দিন এঁরা বিজলি বাতিতে কাজ করেছেন— মাটির পঞ্চাশ ফুট নিচে। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত কিছুই দেখতে পাননি। তারিখ ঠিক থাকবে কী করে? মাঝে মাঝে তাঁরা প্রায় ভিরমি যেতেন। বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস কলের সাহায্যে বুঙ্কারে ঠেলে দেওয়া হত। কিন্তু বোমাবর্ষণের ফলে বাইরের আকাশে মাঝে মাঝে এত ধুলোবালি জমে যেত যে কল সেগুলোও বুঙ্কারের ভিতর পাঠাত। বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণের জন্য কল বন্ধ করে দিতে হত। ফলে অক্সিজেনের অভাবে সবাই নিরুদ্ধনিশ্বাস। বুঙ্কারের ভিতরকার অনৈসর্গিক দূষিত বাতাবরণের— দৈহিক ও মানসিক উভয়ই— সর্বোত্তম বর্ণনা দিয়েছেন হ্যার বল্ট, একখানা চটি বইয়ে। ট্রেভার তাঁর ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। অমূল্য চটি বইখানার অনুবাদ নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু সেটি আমার চোখে পড়েনি— আমি উপকৃত হয়েছি বলে পাঠককে পড়তে বলছি। শুনেছি, বইখানা নাকি দক্ষিণ আমেরিকায় আইষমানের লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়, এবং ক্রোধোন্মত্ত আইষমান নাকি মার্জিনে লিখেছেন— 'ব্যাটাকে যদি একবার পেতুম'![৩]

পূর্বোল্লিখিত আক্রমণের যে আদেশ হিটলার তাঁর জন্মদিনের পরের দিন, ২১ এপ্রিল দিলেন তার সেনাপতি নিযুক্ত হলেন স্টাইনার।

পরের দিন সকালবেলা (হিটলার শুতে যেতেন ভোরের দিকে আর উঠতেন দুপুরের দিকে— শেষের দিকে দুর্ভাবনা আর ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন শুতে যেতেন আরও দেরিতে, উঠতেনও তাড়াতাড়ি, তিন ঘণ্টারও বেশি ঘুম হত না) থেকে হিটলার স্বয়ং এবং তাঁর হুকুমে অন্যরা চতুর্দিকে ফোন করতে লাগলেন, স্টাইনারের আক্রমণ কতদূর এগিয়েছে? কেউই কোনও পাকা খবর দিতে পারে না। যেটুকু আসছে তা-ও পরস্পরবিরোধী; একবার স্বয়ং হিটলার বললেন— তিনি অবশ্য অকুস্থল থেকে দূরে— আক্রমণ চলছে; তার পরমুহূর্তেই অন্য সূত্র থেকে খবর এল আক্রমণ আদপেই আরম্ভ হয়নি। এমনকি স্টাইনার স্বয়ং যে কোথায় তা-ও কেউ সঠিক বলতে পারে না। যে জেনারেল কলারের মুণ্ডুর ভিতর গিয়ে গরম বুলেট

২. উইনি, উইনস্টন চার্চিল।
৩. বল্ট্— ডি লেৎস্তেন টাগে ড্যার রাইষস্কানৎসেলাই।

www.pathagar.com

চালিয়ে দেবার ভয় দেখানো হয়েছিল তিনি তাঁর রোজনামচায় সেই ধুন্ধুমারের বর্ণনা লিখেছেন—এবং সেটি প্রকাশিত হয়েছে।

বিকেল তিনটে পর্যন্ত কোনও খবর নেই। তার পর নিত্যিকার প্রথামতো মন্ত্রণা-সভা বসল। উপস্থিত ছিলেন ফ্যুরার, দুই জেনারেল কাইটেল (হিটলারের পরেই তিনি) ও তার পরে জন ইয়োডল; এবং আরও দুই সেনাপতি বুর্গডফ্ (পাঁড়মাতাল) ও ক্রেব্‌স্— শেষের দুজন সদাসর্বদা হিটলারের পাশের বুঙ্কারে বাস করতেন ও বলতে গেলে হিটলারের লিয়েজোঁ অফিসার ছিলেন এবং হিটলারের সেক্রেটারি বরমান।[৪]

সেই ঐতিহাসিক মন্ত্রণাসভায় হিটলার-রাইষের শেষ হাঁড়ি ফাটল।

স্টাইনার-আক্রমণ আদৌ ঘটেনি। একখানি বোমারু বা জঙ্গিবিমানও আকাশে ওঠেনি। হিটলারের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্ল্যান, মুণ্ডু দিয়ে বুলেট চালানোর বিভীষিকা প্রদর্শন— সব ভণ্ডুল, সব নস্যাৎ!

তাঁর জীবনে এই প্রথমবারের মতো হিটলার পরাজয় স্বীকার করলেন।

হিটলারের মেজাজটি ছিল আগুনে গড়া। দুঃসংবাদ পেলেই তিনি চিৎকার করে উঠতেন কর্কশ কণ্ঠে, চিৎকারে চিৎকারে তাঁর গলা ফেটে যেত, পায়চারি না— ঘরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সবেগে ছুটোছুটি আরম্ভ করতেন, মুখ দিয়ে ফেনা ফেরুতে আরম্ভ করত, এবং চোখদুটো যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইত। প্রধান প্রধান সেনাপতিদের মুখের সামনে ঘুষি বাগিয়ে 'কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক' পর্যন্ত বলতে কসুর করতেন না। বেদরদীরা বলে, তিনি শেষ পর্যন্ত মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতে কার্পেট চিবুতে আরম্ভ করতেন— তাই তারা তাঁর নামকরণ করে 'কার্পেটভুক'। তবে সত্যের খাতিরে বলা ভালো, হিটলারের শত্রু-মিত্র কোনও ঐতিহাসিকই এটা বিশ্বাস করেননি।

এবারে শুধু যে তাই হল তা নয়, এবার চিৎকার, হুঙ্কার, বেপথুর পর তিনি নির্জীবের মতো চেয়ারে বসে স্বীকার করলেন, এই শেষ। রুশের তুলনায় জর্মন জাতি হীনবল, নির্বীর্য, অপদার্থ বলে সপ্রমাণিত হয়েছে, তাঁর মতো লোককে তাদের ফ্যুরাররূপে পাবার গৌরব ও সামর্থ্য তারা ধরে না। তাঁর মনে আর কোনও দ্বিধা নেই, তিনি দক্ষিণ জর্মনি গিয়ে আল্‌প্‌সের গিরি-উপত্যকার গুহাগহ্বরে যুদ্ধ চালাবেন না— তৃতীয় রাষ্ট্র বন্ধ্যা সপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তিনি বার্লিনেই থাকবেন। সম্মুখযুদ্ধ করার মতো শারীরিক শক্তি তাঁর আর নেই বলে রুশরা বার্লিন প্রবেশ করলে তিনি বার্লিনের রাস্তায় বীরের মতো যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে পারবেন না। তিনি তখন আত্মহত্যা করবেন।

একথা সত্য, হিটলারের শরীরে তখন আর কিছু নেই।

হিটলারের অন্যতম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হাসেলবাখ বলেন, '১৯৩৯ পর্যন্ত হিটলারকে তাঁর বয়সের তুলনায় (তখন তিনি ৫০) অনেক কম দেখাত। ওই সময় থেকে তিনি অত্যন্ত

৪. ডাঙর ডাঙর নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধশেষে মিত্রপক্ষ ন্যুরন্‌বের্গে 'মকদ্দমা' করেন। কাইটেল, ইয়োডলের ফাঁসি হয়। বুর্গডর্ফ্, ক্রেব্‌সের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি; তবে প্রায় সবাই নিঃসন্দেহ, রাশানরা যখন ২ মে তারিখে বুঙ্কার আক্রমণ করে তখন এঁরা আত্মহত্যা করেন। তার পূর্বে ক্রেব্‌স্ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে (১ মে) রাশান প্রধান সেনাপতির কাছে যান, কিন্তু রাশানরা শর্ত মানল না বলে প্রস্তাব ভেস্তে যায়। বরমান নিখোঁজ।

www.pathagar.com

তাড়াতাড়ি বুড়োতে লাগলেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত তাঁর যা সত্যকার বয়স তাই দেখাত। ১৯৪৩-এর (স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের) পর তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন।' শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য যে একেবারে ভেঙে পড়ে তার জন্য অংশত তাঁর হাতুড়ে ডাক্তার মরেলই দায়ী— হিটলারকে যেসব গণ্যমান্য চিকিৎসক পরীক্ষা করেছেন, কিংবা সাময়িকভাবে চিকিৎসা করেছেন তাঁরা সকলে একবাক্যে এ সত্যটি বলে গেছেন। হিটলার কার্যক্ষম থাকবার জন্যে— সামান্যতম সর্দিকাশিতে পর্যন্ত তিনি ভয় পেতেন, এবং আসার লক্ষণ দেখতে পেলেই অবিচারে ইনজেকশন নিতেন— মরেলের কাছ থেকে উত্তেজনাদায়ক ওষুধ চাইতেন। মরেলও অবিচারে এমন সব ওষুধ আর ইনজেকশন দিতেন যেগুলো দিত সাময়িক উত্তেজনা কিন্তু আখেরে করত স্বাস্থ্যের অশেষ ক্ষতি। বুঙ্কারে সাময়িকভাবে থাকাকালীন অন্য এক ডাক্তার দৈবযোগে হিটলারের চাকর লিঙের ড্রয়ারে এসব ওষুধ প্রচুর পরিমাণে পান ও বিশ্লেষণ করে দেখেন যে ওগুলোতে মারাত্মক বিষ রয়েছে, যেগুলো অতি অল্প ডোজে কঠিন ব্যামোতে দেওয়া হয়। অথচ মরেল ওগুলো লিঙেকে দিয়ে রেখেছিলেন, হুজুর যাতে যখন খুশি, যত খুশি ওইসব ট্যাবলেট খেতে পারেন।[৫]

আর ইনজেকশনের তো কথাই নেই : লেকচার দিতে হলে পূর্বে ইনজেকশন, পরে ইনজেকশন। প্রকৃতি অসুস্থ মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করে; মরেল বা হিটলার সে সাহায্য নিতে চাইতেন না। ফলে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'ও শেষ বয়সে নির্মমভাবে তার প্রাপ্য নেয়।

ডাক্তাররা যখন হিটলারকে এ তথ্যটি বললেন, তখন তিনি রেগে টং। মরেলের ওপর না, ডাক্তারদের ওপর।

হিটলার তাঁদের অকথ্য অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বক্তব্য, মরেলের কড়ে আঙুলের যত এলেম, এঁদের গুষ্টির সব-কটার মগজেও তা নেই।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ সালে বল্‌ট্‌ মিলিটারি রিপোর্ট দিতে গিয়ে তাঁকে জীবনের প্রথমবারের মতো কাছের থেকে দেখেন। 'হিটলার অনেকখানি কুঁজো হয়ে, বাঁ-পা হেঁচড়ে টেনে আনতে আনতে আমার দিকে এগিয়ে এসে করমর্দন করতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মর্দনের সময় নির্জীব হাত কোনও চাপ দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন— তাঁর চোখে এক অবর্ণনীয় কাঁপা-কাঁপা জ্যোতি[৬] সম্পূর্ণ অনৈসর্গিক এবং ভীতিজনক। তাঁর বাঁ-হাত নিস্তেজ হয়ে ঝুলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে। তাঁর মাথাও অল্প অল্প দুলছে। তাঁর মুখ ও বিশেষ করে চোখের চতুর্দিকে দেখলে মনে হয় যেন এগুলোর সব শেষ হয়ে গেছে। সবসুদ্ধ মিলিয়ে মনে হয়, লোকটি অতিশয় বৃদ্ধ।'[৭] ...অন্যরা বলেছেন, নানারকমের বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে খেয়ে তাঁর চামড়ার রঙ বিবর্ণ পাঁশুটে হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাঁ-হাত এত বেশি কাঁপত যে চেয়ারের হাতা বা টেবিল তিনি সে হাত দিয়ে চেপে ধরতেন; দাঁড়ানো অবস্থায় দু-হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে ডান-হাত দিয়ে বাঁ-হাত চেপে ধরে রাখতেন।... বল্‌ট্‌ হিটলারের মৃত্যুর

---

৫. চিকিৎসকদের কৌতূহল হতে পারে ওষুধটা কী? এর নাম Dr. Koester's Antigaspolls. এর প্রেসক্রিপশন : Extr. Nux. Vom; extr. Bellad. a. a. 0. 5; extr. Gent 1.0. বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি যদ্দৃষ্টং নকল দিলুম।

৬. অনেকে সন্দেহ করেছেন, এ জ্যোতি উত্তেজক ওষুধবশত।

৭. বল্‌ট্‌, ট্রেভার রোপার, আসমান দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

এক সপ্তাহ পূর্বে আবার তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি আরও কুঁজো হয়ে গিয়েছেন, আরও পা টেনে টেনে আস্তে আস্তে এগোন। সমস্ত চেহারাটা মৃত। সবসুদ্ধ শীর্ণ-জীর্ণ বিকৃত-মস্তিষ্ক অতি বৃদ্ধের মূর্তি। চোখেও সেই অস্বাভাবিক জ্যোতি আর নেই।

হিটলার যখন দৃঢ়কণ্ঠে বার্লিনেই মৃত্যুবরণের শপথ গ্রহণ করলেন তখন সকলেই একবাক্যে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'নিরাশ হবার মতো কিছুই নেই। দক্ষিণ জর্মনি ও উত্তর ইতালিতে, বোহেমিয়া অঞ্চলে ও অন্যত্র এখনও অনেক অক্ষত সৈন্যবাহিনী রয়েছে। হিটলার যদি দক্ষিণ জর্মনির গিরি-উপত্যকায় তাদের জড়ো করেন তবে আরও অনেকদিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করা যাবে।'

হিটলার অচল অটল। তাঁর হুকুমে পরের দিন বার্লিন বেতার প্রচার করল, হিটলার, গ্যোবেল্‌স্ ও পার্টির কর্মকর্তাগণ বার্লিন ত্যাগ করবেন না, ফ্যুরার স্বয়ং বার্লিন রক্ষা করবেন। তার পরের কথাগুলো বোধহয় গ্যোবেল্‌সের জোড়া প্রপাগান্ডা-বাণী 'বার্লিন ও প্রাগ চিরকাল জর্মন শহর হয়ে রইবে।' কাইটেল, ইয়োডল বরমানকে ডেকে বললেন, 'আমি বার্লিন ত্যাগ করব না।' জেনারেলদ্বয় প্রতিবাদ করে বললেন, 'তা হলে দক্ষিণ জর্মনির জমায়েত সৈন্যচালনা করবে কে?' হিটলার বললেন, 'সৈন্যচালনার কীই-বা আছে, লড়াইয়ের কীই-বা বাকি? এখন সন্ধিসুলেহ কর গে। সে কাজ গ্যোরিঙই আমার চেয়ে ঢের ভালো পারবে।'

গ্যোরিঙের এই উল্লেখ পরবর্তী অনেক ঘটনার জন্য দায়ী।

২৩ এপ্রিল দুপুরবেলা দক্ষিণ জর্মনিতে গ্যোরিঙের কাছে এই কথোপকথনের খবর পৌঁছল। তিনি যে খুশি হলেন সেটা কারও বুঝতে অসুবিধা হল না। তবু সাবধানের মার নেই বলে হিটলারের আইন-উপদেষ্টাকে ডেকে পাঠিয়ে ১৯৪১ সালের হিটলার-দত্ত সেই পুরনো প্রত্যাদেশের দলিল বের করলেন— যেটাতে হিটলার তাঁকে তাঁর ডেপুটিরূপে নিয়োগ করেছিলেন। এখন যদি রিপোর্ট সত্য হয় যে হিটলার আর কোনও হুকুম দিচ্ছেন না, এবং সন্ধিসুলেহ করার জন্য তাঁকেই স্মরণ করে থাকেন তবে তাঁকে কিছু-একটা করতে হয়। পারিষদদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করার পর তিনি হিটলারকে তার পাঠালেন, আপনি যখন বার্লিনে শেষ পর্যন্ত থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন— তবে কি আপনি ১৯৪১-এর প্রত্যাদেশ মোতাবেক রাজি আছেন যে আমি তাবৎ রাইষের নেতৃত্ব গ্রহণ করি? আজ রাত্র দশটার ভিতর কোনও উত্তর না পেলে বুঝব, আপন কর্ম-স্বাধীনতা থেকে আপনি বঞ্চিত হয়েছেন এবং তদনুযায়ী দেশের-দশের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করব। আপনি জানেন, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বময় এই মুহূর্তে আপনার জন্য আমার হৃদয়ে কী অনুভূতি হচ্ছে! ভগবান আপনাকে—' ইত্যাদি ইত্যাদি (তার পর আশীর্বচন, মঙ্গল কামনা, অন্যান্য দরদী বাৎ)।

অত্যন্ত আইনসঙ্গত সহৃদয় চিঠি। কিন্তু গ্যোরিঙের জাতশত্রু জানের দুশমন সেক্রেটারি বরমান বছরের পর বছর ধরে এই মহাশুভ লগনের জন্য প্রহর গুনছিলেন। দিনভর হিটলার শুধু 'নেমকহারাম, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক সব— দলকে দল' এইসব বুলি আওড়েছেন; যখন তিনি উত্তেজনার চরমে হাঁপাচ্ছেন তখন বরমান গুড়িগুড়ি টেলিগ্রামখানা এগিয়ে দেবার সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে এটাও যে আরেকটা বিশ্বাসঘাতকতা, হিটলার উৎকট সঙ্কটে অসহায় জেনে এ শুধু গ্যোরিঙের নিছক শক্তি কেড়ে নেওয়ার নীচ-হীন ষড়যন্ত্র এবং এটা তারই নির্লজ্জ আলটিমেটাম (ভীতিপ্রদর্শনের সঙ্গে ম্যাদ)— একথাটিও বললেন।

www.pathagar.com

হিটলার তখন চতুর্দিকে দেখেছেন বিশ্বাসঘাতকতা; এটা তারই আরেক নেমকহারাম নিদর্শন— এই অর্থেই সেটা গ্রহণ করলেন। তীব্র কর্কশ কণ্ঠে গ্যোরিঙকে দিলেন অশ্রাব্য গালাগাল। বেবাক ভুলে গেলেন, তাঁরই মুখে বেরিয়েছিল গ্যোরিঙ সম্বন্ধে প্রস্তাব, কিন্তু বরমান যখন গ্যোরিঙের প্রাণদণ্ডাদেশ চাইলেন তখন তিনি পার্টি এবং ফ্যুরারের প্রতি গ্যোরিঙের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সেবা ভুলতে না পেরে আদেশ দিলেন, তাঁকে তাঁর সর্ব-পদ সর্ব-ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত করা হল, এবং আদেশ দেওয়া হল হিটলারের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন না। এবং তাঁকে গ্রেফতার করে বন্দি করে রাখার হুকুম দেওয়া হল।

ইতোমধ্যে হিটলার গ্যোবেল্‌স্‌ দম্পতিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তাঁরা যেন তাঁদের বাসস্থান ত্যাগ করে তাঁদের ছ-টি বাচ্চাসহ তাঁর পাশের বুঙ্কারে বাসা বাঁধেন। সুবুদ্ধিমান হাতুড়ে ডাক্তার মরেল ইতঃপূর্বেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে (কেউ কেউ বলেন চোখের জল ফেলে অনুনয় করে, অন্যেরা বলেন কুমিরের ভণ্ডাশ্রু) হিটলারের কাছ থেকে বিদায় ভিক্ষা করে দূর দক্ষিণে কেটে পড়েছেন (হিটলার যেন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'যে পথে যাচ্ছি সেখানে যাবার জন্যে আপনাকে আমার আর প্রয়োজন নেই')। তাঁর কামরা ছিল বুঙ্কারে হিটলারের মুখোমুখি— গ্যোবেল্‌স্‌ সে ঘরটাও পেলেন। গ্যোবেল্‌স্‌ দম্পতি ও হিটলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে বসলেন। গ্যোবেল্‌স্‌ বললেন তিনিও আত্মহত্যা করবেন, এবং হিটলারের আপত্তি সত্ত্বেও ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্‌ বললেন, তিনিও সেই পথ ধরবেন এবং বাচ্চা ছটিকে বিষ খাইয়ে মারবেন।

এটা এমনি বীভৎস কাণ্ড যে কোনও ঐতিহাসিকই এ নিয়ে মন্তব্য করেননি। এর পর হিটলার তাঁর কাগজপত্র থেকে নিজে বাছাই করে কতকগুলি পোড়াবার আদেশ দিলেন।

সমস্ত দিন ধরে দক্ষিণ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রেপ, উত্তর থেকে নৌসেনাপতি ড্যোনিৎস ও হিমলার এবং আরও একাধিক আর্মির হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, কিন্তু হিটলার অটল অচল। ২৩ তারিখে তিনি জেনারেল কাইটেলকে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন জেনারেল ভেংকের কাছে— তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বার্লিন উদ্ধার করবেন। ইতোমধ্যে রাশানরা বার্লিন মাঝখানে রেখে সাঁড়াশি ব্যূহ নির্মাণের জন্য বার্লিন ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে গিয়েছে। ভেংককে এদের সঙ্গে লড়াই করে করে তবে বার্লিনে পৌঁছতে হবে। হিটলার ঘড়ি ঘড়ি শুধোচ্ছেন, ভেংকের খবর কী, তিনি কতদূর এগিয়েছেন! সমস্ত বুঙ্কারবাসীর ওই এক শেষ ভরসা। কিন্তু তাঁর কোনও খবর নেই।

২৫ তারিখে রুশসৈন্য সমস্ত বার্লিন চক্রব্যূহ ঘিরে ফেলল। এর পর আর দশ-বিশজন লোক যে একসঙ্গে বার্লিন থেকে বেরুবে তার উপায় আর রইল না। তবে একজন দুজন গলিঘুঁচি দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে রাতের অন্ধকারে হয়তো বেরুতে পারে। এ অবস্থায় হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করার জন্য আর অনুরোধ করা যায় না।

কিন্তু বুঙ্কারে দিনে দু-বার কখনও-বা তিনবার হিটলার তাঁর মন্ত্রণাসভায় নেতৃত্ব করে যেতে লাগলেন। সেখানে শুধু ওই খবরই পাওয়া যেত, রুশরা বার্লিনের কোন দিকে কতখানি ভিতরে ঢুকে পড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় বৃদ্ধ আর বারো থেকে ষোল বছরের ছেলেরা যতখানি পারে লড়াই দিচ্ছে। যে-কোনও সেনানীর পক্ষেই কোনও শহরের অন্তর্ভাগ দখল করা সহজ নয়। রুশরা এগুচ্ছে ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে। ইতোমধ্যে পূর্ব থেকে এসে রুশসৈন্য ও

www.pathagar.com

পশ্চিম থেকে এসে মার্কিন সৈন্য মধ্য-জর্মনিতে হাত মিলিয়েছে— জর্মনি এখন দু খণ্ডে বিভক্ত। উত্তর থেকে— বার্লিন থেকে এখন আর আলপ্‌সের গিরি-উপত্যকায় গিয়ে যুদ্ধ প্রলম্বিত করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

দুই সেনাবাহিনীর এই হাত মেলানোর খবর হিটলার পেলেন মন্ত্রণাসভায় বসে। সংবাদদাতা বললেন, 'দু দলে কথা-কাটাকাটি হয়েছে।' ফ্যুরারের পাংশু মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখের জ্যোতি যেন হঠাৎ ফিরে এল। সোল্লাসে বললেন, 'আমি কি তখনই বলিনি? এইবারে শুরু হবে।' কিন্তু হায়, পরের দিনই খবর এল, দু দল শান্তভাবে আপন আপন থানা গড়ে নির্বিরোধে খবর পরামর্শ লেন-দেন করছে।

বার্লিনের অবস্থা অবর্ণনীয়। অষ্টপ্রহর উপর থেকে বোমাবর্ষণ এবং তার সঙ্গে এসে জুটেছে শহরের উপকণ্ঠে বিরাট বিরাট কামান। বোমা ফেলছে বুঙ্কারের উপর। স্তালিনগ্রাদে যেসব জর্মন ধরা পড়েছিল তাদের অনেকে মিলে হিটলার-বিরোধী এক 'স্বাধীন-জর্মনি' দল গড়ে। এরাই আজ রুশদের বার্লিনের রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘর চিনিয়ে দিচ্ছে। তাই তাগেও ভুল হচ্ছে না। বুঙ্কারে ফাটল ধরেছে। শহরের কোনও জায়গায় যদি অগ্নিপ্রজ্বালক বোমায় আগুন ধরল তবে সে আগুন জলের অভাবে নেভানো যায় না বলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যতক্ষণ না পূর্বের থেকে পুড়ে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছয় ততক্ষণ সে ব্লকের পর ব্লক, রাস্তার পর রাস্তা পুড়িয়ে চলে। ভূগর্ভস্থ সেলারে লক্ষ লক্ষ আহত সৈনিক গোঙরাচ্ছে, শিশুরা কাঁদছে। ক্ষুধার চেয়ে তৃষ্ণা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোমা পড়ে কোনও কোনও জায়গায় জলের পাইপ ফেটে পূর্বে যে জল জমেছিল মেয়েরা সেই ঘোলাটে জল বালতিতে করে নিয়ে যাচ্ছে।

খবর এল রাস্তায় রাস্তায় লড়ে লড়ে রুশসৈন্যরা তো এগুচ্ছেই, সঙ্গে সঙ্গে তারা ভূগর্ভস্থ রেলপথের (আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে) টানেল দিয়ে এগিয়ে আসছে। হিটলার হুকুম দিলেন স্প্রে নদীর (কানাল বা বড় খালও বলা হয়) জল বন্ধ করার গেট খুলে দিতে। সে জল রুশদের ডুবিয়ে মারবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মরবে হাজার হাজার আহত জর্মন সৈনিক— যারা মাটির নিচের স্টেশন-প্লাটফর্মে শুয়ে শুয়ে অচিকিৎসায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। এদের জীবন-মরণে হিটলারের ভ্রুক্ষেপ নেই। বল্‌ট্ বলেছেন, সমস্ত যুদ্ধে এরকম হৃদয়হীন আদেশ তিনি শোনেননি। (এ আদেশ পালিত হয়েছিল কি না আমি জানিনে)।

এর চেয়েও নিষ্ঠুর আদেশ হিটলার বরমানকে পূর্বেই দিয়ে বসে আছেন। যে শহরের সামনে শত্রুসৈন্য দেখা দেবে তার তাবৎ কারখানা, ওয়াটার-ওয়ার্কস, বিজলি, নদীর উপর সেতু সব যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। সরবরাহ মন্ত্রী স্পের আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'যুদ্ধের পরে জর্মনরা তবে গড়বে কী, বাঁচবে কী দিয়ে?' হিটলার বললেন, 'এ যুদ্ধে সপ্রমাণ হয়েছে জর্মন জাত রুশের তুলনায় অপদার্থ; এদের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়।' স্পের কিন্তু গোপনে এ আদেশ বানচাল করে দেন।

নিষ্ঠুরতম আদেশ দেন হিটলার বরমানকে জর্মন জাতকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে আবালবৃদ্ধ নরনারীকে খেদিয়ে, সঙ্গিনের ঘায়ে, গুলি চালিয়ে জড়ো করা হোক মধ্য-জর্মনির এক মধ্য অঞ্চলে। পথে বা সেখানে আহারাদির কোনও ব্যবস্থা থাকবে না। সেখানে ও পথে আসতে আসতে তারা সবাই মরবে। এ আদেশ পালিত হয়নি। সেনাবাহিনীতে হুকুম দেবার মতো যথেষ্ট অফিসার ছিলেন না বলে, না অন্য কারণে কেউ

www.pathagar.com

স্পষ্টাস্পষ্টি উল্লেখ করেননি। তবে একাধিক ঐতিহাসিক বলেছেন, বাইবেল-বর্ণিত স্যামসন ('স্যামসন ও ড্যালাইলা' ছবি এদেশেও আসে) যে-রকম মৃত্যুবরণ করার সময় তাঁর শত্রুদের মন্দির টেনে ভেঙে ফেলে তাদেরও মৃত্যু ঘটান, হিটলারও তেমনি ওপারে যাবার সময় কুল্লে জাতটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

বার্লিনবাসীরা প্যারিজিয়ানদের মতো কখনও নিজেদের মধ্যে সিভিল ওয়ার লড়েনি বলে কখনও রাস্তায় রাস্তায় পিপে, পাথর, আসবাবপত্র, ভাঙা গাড়ি, মোটর দিয়ে ঘাঁটি বা ব্যারিকেড বানাতে শেখেনি। যেগুলো বানিয়েছিল সেগুলো এতই আনাড়ি হাতে তৈরি, কাঁচা, যে তার বর্ণনা দিয়েছেন সুইডেন রাজপরিবারের কাউন্ট ফলকে বেরনাডট্টে। ইনি ব্যারিকেড বানাবার সময় বার্লিনে আসেন সুইডিশ রেড্‌ক্রসের প্রতিভূ হিসেবে, তাঁর দেশবাসী বন্দিদের জন্য মুক্তির আবেদন করতে।[৮] ওই ব্যারিকেডগুলো নিয়ে খাস বার্লিন কক্‌নিরা (ঢাকার কুট্টিদের মতো) একে অন্যের সঙ্গে মন্তব্য বিনিময় করছিল। একজন বললে, 'এগুলো ভাঙতে রুশদের একঘণ্টা দু'মিনিট লাগবে।' 'কীরকম?' 'পাকা একঘণ্টা তাদের লাগবে হাসি থামাতে। আর দু মিনিট লাগবে সেগুলো ভাঙতে।'

ভিন্ন ভিন্ন বুঙ্কারে প্রায় ছ-সাতশো হিটলার-দেহরক্ষী দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বেঞ্চিতে মাটিতে ঘুমিয়ে অথবা সংখ্যাতীত টিনে রক্ষিত হ্যাম, বেকন, সসেজ ('রুটির উপর এত পুরু মাখন যে বলদ ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যাবে'), মুরগি-রোস্ট আর বোতল বোতল ফ্রান্স থেকে লুট করে আনা, জর্মনির আপন উৎকৃষ্ট ওয়াইন, শ্যাম্পেন খাচ্ছে। এরা জর্মনির ঐতিহ্যগত সেনাবাহিনীর লোক নয়— তারা লড়ছে আপ্রাণ— এরা হিটলার-হিমলারের আপন হাতে তৈরি এসএস, যুদ্ধে নামবার বিশেষ আগ্রহ এদের নেই। এদের দেখে বল্‌ট্‌ মনে মনে ভাবছেন, 'এরা এখানে কেন? ফ্যুরার তথা জর্মনির শত্রু বুঙ্কারের ভিতরে না বাইরে, যেখানে লড়াই হচ্ছে?' কিন্তু রান্নাঘরের খাস বার্লিনের কক্‌নি (কুট্টি) মেয়েরা স্পষ্টভাষী। হঠাৎ কয়েকজন চিৎকার করে এদের বললে, 'হেই, হতভাগা নিষ্কর্মার দল! তোরা যদি এখ্‌খুনি বাইরে গিয়ে যুদ্ধে না নামিস তবে তোদের পরিয়ে দেব আমাদের গা থেকে মেয়েছেলেদের রান্নার সময়কার পোশাক। আর আমরা যাব লড়তে। বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেরা প্রাণ দিচ্ছে লড়তে লড়তে, রাস্তায়— আর হামদো হামদো তাগড়ারা বসে আছে এখানে!'

হিটলার তাকিয়ে আছেন ভেংকের আশায়।

বুঙ্কারের এই পাগলদের দুরাশার ভিতর একটি লোকের মাথা পরিষ্কার ছিল— ইনি হিমলারের প্রতিনিধি— ফেগেলাইন। কিন্তু তিনি জানতেন না, যেখানে সবাই পাগল সেখানে সুস্থ-মস্তিষ্ক হওয়া পাগলামি। ইনি মোকা বুঝে এফার (যাকে দু দিন পরে হিটলার বিয়ে করেন) বোনকে বিয়ে করে যেন হিটলার-পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন— আসলে সবাই

---

৮. ওই সময়েই হিমলার প্রভু হিটলারকে না জানিয়ে আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে তাঁরই মাধ্যমে মিত্রপক্ষের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। এসব আলোচনা ও জর্মন রাষ্ট্রের শেষ ক-মাস সম্বন্ধে তিনি যুদ্ধের পর একখানি মনোরম বই লেখেন— ইংরেজি অনুবাদের নাম The curtain falls. পরম পরিতাপের বিষয় এই সহৃদয়, বিশ্বনাগরিক কয়েক বৎসর পর প্যালেস্টাইনের ইহুদি আরবের সমঝাওতা করতে গেলে সেখানে ইহুদি আততায়ীর গুলিতে মারা যান।

www.pathagar.com

একমত, লোকটা অপদার্থ। গোড়াতে ছিল রেস্‌-কোর্সের জকি। আঙুল ফুলে কলাগাছ, দম্ভভরে যাকে-তাকে অপমান করত— ওদিকে বরমান, বুর্গডর্ফ, ক্রেব্‌স্‌ তার এক গেলাসের ইয়ার। হিটলার-পরিবারের সম্মানিত সদস্য হয়েও প্যারিবারিক আত্মহত্যা করে পারিবারিক চিতানলে হিটলার-এফার সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে বৃহত্তর গৌরব সে কামনা করেনি। সোনা-জওহর নিয়ে পালাবার সময় সে ধরা পড়ল— এই সঙ্কটের সময়ও যে হিটলার সবদিকে নজর রাখতেন সেটা সপ্রমাণ হল যখন তিনিই প্রথম লক্ষ করলেন, ফেগেলাইন নেই। ধরার পর হিটলারের আদেশে তার ইউনিফর্ম, মেডেলাদি কেড়ে নিয়ে, পদচ্যুত করে তাকে বন্দি করে রাখা হল।

২৭ এপ্রিল দিনের শেষ রাত্রে রাশানরা যেন দৈবক্ষমতায় দিব্যদৃষ্টি পেয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে হিটলারের বুঙ্কারের আশেপাশে, উপরে বোমার পর বোমা ফেলতে লাগল। বুঙ্কারবাসীরা জড়সড় হয়ে শুনতে পাচ্ছে যেন প্রত্যেকটি কামানের বিরাট গোলা তাদেরই মাথার উপর ফাটছে। কারও মনে আর সন্দেহ রইল না, এবার যে কোনও মুহূর্তে রুশেরা সরাসরি বুঙ্কার আক্রমণ করবে।

সে রাত্রে হিটলার তাঁর অন্তরঙ্গজনকে নিয়ে মজলিসে বসলেন। স্থির হল, প্রথম রুশসৈন্য দেখা দিতেই পাইকারি হারে সবাই আত্মহত্যা করবেন। তার পর সবাই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলেন, কী প্রকারে মৃতদেহগুলোও শনাক্তের বাইরে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা যায়। তার পর একে একে প্রত্যেকে ছোট্ট ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে হিটলার ও জর্মনির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন বলে শপথ নিলেন।

ব্লাফ্‌! ব্লাফ্‌! ব্লাফ্‌! সবসুদ্ধ দুই কিংবা তিনজন প্রতিজ্ঞা পালন করেন। আর সবচেয়ে হাস্যকর— হিটলারের মৃত্যুর ঘণ্টা তিনেক পরেই আমিরদের পয়লা নম্বরি বরমান চার নম্বরি ক্রেব্‌স্‌কে পাঠালেন রুশদের কাছে সন্ধি-স্থাপনার্থে! সেটা বানচাল হয়ে গেলে দুজন ছাড়া সবাই চেষ্টা করলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে, বরমান একটা ট্যাঙ্কে চড়ে— এটার ব্যবস্থা তিনি শপথ নেবার পূর্বেই করেছিলেন নিশ্চয়— রুশ-ব্যূহ এড়িয়ে, তখনও অপরাজিত উত্তর জর্মনিতে ড্যোনিৎসের (হিটলার মৃত্যুর পূর্বে এঁকেই রাষ্ট্রের প্রধান রূপে নির্বাচিত করে যান) সঙ্গে যোগ দিতে। যাঁরা অক্ষম হয়ে মার্কিনদের হাতে বন্দি হলেন তাঁরা তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করলেন মার্কিনদের সুমুখে, কে হিটলারকে কত বেশি ঘৃণা করতেন সেইটে সাড়ম্বরে বোঝাতে।

হিটলার তখনও আশা ছাড়েননি। কখনও সামনে ম্যাপ খুলে কম্পিত হস্তে রুশসৈন্য, ভেংকের সৈন্য, নবম বাহিনীর সৈন্য রঙিন বোতাম দিয়ে প্রতীক করে যুদ্ধের ব্যূহ নির্মাণ করছেন, আক্রমণের পথ স্থির করছেন; কখনও চিৎকার করে মিলিটারি হুকুম দিচ্ছেন— যেন তিনি নিজে রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করছেন। কখনও ঘর্মাক্ত হস্তে ম্যাপ নিয়ে দ্রুতপদে পায়চারি করছেন— ভেজা হাতের স্পর্শে ম্যাপখানা দ্রুত পচে যাচ্ছে— আর যাকে পান তাকেই সেই ম্যাপ দেখান; কীভাবে, কোন পথে, সমরনীতির কোন কূটচালে শত্রুপক্ষকে নির্মম ঘায়েল করে, যেন এক অলৌকিক বিস্ময়ে ভেংক এসে সবাইকে এই সংকট থেকে মুক্ত স্বাধীন করবেন।

এঁদের অনেকেই ততদিনে জেনে গিয়েছেন, ভেংকের সেনাবাহিনী বলে আর কিছু নেই। যে ক-জন তখনও বেঁচে ছিল তাঁদের তিনি অনুমতি দিয়েছেন, পশ্চিম দিকে পালিয়ে গিয়ে

www.pathagar.com

মার্কিনদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে— রুশদের চেয়ে মার্কিনরাই ভালো, এই তখন আপামর জনসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু ভেংকের সত্য বিবরণ হিটলারকে বলে কে? বলে লাভ? কাইটেল, ইয়োডল সব জেনে-শুনে হিটলারের আর্তনাদী টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রামের কোনও উত্তর দিচ্ছে না— (নামেমাত্র) আর্মি হেড-কোয়ার্টার্স থেকে। কী উত্তর দেবেন এঁরা?

লিঙে এ সময়ে হিটলারের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি কামরার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুতগতিতে পায়চারি করছেন, কখনও-বা ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বদ্ধমুষ্টি দিয়ে দেয়ালে করাঘাত করছেন।' কেন? তাঁর কাছে ঘরের চারখানা দেয়াল কি কারাগারের চারখানা প্রাচীরে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে?

আর পায়চারি? এটা তাঁর প্রাচীন দিনের অভ্যাস। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেন? দিনের পর দিন। হিটলারের একমাত্র বন্ধু ফোটোগ্রাফার হফ্‌মান লিখেছেন, 'হিটলারের প্রথমা প্রেয়সী (সকলেরই মতে এইটেই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ গ্রেট্ লাভ— এফার প্রতি তার প্রেম ছিল অন্য ধরনের) যখন আত্মহত্যা করে মারা যান, তখন তিনি নিচের তলা থেকে হিটলারের পদধ্বনি শুনতে পান তিন দিন তিন রাত ধরে— মাঝে মাঝে ক্ষান্ত দিয়ে। এই তিন দিন তিন রাত তিনি জলস্পর্শ করেননি। প্রণয়িনীর গোর হয়ে গিয়েছে খবর পেয়ে হিটলার পায়চারি বন্ধ করে সোজা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গিয়ে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।'[৯]

আর কখনও কখনও টেবিলের উপর কনুই রেখে অনেকক্ষণ ধরে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সমুখপানে।

ভেংকের জন্য প্রতীক্ষা, তাঁর উত্তেজনা ও জালবদ্ধ পশুর মতো ছটফটানি তার চরমে পৌঁছল ২৮ এপ্রিল। রাশানরা তখন বার্লিন নগরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে লড়াই করে করে হিটলারের বাসভবনের দিকে এগিয়ে আসছে। বার্লিনের কমান্ডান্ট হিটলারকে বলে গেছেন, দু দিন, জোর তিন দিনের ভিতর রুশরা বুঙ্কারে এসে পৌঁছবে। কিন্তু ভেংক কোথায়? কী ঘটে থাকতে পারে?

নিশ্চয়ই আবার বিশ্বাসঘাতকতা! বার্লিন জয় করার মতো শক্তির শতাংশের একাংশও যে ভেংকের নেই সেকথা কে বিশ্বাস করে? ২৮শে সন্ধ্যায় বরমান সেই সুদূর দক্ষিণ জর্মনির ম্যুনিকে তাঁর মিত্র এডমিরাল পুট্‌কামার্‌কে টেলিগ্রাম করলেন, 'সৈন্যদের আদেশ ও অনুরোধ করে যেসব কর্তৃপক্ষ তাদের এখানে আমাদের উদ্ধার করার জন্য পাঠাতে পারতেন, তাঁরা সেটা না করে নীরব। বিশ্বাসঘাতকতা বিশ্বস্ততার স্থান অধিকার করেছে। আমরা এখানেই থাকব। ফ্যুরার-ভবন খণ্ড-বিখণ্ড।'

এক ঘণ্টা পর, বহু প্রতীক্ষার পর বাইরের জগৎ থেকে পাকা খবর এল। হিটলারকে কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে হাইনরিষ হিমলার— গ্যোরিঙের পদচ্যুতির পর এখন যিনি জর্মনির দ্বিতীয় ব্যক্তি— মিত্রশক্তির কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেছেন, পূর্বোল্লিখিত রেড্‌ক্রসের নেতা সুইড্ কাউন্ট বের্নাডটের মাধ্যমে। প্রস্তাবটি গোপনেই করা হয়েছিল কিন্তু কী করে কে জানে সেটা গুপ্তিপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কোনও এক বেতার-কেন্দ্র সেটা প্রচার করেছে। হিটলারের বার্তা সরবরাহ বিভাগের কর্মচারী বেতারে সেটা শুনে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে স্বয়ং এসেছেন হিটলারকে মুখোমুখি খবরটা দিতে।

৯. হাইনরিষ হফ্‌মান, *হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড*।

www.pathagar.com

কামানের গোলা, বোমারুর বোমা তখন ডাল-ভাত। কাজেই ঘরের ভিতর বোমা ফাটলেও হিটলার অতখানি বিচলিত হতেন না। 'সেই বিশ্বাসী হাইনরিষ, যে কি না তার খাস সৈন্যদলের বেল্টে খোদাবার আদেশ দিয়েছিল— TREUE— বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি, নেমকহালালি!— সে কুকুর এখন ঠাকুরের আসনে বসতে চায়, তাঁর প্রতি নেমকহারামি করে?' এই একমাত্র নাৎসি নেতা যাঁর প্রভুতে অবিচল ভক্তি সম্বন্ধে কারও মনে কখনও সন্দেহ হয়নি। আর এ-কথা সকলেই জানতেন, যুদ্ধারম্ভের প্রথম দিনই হিটলার মার্শাল ল প্রচার করেছিলেন, 'তাঁর কোনও কর্মচারী— তা তিনি যত উচ্চপদেরই হোন না কেন— যদি কোনও সন্ধির আলোচনা করেন তবে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে— এ বাবদে কোনও করুণা দেখানো হবে না।'

হিটলারের মুখ থেকে নাকি সবশেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছিল।

স্টাইনারের আক্রমণ কেন হয়ে ওঠেনি, ভেংক কেন আসছে না— এসব সমস্যা হিটলারের কাছে সরল হয়ে গেল। নিশ্চয়ই পিছনে রয়েছে হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতা। অবশ্য ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন এ সন্দেহ সত্য নয়। হিমলার শেষ মুহূর্তে সন্ধির প্রস্তাব এনে শুধু আপন প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন— অন্য বহু বহু নাৎসি নেতার মতো। তারা গোপনে সুইস ও দক্ষিণ আমেরিকার জর্মন বহুল নাৎসিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একাধিক রাষ্ট্রে বিস্তর অর্থ জমা রেখেছিলেন ও জাল নামে পাসপোর্টও তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। হিমলারকে জনসাধারণ ভালো করেই চিনত; তাঁর পক্ষে এ পন্থা সম্ভবপর ছিল না।[১০]

হিমলারের 'বিশ্বাসঘাতকতা'র পর হিটলারের সর্বশেষ কর্ম সম্বন্ধে মনস্থির করতে আর কোনও প্রতিবন্ধকতা রইল না। প্রথমেই হিমলারের বিশ্বাসী নায়েব, প্রতিভূ, লিয়েজোঁ অফিসার ফেগেলাইনকে বন্দিশালা থেকে বের করে নিয়ে এসে সওয়াল করা হল। এইসব বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে তিনি কতখানি ওকিবহাল ছিলেন? ফেগেলাইন কী উত্তর দিয়েছিলেন তা আর জানবার উপায় নেই। প্রশ্নকর্তারা মৃত নয়, নিরুদ্দেশ। হিটলারের যুক্তি, ফেগেলাইন যদি না জানবে তবে পালাবার চেষ্টা করল কেন? বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কী? হুকুম দিলেন, বুঙ্কারের বাইরের বাগানে তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে। বল্‌ট্ তাঁর বইয়ে বলেছেন, 'এফা তাঁর ভগ্নিপতিকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা করেছিলেন কি না আমরা তার কোনও খবর পেলুম না, হয়তো স্বামীর ওপর তাঁর কোনও প্রভাবই ছিল না, কিংবা হয়তো তিনি তাঁর স্বামীর মতোই ধর্মান্ধের মতো বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাসঘাতকের প্রাপ্য মৃত্যুদণ্ড— তা সে যে-ই হোক।' আমাদের মনে হয় দুটোই। ওই সময় শ্রীমতী হানা রাইট্‌শ বুঙ্কারে ছিলেন। ইনি বিশ্বের অন্যতম নামজাদা পাইলট (পরবর্তীকালে পণ্ডিতজীর সঙ্গে এঁর হৃদ্যতা হয় এবং তাঁর অতিথি হয়ে কিছুদিন দিল্লিতে ছিলেন)। ইনি বলছেন, এফা নাকি ওই সময় বেদনাভরে এক

১০. আখেরে তিনি সেই চেষ্টাই করেছিলেন। ছদ্মবেশে মিত্রশক্তির ঘাঁটি পেরুবার সময় তিনি বন্দি হন। দেহতল্লাশির সময় মুখে কিছু আছে কিনা দেখবার জন্য তাঁকে মুখ খুলতে বললে তখন তিনি বুঝলেন এই তাঁর শেষ সুযোগ। ডাক্তার মুখে হাত ঢোকাবার পূর্বেই তিনি দাঁত ও মাড়ির মধ্যে লুকানো ক্যাপসুলে কামড় দিলেন। আবরণ ভেঙে বিষ বেরিয়ে এল; কয়েক মিনিটের ভিতরই ভবলীলা সম্বরণ করলেন। গ্যোরিঙও এই পদ্ধতিতেই জেলের ভিতর আত্মহত্যা করেন। তাঁর দেহ ও মুখ বহুবার সার্চ করা হয়, কিন্তু তিনি যে কোথায় ক্যাপসুলটি দিনের পর দিন লুকিয়ে রেখেছিলেন সেটা আজও রহস্য।

www.pathagar.com

হাত দিয়ে আরেক হাত মোচড়াতে মোচড়াতে যাকে পেতেন তাকেই বলতেন, 'হায় বেচারা, বেচারা অ্যাডল্‌ফ্‌! সবাই তাঁকে ত্যাগ করেছে, সবাই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দশ হাজার লোক মরুক ক্ষতি নেই, কিন্তু জর্মনি যেন অ্যাডল্‌ফ্‌কে না হারায়!'

রুশরা বুঙ্কার থেকে আর মাত্র হাজার গজ দূরে।

২৮/২৯ এপ্রিলের রাত। ফেগেলাইনের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে হিটলার অন্যান্য কর্তব্যের দিকে মন দিলেন। যে রমণী তাঁকে ১৪/১৫ বৎসর ধরে ভালোবেসেছেন, ভালোবাসার প্রথম দিকে একবার নিরাশ হয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টাতে গুরুতররূপে জখম হন, হিটলার যাঁকে বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে বেশি (হিটলারও বলতেন, তিনি দুজনকে অবিচারে বিশ্বাস করেন। এফা ও তাঁর আলসেশিয়ান ব্লন্ডিকে), সঙ্কট ঘনিয়ে এলে তাঁর নিরাপত্তার জন্য হিটলার বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যিনি তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে রাজি হননি, এবং যিনি দৃঢ়কণ্ঠে একাধিকজনকে একাধিকবার বলেছেন, 'অ্যাডল্‌ফ্‌ আর আমার জীবনমরণ একসূত্রে গাঁথা', সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে যাঁকে হিটলার অল্প লোকের সামনেই বেরুতে দিতেন, কোথাও যেতে হলে ভিন্ন ভিন্ন মোটরে যেতেন, সভাস্থলে এফা দর্শকদের সঙ্গে বসে হিটলারের বক্তৃতা শুনতেন— সেই এফা এত বৎসর পর তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার এবং আসন পেলেন। সে রাত্রে হিটলার তাঁকে বিয়ে করলেন।

কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা ডিকটেটরদের প্রিয়া, রক্ষিতা, উপপত্নী, পত্নীরা যেরকম রোমান্টিকভাবে তাঁদের বল্লভদের জীবন প্রভাবান্বিত করেন, পর্দার সামনে কিংবা আড়ালে বহুলোকের জীবনমরণ নিয়ে খেলা করেন— চক্রান্ত, বিষপ্রয়োগ অনেক কিছু করে থাকেন,— এফার সেদিকে কোনওই আকর্ষণ ছিল না। কর্মব্যস্ত হিটলার তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় পেতেন কমই। বিশেষ করে যুদ্ধের পাঁচ বৎসর তিনি ভিন্ন আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের সন্নিধানে থাকতে বাধ্য হতেন বলে প্রোষিতভর্তৃকা এফা দূর আল্‌প্‌সের উপর হিটলারের নির্জন নিরানন্দ বের্গহর্ফ ভবনে একা একা দিনের পর দিন তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করতেন। চাকর-বাকররা বলত এ যেন 'সোনার খাঁচার বদ্ধ পাখি'। তার পর হঠাৎ একদিন বল্লভ এসে উপস্থিত হতেন অতিশয় অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। বাড়ি গমগম করে উঠত। ডিনার, তার পর ফিল্ম, তার পর সঙ্গীত, রাত দুটোয় শেষ পার্টি— হিটলার টিটোটেলার, খেতেন হালকা চা, কাপের পর কাপ, অন্য সবাই শ্যাম্পেন। হিটলার ঘুম থেকে উঠতেন দেরিতে। খেয়ে জিরিয়ে এফা, ব্লন্ডি, অনুচরদের নিয়ে নির্জন পথে বেড়াতে বেরুতেন। পথের শেষপ্রান্তে একটি বিশ্রামাগার। সেখানে চা, কেক্‌, ক্রিম-বান্‌ খাওয়া হত। হিটলার প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। সবাই ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলত, প্রভুর নিদ্রা ভঙ্গ হলে সবাই বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে তাঁর স্থান ছিল না। হিটলারের মৃত্যুর পূর্বে ১০ লক্ষের ভিতর একজনও জানত না, হিটলারের কোনও বান্ধবী আছেন।[১১]

---

১১. এফা ব্রাউন (হিটলার) সম্বন্ধে কৌতূহলীজন সর্বোত্তম খবর পাবেন পূর্বোল্লিখিত হফ্‌মানের বইয়ে। এঁর ফোটো-ল্যাবরেটরিতেই এফা কাজ করার সময় হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হফ্‌মান তাঁর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দেন। হিটলারের ভ্যালে লিঙে উভয়েরই কামরা-বিছানা সাফসুতরো করতেন এবং একদিন দৈবাৎ তিনি দুজনাকে এমন অবস্থায় পান যে, লিঙের চাকরি যাবার জোগাড় হয়েছিল। লিঙে এঁদেরই অন্তরঙ্গতার বিস্তৃততম খবর

www.pathagar.com

এই দুর্দিনে বিয়ের রেজেস্ট্রি অফিসার জোগাড় করা সহজ হয়নি। শেষটায় একজন এলেন যাঁকে বুঙ্কারের কেউই চেনে না। গ্যোবেল্‌স্ এঁকে জোগাড় করে এনেছেন; লিঙের মতে ইনিই নাকি একদা গ্যোবেল্‌সের বিয়ে সম্পন্ন করেন। এমার্জেন্সি বা বিন্‌নোটিসের বিয়ে বলে বহ্বাড়ম্বর আর বাহ্যাড়ম্বর বাদ দেওয়া হল। দুই পক্ষে মৌখিক— সাধারণত হিটলার জর্মনিতে সার্টিফিকেট দরকার হত— শপথ দিলেন, উভয়েই অবিমিশ্র 'আর্যরক্ত' ধরেন, ও তাঁদের বংশগত কোনও ব্যাধি নেই। তার পর উভয়ে রেজিস্ট্রিতে সই করলেন। কনে নাম সই করার সময় 'এফা' লিখে 'ব্রাউন' লেখবার জন্যে 'বি' হরফ লিখে ফেলেছিলেন; তাঁকে ঠেকানো হল, তিনি 'বি' কেটে 'হিটলার' ও 'ব্রাউন নামে জন্ম' (nee) লিখলেন। গ্যোবেল্‌স্ ও বরমান সাক্ষী হলেন।[১২] রাত তখন একটা বেজে গিয়েছে। ২৯ এপ্রিল শুরু হয়েছে।

বিয়ের পর হিটলারের ঘরে পার্টি বসল। শ্যাম্পেন এল। বহু বৎসর পূর্বে গ্যোবেল্‌স্ যখন বিয়ে করেন তখন হিটলার সে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি ও হিটলার সেই অবিমিশ্র আনন্দের দিনের সঙ্গে অদ্যকার আনন্দের ওপর করাল ছায়ার তুলনা করে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন। জর্মন ভাষায় একটি সংহিটে আছে, 'চোখের জল নিয়ে আমি নাচছি'— এ যেন তাই। হিটলার আবার তাঁর আত্মহত্যার কথা তুললেন। বললেন, তাঁর জীবনাদর্শ (ভেল্টআনশাউউঙ) নাৎসিবাদ খতম হয়ে গেল; এর পুনর্জন্ম আর কখনও হবে না। তার সর্বোত্তম বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মৃত্যুর ভেতর দিয়েই তিনি এসব থেকে নিষ্কৃতির আরাম পাবেন।

পার্টি চালু রেখে তিনি পাশের ঘরে তাঁর স্টেনো-সেক্রেটারি ফ্রাউ য়ুঙেকে নিয়ে তাঁর দু-খানা উইল মুখে মুখে বলে যেতে লাগলেন। প্রথম উইলখানা রাজনৈতিক, দ্বিতীয়খানা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে। পাঠক হিটলার সম্বন্ধে যে-কোনও বইয়ে এ দু-খানার কপি পাবেন। আমি সংক্ষেপে সারি। সর্বপ্রথমেই তিনি আরম্ভ করেছেন এই বলে যে, 'একথা মিথ্যে যে আমি বা জর্মনির আর কেউ এ যুদ্ধ চেয়েছিল। এটা ইহুদি এবং যারা তাদের জন্য কাজ করে তাদের কীর্তি...এখন আমার সৈন্যদল আর নেই বলে রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হলে আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করব। আমি শত্রুর হাতে ধরা দেব না— ইহুদিরা যাতে করে আমাকে নিয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত জনতার জন্য একটা নয়া তামাশা সৃষ্টি না করতে পারে।'— তার পর তিনি গ্যোরিঙ ও হিমলারকে নাৎসি পার্টি থেকে ও সর্ব আসন থেকে বিচ্যুত করে বললেন, 'এঁরা যে শক্তিলোভে শত্রুর সঙ্গে গোপন-সন্ধি-প্রস্তাব করে শুধু আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাই নয়, জর্মনি ও তার নাগরিকদের মুখে অমোচনীয় কলঙ্ককালিমা মাখিয়েছেন।' হিটলারের মূলমন্ত্র ছিল 'যুদ্ধের সাধন কিংবা জীবনপাতন'— সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করাই বেইজ্জতির চূড়ান্ত। সর্বশেষে তিনি জর্মনদের কঠোরতম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের

দিয়েছেন। এফাও লিঙেকে খুব বিশ্বাস করতেন ও তাঁর মনের কথা খুলে বলতেন। আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি লিঙের কাছে যেসব করুণ কথা বলেন সেগুলোও পড়ার যোগ্য।... হিটলারের চিকিৎসক মরেলও এফা সম্বন্ধে তাঁর জবানবন্দিতে কিছু কিছু বলেছেন।

১২. কয়েক মাস পূর্বে, অর্থাৎ এ-বিয়ের কুড়ি বৎসর পর রুশদের প্রধান সেনাপতি— যিনি বার্লিন জয় করেন— ঘোষণা করেন যে তাঁর মূল্যবান সম্পত্তির মধ্যে আছে এই দলিলখানা। রুশরাই সর্বপ্রথম বুঙ্কার দখল করেছিল বলে বিয়ের রেজিস্টারখানা তারাই হস্তগত করে।

www.pathagar.com

রক্তে যেন সংমিশ্রণ না হয় তার জন্যে, এবং বিশ্বে বিষসঞ্চারণকারী আন্তর্জাতিক ইহুদিদের নির্দয়ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য দিব্য দিলেন।...এই উইলেই তিনি এডমিরাল ড্যোনিৎসকে দেশের নেতৃত্ব দিলেন, এবং তাঁর জন্যে মন্ত্রিসভা নির্বাচন করে গেলেন।[১৩]

তাঁর ব্যক্তিগত হ্রস্ব উইলে তিনি এফাকে বিবাহ করার পটভূমি ও কারণ দর্শালেন। তার পর বললেন, 'তিনি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করছেন।' তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি নাৎসি পার্টিকে দান করলেন, পার্টির অস্তিত্ব লোপ পেলে জর্মন রাষ্ট্রকে, এবং সে-ও যদি লোপ পায় তা হলে সে বিষয়ে তাঁর আর কোনও নির্দেশ নেই। তাঁর বিরাট চিত্রসঞ্চয় তিনি তাঁর জন্মভূমির লিন্‌ৎস্ শহরের যাদুঘর নির্মাণের জন্য দিলেন। দরকার হলে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর আত্মজন, তাঁর সহকর্মী সেক্রেটারি ইত্যাদি যেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মতো জীবনযাত্রা করতে পারেন, তার আর্থিক ব্যবস্থাও তিনি উইলে রাখলেন।... উইল লেখা শেষ হলে ভোর চারটায় তিনি শুতে গেলেন। হায়রে বাসরশয্যা!

গ্যোবেল্‌স্‌ও তাঁর উইল লিখলেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য : ফ্যুরার আমাকে আদেশ দিয়েছেন, নতুন মন্ত্রিসভায় অংশ নিতে, কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার (এবং ইচ্ছে করলে তিনি 'শেষবারের' মতোও লিখতে পারতেন; কেন করলেন না, বোঝা ভার) আমি ফ্যুরারের আদেশ সরাসরি লঙ্ঘন করছি। আমি, আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণসহ ফ্যুরারের পার্শ্বেই জীবন শেষ করব। এর পর আছে 'সর্বব্যাপী বিশ্বাসঘাতকতা' ইত্যাদি ইত্যাদির কথা।

সেই দিন ২৯ এপ্রিল। দুপুরের দিকে চারজন বিশ্বস্ত লোক মারফত তিনখানা উইল তিন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। যে করেই হোক তারা যেন রুশব্যূহ ভেদ করে, কিংবা ব্যূহে কোনও ছিদ্র থাকলে তাই দিয়ে ড্যোনিৎসের কাছে পৌঁছয়, নইলে ব্রিটিশ বা মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলে।

দুপুরবেলা মন্ত্রণাসভা বসল। সেখানে প্রধান খবর, রাশানরা এগিয়ে এসেছে এবং ভেংকের কোনওই খবর নেই। তিনজন অফিসার— এঁদের মধ্যে ছিলেন আমাদের পূর্বোল্লিখিত বল্‌ট্‌— বললেন, তাঁরা ভেংকের সন্ধানে ও তাঁকে বার্লিন পানে ধাওয়া করবার জন্য ফ্যুরারের আদেশ পৌঁছে দিতে প্রস্তুত আছেন। হিটলার অনুমতি দিলেন। রাত্রের মন্ত্রণাসভার পর আরেকজন চলে যাবার অনুমতি পেলেন।

রাত্রের মন্ত্রণাসভায় বার্লিনের কমান্ডান্ট জানালেন, রাশানরা চতুর্দিক থেকেই শহরের ভিতরে এগিয়ে এসেছে। পয়লা মে তারা বুঙ্কার (এবং রাষ্ট্রভবনে) পৌঁছে যাবে। বার্লিনের ভিতর যেসব জর্মন সৈন্যদল আটকা পড়েছে তারা এইবেলা যদি রুশব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে না যায়, তবে আর কখনও পারবে না। হিটলার বললেন, দু-একজনের পক্ষে কোনওগতিকে বেরোনো সম্ভব হলেও হতে পারে কিন্তু এইসব রণক্লান্ত ভাঙাচোরা হাতিয়ারে সজ্জিত— তারও আবার গুলি-বারুদের অভাব— সৈন্যরা দল বেঁধে, তা সে যতই ছোট দল হোক না কেন, কখনওই বেরুতে পারবে না। ব্যস্, হয়ে গেল; হিটলারের অভিমতই সর্বশেষ অভিমত। সৈন্যদের কপালে নিরর্থক মৃত্যুর লাঞ্ছন অঙ্কিত হয়ে গেল।

এই সময়ে হিটলার তাঁর সর্বশেষ টেলিগ্রাম পাঠান— জেনারেল ইয়োডল্‌কে। আশ্চর্যের বিষয়, ট্রেভার রোপারের মতো অতুলনীয় ঐতিহাসিক এই শেষ টেলিগ্রামের উল্লেখ করেননি।

১৩. ড্যোনিৎস এঁদের অধিকাংশকেই গ্রহণ করেননি।

www.pathagar.com

বল্‌ট্‌ তো তার আগেই বুঙ্কার ত্যাগ করেছেন— তাঁর কথা ওঠে না। হিটলারের কোনও প্রামাণিক জীবনীতেও আমি এর উল্লেখ পাইনি। শুধু আস্‌মান্‌ ও অন্য কোনও নৌ-সেনাপতি এর উল্লেখ করেছেন; আস্‌মান্‌ তাঁর ইতিহাসে টেলিগ্রামখানার ফটোও দিয়েছেন। তাতে হিটলারের সেই আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন, 'ভেংক কোথায়, নবম বাহিনীর পুরোভাগ কোন কোন স্থলে পৌঁছেছে, ইত্যাদি; আমি এই মুহূর্তেই উত্তর চাই।'

সেদিনই খবর পৌঁছল, হিটলার-সখা ডিকটেটর মুস্‌সোলিনিকে মিলানের বিদ্রোহী দল তাঁকে তাঁর উপপত্নীর সঙ্গে ইতালি ছেড়ে সুইটজারল্যান্ডে পলায়নের সময় ধরে দুজনকে খতম করে শহরের মাঝখানের বাজারে পায়ে পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে— যাতে করে উত্তেজিত প্রতিহিংসোন্মত্ত জনগণ দুজনাকে পেটাতে ও পাথর ছুড়ে ছুড়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে। এ সংবাদ হিটলারের মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল জানা যায়নি। তবে বহু ডিকটেটরদের শেষ পরিণতি হিটলারের কাছে কোনও নতুন খবর নয়। তাই উইল লেখার সময় ও তার পূর্বেও হিটলার আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ও এফার দেহ যেন পুড়িয়ে এমনভাবে ভস্ম করে দেওয়া হয় যে ইহুদিরা পাগলা জনতাকে তামাশা দেখাবার জন্য কোনও-কিছু না পায়। বুঙ্কারের একাধিক বাসিন্দা হুবহু একই ভাষায় এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২৯ তারিখ অপরাহ্নে হিটলারের আদেশে তাঁর প্যারা অ্যালসেশিয়ান কুকুর ব্লন্ডিকে গুলি করে মারা হল। সেদিনই তিনি তাঁর দুই মহিলা সেক্রেটারিকে চরম সঙ্কটে ব্যবহারের জন্য বিষের ক্যাপসুল দিতে দিতে দুঃখ করে বললেন যে, শেষ বিদায়কালে তিনি এর চাইতে ভালো কোনও উপহার দিতে পারলেন না।

সেই রাত্রে হিটলার ভিন্ন ভিন্ন বুঙ্কারবাসীদের খবর পাঠালেন, তিনি মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চান,— তাঁরা যেন অপেক্ষা করেন। রাত আড়াইটার সময় (৩০ এপ্রিল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে) প্রায় কুড়িজন অফিসার ও মহিলা সারি বেঁধে করিডরে দাঁড়ালেন। বরমানসহ হিটলার বেরিয়ে এসে তাঁদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন এবং মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। হিটলারের চোখের উপর যেন ক্ষীণ বাষ্পের হালকা পরশ লেগে আছে। এ বিষয় এবং তাঁর মৃত্যু, শবদাহ ইত্যাদি অনেকেই সবিস্তর লিখেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হিটলারের ড্রাইভার কেম্পকার 'আমি হিটলারকে পুড়িয়েছিলুম' এবং লিঙের কাহিনী। হিটলারের অন্যতম মহিলা সেক্রেটারি ছদ্মনামে 'হিটলার প্রিভাট' অর্থাৎ হিটলারের প্রাইভেট জীবন নিয়ে বই লেখেন। সর্বশেষে হিটলারের নরদানব অ্যাডজুটান্ট গ্যুন্‌শের বিবৃতি— রুশ কারাগারে দশ বছর কাটানোর পর জর্মনি ফিরে এসে তিনি বিবৃতি দেন। কিন্তু ট্রেভার রোপার সকলের জবানবন্দি ও বিবৃতি যাচাই করে লিখেছেন বলে তাঁকে অনুসরণ করাই প্রশস্ত। এস্থলে বলে রাখা ভালো হিটলার সপ্তাহখানেক পূর্বে তাঁর চারজন মহিলা সেক্রেটারিকে বুঙ্কার ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাবার প্রস্তাব করেন। দুজন চলে যান, দুজন থাকেন। নিরামিষাশী হিটলারের জন্য রান্না করতেন ফ্রলাইন মান্‌ৎসিয়ালি। তিনিও থেকে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। লিঙেকেও যাওয়া না-যাওয়া তাঁর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন— তিনি যাননি। ফলে রাশাতে দশ বৎসর কারাভোগ করতে হয়েছিল।

অবধারিত আশু বিপদের সামনে মানুষ সবসময় ভেঙে পড়ে না। জাপানিরা যখন সিঙ্গাপুর দখল করে তখন সবকিছু জেনেশুনেই সিঙ্গাপুর-বাসিন্দারা বিশেষ করে ইংরেজগুষ্টি নৃত্য-মদে

www.pathagar.com

মত্ত ছিলেন। এস্থলেও তাই হল। হিটলারের বিদায় নেওয়ার পরই সবাই বুঝে গেল, এই শেষ, আর আশা-নিরাশার কিছু নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বুঙ্কারে (হিটলারেরটা প্রথম) তখন আরম্ভ হল জালা জালা অত্যুৎকৃষ্ট মদ্যপান ও গ্রামোফোনযোগে নৃত্য। 'হেসে নাও দু দিন বই তো নয়'— এস্থলে দু দিন শব্দার্থে। ঠিক 'দু'দিন' বাদেই রুশরা বুঙ্কার দখল করে।

৩০ এপ্রিল— শেষ দিন

সকালবেলা জেনারেলরা বার্লিনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের খবর নিয়ে মন্ত্রণাসভায় এলেন। অবস্থা আগের চেয়ে সামান্য একটু ভালো, কিন্তু হরেদরে সেই পুরনো কাহিনী— জর্মনরা যদি অসীম বিক্রমে কোনও এক অংশে একটুখানি এগোয় তবে রুশরা আর পাঁচটা দুর্বল জায়গায় তারও বেশি এগিয়ে আসে।

হিটলার আগের রাত্রে যে শেষ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তার উত্তর আসেনি, আর বরমান হিটলারের অনুমতিতে বিনানুমতিতে গণ্ডায় গণ্ডায় যেসব টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তারও কোনও উত্তর নেই।

দুপুরবেলার মন্ত্রণাসভা হিটলারের জীবনের শেষ সভা। এবং সে-সভায় যে খবর সব এল সে-রকম দুঃসংবাদ তিনি জীবনে আর কখনও শোনেননি (এবং শুনতেও হবে না)। রাষ্ট্রভবন থেকে উত্তরে বেরোবার পথে স্প্রে খাল। তার ভাইডেনডামার ব্রিজের কাছে রুশরা এসে গেছে (এই পোলের উপর দিয়েই বরমান এবং কয়েকজন পরের দিন বার্লিন থেকে বেরুনোর চেষ্টা করেছিলেন)— অর্থাৎ উত্তরের পথও বন্ধ হল। এবং রাষ্ট্রভবনের এক কোণ যে ফস্ স্ট্রিটে এসে ঠেকেছে তার অন্য প্রান্তে টানেলের কিছুটা রুশরা দখল করে ফেলেছে। নির্লিপ্ত নিরাসক্ত চিত্তে হিটলার সঞ্জয়-বার্তা শুনে গেলেন।

দুটোর সময় হিটলার লাঞ্চ খেতে বসলেন। এফা আসেননি।

তিনি যে মানসিক চঞ্চলতা ও উত্তেজনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন সেকথা লিঙে বলেছেন। ট্রেভার রোপার ঐতিহাসিক। মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নিয়ে তাঁর কারবার কম— বিশেষ করে এফা যখন ইতিহাসে কোনও অংশ নেননি, তখন তিনি যে তাঁকে কিঞ্চিৎ অবহেলা করবেন সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু লিঙে ভ্যালে। তিনি তাঁর বিবৃতিতে যে এফার জন্য একটু বেশি স্থান দিয়েছেন সেটা কিছু বিস্ময়জনক নয়। লিঙে বলেছেন, ওই শেষের দিনেও তিনি লিঙেকে অনুরোধ করেন, হিটলারকে বুঙ্কার ত্যাগ করার জন্য চেষ্টা দিতে। এস্থলে অন্য আরেকটি ব্যাপারে ট্রেভার রোপারের সঙ্গে লিঙের কাহিনী মেলে না। ট্রেভার রোপারের মতে গ্যোবেল্‌স্ আগাগোড়া হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ না করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু লিঙের বিবরণী থেকে জানা যায়, গোড়ার দিকে না হোক, অন্তত শেষের দিকে তিনি পর্যন্ত লিঙেকে এফারই মতো অনুরোধ জানান, লিঙে যেন হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করার কথা বোঝান। লিঙে নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তিনি ফ্যুরারের মন্ত্রী ও নিত্যালাপী হয়েও যে কর্ম সমাধান করতে পারেননি, সামান্য লিঙে সেটা করবেন কী প্রকারে?

www.pathagar.com

লাঞ্চের পর হিটলার যখন বিশ্রাম করছেন তখন ফ্রাউ (মিসেস) গ্যোবেল্‌স্ লিঙের হাতে একখানা চিরকুট দেন হিটলারের জন্য। শেষবারের মতো একবার দেখা করে যেতে। হিটলার প্রথমটায় ভ্রু-কুঞ্চিত করে পরে সেদিক পানে চললেন। সিঁড়িতে গ্যোবেল্‌সের সঙ্গে দেখা। তিনি হিটলারকে মত পরিবর্তন করতে বললেন। হিটলার অনিচ্ছা জানিয়ে আপন বুঙ্কারে ফিরে এলেন।

এ ঘটনার উল্লেখ আর কেউ করেননি, কারণ লিঙে ভিন্ন আর সবাই ওপারে। ইতোমধ্যে হিটলারের অন্তরতম অন্তরঙ্গ জনা পনেরো বুঙ্কারের করিডরে দাঁড়িয়ে আছেন। হিটলার ও ফ্রাউ হিটলার (এফা) তাঁদের সঙ্গে নীরবে একে একে করমর্দন করলেন। এই শেষ বিদায়। ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্ উপস্থিত ছিলেন না। সন্তান কটির আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন।

বুঙ্কারে সৈন্যসামন্ত এবং তজ্জনিত রূঢ় কঠোর বাতাবরণের ভিতর এসব সুন্দর মধুর বাচ্চাদের দেখাত যেন অন্য কোনও জগতের; কোনও বেহেশ্‌তের ফিরিশতা দেবদূতের মতো। তারা এঘর থেকে ওঘরে ছুটোছুটি করত। এক বুঙ্কার থেকে অন্য বুঙ্কারে যেতে হলে যেখানে দেশের প্রধান সেনাপতি কাইটেলকেও পাস দেখাতে হত সেখানেও তাদের অবাধ গতি। যে কদিন পাইলট নারী হানা রাইট্‌শ্ বুঙ্কারে ছিলেন তারা তাঁর কাছ থেকে কোরাস্ গান শিখেছে। তাদের কী ভয়? ওই তো কাকা অ্যাডল্‌ফ্ রয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের মতো (ঈশ্বর জাতীয় 'কুসংস্কার' গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি হয়তো বাচ্চাদের জন্য ব্যান করে দিয়েছিলেন!) সর্বশক্তিমান; এই তো তারা জন্মের প্রথম দিন থেকে জানে। কাকা হিটলারের অনুকরণে তাদের প্রত্যেকের নাম, 'এইচ' অক্ষর দিয়ে আরম্ভ।

শেষ বিদায় নেবার পর একমাত্র তাঁরাই করিডরে রইলেন যাঁরা হিটলারের শেষ-কৃত্য সমাধা করবেন, অন্যদের বিদায় দেওয়া হল।

হিটলার ও এফা তার পর তাঁদের খাস কামরাতে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই,— লিঙে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন— তিনি হঠাৎ কী এক অজানা ভয়ে করিডর দিয়ে ছুটে পালালেন। অল্পক্ষণের ভিতরই কিন্তু তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হল। তিনি ধীর পদক্ষেপে ফিরে এলেন।

এর পরের ঘটনা দিয়ে, আমরা এ-প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি। মাত্র একটি গুলি ছোড়ার শব্দ শোনা গেল, এবং লিঙে বলছেন পোড়া বারুদের কটু গন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে ভেসে এল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে লিঙে, গ্যুন্‌শে, বরমান, গ্যোবেল্‌স্ ইত্যাদি ঘরে ঢুকলেন এবং যা দেখতে পেলেন তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

মৃতদেহ দুটি পোড়াবার জন্য দশ লিটার পেট্রল আনতে সেদিন সকালেই হিটলার তাঁর অ্যাডজুটান্ট গ্যুন্‌শেকে আদেশ দিয়েছিলেন। গ্যুন্‌শে হিটলারের ড্রাইভার কেম্পকাকে সে আদেশ জানালে তিনি বলেন, অতখানি পেট্রল জোগাড় করা সম্ভব হবে না (রুমানিয়া রাশান হাতে চলে যাওয়ার পর বার্লিন আর কোনও পেট্রল পায়নি)। অবশেষে পেতে হবেই হবে আদেশ এলে কেম্পকা অতি কষ্টে ১৮০ লিটার পেট্রল টিনে করে বুঙ্কারের বাইরে বাগানে পাঠিয়েছিলেন। শেষ রেস্ত খতম না হওয়া পর্যন্ত হিটলার যে জুয়োখেলা বন্ধ করেননি, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

সকাল থেকেই অন্যান্য বুঙ্কার থেকে হিটলার-বুঙ্কারে আসার সব-কটা পথ তালা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল— যাতে করে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং প্রয়োজনীয় জন ভিন্ন অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।

হিটলারের আপন সৈন্যবাহিনী এস.এস. সৈন্য ও লিঙে হিটলারের দেহ কম্বলে জড়িয়ে নিলেন— রক্তমাখা মাথা-মুখ ঢাকবার জন্য। পরিচিত কালো পাতলুন পরা পা দুখানা দেখে করিডরে আর সবাই অনায়াসে ইনি যে হিটলার সেকথা বুঝতে পারলেন। চার দফে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে এরা পঞ্চাশ ফুট উপরে খোলা বাগানে বেরুলেন। ইতোমধ্যে বরমান এফার দেহ তুলে নিলেন। তিনি বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে তাঁর দেহে কোনও রক্তের দাগ ছিল না, এবং দেহটিকে ঢাকবার প্রয়োজন হয়নি। বাগানে এনে তাঁর দেহ হিটলারের দেহের পাশে শোয়ানো হল।

কিন্তু ইতোমধ্যে একটি 'দুর্ঘটনা' ঘটে গেল। মাটির উপরে বুঙ্কারে যে প্রহরা মিনার ছিল সেখান থেকে প্রহরারত মান্‌স্‌ফেল্ট নিচে সন্দেহজনক দ্রুত চলাফেরা; দরজা খোলা-বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল। প্রহরীর কর্তব্য অনুযায়ী অনুসন্ধান করতে নিচে এসে বুঙ্কারের সামনে সে খেল ধাক্কা শবযাত্রার সঙ্গে। এফাকে সে পরিষ্কার চিনতে পারল এবং কম্বলে ঢাকা শরীর থেকে কালো পাতলুন পরা দু-খানা পা ঝুলছে দেখতে পেল। সঙ্গে বরমান, জেনারেল বুর্গডর্ফ (পূর্বের সেই পাঁড়-মাতাল), দানব সাইজের অ্যাডজুটান্ট গ্যুন্‌শে, ভ্যালে লিঙে। গ্যুন্‌শে হুঙ্কার দিয়ে মান্‌স্‌ফেল্টকে সরে যেতে বলল। অদর্শনীয় চিত্তাকর্ষক ব্যাপার দেখা হয়ে গেল মান্‌স্‌ফেল্টের।

বরমান সম্প্রদায় সব আটঘাট বেঁধে ভেবেছিলেন 'সাবধানের মার নেই'।

সপ্রমাণ হল 'মারেরও সাবধান নেই'!

অনুষ্ঠান আবার চলল।

বুঙ্কারের দরজার উপর পর্চ ছিল। দরজা থেকে কয়েক হাত দূরে দুটি লাশ মাটিতে শুইয়ে তার উপর পেট্রল ঢালা হল। এমন সময় রাশান কামানের বোমা এসে পড়তে লাগল বলে শবযাত্রীরা পর্চের তলায় আশ্রয় নিলেন। ট্রেভার রোপারের মতে গ্যুন্‌শে একখানা ন্যাকড়াতে পেট্রল ভিজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে সেটা লাশদের উপর ছুড়ে ফেললেন। লিঙে বললেন, তিনি খবরের কাগজে আগুন ধরিয়ে ছুড়ে মারেন। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠে লাশ দুটো ঢেকে ফেলল। পর্চে দাঁড়িয়ে শবযাত্রী দল হিটলারকে শেষ মিলিটারি সেল্যুট দিলেন। তার পর তাঁরা বুঙ্কারের ভিতরে ফিরে গেলেন।

কারনাও নামক আরেকজন সাধারণ প্রহরীরও এসব গোপন অনুষ্ঠান দেখবার কথা নয়। বুঙ্কারের ভেতরকার দরজা তালাবন্ধ দেখে সে-ও বাগানের দিক দিয়ে ঘুরে আসবার চেষ্টা করে মোড় নিতেই আশ্চর্য হল। হঠাৎ সামনে দেখে দুটি মৃতদেহ পাশাপাশি শুয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো দপ করে জ্বলে উঠল— বুঙ্কার মিনারের পর্চে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বলে সে দেখতে পায়নি, ওখান থেকেই জ্বলন্ত ন্যাকড়া, কাগজ ছুড়ে লাশে আগুন ধরানো হয়েছে। খানিক পর আগুন একটু কমে যেতে সে পরিষ্কার চিনতে পারল ভগ্ন-মুণ্ড হিটলারের দেহ। প্রহরী কারনাও কিন্তু সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। পরে সে বলে, 'বীভৎসতম দৃশ্য'। গ্যুন্‌শের মতো বিরাট-দেহ দানব তাবৎ জর্মনিতেই কম ছিল। অল্পেতে বিচলিত হবার পাত্র নয়। সে পর্যন্ত বলে, 'হিটলারের দেহ-দাহ-দর্শন আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা'।

www.pathagar.com

প্রহরা পুলিশের এক তৃতীয় ব্যক্তি এই ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখবার জন্য বুঙ্কারের পর্চে গিয়ে দাঁড়ান কিন্তু মনুষ্যদেহ-বসা পোড়ার দারুণ উৎকট দুর্গন্ধ তাঁকে সেখান থেকে পালাতে বাধ্য করে।

মিনারের ঘুলঘুলি দিয়ে মান্‌স্‌ফেল্ট ও কারনাও দেখতে পান, কিছুক্ষণ পরে পরে এস্‌এস্‌-এর লোক বুঙ্কার থেকে বেরিয়ে 'চিতা'তে আরও পেট্রল ঢেলে দিচ্ছে। তার পর দুজনাতে নিচে নেমে এসে দেখেন, লাশগুলোর পায়ের দিকটা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং হিটলারের হাঁটুর হাড় দেখা যাচ্ছে। একঘণ্টা পরে তাঁরা ফের এসে দেখেন আগুন তখনও জ্বলছে, কিন্তু তেজ কম।

হিটলার আত্মহত্যা করেন অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটেয়— লিঙের হিসাবে তিনটে পঞ্চাশে। খুব সম্ভব বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ-টা অবধি পেট্রল ঢালা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেট্রল ফুরিয়ে যাবার পরও দেখা যায়, দেহদুটো পুড়ে ছাই হওয়া দূরে থাক্‌, মাসচাম পুড়ে গিয়ে কালো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হিটলারকে যাঁরা কাছের থেকে দেখেছেন তাঁরা তখনও তাঁকে চিনতে পারবেন।

শবদাহকারীগণ পড়লেন বিপদে। হিটলার এ পরিস্থিতির সম্ভাবনা মনশ্চক্ষে দেখেননি এবং সে অনুযায়ী কোনও নির্দেশও দিয়ে যাননি। লিঙে তাঁর বিবৃতিতে হক্‌ কথা বলেছেন : পেট্রল দিয়ে মানব-দেহ পোড়ানো তো সহজ কর্ম নয়, হিটলার কেরোসিনের ব্যবস্থা করে গেলেন না কেন? লাশ পোড়ানোর অভিজ্ঞতা ভারতের বাইরে কম লোকেরই আছে। এটা যে কত কঠিন কর্ম সেটা যেসব নাৎসি গ্যাস-চেম্বারের লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে পরে বিরাট বিরাট চুল্লিতে এদের লাশ পোড়ান, তাঁরা ন্যুরন্‌বের্গের মোকদ্দমায় জবানবন্দির সময় এ কথার উল্লেখ করেছেন। এঁদের কর্তা বলেন, 'হাজারখানেক মানুষ গ্যাস দিয়ে মারতে আমাদের বারো মিনিটেরও বেশি সময় লাগত না, কিন্তু সেগুলো পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা ছিল অতিশয় কঠিন ব্যাপার। আমাদের চুল্লিগুলো দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখেও এদের নিশ্চিহ্ন করতে পারতুম না। বিস্তর হাড় চুল্লির তলায় পড়ে থাকত।' অন্য এক সাক্ষী বলেন, 'সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ছিল চুল্লির ধুঁয়ো। মানুষের পুড়ে-যাওয়া ছাই চিমনি দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের নাকে-কানে পোশাক-আশাকে সর্বত্র ঢুকে পড়ত। পাশের এবং দূরের গাঁয়ের লোকগুলো পর্যন্ত বুঝে যায় যে আমরা কোন ব্যবসাতে লিপ্ত আছি।

হিটলারের অনুচরবর্গ ভাবলেন, তাঁর প্রধান বাসনা ছিল তাঁর দেহ যেন শত্রুহস্তে বর্বর তামাশার বস্তু না হয়; অতএব তাঁকে যদি খুব গোপনে গোর দেওয়া হয়, তবে 'ইহুদি' ও রুশরা তাঁর স্বল্পদগ্ধ দেহ খুঁজে পাবে না। সন্ধ্যা মিলিয়ে যাওয়ার পর পুলিশকর্তা রাটেনহুবার গার্ডদের বুঙ্কারে ঢুকে সেখানকার সার্জেন্টকে বলল, হিটলার দম্পতির লাশ গোর দেবার জন্য তিনজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন। তাঁদের নিয়ে যেন তিনি আসেন। এঁদের শপথ করানো হল, তাঁরা সবকিছু গোপন রাখবেন। নইলে তাঁদের গুলি করে মারা হবে।

এঁদের একজনের নাম মেঙেরস্‌ হাউজ্‌ন্‌ ও অন্যজন গ্ল্যান্‌ৎসার। দ্বিতীয়জন বার্লিনের রাস্তায় যুদ্ধে মারা যান, এবং প্রথমজন রুশহস্তে বন্দি হয়ে রুশদেশে দশ বছর কাটিয়ে পশ্চিম জর্মনিতে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, হিটলারের শরীর সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া দূরে থাক, তাঁকে তখনও চেনা যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

বাগানে চিতার কাছে বোমা পড়ে একটা গর্ত হয়েছিল। মেঙেরস্ হাউজ্‌ন্ ও গ্লানৎসার সেটাকে একটা ডবল গোরের সাইজে তিন ফুট গভীর করে খুঁড়লেন। তলায় তক্তা পেতে তার উপর লাশ দুটি রেখে উপরে মাটি চাপা দেয়া হল।

লিঙে ও রাটেনহুবার রুশদেশে দশ বৎসর বন্দিদশায় কাটিয়ে ফিরে এসে বলেন, তাঁরা ঠিক গোরের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন না বটে তবে বাগানের একটা বোমাতে বানানো গর্তে যে উভয়ের কবর দেওয়া হয় সেটা সত্য। রাটেনহুবার তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন, শেষ মিলিটারি সম্মান দেবার জন্য তাঁর কাছে একখানা স্বস্তিক (হাকেন্‌ক্রয়েৎস— হুক্ট ক্রস) পতাকা চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি জোগাড় করতে পারেননি।

মধ্যরাত্রে প্রহরী মান্‌স্‌ফেল্ট প্রহরায় ফিরে এসে আবার মিনারে চড়ল। রাশান বোমা তখনও চতুর্দিকে পড়ছিল ও বিমানবাহিনী আকাশে হাউই ফাটাচ্ছিল। তারই আলোকে সে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, লাশদুটো নেই, এবং বোমাতে খোঁড়া এবড়ো-খেবড়ো গর্তটা পরিপাটি লম্বমান চতুষ্কোণ গোরের আকারে নির্মিত হয়েছে। তার মনে কোনও সন্দেহ রইল না, এটা মানুষের হাতের দক্ষ কাজ; আকাশ বা কামান থেকে বোমা পড়ার ফলে এরকম সুবিন্যস্ত নমুনা তৈরি হতে পারে না।

ওদিকে তার সহকর্মী কার্‌নাও রাষ্ট্রভবনের কাছে সঙ্গীদের নিয়ে প্রহরার রোঁদে বেরিয়েছিল। এদের একজন তাকে বলল, 'ভাবতে দুঃখ হয়, অফিসারদের একজনও ফ্যুরারের দেহ কোথায় রইল না-রইল সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি তাঁর দেহ কোথায় আছে জানি বলে গর্ব অনুভব করি।' (লোকটি হয় মেঙেরস্ হাউজ্‌ন্, নয় গ্লানৎসার)।

কিন্তু যে-ই হোক, লোকটির বাক্যটি ন'সিকে খাঁটি। হিটলারের মৃত্যুর পর থেকে বাকি সব ব্যবস্থা অত্যন্ত অবহেলা ও দরদহীনভাবে করা হয়। এমনিতে জর্মনরা অত্যন্ত পাকা কাজ করতে অভ্যস্ত। তা হলে এমনটা হল কেন? খুব সম্ভবত লোকে যে বলে হিটলার তার সাঙ্গোপাঙ্গকে (এমনকি বহু বিদেশিকেও) মন্ত্রমুগ্ধ, প্রায় মেস্‌মেরাইজ করে রাখতেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। সেই ভানুমতীর ভোজবাজির সঙ্গে সঙ্গে যখন ম্যাজিসিয়ান হিটলার-ভানুমতীও অন্তর্ধান করলেন তখন তারা হঠাৎ সচেতন হল, তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে। অন্ধ হোক সত্য বিশ্বাস হোক, এতদিন গুরুর ওপর তারা তাদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন? 'ঈচ্ ফর হিমসেলফ্ অ্যান্ড ডেভিল টেক দি হাইন্ডমোস্ট'— 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা, আর শয়তান নিক যেটা সক্কলের পিছনে, যেটা অগা কাঁচা'। বরমান অবশ্য তখন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু বুঙ্কারের অন্যতম অধিবাসী— সে বেচারি লাটবেলাট কিছুই না, এমনকি সামান্য 'আগডোম বাগডোমের' ডোম সেপাইও নয়, সে নগণ্য দরজি, ইউনিফর্ম বানায়, 'রিপুকম্ম' করে— সে বলে, 'নেতৃত্ব কখখনও এক কানাকড়িরও ছিল না, লোকগুলো হেথাহোথা ছুটোছুটি করছিল মুণ্ডুকাটা মুরগির মতো।' কিন্তু সেটা তার পরের অধ্যায়ের কাহিনী— সেটা আমি লিখতে যাচ্ছিনে।

আমি শুধু হিটলারের গোর দেওয়ার পরের একটি ঘটনা উল্লেখ করব। আনাড়ি হাতে হিটলার-এফার শবদেহ পোড়ানোর অপটু প্রচেষ্টা যথেষ্ট বীভৎস, এটা বীভৎস ও নিষ্ঠুর।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেই রাত্রেই বুঙ্কারবাসীর পক্ষ থেকে রুশদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব নিষ্ফল হয়। শেষ নিষ্ফলতার খবর আসে পরদিন, ১ মে, দুপুরের দিকে।

www.pathagar.com

এবং পূর্বেই বলেছি, গ্যোবেল্স্ স্থির করেন যে তিনি সপরিবার আত্মহত্যা করবেন। এখন সে সময় এসেছে। তিনি সকলের সঙ্গ ত্যাগ করে সপরিবার আপন বুঙ্কারে চলে গেলেন। কোনও কোনও বন্ধু সেখানে তাঁর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে নিলেন।

লিঙে বলেন— ট্রেভার রোপার এ-বাবদে স্বল্পভাষী— গ্যোবেল্স্ হিটলারের সার্জন ডাক্তার স্টুম্প্ফ্ফেগারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ভিতরে ঢুকতেই গ্যোবেল্স্ দম্পতি বেরিয়ে এলেন। ভিতরে কী হল কেউ সঠিক জানে না।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সিঁড়ির কাছে বেরিয়ে এসে ফ্রাউ গ্যোবেল্সের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন— অর্থ, 'হয়ে গেছে'। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাউ গ্যোবেল্স্ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ভিতরে কী হয়েছিল, কেউ জানে না, জানবেও না। কারণ ডাক্তার ও গ্যোবেল্স্ পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। জনশ্রুতি, ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকলেন তখন বাচ্চারা কফি খাচ্ছে। তাদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল; তিনি বললেন, 'কফি খাওয়া শেষ হলেই তোমাদের সবাইকে নানা রঙের লজেঞ্চুস দেব। নতুন ধরনের লজেঞ্চুস।' বাচ্চারা সাত-তাড়াতাড়ি তাদের কফি, কোকো, দুধ শেষ করল। তিনি বিষে-ভরা লজেঞ্চুস দিলেন। নিজে অন্য ধরনের একটা নিলেন। সব্বাইকে একসঙ্গে মুখে পুরতে হবে। ব্যস হয়ে গেল।...অন্যেরা বলেন, ইনজেকশন দেন, এবং সবচেয়ে বড় মেয়েটি নাকি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নেবে না বলে ধস্তাধস্তি করেছিল। এসব জনশ্রুতির মূলে কী ছিল? যে পাষণ্ড এরকম হীন কাজ করতে পারে সে হয়তো বুঙ্কারে তার পরিচিতদের ভিন্ন জনকে ভিন্ন কথা বলেছিল। যে এসব করতে পারে তার পক্ষে বলাটা আর এমন কী কঠিন কর্ম? কিংবা হয়তো তার এসিসটেন্ট ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিল এবং জনশ্রুতিগুলোর মধ্যে একটা হয়তো তার।

এবং আরেকটা কথা বুঙ্কারের প্রায় সবাই জানতেন। একাধিক রমণী গ্যোবেল্স্দের সব ক'টি সন্তান একসঙ্গে বা ভাগ-বাটোয়ারা করে, ছদ্মনামে বা আপন নামে পালাতে প্রস্তুত ছিলেন। বল্ট্ বলেছেন, 'গ্যোবেল্স্ শেষটায় তাঁর আপন প্রোপাগান্ডার ফাঁদে বন্দি। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, বার্লিন অজেয়। তার পর শেষ মুহূর্তে যখন বার্লিনের হাজার হাজার অসহায় শিশু রোগে ক্ষুধায় মরছে, তখন তিনি— প্রোপাগান্ডা মন্ত্রী— আপন সন্তানদের নিরাপদ স্থলে পাঠান কী করে?' আমি বলি, পাঠালে কী হত? দু-চারটা লোক ঠাট্টা ব্যঙ্গ করত। কিন্তু ছ-ছটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন বড়, না দুটো হৃদয়হীনের তিনটে মস্করা!

পূর্বেই বলেছি, শিশুগুলোর সব-কটারই নাম ছিল হিটলারের আদ্যক্ষর 'এইচ' দিয়ে। তারা তাঁর সঙ্গেই গেল।

বেঁচে গেল শুধু একজন। গ্যোবেল্সের স্ত্রী তাঁর প্রথম স্বামীর সঙ্গে লগ্নচ্ছেদ (ডিভোর্স) করে গ্যোবেল্স্কে বিয়ে করেন। সে-পক্ষের একটি সন্তান ছিল। নাম কোয়ান্ট্। গ্যোবেল্স্ তাকে খুব স্নেহ করতেন। সে তখন বার্লিন থেকে দূরে। গ্যোবেল্স্ তার জন্য একখানি সুন্দর চিঠি রেখে যান।

অতঃপর গ্যোবেল্স্ তাঁর অ্যাডজুটান্ট শ্ব্যাগেরমানকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'এটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা; সব-কটা জেনারেল ফ্যুরারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের সবকিছু লোপ হয়ে গেল। আমি সপরিবার আত্মহত্যা করব। তুমি আমার দেহ পোড়াবার ভার নিতে পার?' শ্ব্যাগেরমান স্বীকৃত হলেন ও পেট্রলের জন্য লোক পাঠালেন

www.pathagar.com

কিন্তু অল্প পরিমাণেই পাওয়া গেল। প্রায় সাড়ে আটটার সময় গ্যোবেল্‌স্ তাঁর স্ত্রীসহ বুঙ্কারের করিডর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে চললেন। পথে শ্যগেরমান ও ড্রাইভারকে পেট্রলসহ দেখতে পেলেন কিন্তু কোনও কথা বললেন না। বাগানে বেরিয়ে তিনি তাঁর অর্ডারলিকে আদেশ দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনা তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। অর্ডারলি দুজনার ঘাড়ের উপর দুটি গুলি মারল। শ্যগেরমান শব্দ শোনার পর উপরে বাগানে গিয়ে মাটির উপর দুই মৃতদেহ পেলেন। পূর্বাদেশ অনুযায়ী তাঁদের চার টিন পেট্রল— আঠারো গ্যালন— তাঁদের উপর ঢেলে চলে গেলেন। ওইটুকু পেট্রলে তাঁদের শরীরের চামড়া আর পোশাক পুড়েছিল মাত্র। মৃতদেহগুলো বিনষ্ট করার বা গোর দেবার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি। রাশানরা পরের দিন সেগুলো বুঙ্কার আক্রমণ করার সময় পায় ও তাঁদের শনাক্ত করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। গ্যোবেল্‌সের ঝলসে যাওয়া শরীরের ফোটোগ্রাফ কাগজে বেরোয়। ভাঙা গাল চওড়া কপাল— চিনতে আমার পর্যন্ত কোনও অসুবিধা হয়নি।

উত্তর হিটলার

হিটলারের মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি, আবার অন্য অর্থে হয়েও ছিল।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই সর্ব পবিত্র শপথ ভঙ্গ করে একাধিক ব্যক্তি বন্দিদশায় রাশানদের কাছে হিটলারের শবদাহ ও কবরের গুপ্তভূমির খবর দিয়ে দেন। তারা হিটলার ও এফার মৃতদেহ খুঁড়ে বের করে ও মেঙেরস্ হাউজন্ প্রভৃতিকে দিয়ে সন্দেহাতীতরূপে শনাক্ত করায়।[১৪]

কিন্তু রাশানরা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। ইতিহাস তাদের ভালো করেই পড়া আছে। তারা জানে, এ-যুগে যাকে অপমান করে আগুনে পুড়িয়ে বা পাথর ছুড়ে ছুড়ে মারা হয়, পরের যুগের লোক তাকেই শহীদরূপে পূজা করে— তার নির্যাতন-ভূমি তীর্থভূমিতে পরিণত হয়।

একজন বিচক্ষণ রুশ জনৈক বন্দি হিটলার-পার্শ্বচরকে বলেন, 'হিটলারের দেহ আমাদের কাছে গোপনে লুকোনো আছে, ভালোই আছে; তোমরা জর্মনরা শহীদ পূজারি।'

তাই রুশরা হিটলারের দেহ জনগণের তামাশার জন্য বাজারে লটকায়নি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হিটলারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে!!

---

১৪. সে আরেক দীর্ঘ কাহিনী এবং তার সঙ্গে যায় বুঙ্কার থেকে বরমান, লিঙে ইত্যাদির পলায়নের চেষ্টা। কিন্তু সেটা বর্তমান কাহিনীর অংশ নয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com